KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Serial No KLMLGK 2007	Place of Publication 20 কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection KLMLGK	Publisher মজুমদার লাইব্রেরি
Title সমালোচনী	Size 4.5" x 7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol & Number ১/১-১২ 2/১-১২ ৩/১-১২	Year of Publication ১৩০৮ মাঘ - ১৩০৯ পৌষ ১৩১০ ১৩১১
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : কৃষ্ণবিহারী সে	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

সমালোচনী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

(মাসিক পত্র)

১ম বর্ষ। Complete

(১৩০৮ মাঘ—১৩০৯ পৌষ)

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনভিজ্ঞ	১৬৪
অনাদৃত	২৩৫
অন্তিমপ্রেম	১৬৪
অন্তিমে	৩৮৬
অনুস্বর ও বিসর্গ	৪৭৩
অলঙ্ঘ্য	৩২৮
অবশিষ্ট	৫৪
অসময়	৪০৯
অস্ফুট	৩৫৯
আকার মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্নাবলী ...	৩৮৯
আকাশের মত	১৬৯
আত্ম সমর্পণ	২৩৭
আদর্শ কবিতা	৮১
আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা	৪৫৩
আশ্বাস	৪৫১
আসলে জীবিত	১৬৯
কবিতার অতীত ও বর্ত্তমান	৫৬
কবির গান	২৮২
কাব্য কথা	২২৬
কাবুলে হিন্দুরাজ্য	৩৪
কাব্যের সংজ্ঞা	১৫৬

বিষয়

কুন্দ, সূর্য্যমুখী ও কমল ... ...
কেন ! ... ...
কৌতুকময়ী (স্বরলিপি) ... ...
গ্রন্থকার (সাকৃরেদি) ... ...
গ্রন্থ সমালোচন ... ...
গান ... ...
গার্ডভূত ... ...
গীতি কবিতা ও তাহার গতি ক্রম ... ...
গোয়েন্দা কাহিনী ... ...
চিঠিচুরী ... ...
চিত্রকরের খেদ ... ...
চিত্র চয়ন ... ...
জাগ্রত স্বপন ... ...
জাল কুমারসম্ভব ... ...
তৈমুরের সদাশয়তা ... ...
নাটকের ভাষা ... ...
নিমীলিতা নয়না ... ...
নিরুপম ... ...
নিবেদন ... ...
পরিত্যক্তের প্রতিজ্ঞা ... ...
প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ... ...
প্রাতঃ পবনা ... ...
প্রার্থনা ... ...
পারসীকদিগের ভারতে আগমন ... ...

পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা

৪৩ প্রিয়তমের প্রতি ৪১
৪ পুস্তক সমালোচনা ২৯২
৬ প্রেমের আদর্শ ৪৭৭
২৯ প্রেমের লক্ষণ ১৪১
১৭ ফ্রেজারি বাবা ১০৪
২ বঙ্কিম কথা ২৭৫
৩৩ বঙ্কিম বাবুর প্রভাব ১১৩
৪ বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ ৮,১৯৭
২৮,৯০,১৮ ব্যথিতা ২৮১
৪১৯,৪৬ বল প্রার্থনা ২২৯
৩২ বর্ষা ও শরৎ ২৮৮
২৩ বর্ষায় প্রেম ৩১৮
৩২ বাদক ৪০৮
৭ বিরহিণী ২৮০
২৪ বিশ্বরূপ ৩৭৫
৩ বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্থূলমর্ম্ম ৯৮
১৬ বৈষ্ণব সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ৩৭৭
১৬ ভগবতী প্রসঙ্গ ১৪৬,২১৫,২১৯
ভারতের আশঙ্কা ৩
১৬ ভাষাতত্ত্ব ২০
২৮ ভাষার প্রাদেশিকতা ২৬৯
১৬ ভিক্ষুক (ছোট গল্প) ১২৫
৪১ ভুল ৩০৬
৩৯ মায়ার খেলা (গীতি নাট্য) ৩৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১
যুগ্মচিত্র	২৫৯
রণরঙ্গিণী	২০৫
রমণী	৪৫১
ললনা	৪৫০
লেখক ও সমালোচক ...	৮৩
শুভদৃষ্টি	৫৪
সন্ধান	৩৭৬
সম্পাদকের প্রতি	৩০৪
সমালোচনা	৭৪
সমালোচনার সমালোচন	২৪০
স্বরলিপি	৪০৫
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	১৭৮
সারওয়াল্টার স্কট্	২২৫
সুন্দরী	২৩৮
সৌন্দর্য্য বুদ্ধি ও তাহার বিকাশ	৪১৩
সৌন্দর্য্য রহস্য	১৭৯
হাসি	৫৫
ক্ষণিকা	৩৬১

সমালোচনী।

মাসিক পত্র।

(মাঘ ও ফাল্গুন)

১ম ও ২য় সংখ্যা।

১৩০৮।

কলিকাতা
হরসুন্দর মেসিন প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৪৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৮। | ১ম, ২য় সংখ্যা।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	নাম
মুখবন্ধ	১	... ...
নিবেদন	২	... ...
ভারতের আশা	৩	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ	৮	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ভাষাতত্ত্ব	২০	শ্রীনাথ সেন
গান	২৭	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোয়েন্দা কাহিনী	২৮	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার
কাবুলে হিন্দুরাজ্য	৩৪	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত
নাটকের ভাষা	৩৭	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
প্রিয়তমের প্রতি	৪১	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কেন!	৪৩	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
গীতি কবিতা ও তাহার গতিক্রম	৪৪	শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
শুভদৃষ্টি	৫৪	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী
অবশিষ্ট	ঐ	শ্রীগিরিজাকুমার বসু
হাসি	৫৫	শ্রীইমদাদল হক্
কবিতার অতীত ও বর্ত্তমান	৫৬	শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত
কৌতুকময়ী—(স্বরলিপি)	৬৯	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
জাল কুমারিসম্ভব	৭২	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমালোচনা	৭৪	শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত
আদর্শ কবিতা	৮১	শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর

মুখবন্ধ।

অভ্যাগতের পরিচয় আবশ্যক। কিন্তু প্রথম দর্শনে যে পরিচয়, সে আর কতটুকু! সে পরিচয়টুকু সমালোচনী নামেই সাধারণে কতক পাইবেন। বিস্তারিত পরিচয় অমুশ্য। কারণ মুখবন্ধেই আমরা মুখ বন্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এটা বলিয়া রাখা ভাল, সাধারণত সকল কাজেই দুইটি উদ্দেশ্য থাকে, মুখ্য ও গৌণ; সমালোচনীর মুখ্য উদ্দেশ্য সমালোচনা। তার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার সাহিত্যের আলোচনাও ইহাতে থাকিবে। উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টার ত্রুটি সাধ্যমতে হইবে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ যা গড়িতে চায় বা যায়, প্রতিকূল স্রোত তা ভাঙ্গিয়া দেয়! সেই সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় ভগবানের নিকট এই আরব্ধ কার্য্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা, আমরা যেন সহস্র প্রতিকূল-স্রোতের মধ্যেও আমাদের সংকল্পিত উদ্দেশ্য স্থির রাখিতে পারি।

নিবেদন।

আমার বিচার তুমি কর, তব
করাল করে,
দিনের কর্ম সঁপিনু তোমার
চরণ পরে।
স্বার্থ দেবতা যদি শিরে ধরি
মিথ্যা আচারে যদি বাঁধা পড়ি
পাপ মনে যদি অবিচার করি
কাহার পরে।
আমার বিচার তুমি করো, তব
করাল করে!
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি বন্ধে বিমুখ
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ
ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়
আপনি বিনাশ করি আপনায়
মোহের ভরে
আমার বিচার তুমি করো, তব
করাল করে!

ভারতের আশঙ্কা।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। এই মৃতপ্রায় দেশে ও সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল জীবন্ত প্রবাহ সবেগে আঘাত করিয়াছিল। বাহুবলে ও রাজ্যকৌশলে ইংলণ্ড সমগ্র ভারত গ্রাস করিয়া চাকচিক্যবিশিষ্ট সভ্যতাবলে সমাজ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমাদের সকল বন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, ইয়োরোপের আকর্ষণে ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়, আচার ভ্রষ্ট হয়, জাতির লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়—সকলই যায় যায় হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রথম ফল স্বদেশীয় সকল সামগ্রীর প্রতি বিরাগ—ধর্ম্মে অনাস্থা, লোকাচারে অশ্রদ্ধা, আহার ব্যবহারে অভক্তি। স্বধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ ধর্ম্মসংস্কারের, স্বজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা উন্নত মনের, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা স্বাধীন চিত্তের, পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিক হইতে নানাবিধ আসুরিক বল সমবেত হইয়া ভারতের ক্ষীণ জীবনস্রোত অপ্রতিহত খরবেগে পশ্চিম সিন্ধুর অভিমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু এই প্রাচীন দেশের মেরুমজ্জাগত একটী প্রাণশক্তি আছে যাহাতে ইহা মরিয়াও মরে না। এত পরীক্ষা কখন কোন জাতির হয় নাই—ধর্ম্মবিপ্লব, রাজ্যচ্যুতি, পরাধীনতা কতবার ঘটিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে অতল-জলমগ্ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম জাগিয়া উঠিয়াছিল, অবশেষে সেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভাসিয়া দেশের বাহির হইয়া গেল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বর্দ্ধিত প্রভাবে পুনরায় দেশ অধিকার করিল। ইসলাম ধর্ম্ম শোণিতাক্ত তরবারি হস্তে দেশময় ধর্ম্মপ্রচার করিতে

লাগিল, মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জীদ-গঠন করিতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ লোককে বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করিতে লাগিল। অবশেষে সে সাম্রাজ্য ও ধর্ম্ম হীনবল হইয়া আসিল। ইংরেজের সঙ্গে তাহাদের নূতন ধর্ম্মের আগমনে কত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ে সে স্রোতও মন্দ হইয়া আসিল। কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম বিনিময়ের অপেক্ষা অধর্ম্মের প্রচার আরও অধিক। নাস্তিকতার দৃঢ়তা ও দর্প গেল, কেবল নাস্তিকতার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম রহিল। যেমন নিষ্ঠা গেল তেমনি আত্মসম্ভ্রম গেল; অবিশ্বাসের সহিত যথেচ্ছাচার আসিল। এই স্রোতের বেগও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল আবার তাহারই উপক্রম। আমাদের যে সকল সামগ্রী ভাসিয়া যাইতেছিল জোয়ারের মুখে আবার তাহাই ফিরিয়া আসিতেছে, বান ডাকিয়া বড় জোরে জোয়ার আসিবার উপক্রম হইতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে কালের স্রোত অত্যন্ত বেগে আবার উজান বহিবে।

আমরা কি করিব? ভাটার সহিত যেমন ভাসিয়া যাইতেছিলাম জোয়ারের সহিতও কি তেমনি ভাসিয়া চলিব? নিশ্চেষ্ট, নিশ্চিন্ত হইয়া জলে গা ভাসান দিলেই কি আমাদের কর্ত্তব্য সাধিত হইবে? স্রোত যেরূপ ফিরিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে ধর্ম্ম যে সমাজকে সেই দেশের লোকে নানাবিধ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও হেয়জ্ঞান করিত, তাহারই প্রতি ইয়োরোপ আমেরিকার বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অত্যন্ত অনুরক্ত হইতেছেন। কেহ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, কেহ বক্তৃতা করিতেছেন যে এমন ধর্ম্ম ও সমাজ পৃথিবীতে কোথাও নাই। ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণ হিন্দুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছেন। এই সকল বিদেশী লোক আমাদিগকে বলিতেছেন, তোমরা স্বীয় ধর্ম্ম, লোকাচার প্রভৃতি কখন ছাড়িও না।

তোমাদের দর্শনের সমক্ষে সকল দর্শন পরাস্ত হইবে, তোমাদের সমাজ ও বর্ণাশ্রমের তুলনায় সকল সমাজ হীন। এই সকল কথা শুনিয়া, ও শ্বেতাঙ্গ হিন্দু প্রভৃতি চমৎকার ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া আমরা ক্রমশ আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইতেছি। প্রাচীন আর্য্যদিগের লোকাচার ও ধর্ম্ম যে উৎকৃষ্ট ছিল সে ধারণা ত বহুকাল দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। এখন আমাদের মনে সংস্কার জন্মিতেছে যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজও সেইরূপ উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয়। আমাদিগের সামাজিক প্রথা, আমাদিগের আচার ব্যবহার, আমাদিগের বিবাহ পদ্ধতি, সকলই উৎকৃষ্ট ও উন্নত। অতএব কেহ কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের নামোল্লেখ করিলে হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিব!

ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা স্বতন্ত্র, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য আমরা উত্তমরূপে অনুভব করি না! প্রাচীন আর্য্যজাতির কথা লইয়া যখন আমরা গর্ব্ব করি তখন আমরা যে কেবল সেই বংশজাত এরূপ মনে হয় না, বরং ধারণা হয় যে সেই জাতির সকল গুণই আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তিয়াছে। এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা অপর অপর জাতিকে, বিশেষ যে জাতি এখন আমাদিগের রাজা, অত্যন্ত কৃপা ও কিঞ্চিত ঘৃণার চক্ষে দেখি। ভাবি, ইংরাজের সৈন্য আছে, কিন্তু তাহাদের কি শাস্ত্র আছে? তাহাদের গোলা গুলি আছে, কিন্তু তাহাদের কি যোগ আছে? আমাদের তুলনায় উঁহারা সেদিনকার বর্ব্বর জাতি মাত্র! বেদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত যে জাতির সেই জাতিই যে আমরা, সেই জাতির পূর্ণ মহিমা আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এ কথা বলিতে বা ভাবিতে আমরা কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না।

সেই আর্য্যজাতির অপেক্ষা প্রাচীন রোমান্ জাতি অনেক তরুণ। ইটালী স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়া আবার সেই রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই রোম এখনও রহিয়াছে। তবে বর্ত্তমান ইটালিয়ান জাতি রোমান্‌দিগের

বংশধর নহে কেন? ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীকে সিসিরো ও ব্রুটসের সমকক্ষ বলি না কেন? আর হুবর্টকে সিজরের স্থানীয় বলিব কি? তাহা হইলে পৃথিবী সুদ্ধ লোক হাসিয়া আমাদিগকে বাতুল বলিবে। অপর পক্ষে ইটালিয়ান রোমান জাতিতে যে টুকু সাদৃশ্য আছে আমাদিগের সহিত প্রাচীন আর্য্যজাতির সে টুকুও নাই। কোথায় সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর কোথায় বা সেই চিরানন্দময়ী অযোধ্যা নগরী! আমরা শত শত বৎসর পরাধীন অবস্থায় বাস করিতেছি। ইটালীয়গণ যেরূপ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর্য্যগণ সেইরূপ রোমান্‌দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি আমরা নিজকে প্রাচীন আর্য্যজাতির স্থানীয় বিবেচনা বা প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না।

প্রাচীন আর্য্যজাতির ন্যায় যদি আমাদিগেরও প্রকৃত মাহাত্ম্য থাকে তাহা হইলে আমাদিগের অবস্থান্তর হইল কেন? তাঁহারাই বা কেন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, আমরাই বা কেন ভিন্ন ভিন্ন জাতির পদানত হইয়াছি? এই গুরুতর ভ্রম অপনীত হওয়া কর্ত্তব্য। আর্য্যজাতির গৌরব এক্ষণে জগতের গৌরব। আমাদিগের জন্য কেবল সেই আদর্শ রহিয়াছে। সে সংযম, সে শিক্ষা, সে তেজস্বিতা, সে ন্যায়পরায়ণতা কিছুই আমাদের নাই। সে ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয় সংযম, সে চরিত্রদৃঢ়তা, কিছুই নাই। সেকালের সমুদয় লুপ্ত হইয়াছে, কেবল কীর্ত্তি যায় নাই। কেবলমাত্র কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমরা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইব না।

আরও একটী কথা স্মরণ করিতে হয়। সেই প্রাচীন-কালে জাতি যেরূপ উন্নত ছিল, জাতির আদর্শ তদপেক্ষা উন্নত ছিল। তাঁহারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, সর্ব্বদা উন্নতির অনুশীলন করিতেন। মানব জাতির উন্নতির সমাপ্তি নাই। আমরা যে আদর্শ সর্ব্বদা উল্লেখ করি সেই ভ্রষ্ট আদর্শের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কি চেষ্টা করিতেছি?

রাজদ্বারে অমরা নানা বিষয়ের জন্য প্রার্থিত হই, কিন্তু জাতির যথার্থ উন্নতি আমাদিগের স্বায়ত্ত সে কথা আমরা স্মরণ রাখি না। আমাদের চরিত্র আমাদের স্বায়ত্ত, সমাজ আমাদের অধীন, এ কথা কেন আমরা স্মরণ করি না? যদি আত্মসম্মান, আত্মসংযম আমরা রক্ষা করিতে না পারিব তাহা হইলে রাজপ্রসাদেই বা আমাদের কি উপকার হইবে? এই যে বিশ্বাস মূলীভূত হইতেছে যে আমাদের বর্ত্তমান সকল প্রথাই উৎকৃষ্ট এবং আমরা পরাধীন হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ইহাতেই আমাদিগের প্রকৃত অমঙ্গলের আশঙ্কা, কারণ আমরা উন্নতির পথ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রোধ করিতেছি। এখন ভারতের নানা দেশে নানা রূপ প্রথা, নানা জাতির আচার নানা। এক দেশে বাল্য বিবাহ লইয়া তুমুল তর্ক চলিতেছে, কেহ বলেন এরূপ বিবাহ উত্তম, কেহ বলেন ইহা দোষাবহ। কোন দেশে বাল্য বিবাহ আদৌ প্রচলিত নাই। অথচ উভয় জাতিই হিন্দু, কাহার নিষ্ঠার অভাব নাই। বিধবার ব্রত রক্ষার সম্বন্ধে দেশাচার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; এক পশ্চিম বঙ্গের কয়েক বর্ণ ব্যতীত আর কোনও বিধবার নির্জ্জলা একাদশীর ব্যবস্থা নাই। উত্তর ভারতে পর্দ্দা আছে, দক্ষিণ ভারতে নাই। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশাচার ও লোকাচারের সামঞ্জস্য হয় না কেন? সকল জাতিই হিন্দু, অতএব অনর্থক ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণের কথা তুলিলে চলিবে না। যদি যথার্থই প্রাচীন আর্য্য জাতিকে আমরা আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করি তাহা হইলে তৎপ্রতি অগ্রসর হইবার প্রয়াস করি না কেন? কূট তর্কে কালক্ষেপ ও চিত্ত বিক্ষেপ না করিয়া আমরা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই না কেন? রাজদ্বারে এ জন্য ভিক্ষা করিতে হইবে না, রাজার নিয়োগ অথবা আদেশেরও প্রয়োজন হইবে না। যদি আমরা এই মহাব্রতে কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহা হইলে শত শত রাজপ্রসাদও ইহার সমতুল্য হইবে না।

আর এই যে রজোগুণপ্রবল ইংরাজ জাতি, ইহারা কি যথার্থই ঘৃণার পাত্র? আলস্যে অভিভূত হইয়া আমরা এই ক্ষমতাশালী জাতির নিকট কি কিছু শিক্ষা লাভ করিব না? এই রজোগুণসম্পন্ন মহাপ্রতিভাশালী অক্লিষ্টকর্ম্মা, রাজনীতি বিশারদ, কর্ম্মযোগী জাতির নিকট আমাদের কি কিছুই শিখিবার নাই? আমাদিগের শিক্ষার নিমিত্তই ললাটে রাজতিলক ধারণ পূর্ব্বক ইহারা ভারতে আগমন করিয়াছেন। যদি কেবল ইঁহাদের আহারবিহার, বেশভূষা, বিলাস ঐশ্বর্য্য শিক্ষা করিয়াই আমাদিগের শিক্ষা পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে ভারতের নিতান্ত মন্দভাগ্য গণনা করিতে হইবে।

ভারতে যে কালের স্রোত ফিরিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এ নব প্রবাহে আত্মশ্লাঘা ও আত্ম-গরিমার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু যে জাতি বা সমাজের গতিরোধ হইবে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে জাতি চলন্ত তাহারা জীবন্ত, স্থিত হইলেই মৃত্যু নিকট। ভারতের যে চিরন্তন আদর্শ রহিয়াছে ভারতবাসী অপরিশ্রান্ত গতিতে তাহারই অনুসরণ করিতে যত্নবান হউন।

বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)*

১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে সাবিত্রী লাইব্রেরির বাৎসরিক সভায় বঙ্কিম বাবু সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি বাবু শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বক্তা বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু এবং বক্তৃতার বিষয় "আমাদের অভাব।" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার শীঘ্র কার্য্যান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন বলিয়া বঙ্কিমবাবু

* প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব "সাধনা" ও "প্রদীপে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রভৃতিকে ঠেলিয়া অধিবেশন স্থানে পাঠাইলেন। "বন্দে মাতরং" গীত এবং প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হইলে পর উপরের বারান্দা হইতে একটী বালিকা "ঐ ঐ" বলিয়া চীৎকার করিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—গোধূলির তরল ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। সকলেই চাহিয়া দেখিলেন যে সভাপতির মাথার উপর যে ল্যাম্প জ্বলিতেছিল সহসা তাহা ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় স্থান ছাড়িয়া পলাইলেন—সেই অবকাশে সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবুদের সঙ্গে আমিও বাহিরে আসিলাম। ডাক্তার সরকার চলিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়া হাসিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন "ডাক্তার যেখানে, রোগী সেখানে!"

একদিন সন্ধ্যার পর কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বিজ্ঞানে action reaction যেমন, কাব্যেও কি ঠিক তাই? উত্তর "ঠিক্ তাই"। তোমার সঙ্গে সেক্ষপীয়র পড়িতে পারি ত বেশ বুঝাইতে পারি। ক্লিওপেট্রার সে কথা মনে আছে কি Have I the aspic in my lips? সেই reaction. ওথেলোতে ইয়াগোতে সেই কথাবার্ত্তায় action. এণ্টনি—ক্লিওপেট্রার এণ্টনির সঙ্গে জেনারেলের ঝগড়া action reaction. ম্যাকবেথের Knocking Scene সেই action reaction. ইহার পর হর্ ব্যাওম্যানের ম্যাকবেথ অভিনয়ের কথা উঠিল।

১২৮৯ সালের শেষ ভাগে ইণ্ডিয়ান্ক্লবের সাধারণ অধিবেশনে দেশের বড় লোকেদের সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। তখন ইলবার্ট বিলের আমল, সাহেবদের সঙ্গে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির ভাব প্রবল হইতেছিল। সেই অধিবেশনে সে কথাও আলোচনা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু মন খুলিয়া নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সেই সূত্রে যে প্রতিযোগিতার ভাব

জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মন্দ নহে। ঐরূপ দলাদলির ফলেই আমাদের উন্নতি—আপনা হইতে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে সে ভালই হইয়াছে। বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন, একটু রাখিয়া ঢাকিয়া তিনিও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা এবং আত্মমর্য্যাদার ভাব বঙ্কিম বাবুর চরিত্রে যেরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, রাজকর্ম্মচারীদের ভিতর তাহা সচরাচর সুলভ নহে। স্বর্গীয় শ্যামাধব বাবু বলিতেন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের সহিত অতি কম বাক্যে এবং ব্যবহারে সর্ব্বদা তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন। হুগলীতে নূতন নূতন আসিয়া শ্যামাধব বাবু একদিন ১১ টার আমলে কোন বড় সাহেব সন্দর্শনে চলিয়াছেন। ছুটার দিন ধড়া চূড়া আঁটিয়া প্রখর রোদে তিনি ছুটিয়াছেন, বঙ্কিমবাবুর বারান্দার সম্মুখে তাঁহার সাম্‌নে পড়িয়া গেলেন। "এত রৌদ্রে ব্যস্ত হ'য়ে কোথা যাও শ্যামাধব ?" ব্যাপার বুঝিয়াও বঙ্কিম বাবু প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তর শুনিয়া হাসিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে গলদ্ঘর্ম্মাবস্থায় শ্যামাধব বাবু গৃহে ফিরিতেছেন, আবার বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "শ্যামাধব, আমার ইচ্ছা তোমার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আর একটু বাড়ে।"

কেশব বাবুর স্বর্গারোহণের পরবৎসর এলবার্ট কলেজের পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পার্শ্বে বঙ্কিমবাবু উপবিষ্ট ছিলেন। মিত্র মহাশয় উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলে কোন দেশ-বিশ্রুত ব্যক্তি স্মিতমুখে কখনও বা হাস্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎবৃদ্ধি করিয়া মাথা নাড়িয়া তাহার প্রত্যেক কথার অনুমোদন করিতেছিলেন। বক্তৃতা সরস হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে হাস্যরস সঞ্চারের বিশেষ অবসর ছিল না। সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই উন্নত নাসা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হাস্যপটু শ্রোতা মহাশয়ের আপাদ-

মস্তক লক্ষ্য করিতেছিলেন। "মুচিরাম গুড়ের জীবনী" সম্ভবত ইহার পরেই ছাপা হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শন আমার হস্তে আসিবার কথা ঠিক্ হইয়া গিয়াছে এমন সময় অক্ষয় বাবু চুঁচুড়া হইতে একদিন কলিকাতায় আসিলেন। কলুটোলায় বঙ্কিম বাবুর বাসাটি তাঁহার জানা ছিল না আমি সঙ্গে করিয়া গেলাম। সামান্য জ্বর হওয়ায় বঙ্কিম বাবু সেদিন কাছারি যান নাই। কি আহার করিয়াছেন অক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "লুচি ভাজিতে বলেছি খাব এখন।" অক্ষয় বাবু বলিলেন "রাঢ় দেশে নিয়ম, জ্বর হইলেই গৃহস্থের ঘরে মুড়ির খোলা চড়ে।" বঙ্কিম বাবুকে "ব্রাইড অব লেমারমুর" পড়িতে দেখিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম, "এসব বই এখনও আপনি পড়েন ?" আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর করিলেন "এসব বই কি কখন পুরাণ হয় ?" তার পর বঙ্গদর্শনের কথা উঠিল। অক্ষয় বাবুকে বলিলেন—প্রীশ বাবু বঙ্গদর্শন নিলেন, তোমরা লেখ। "কেন, আপনি ?" "আমিও লিখব, তবে বুড় হ'লাম কত আর লিখব ?" হাসিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, "এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে তায়।" বঙ্কিমবাবু উচ্চহাস্য করিলেন।

উত্তরপাড়ার হিতকরীসভায় যে বাৎসরিক অধিবেশনে প্রতাপ বাবুর বক্তৃতায় সভাপতি বীমস্ সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া যান, বঙ্কিম বাবু সে দিন সেখানে বৈবাহিক গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর রাত্রে এক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমরা কলিকাতায় ফিরিতেছিলাম। গাড়ী ছাড়িতেছে এমন সময় উকীল ভৈরব বাবু ট্রেণ ফেল করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের গাড়ী পূর্ণ, ভৈরব বাবুর স্থান হয় না। আমি সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ, বিশেষত ভৈরব বাবু আমার পিতৃবন্ধু, বঙ্কিম বাবুকে আমি বলিলাম যে তিনি ভিতরে বসুন, আমি কোচ-বাক্সে যাব। শীতকালের রাত্রি,

ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার অসুখ করিবে বলিয়া বঙ্কিম বাবু বারম্বার তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং আমি নিতান্ত জেদ করিলে নিজে ধরিয়া আমায় কোচ বাক্সে উঠাইয়া দিয়া তবে গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। পথে ডাকিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কষ্ট হইতেছে কি না এবং গাড়ী থামিলে নিজে আসিয়া আমায় নামাইয়া লইলেন। বাসায় ফিরিয়া রাখালকে আমার কথা, অনেক বার বলেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন হয়ত আমার অসুখ করিবে।

এই স্নেহ প্রীতির গভীরতা তাঁহার স্বসম্পর্কীয়গণ সম্বন্ধে কত বেশী ছিল, সহজেই বুঝা যায়। ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ সংসার রাজ্যের ফের-ফাঁফর কখনই বুঝে না, তার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। আমাদের বীরভূম অবস্থান কালে যখনই কলিকাতায় গিয়া তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, জ্যোতিশের উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া বারম্বার আমায় বলিয়াছেন, তাকে সর্ব্বদা দেখিও। রাখালের অসুখ বিসুখ করিলে বড় বিচলিত হইতেন।

সাহেব সুবার ছায়া কখন বড় ইচ্ছা করিয়া মাড়াইতেন না, জামাতৃস্নেহের আধিক্যবশত ইদানীং দুই একবার সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। নবজীবন বাহির হওয়ার মাস দুই মধ্যে প্রচারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। দুই খানি মাসিক পত্র ভাল চলিবে না বলিয়া বঙ্কিম বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু কয়জন তাঁহাকে শেষোক্ত উদ্যম হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানত রাখালকে লিপ্ত রাখার জন্যই প্রচারের সৃষ্টি, তাহাকে কোন কার্য্যোপলক্ষে দূরে পাঠাইতে ইচ্ছা ছিল না। বন্ধুগণ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করায় স্নেহার্দ্রস্বরে বলিয়াছিলেন "রাখাল কাছে না থাকিলে কি লইয়া থাকিব?" হেম বাবু সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন—হাসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিম আমায় পোষ্য পুত্র কর্ ভাই!" ভারি হাসি পড়িয়া গেল!

দৌহিত্রগণের প্রতি স্নেহ মায়ায় তাঁহার জীবন মধুময় হইয়াছিল। রাখালের যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না, রাখালকে বলিতেন, তাদের লইয়া তাঁর আর লেখা পড়া হয় না। একটী ছেলের অভাব হইলে তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়াছিলেন—তাহার উদ্দেশে পুস্তক উৎসর্গচ্ছলে বলিয়া ছিলেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ! জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সীধুকে যত্ন করিয়া হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে তাহার আলোচনা করিলে ভারি আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের কিছু দিন পূর্ব্বে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক দিন দেখা করিতে যাই। বালক সীধু বাটীর সন্নিহিত গলিতে বল লইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল, মাতামহের উপর্য্যুপরি আহ্বানে আসিল বটে, কিন্তু খেলার বিঘ্ন হইয়াছিল, মুখ ভার করিয়া রহিল। দাদা মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধ শ্রীশ বাবুকে একবার হার্ম্মোনিয়ম শুনাও, সীধুর মন তখন কিন্তু খেলার দিকে ছিল সে বাজানায় তেমন ঘেঁসিল না। তাঁহার সেদিনকার স্নেহ-কোমল মুখচ্ছবি এবং আগ্রহ অনুরোধের মিষ্টহাসি টুকু আজিও আমার মনে জাগিতেছে।

ঐ দিন বলিয়াছিলেন যে "সখা" নামক বালক-পাঠ্য মাসিক পত্রে তাঁর বাল্য জীবনের যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা অনেকটা ঠিক। সত্য সত্যই কয় বৎসর তিনি বৎসরে দুইবার ক্লাস প্রোমোশন পাইয়াছিলেন। মধ্যম দৌহিত্র বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাসে প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হইতেছে, অতএব সন্তরত তাঁর ছাত্র জীবনের গৌরব কতক সে রক্ষা করিতে পারিবে সোৎসাহে এরূপ ভরসা করিয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে কলুটোলার বাসায় একদিন সন্ধ্যার পর কয় জন মফঃস্বলের বাবু বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পার্শ্বের দিক্ হইতে শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল "ঠাকুর দাদা হে? উত্তর "কেন হে?" প্রশ্ন "কি কচ্চ হে? সকলে হাসিয়া উঠায় শিশু অপ্রতিভ্ হইয়া গেল;

আর অগ্রসর হইল না। এই শিশু রাখালের দ্বিতীয় পুত্র, আদরের ডাক নাম নুটু। নুটু দেখিতে অনেকটা মাতামহের মত।

ছেলেরা একটু একটু বড় হইলে বাপের কাছে মাঝে মাঝে ধমক খাইত। কাছারী হইতে ফিরিয়া সে কথা শুনিলে বঙ্কিম বাবু হাসিতেন, বলিতেন, বেশ বেশ, বাপের একটু আধটু শাসন করা ভাল!

আমার রাজকার্য্যে প্রবেশ করার কিছুদিন পর রাখালের ইচ্ছা হইয়াছিল ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ড যান। আমি সে পরামর্শ অনুমোদন করিয়াছিলাম। অতি গোপনে পরামর্শ হইয়াছিল। আমি জানিতাম শেষে বঙ্কিম বাবু যাইতে দিবেন না। রাখালের শোক যে তাঁহাকে পাইতে হয় নাই ইহা এখন সান্ত্বনার কথা মনে হয়। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর দুই তিন বার মাত্র রাখালের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। দৌহিত্রগণের প্রতি বঙ্কিম বাবুর স্নেহের কথা উঠিলে বলিয়াছিলেন সে স্নেহে তিনি পাগল ছিলেন। রাখালের মুখে যে আনন্দ দীপ্তি ছিল, ইদানীং তাহা আর দেখিতাম না। আমার কাছে কিছুই তাঁর গোপন ছিল না, বুঝিতে পারিতাম বঙ্কিম বাবুর শোক শেলের মত তার হৃদয়ে বিঁধিয়াছে। কিন্তু তখন জানিতাম না ইহ জীবনে সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

কৃষ্ণনগর রাজবাটীর দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুলেখক বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মাঝে মাঝে স্বাধীনভাবে বঙ্কিমবাবুর লিপিপ্রণালী এবং উপন্যাসে চিত্রিত কোন কোন চরিত্রের সমালোচনা করিতেন। এক দিন জ্ঞানেন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কথায় কথায় কার্ত্তিক বাবুর সহিত তাঁর বন্ধুত্বের কথা উঠিল। হাসিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"সে কথাটা মনে রেখো হে, সে কথাটা মনে রেখো!"

বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও ক'দিন আমার কথাপ্রসঙ্গে এ দেশে পোষ্যপুত্র—গ্রহণ প্রথার আলোচনা হইল। তাঁহার মতে পোষ্যপুত্র প্রায় ভাল হয় না। লোকে নাম রাখিবার জন্য পরের ছেলে গ্রহণ করে, তার চেয়ে সৎকীর্ত্তির কোন অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত নাম রক্ষা হইতে পারে। নিজের পুত্রের দ্বারা অনেকের মুখ অন্ধকার হইতে দেখা গিয়াছে, পরের ছেলে ত দূরের কথা।

শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর একবার পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল। তাহাতে তিনি তন্ত্রের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন। সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে এক দিন সে কথা উঠিলে বলিলেন প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র বঙ্কিমের পড়া নাই। সিদ্ধ তান্ত্রিকেরা বলেন আসল তন্ত্রশাস্ত্র বঙ্গদেশে এখন আর চলিত নহে—সে আলোচনাই নাই।

পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত বাবু অধরলাল সেনের গৃহে একদিন বঙ্কিম বাবুর সাক্ষাৎ ঘটে। পরমহংস কথায় কথায় বলিয়া ছিলেন, শুনিয়াছি আপনার বড় বিদ্যার অভিমান। বঙ্কিম বাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেও পরমহংস নরম হন নাই। বঙ্কিম বাবু হাসিয়া সকল উড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের অতঃপর আর কখন দেখা শুনা হইয়া ছিল কি না আমি অবগত নহি।

একদিন অপরাহ্ণে বঙ্কিম বাবুর কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় গেরুয়া বসন পরিধান তাঁর কোন পূর্ব্ব পরিচিত একটী লোক আসিলেন। কথায় বুঝিলাম কার্য্যক্ষেত্রে পুরাতন পরিচয়। আগন্তুক নিজের কোন আত্মীয়ের জন্য সাহেবসুবার কাছে এক খানি অনুরোধ পত্রের প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিম বাবু ঔদাস্য সহকারে অথচ মিষ্টভাবে বলিলেন, "ওসবে আমি

আর নই। তুমি গেরুয়া ধরেছ, মনে মনে আমার ও তাই জেনো।"

সচরাচর কার্য্যক্ষেত্রে সিভিলিয়ানদের সহিত বঙ্কিম চন্দ্রের বনিবনাও হইত না। বিশেষত Bransonism লেখার পর হইতে সাহেব মহলে তিনি কিছু অপ্রিয় হইয়া ছিলেন। অনেক বিবেচনার পর আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক সাহেব তাঁহার গুণের মর্য্যাদা করিতেন। মাননীয় বোলটন সাহেবের সঙ্গে বহরমপুরে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার যে ঘনিষ্টতা হয়, বরাবর তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্প্রতি-পরলোক-গত গৃম্‌লি সাহেব তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কথা কতবার আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন। সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট হইলে বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ নির্ভীকতার জন্য প্রথম প্রথম একবার মনোমালিন্যের কারণ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে বঙ্কিম বাবুর কাজকর্ম্ম দেখিয়া তিনি একেবারে খুসি হন। হাসিয়া বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন তোমার কথাই ঠিক; গৃম্‌লি সাহেবের খুব মহৎ অন্তঃকরণ। সুপণ্ডিত গৃয়ারসন্ সাহেব আমায় দুইবার বলিয়াছিলেন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "শকুন্তলা মিরান্দা ও ডেস্‌ডিমোনা" শীর্ষক বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ যথার্থই বড় উপাদেয়। সেরূপ লেখা বেশী তিনি পড়েন নাই।

দেখিয়াছি শম্ভু বাবু লিখিতে বসিয়া বড় কাটকুট করিতেন। নব্যলেখকদিগকে তিনি বলিতেন নিজে লিখিয়া কাটিতে মনের খুব বলের প্রয়োজন। বঙ্কিম চন্দ্রের সে সব ছিল না। প্রথম বারেই ক্ষিপ্রহস্তে অবিশ্রান্ত কাপি হাফ মার্জ্জিনে তিনি লিখিয়া যাইতেন, পরে কিছু দিন ফেলিয়া রাখিয়া আবশ্যক বোধ করিলে চাই কি সমগ্র পরিচ্ছেদ বাদ দিয়া নূতন করিয়া আবার

লিখিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতির অবসরে রাখালের সঙ্গে লুকাইয়া দেবীচৌধুরাণীর যে সম্পূর্ণ কাপি পাঠ করি প্রকাশকালে তাহার বিস্তর বদলাইয়া গিয়াছিল। বঙ্গদর্শন আমার হাতে আসিলে ঐ উপন্যাসের প্রুফ আমায় দেখিতে হইত। তিনি যে সব অংশ অবহেলায় কাটিয়া দিতেন, আমার তাহাতে বড় মায়া বোধ হইত। তাঁহার লেখনী কিরূপ দ্রুত চলিত তাহার একটী উদাহরণ মনে হইতেছে। "বহুবাজারের মোড়ে সংস্থাপিত জনসন্ প্রেসে একদিন সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া তাঁহার টেবিলে "কমলাকান্তের জোবানবন্দী"র অসম্পূর্ণ কাপি দেখিলাম। পড়িতে পড়িতে আমায় হাসিতে দেখিয়া সঞ্জীব বাবু বলিলেন—আমি এখনও পড়ি নাই। কি লিখেছে পড় ত। শুনিয়া তিনিও হাসিতে লাগিলেন এবং যেরূপে প্রবন্ধটীর জন্ম হইল তাহার গল্প করিলেন। সেইদিন প্রত্যূষে বৃষ্টি হইতেছিল, সঞ্জীব বাবু তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। বঙ্কিম বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মেজদাদা এখনও বিছানায় পড়ে কি ভাবচেন? বঙ্গদর্শনের একটা লেখার অভাব হওয়ায় সঞ্জীব বাবু চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন—জল লিখি কি বাদল লিখি তাই ভাব্‌চি। বঙ্কিম বাবু তখনই বাসায় চলিয়া গেলেন এবং কাছারী গমনের পূর্ব্বে কমলাকান্তের জোবানবন্দীর অর্দ্ধেকের উপর সম্পূর্ণ হইল। পরদিন বাকী অংশ পড়িবার ঔৎসুক্যে শীঘ্র শীঘ্র বঙ্গদর্শন আফিসে গিয়া দেখি, প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে, অথচ কাটকুট নাই বলিলেও চলে।

উভয় ভ্রাতায় বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের লিপিচাতুর্য্যের বড় প্রসংশা করিতেন। বঙ্কিম বাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার বলিয়াছিলেন চন্দ্রশেখর বাবুর দুই একটী প্রবন্ধ পড়িয়া নিজের লেখা বলিয়া তাঁর ভ্রম হইয়াছে।

ইদানীং বঙ্কিমচন্দ্র ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন, বেশ কোষ্ঠী দেখিতে শিখিয়াছিলেন। আমার কোষ্ঠী দেখিতে চাওয়ায় একদিন তাহা পকেটে লইয়া বাহির হইলাম। তখন রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যগুলি পড়িয়া পদরত্নাবলী সংগ্রহ করিতে ছিলাম, প্রত্যহ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের বৈঠক হইত। আমার, কোষ্ঠী দেখিয়া রবীন্দ্র বাবু নিজের সুবৃহৎ কোষ্ঠী-খানি বাহির করিলেন, আমি সে খানিকেও হস্তগত করিয়া সন্ধ্যার পরই বঙ্কিম বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। রবি বাবুর কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ছিলেন, বারম্বার বলিয়া ছিলেন যে তিনি "লগ্ন চাঁদা" এবং কোষ্ঠীর ফল অতি আশ্চর্য্য। রবীন্দ্রনাথকে কি অনন্যসাধারণ চক্ষে তিনি দেখিতেন, তাহা সেই দিন বিশেষ ভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। মনে হইতেছে আমার সেই ধারণার কথা পর দিন প্রিয়বন্ধু বাবু প্রিয়নাথ সেনকে না বলিয়া থাকিতে পারি নাই। তাহার নিজের ও সহধর্ম্মিনীর কোষ্ঠী এবং ঠিকুজি মিলাইয়া বঙ্কিম বাবু আমায় বুঝাইলেন তাঁহাদের জীবনের অনেক কথা ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া গিয়াছিল। আমার কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দুই একটী পরে ঘটিয়া গিয়াছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ বেলা সাড়ে দশটার আমলে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রুসিয়ার বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফে-সর বন্‌রফ্ বঙ্কিম চন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণ বিহারী সেন, বাবু হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত এবং বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি কলুটোলায় তাঁহার বাসায় সম-বেত হন। প্রবীণ প্রফেসর নববিজিত বর্ম্মা মুল্লুক সম্প্রতি ঘুরিয়া আসিয়া ছিলেন, প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন সে দেশ সম্বন্ধে বাংলা

ভাষায় কোন পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে কিনা? রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহা ব্রহ্ম বিজয়ের অনু-কূল নহে, কিন্তু কোন পুস্তিকা (pamphlet) কেহ লেখে নাই। প্রফেসর পুনরায় বিশেষভাবে ইহার কারণ জানিতে কৌতূহলী হইলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, আসল কথা স্পষ্ট করিয়া মতামত দিতে কাহারও সাহস হয় না। তখন দেশ ভ্রমণের কথা উঠিল। রমেশচন্দ্র আবু পর্ব্বতের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করিলেন। বঙ্কিম বাবু প্রফেসরকে সুধাইলেন ব্রহ্মদেশের স্থাপত্য (architecture) কেমন দেখিলেন, অধ্যাপক বন্‌রফ্ ব্রহ্ম স্থাপত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—কিন্তু সবই কাষ্ঠনির্ম্মিত। সেখানকার রাজার পুস্তকালয় এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবরের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। খুব প্রকাণ্ড লাইব্রেরি, তবে একই পুস্তকের বিস্তর সংখ্যা। প্রফেসর বন্‌রফের বিনয় এবং সৌজন্যে সকলেই সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে পথে ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন একসঙ্গে এতগুলি লোকের সহিত আলাপ, ইতিপূর্ব্বে আর কখন তিনি করেন নাই। এই সম্মিলন দিনে বঙ্কিম চন্দ্রের আড়ম্বরশূন্যতা আমি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম বেশভূষায় কোন পারিপাট্য করেন নাই। বাটীতে যে সাদা সিদে ধুতি এবং হাতকাটা জামা তাঁহার নিত্য পরিধেয় ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। ইহার পর মহা সমাদরে বঙ্কিম বাবু বন্ধুগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রীতি ভোজনে তিনি অতিশয় আমোদ অনুভব করিতেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ভাষাতত্ত্ব।

আমার লিখিত "ভাষাতত্ত্ব" আলোচনা করিয়া কেহ কেহ কতক গুলি প্রশ্ন উথাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক গুলি প্রশ্নই সাধারণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সেই প্রকার কয়েকটি প্রশ্ন আলোচিত হইল।

প্রশ্ন :—সংস্কৃত আগে না বাংলা আগে? না সংস্কৃত এবং বাংলা উভয়ই যুগপৎ সৃষ্ট বা প্রচারিত?

উত্তর।—বাংলা সংস্কৃতের কথিত ভাষা মাত্র এবং সংস্কৃত বাংলার শুদ্ধ ভাষা। অগ্রে কথিত ভাষাই বর্ত্তমান থাকে। তাহা সমাজের শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দুই আকার ধারণ করে। শিক্ষিতের যে ভাষা তাহাকেই শুদ্ধ ভাষা বলা যায় এবং অশিক্ষিতের ভাষাকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃত ভাষা বলা যায়। এই বিভিন্নাকার ধারণ করার পর সাধারণ ভাষা এবং বিশুদ্ধ ভাষা উভয়তেই নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। সেই দুই শ্রেণীর শব্দ মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধারণ অশিক্ষিতের দ্বারা যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাহা সাহিত্যের অযোগ্য এবং শিক্ষিত-লোকদ্বারা যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাহা অর্থযুক্ত এবং সাহিত্যের উপযোগী হয়। সাধারণ লোকেও শিক্ষিতের শব্দ সকল গ্রহণ করে এবং শিক্ষিতেরাও সাধারণ শ্রেণীর শব্দ সকল গ্রহণ করেন। এই প্রকারে একে অন্যের শব্দ গ্রহণ করিতে করিতে তাহা রূপান্তর-প্রাপ্ত হয়; কারণ শিক্ষিতেরা সেই অসভ্য শব্দ গুলিকে স্বভাবত একটুকু সভ্যাকার দিয়া গ্রহণ করেন এবং সাধারণ লোকে সাধু ভাষার শব্দ হইতে শব্দ

লইয়া স্বভাবত উহাকে একটুকু সরল ও মৃদু করিয়া লয় এবং দুই একটি বর্ণও ত্যাগ করে। উভয় শ্রেণীতেই দিন দিন নব নব শব্দের সৃষ্টি হইতেছে এই সকল নব সৃষ্ট শব্দমধ্যে কে অগ্র কে পশ্চাৎ তাহা নির্ণয় করিতে হইলে একটা একটা শব্দ লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয় কারণ প্রত্যেক শব্দেরই এক একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। কোন শব্দ প্রাকৃতে উৎপন্ন হইয়া সভ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক সাধু ভাষায় পরিণত হইয়াছে কেহ বা সাধুক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাকৃতে অসভ্যাকার ধারণ করিয়াছে। অতএব কতক প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃতের পরবর্ত্তী।

সমাজের প্রথমাবস্থায় ভাবের অল্পতা হেতু ভাষাতে শব্দ অতি অল্পই থাকে এবং ক্রমে শিক্ষা ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। আর আদিম কথিত ভাষার শব্দ সকলও কথঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়া সংস্কৃতাকার ধারণ করে, আবার সেই সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে যাইয়া সাধারণ লোকে সেই সংস্কৃত রঙের উপর আবার অন্য প্রকার প্রাকৃত-ছায়া দিয়া অন্যরূপ করিয়া তোলে। এই প্রকারে ভাষার অধিকাংশ শব্দেরই এখন সংস্কৃতরূপ অগ্রে এবং প্রাকৃত রূপ পরবর্ত্তী বলা যায়। সমাজের আদিতে যে একটা কথিত ভাষা ছিল তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু সেই ভাষা এখন আর নাই বলিলেই হয়, এখন প্রাকৃত শব্দ সকলকে সংস্কৃতের পরবর্ত্তী বলিতেই হইবে, কারণ উহার কতক শব্দ যদিচ অগ্রে বর্ত্তমান ছিল তথাপি তাহারা পরে একবার সংস্কৃতে রঞ্জিত হইয়া পুনরায় তাহা হইতে অন্যরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মনে করুন "থাই" একটা শব্দ ইহা অতি আদিম ভাব ব্যঞ্জক। সমাজের এমন অবস্থা কখনই থাকে না যখন "থাই" এই ভাব বর্ত্তমান না থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি এই শব্দকে

আদিম শব্দ বলিতে পারি? তাহা পারি না, কারণ উহার মধ্যে থাওয়া এবং আমি বোধক দুইটি শব্দ আছে। তাহারই কুঞ্চিতাকারে "খাদ"র খা এবং "আমি"র "ই" মিলিয়া খাই হইয়াছে। ঐ দুই শব্দের প্রথম কি আকার ছিল তাহা জানার উপায় নাই। এক্ষণে সংস্কৃতে দেখিতেছি খাদামি তাহার বিশেষণ খাদ এবং আমি এই দুইটী শব্দ পাই। পরে খা+আমি=খামি, তদনন্তর খা+অই =খাই পরিশেষে খা+ই=খাই। অতএব যদিচ মৌখিক ভাষা অগ্রে হইয়া পরে তাহা সংস্কৃত রূপ ধারণ করে ইহা স্বীকার করিতে হয় তথাপি বর্ত্তমান সংস্কৃত প্রাকৃত মধ্যে প্রাকৃতকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না। দুই চারিটী সাধারণ শব্দ যাহা এ পর্য্যন্তও রক্ষিত হইয়া সংস্কৃত রূপ ধারণ করে নাই তদ্ভিন্ন এখন প্রাকৃত সমস্ত শব্দই সংস্কৃতের রূপান্তর বলিতে হইবে এবং সংস্কৃত প্রাকৃত মধ্যে কে আগে কে পরে জিজ্ঞাসার উত্তরে সংস্কৃতই আগে বলিতে হইবে।

প্রশ্ন :—ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আপনি কোন কথাই বলেন নাই।

উত্তর :—উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে অগ্রে কথিত ভাষাই বর্ত্তমান থাকে তাহাই ক্রমে সভ্যাসভ্য দুই আকার ধারণ করে। যে অবস্থায় সমাজে সভ্যাসভ্যভেদ ছিলনা, সভ্যতা এবং শিক্ষা সকলেরই সমান ছিল তখনকার যে অভিন্ন এক ভাষা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। সাহিত্যের ভাষা এবং সাধারণের কথিত ভাষা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া যে প্রকারে আবহমান চলিয়া আসিতেছে তাহাই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভূত। ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা কতদূর মনুষ্যশক্তির আয়ত্বাধীন তাহা আমরা বলিতে সাহসী হই না। আমরা পিপীলিকার বুদ্ধি লইয়া যদি বিধাতার সৃষ্টি প্রণালীর চরম তত্ত্ব সকল নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হই তবেই ভাষার

আদিম অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিব। সে যাহা হউক অসাধ্য বিষয়ের ও আলোচনায় সুখ আছে এই জন্য বলি তাঁহারা যাহা করিতেছেন করুন, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঐই বিশ্বাস করি যে এই সুখ পর্য্যন্তই সেই চেষ্টার পরিণাম ফল। আমি "ভাষাতত্ত্বে" এই মাত্র বলিয়াছি যে ভাষার প্রথমাবস্থায় এক অক্ষর দুই অক্ষরের এক একটী শব্দ হয় এবং তাহাই ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় সংক্ষিপ্তাকার ধারণ করে। (ভাষাতত্ত্ব ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। ভাষার সৃষ্টি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আমাদের চরমোক্তি; আর কিছু বলিবার নাই। ভাষার যতদূর পূর্ব্ব এবং যতদূর পর পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই তাহাই আমাদের আলোচ্য, তদতীত বিষয় আমাদের আয়ত্বাধীন নহে।

প্রশ্ন :—বঙ্গভূমিতে সংস্কৃত কতকাল পূর্ব্বে আসিয়াছে? তৎপূর্ব্বে কোনও ভাষা ছিল কিনা?

উত্তর :—যখন আর্য্যগণ এই সকল দেশে ব্যাপ্ত হয়েন তখন এই ভারতবর্ষের অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, সেই জঙ্গলের মধ্যে কোন কোন স্থানে অসভ্য বন্য জাতি বাস করিত। আর্য্যগণ ক্রমে সেই সকল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাসোপযোগী করিয়াছেন এবং সেই সকল অসভ্য জাতি ক্রমে অপসরণ করিয়াছে। আমরা এখন যে সকল স্থানে বাস করিতেছি সেই সকল স্থানে পূর্ব্বে কোন অসভ্য জাতির বাস ছিল, তাহার যদি প্রমাণ থাকে তবে বলিব যে পূর্ব্বে এদেশে সেই অসভ্য জাতির বাস ছিল এবং তাহারা তাহাদের অসভ্য ভাষা বলিত এবং তাহারা যখন সরিয়া গিয়া পর্ব্বতাদিতে বাস করিয়াছে এবং হিন্দুগণ এইদেশে বাস করিয়াছেন তদবধি এদেশে তাঁহারা তাঁহাদের আর্য্যভাষায় কথা বলিতেন।

প্রশ্ন :—মুসলমানী এবং ইংরাজি অনেক শব্দ আমাদের চলিত

ভাষায় গৃহীত হইয়াছে কিন্তু সংস্কৃতে গৃহীত হয় নাই তবে বাংলা ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা না বলিব কেন?

উত্তর :—সংস্কৃত লিখিত ভাষা এবং বাংলা তাহার কথিত ভাষা। বাংলা সংস্কৃতের যখন এই সম্বন্ধ তখন বাংলাতে গৃহীত হইলেই সংস্কৃত হইল এবং সংস্কৃতে গৃহীত হইলেই বাংলাতে গৃহীত হইল। যে সকল বিদেশীয় শব্দ বাংলা ভাষায় অপরিত্যাজ্য, সেই কথা সংস্কৃতে লিখিতে হইলে সেই বিদেশীয় শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে যথা, বিএ, উপাধি-ধারিণা জীবানন্দ বিদ্যাসাগরেণ প্রণীতং। একটিতে গৃহীত হইলেই অন্যটিতে গৃহীত হইল।

প্রশ্ন :—কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষাকে মৃত ভাষা বলেন। ইহা আপনি স্বীকার করেন কিনা জানিনা।

উত্তর :—ইহার সম্বন্ধে "ভাষা তত্ত্বের" ২৩ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি তাহার অধিক কি লিখিব? যাহার কথিত ভাষা নাই তাহাকেই মৃত ভাষা বলে। বাংলাকে যখন সংস্কৃতের কথিতাকার বলিতেছি তখন সংস্কৃতকে মৃতভাষা কি প্রকারে বলিব? সংস্কৃত আমাদের অতি গৌরবের ভাষা উহা বাস্তবিক জীবিত থাকিতে উড় কথায় তাহার শ্রাদ্ধ করিতে বসা নিরাপদ নহে। বাস্তবিক মরিয়াছে কিনা অগ্রে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রশ্ন :—কি হইলে ভাষার পার্থক্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্য আপনি স্বীকার করেন তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই।

উত্তর :—ইহার উত্তর "ভাষাতত্ত্ব" ১৫৩ পৃষ্ঠায় আছে। শব্দাদি স্বতন্ত্র হইলেই তাহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলে। শব্দাদি এক হইয়াও যদি অনিয়মে তাহার উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয় অথবা অনিয়মে বর্ণান্তর, বর্ণবিপর্য্যয়াদি হয় তাহা হইলেও ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া যায়, কিন্তু যদি স্বাভাবিক এবং ভাষার অনুমোদিত নিয়মানুসারে উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয় তাহাতে ভাষান্তর হয় না।

প্রশ্নঃ—কুলা, ডালা প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত কি?

উত্তর—এই প্রশ্নের উত্তর "ভাষাতত্ত্বের" ১২৮, ১২৯, ১৩০ পৃষ্ঠায় আছে তাহা এই,—অনেক শব্দ যাহা চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় তাহা অভিধানে স্থান পায় নাই, এবং অভিধানে যে সকল শব্দ নাই তাহাই লোকে অন্যভাষা বলিয়া থাকে; কিন্তু অভিধান ত অভ্রান্ত হইতে পারে না; কারণ দেখিতে পাই কোন শব্দ এক অভিধানে নাই অন্য অভিধানে আছে। কোন শব্দের এক অভিধানে যে সকল অর্থ লিখিত আছে অন্য অভিধানে তদপেক্ষা অধিক বা ন্যূন অর্থ লিখিত আছে। চলিত কথায় যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাই ভাষা; অন্য কোন কারণ ব্যতীত কেবল অভিধানে নাই বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। একজন ইংরেজ যাহা বলে তাহাকেই ইংরেজি বলিতে হইবে তাহা অভিধানে থাকুক আর নাই থাকুক; তদ্রূপ একজন ভারতবর্ষীয় আর্য্য যাহা বলে তাহাকেই অন্য কোন যুক্তি-যুক্ত বিরুদ্ধ কারণাভাবে আর্য্য ভাষা বলিয়াই অনুমান করিতে হইবে। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে কোন একটি শব্দ যাহা একজন আর্য্য ব্যবহার করিলেন তাহা অন্য কোন ভাষার শব্দ তাহা হইলেই তাহাকে ভাষান্তর বলিতে পারিবেন এবং তাহা না দেখাইতে পারিলে সেই শব্দকে আর্য্যভাষা বলিয়াই মানিতে হইবে। অতএব কুলা, ডালা প্রভৃতি শব্দকে যদি কেহ আর্য্য ভাষা বলিতে চাহেন তাহার কারণ তাঁহাকেই দর্শাইতে হইবে। আমরা আর্য্য-মুখ-নিসৃত ভাষাকে আর্য্য ভাষাই বলিব; তাহা বিরুদ্ধ কারণ দর্শাইবার ভার বিরুদ্ধবাদীগণের উপর। সংস্কৃতে যত পুস্তক ছিল তাহার অধিকাংশ নাই অতএব কুলা প্রভৃতি শব্দ কোন গ্রন্থে পূর্ব্বে ছিল কি না কে বলিতে পারে? যে সকল পুস্তক আছে তাহাও সম্যক পাঠ করিয়া কি কেহ বলিতে পারিয়াছেন যে এই সকল শব্দ কোন পুস্তকে নাই। আবার মনে করুন, সংস্কৃতসাহিত্য পৃথিবীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। অন্য ভাষার সাহিত্য সাধারণ ভাষা হইতে যতদূর অধিক উন্নত, সংস্কৃত ভাষা তদপেক্ষা সাধারণ ভাষাকে অধিক অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, সেই কারণে সাধারণ কথিত ভাষার অনেক শব্দ সাহিত্যে আদৌ ব্যবহৃত না হওয়া বিচিত্র নহে, তাহা বলিয়া কি সেই সকল শব্দকে অনার্য্য ভাষা বলিতে হইবে? 'কুলক' বা কুলিক পদের এক অর্থ শিল্পকার; ইহা হইতে কি অনুমান করা যায় না যে শস্যাদি পরিষ্কার করার যে শিল্প নির্ম্মিত-যন্ত্র তাহাকে সাধারণ লোকে কুলা বলিত।* ডল্লক শব্দ হইতে ডালা হইয়াছে। ধৌত শব্দ হইতে ধুচণী হইয়াছে বলিলেও বলা যায়; "ভাষাতত্ত্বে"র নিয়মানুসারে ত স্থানে চ হয় যথা, নৃত্য=নাচ; তে+চল্লিশ=তেতাল্লিশ, ইংরেজিতে tincture=tinceher. ঢেকীর পতনে ঢেক্ ঢেক্ শব্দ হইয়া থাকে তাহা হইতে অনুকৃতিতে ঢেকী নাম হইয়াছে বলিলে কি ক্ষতি আছে? আমা হইতে হয়ত সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি পাইলেন না; কিন্তু সকলে চিন্তা এবং অনুসন্ধান করিলে কি এই সকল শব্দের আর্য্যত্ব প্রমাণ হওয়া অসম্ভব কথা? তাহা যদি সম্ভব মনে করেন তবে উহাঁদিগকে হঠাৎ কোন যুক্তি যুক্ত কারণ না দিয়া অনার্য্য ভাষা অনুমান করা উচিত নহে।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

---

* শিল্পকার অর্থে কুলক বা কুলিক পদের ব্যবহার আমাদের জানা নাই। আমাদের মনে হয়, কুল্য হইতে কুলা শব্দের উৎপত্তি। কুল্য শব্দের অন্যতম অর্থ সূর্প বা কুলা। স: স:

গান।

ভৈরবী একতালা।

ওগো দেবতা আমার পাষাণ দেবতা
হৃদিমন্দিরবাসী!
তোমারি চরণে উজাড় করেছি
সকল কুসুম রাশি!
প্রভাত আমার সন্ধ্যা হইল
অন্ধ হইল আঁখি!
এ পূজা কি তবে সবি' বৃথা হবে,
কেঁদে কি ফিরিবে দাসী?
ওগো দেবতা আমার পাষাণ দেবতা
হৃদিমন্দিরবাসী।
এবার প্রাণের সকল বাসনা
সাজায়ে এনেছি থালি
আঁধার দেখিয়া আরতির তরে
প্রদীপ এনেছি জালি'
এ দীপ যখন নিবিবে তখন
কি রবে পূজার তরে
দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়ে রহিব
নয়নের জলে ভাসি।
ওগো দেবতা আমার, পাষাণ দেবতা
হৃদিমন্দিরবাসী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোয়েন্দা কাহিনী।

বেমালুম চুরি। (সঙ্কলিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস গোয়েন্দার নাম ডাক যথেষ্ট। সর্ব্বত্র তাঁহার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। পুলিশের অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বা তাঁহার পরামর্শ না লইয়া, কোন কাজ করেন না। তিনি যে ঘটনার তদন্তভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন প্রায় তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হন না। চোর, জুয়াচোর, খুনী, ডাকাইত, জালীয়াত, বদমায়েস্ প্রভৃতির তিনি একপ্রকার যম সদৃশ। বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তিনি স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। কতবার কত প্রকার বিপদ-জালে জড়িত হইয়াও, নিজ বুদ্ধিবলে, তিনি উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এবং অবশেষে অপরাধীর দণ্ড বিধান করিয়াছেন। কথাবার্ত্তায় তিনি মিষ্টভাষী। পুলিশের লোকের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্প্রীতি, অন্যান্য গোয়েন্দার তাদৃশ নয়। পরামর্শ দানে তিনি মুক্তকণ্ঠ, পরশ্রী-কাতরতা ও দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত চিত্ত, বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সদা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সহকারী গোয়েন্দাগণের নাম ডাক ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে সতত চেষ্টিত, আশ্চর্য্য ও কৌতূহলপ্রদ গল্প বা নিজ জীবনের লোমহর্ষণ ঘটনাবলী বর্ণন করিতে সদাই প্রস্তুত।

একদিন বেলা দুইটার সময় তিনি নিজ কক্ষে বসিয়া দুইখানি জাল নোট লইয়া নিবিষ্টচিত্তে অবলোকন করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার চাকর আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, বিনোদ বাবু নামক একজন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

হরিদাস গোয়েন্দা চাকরকে আদেশ করিলেন—"তাঁকে নিয়ে এস।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চাকর চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিনোদবাবু হরিদাস গোয়েন্দার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিনোদ বাবু দেখিতে স্থূলাকার, দীর্ঘাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের মধ্যে, মস্তকের কেশরাশি পক্ক, চক্ষু জ্যোতিহীন এবং বদনমণ্ডলে বহু মস্তিষ্ক-চালনার চিহ্ন সকল বর্ত্তমান।

হরিদাস গোয়েন্দা তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া হাত ধরিয়া বসাইলে পর, তিনি একেবারেই কাজের কথা আরম্ভ করিলেন।

বিনোদ বাবু বলিলেন—"আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, রেলওয়ে কোম্পানী সম্প্রতি একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, দামোদর নদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, বুদ্ধিশক্তির পরিচায়ক ও উত্তম কার্য্যকরী সেতু নির্ম্মাণের আদর্শপত্র (*plan*) যে কোন ইঞ্জিনিয়ার (*Engineer*) প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।"

হরিদাস। শুনিয়াছি।

বিনোদ। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের ও ভারতবর্ষের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই আদর্শপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু দামোদর নদের ন্যায় নদীর উপযোগী সেতু প্রস্তুত করার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যর্থ মনোরথ হইবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের মধ্যেও সকলে যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমার এ সম্বন্ধে, ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে, এবং আমি নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে

অনেক সেতু নির্ম্মাণও করাইয়াছি। আশায় বুক বাঁধিয়া, বহু পরিশ্রম ও বহু চিন্তার পর, আমি এতদিন পরে একটি আদর্শপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার আশা ছিল যে, ২৫ হাজার টাকা পারিতোষিক আমিই পাইব এবং হয়তো সেতুনির্ম্মাণের তত্ত্বাবধানের ভারও আমারই উপর পড়িবে। এই সুযোগে, আমি, অন্তত ৫০ হাজার টাকা উপায় করিব, আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! "আমার বাণিজ্যের পূর্ণতরী তীরে আসিয়া মগ্ন হইল," এত আশায় ছাই পড়িল!

হরিদাস। কেন—কি হয়েছে?

বিনোদ। আগামী পরশ্ব তারিখের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানীর হস্তে সকল ইঞ্জিনিয়ারের আদর্শপত্র পঁহুছিবার শেষ দিন। বিদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের আদর্শপত্র সকলগুলিই আসিয়া পঁহুছিয়াছে। দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারগণও অনেকে কার্য্য শেষ করিয়া আদর্শপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার একজন বন্ধু রেলওয়ে আফিসে কাজ করেন; তাঁহারই সহায়তায়, আমি, এ পর্য্যন্ত যতগুলি আদর্শপত্র তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সকল গুলিই দেখিয়াছি। আর, সকলগুলি দেখিতে পাইয়াছি বলিয়াই, আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমার খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অতি গোপনীয় ভাবে, আজ এক বৎসর ধরিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, ক্রমাগত পরিশ্রমের পর, কাল রজনীতে আমি পরিষ্কার করিয়া আদর্শপত্র খানি তৈয়ার করিয়া, তৎসম্বন্ধীয় অন্য কাগজ পত্র সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। সে কাগজ গুলি থাকিলেও, আমি, রাত্রদিন পরিশ্রম করিয়া অন্তত আর একখানি পরিষ্কার কাপি প্রস্তুত করিতে পারিতাম; কিন্তু পাছে সেগুলি অপরে দেখিতে পাইয়া, ফাঁকি দিয়া কাজ সারে এবং আমার এত পরিশ্রমের ফল বিনা আয়াসে ভোগ করে, এই ভয়ে, পুরাতন আঁকা যোঁকা, হিসাব কিতাব, কষা মাজা, সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি।

এখন আমার সেই পরিষ্কার আদর্শপত্র খানি, যাহা রেলওয়ে কোম্পানীর হস্তে দিয়া অন্তত পক্ষে ৫০ হাজার টাকার সংস্থান করিবার আশা করিয়াছিলাম তাহা সহসা চুরি গিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিদাস গোয়েন্দা, বিনোদ বাবুর কথা শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনার বাটী হইতে আদর্শপত্র খানি চুরি গিয়াছে?"

বিনোদ। না, আমার কার্য্যস্থান হইতে চুরি হইয়াছে।

হরিদাস। আপনার কার্য্যস্থান কোথায়?

বিনোদ। ক্লাইভষ্ট্রীটে।

হরিদাস। আদর্শপত্র খানি আপনি কোথায় রেখেছিলেন?

বিনোদ। আমি যে টেবিলে বসিয়া কাজ করিতাম, সেই টেবিলের একটি টানার মধ্যে ছিল। আজ সেই আদর্শপত্র খানি স্বহস্তে লইয়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিসে যাইবার কল্পনা ছিল। বেলা দশটার সময় কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন পর্য্যন্ত সেই টানার ভিতর আদর্শপত্র খানি ছিল। কিন্তু বেলা বারটার সময় তাহা বাহির করিতে গিয়া আর খুঁজিয়া পাইলাম না। একি, কোন যাদুমন্ত্র বলে উড়িয়া গেল? না—এ যেন ভৌতিক মায়া! আজ বেলা দশটার পর আমার কার্য্যস্থল হইতে কেহই বাহির হয় নাই—বাহির হইতেও কোন লোক কার্য্যস্থানে আসে নাই—অথচ এত বড় একখানি মূল্যবান কাগজ সহসা কেমন করিয়া উড়িয়া গেল, কিছুই বলিতে পারি না।

হরিদাস। আপনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন।

বিনোদ। ওঃ—যথেষ্ট,—যথেষ্ট! খুঁজিতে আর আমি কিছু বাকি রাখি নাই, বেলা ১২টার সময় আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে আমার আদর্শ পত্র খানি খোয়া গিয়াছে। তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত

আমি এবং আমার কর্ম্মচারিগণ, কয়টি ঘরের জিনিষ ওলট্ পালট্ ক'রে দেখেছি। প্রত্যেক আলমারি, প্রত্যেক দেরাজ, প্রত্যেক টেবিলের জিনিষ পত্র সমস্ত বাহির করিয়া ফেলিয়াও তাহা পাই নাই। ঘরের মেজেতে যে সতরঞ্চ ও মাদুর পাতা আছে, সে সমস্ত পর্য্যন্ত ওল্টাইয়া পাল্টাইয়া অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কোথাও সে আদর্শ পত্র খানি পাই নাই। আমার কর্ম্মচারিরা স্বইচ্ছায় তাহাদের জামার পকেট পর্য্যন্ত উল্টে পাল্টে, কাপড় চোপড় ঝেড়ে ঝুড়ে, আমায় দেখিয়েছে; কিন্তু আমি জানি, সে আদর্শ পত্র খানি, দু'তিন ভাঁজ করিলেও ছোট খাট পকেটে যাইতে পারে না; তাই আমি কোনরূপে তা'দের উপর সন্দেহ করিতে পারি নাই।

হরিদাস। আপনার কয়জন কর্ম্মচারী আছেন!

বিনোদ। দুই জন।

হরিদাস। তাঁহারা বোধ হয় এখনও কার্য্যস্থলেই আছেন?

বিনোদ। হাঁ, তাহারা স্বইচ্ছাতেই এখনও কার্য্যস্থলে বসিয়া আছে। যদিও আমি তাহাদিগের উপর কোন সন্দেহ করি নাই, তথাপি তাহারা বলে, যতক্ষণ পুলিশের লোক গিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, ততক্ষণ তাহারা কার্য্যস্থল পরিত্যাগ করিবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমি তাহাদিগের কথায় সম্মত হয়ে চলে এসেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাবুর কথা শুনিয়া, হরিদাস গোয়েন্দা কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন—"বেশ কাজ করেছেন। তা হলে এখন আপনি কি এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার আমারই উপর অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

বিনোদ। আজ্ঞা হাঁ। আপনি ভিন্ন আমাকে এ বিপদে রক্ষা

করিবার উপযুক্ত লোকতো আর আমি কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না।

হরিদাস। ভাল, চলুন—আমি এখনি আপনার কার্য্যস্থলে যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনাকে আমি এইখান হইতেই আর গোটা কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তথায় যাইতে ইচ্ছা করি। আমি প্রথমত আপনার কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি।

বিনোদ। আমার প্রধান কর্ম্মচারীর নাম রাখাল সে আঁকা জোঁকার, কাজ করে। লোকটি খুব চালাক চতুর এবং কার্য্যে সুদক্ষ। আজ ত্রিশ বৎসর হইল সে আমার কার্য্য করিতেছে। সে আমার খুব বিশ্বাসী।

হরিদাস। আর একজন?

বিনোদ। আর একজনের নাম যদু। সে কাজ কর্ম্ম তত ভাল জানেনা—আমারই আপিসে শিক্ষা করিতেছে মাত্র। দুই বৎসর হইল, আমি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছি। যদু তত চালাক চতুর নয়—কারণ তাহা হইলে এই দুই বৎসর মধ্যেই সে বেশ কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারিত। তাহাকেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমি আমার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহারও উপর সন্দেহ করিবার কারণ দেখিনা।

হরিদাস। তাহা হইলে এখন মোট কথা এই দাঁড়াইতেছে যে, আপনি বেলা দশটার সময় আপনার কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়া আদর্শ পত্র খানি পূর্ব্ব দিনে যেখানে রাখিয়া ছিলেন, সেই খানেই দেখিয়া ছিলেন। কেহ বাহিরে আসে নাই—কেহ ভিতরে যায় নাই—অথচ তাহা উড়িয়া গিয়াছে।

বিনোদ। না, একে বারেই কেহ আসে নাই বলিলে, একটু যেন মিথ্যা কথা কওয়া হয়। পোষ্ট আপিসের পেয়াদা আসিয়া

একবার চিঠিপত্র দিয়া গিয়াছিল। আর আমি এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলিতে পারি, যে ঘরে উক্ত আদর্শ পত্র খানি রাখিয়া ছিলাম, তথায় আর কোন বাহিরের লোক আসে নাই। আর যে টেবিলের টানার ভিতর উক্ত আদর্শ পত্রখানি ছিল, সে টেবিলটি আমারই কক্ষ মধ্যে। কর্ম্মচারিগণের কক্ষ মধ্যেও যদি আমার অজ্ঞাতে কেহ আসিয়া থাকে, কিন্তু কেহ যে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকট গিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না অন্তত আমি কাহাকেও দেখি নাই।

ক্রমশ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

কাবুলে হিন্দুরাজ্য।

বর্ত্তমান কাবুল রাজ্যের অন্যতম অংশের নাম কান্দাহার। কান্দাহারের প্রাচীন নাম গান্ধার। কুরুক্ষেত্র সমর কালে গান্ধারে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতিরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন্ সময়ে গান্ধার ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির হস্তচ্যুত হয় এবং কোন জাতি বিজয়শ্রীলাভ করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন তৎসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বই আমরা অবগত নহি। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বেই সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যাধিপতি দারয়াবুস ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত অধিকার ভুক্ত করেন।

খৃষ্টের জন্মের বিংশাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মাসিডনের অধিপতি গ্রীকবীর আলেকজন্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাবে গ্রীক অধিকার সংস্থাপন করেন। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের রাজ কুলতিলক চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই সময় ব্যাকট্রিয়া নামক স্থানে গ্রীক জাতির এক স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত ছিল। চন্দ্র গুপ্তের পর এই গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্জাব ও পঞ্জাবের পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশে ছোট বড় অনেক গুলি রাজ্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টের জন্মের পঞ্চবিংশাধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে ব্যাকট্রিয়া গ্রীকগণ নিতান্ত নির্ব্বির্য্য হইয়া পড়েন এবং তুর্কী জাতীয় ইউ-চি বংশীয়গণ তাঁহাদের আধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশের হবিষ্ক নামক একজন নরপতি কাবুলে অধিকার স্থাপন করেন। কিন্তু কাবুল অধিকারের পরেই তাঁহার অদৃষ্টচক্র নিম্নগামী হয়। শত্রুগণ কাবুল রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বহিস্কৃত করিয়া দেন। কিন্তু রাজ্যচ্যুতির পরেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি পুনর্ব্বার সুপ্রসন্না হন এবং তিনি সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া তথায় এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তদীয় উত্তরাধিকারী হুষ্ক এবং কণিষ্কও কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

কনিষ্ক খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্ক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। হুয়েন সাঙের মতে সমগ্র কাবুল উপত্যকা, পেশওয়ার, পঞ্জাব ও কাশ্মীর তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি কাবুল ও ইয়ারকন্দ হইতে আগ্রা ও গুজরাট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। কনিষ্ক "জম্বুদ্বীপাধিপতি" উপাধি গ্রহণ করেন। ইউ-চি বংশীয়গণ

কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কনিষ্ক নিজে বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ছিলেন, পরে ঘটনাচক্রে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উহার প্রচারকল্পে প্রবলোৎসাহে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন।

কনিষ্কের পরলোক গমনের পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। কিন্তু কাবুল বহুকাল পর্য্যন্ত ইউ-চি বংশের শাসন বদ্ধমূল ছিল। আলবেরুণীর মতে ৬০ জন অধিপতি কাবুলে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকে যদি গড়ে ১৩ বৎসর করিয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন তাহা হইলে কাবুলে ইউ-চি বংশের শাসন কাল ৭৮০ বৎসর ব্যাপী ছিল। ৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের সিংহাসনারোহণের কাল। এই সময়ের সঙ্গে ৭৮০ বৎসর যোগ করিলে আমরা ৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হই। বস্তুতঃ ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই এই প্রাচীন বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ইউ-চি বংশের শেষ নরপতির নাম কনক অথবা কাটর মান। তাঁহার মন্ত্রীর নাম কলার (কল্লার ?) তিনি ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত; রাজমন্ত্রী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি ভূগর্ভে বহুধনরত্ন লাভ করিয়া অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। কনক নীচমতি প্রজাপীড়ক শাসন কর্ত্তা ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মন্ত্রী কলারের শরণাপন্ন হয়। কলার রাজার চরিত্র সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অবশেষে রাজ্য লালসা রাজমন্ত্রীর হৃদয় অধিকার করে এবং তিনি আপনার বিপুল অর্থের সাহায্যে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলারের মৃত্যুর পর সামন্ত, কমল, ভীম, জয়পাল, আনন্দ পাল, দ্বিতীয় জয়পাল এবং ভীমপাল ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। ভীমপালই এই হিন্দুরাজ-

বংশের শেষ নরপতি। ভীমপালের পর, বংশে বাতি দিতে আর কেহ ছিলেন না। আল বেরুণী লিখিয়া গিয়াছেন যে কাবুলের হিন্দু রাজন্যবর্গ নানা গুণালঙ্কৃত সত্যসঙ্কল্প এবং সদ্ব্যবহারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

নাটকের ভাষা।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" ১৩০৬ সালের বিশেষ অধিবেশনে* সমালোচক শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বসুজ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে এই কয়টী বিষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা (১) গ্রাম্যতা ও অপভ্রংশতা, (২) বাহুল্যতা, (৩) প্রাদেশিক বাক্‌ধারা (Idiom) র বিভিন্নতা (Provincialism), (৪) পণ্ডিত শ্রেণীর ভাষা, (৫) সঙ্কীর্ণ প্রয়োগ-দোষ প্রভৃতি। কিন্তু সাহিত্যের অংশ বিশেষে অর্থাৎ নাটক, উপন্যাস, ও গল্প প্রভৃতিতে যে চলিত বা কথোপকথনের ভাষা (Colloquial) এবং গ্রাম্যতা (Slang) ব্যবহারে সুকুমার সাহিত্য শিল্পের শোভা বর্দ্ধন করে ইহা সাহিত্য-সেবী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ নাটকাদিতে বর্ণিত চরিত্র নানা শ্রেণীর; সুতরাং তাহাদের ভাষাও নানা শ্রেণীর হওয়া কর্ত্তব্য। নাটকে রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ্ বা সংভ্রান্ত বংশের নায়ক নায়িকার ভাষা, শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভাষা, দূত, প্রতিহারী, দাস

* পরিষদের উক্ত অধিবেশনে মাননীয় জজ গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন "গ্রাম্যতা ও আবার আবশ্যক বুঝিয়া ব্যবহার ও বর্জ্জন করা উচিত। তাহারও স্থান বিশেষে আবশ্যকতা ও উপযোগীতা ইত্যাদি আছে"। ১৩০০ সালের জৈষ্ঠের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দাসী অথবা অপরাপর পাত্র পাত্রীর ভাষা সমান ভাবে উক্ত হইলে নাটকাদির সৌন্দর্য্য ও রস ভঙ্গ হয়। মনে করুন যদি "নীল দর্পণ" নাটকে জমিদারদিগের ভাষা আর প্রজা সাধারণের ভাষা সমান হইত তাহা "নীল দর্পণ," নাটক না হইয়া কথোপকথনের বই হইত। হরিশ্চন্দ্র নাটকে "ভোদো চণ্ডালের" ভাষা ও "রামাভিষেকে" কৃষক (প্রজা) শ্রেণীর ভাষা, রাজা, রাজকুমার মন্ত্রী, ঋষি প্রভৃতির ভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হইলে অথবা "অশ্রুমতী" নাটকের "ভীল সর্দ্দারের" ভাষা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকটিত হইলে উক্ত নাটকগুলি কিরূপ অস্বাভাবিক হইত তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মোট কথা রামা চাকরের ভাষা আর সংস্কততে পণ্ডিত তর্ক-পঞ্চাননের ভাষা একরূপ হইলে সে নাটক উপহাস্য ভিন্ন কখনই প্রশংসনীয় হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানব সমাজে শ্রেণী বিশেষে নর নারীর চরিত্র ও ভাষা যেমন নানা প্রকার, নাটকোক্ত পাত্র ও প্রাত্রীর স্বভাব ও ভাষা ঠিক সেইরূপে প্রকটিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ "ব্যক্তিগ্রহ" হইবে কেন? এই "ব্যক্তিগ্রহ" কথাটা একটু বিশদ ভাবে বলা প্রয়োজন। মনে করুন দীনবন্ধুর নাটকে "তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিম চাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিম চাঁদের মাতলামী আর নিম চাঁদের মাতলামীর মত থাকে না।" * সুতরাং নাটকে যে চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে তাহার চিত্রের (চরিত্রের) যে টুকু বিশেষত্ব সে সমস্তই লইতে হইবে তাহার কতক বাদ দিয়া কতক লইলে চলিবে না। আর একটা উদাহরণ দেখুন। "হরিশ্চন্দ্র" নাটকে রাজা

* বঙ্কিম বাবুর লিখিত "দীনবন্ধুর কবিত্ব সমালোচনা" দ্রষ্টব্য।

হরিশ্চন্দ্র যখন শ্মশানে চণ্ডাল বেশে উপস্থিত তখন রাজার মত কথা-বার্ত্তা বা বিলাপ করা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে এ কারণ প্রবীণ নাট্য-কবি মনোমোহন বাবু চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র চিত্রে চণ্ডালের কর্কশ ভাষার উচ্চারণ-কৌশল ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কেন না শ্মশানে চণ্ডাল বেশে রাজার ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিলে তাহা চণ্ডাল চরিত্রের অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইবে, তখন রাজা হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডাল বলিয়া বিশ্বাস হইবে কেন? ইহাকেই বলে "ব্যক্তি গ্রহ"।

আধুনিক বাঙ্গলা নাটকাদিতে রাজা মন্ত্রী পণ্ডিত, সভাসদ সেনা-পতি প্রভৃতি যে ভাষায় কহে, রাণী, সখী ও অন্যান্য পুরমহিলার মুখে যে ভাষা শুনা যায়, প্রতিহারী দাস দাসী দ্বারবান প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর পাত্র ও পাত্রীর মুখেও সেই এক ভাষা শুনা যায়। নাটকে এরূপ প্রথা বাস্ত-বিক অন্যায়। যাহা হউক কেবল মত প্রকটন করা অপেক্ষা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলে অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। শিক্ষিতা কিম্বা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কথিত ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি পুরুষের ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। মনে করুন কোন সম্ভ্রান্ত রমণী (গৃহিণী) বলিছেন "ওমা, আরো পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন ক'রে আইবুড়ো রাখ্‌বো। বার তের বছরের আইবুড়ো মেয়ে থাকিলে কেমন ক'রে লোকের কাছে মুখ দেখাব।" উদ্ধৃত কয়েক ছত্র পাঠ করিলে সহজেই অনুমান হয় যে ইহা কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিবাহ যোগ্যা কন্যার মাতার কথা, পুরুষের কথা নহে; কিন্তু যদি উক্ত কথাগুলি ঐরূপ "মেয়েলী ভাষায়" ব্যক্ত না করিয়া "আর চতুঃ পঞ্চ বৎসর কন্যাকে কি রূপে অবিবাহিতা রাখিব? দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরবয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে জনসমাজে কিরূপে মুখ দেখাইব।" এই রূপে সাধু ভাষায় ব্যক্ত করিলে সে নাটক কিরূপ অস্বাভাবিক হয়, বলুন দেখি? কোন কোন স্থলে এরূপ প্রথারও ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,

স্ত্রীলোক কিম্বা নিম্ন শ্রেণীর সহিত কথাবার্ত্তায় চলিত কথা ব্যবহার করেন তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সাধুভাষায় কথা কহিলে চলিবে না, কেন না তাহা হইলে তাঁহার ভাষা উহাদের বোধগম্য হওয়া কঠিন। এরূপ স্থলেও উভয় শ্রেণীর (শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের,) কথোপ-কথনের মধ্যে ভাষার তারতম্য থাকা প্রয়োজন। বস্তুত নাটক লিখিবার কালে নাট্যকারকে, বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া নাটকোক্ত পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অর্থাৎ ভদ্র ও অভদ্র, উচ্চ ও নীচ বংশীয়, আর্য্য অনার্য্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, রাজা প্রজা, রাজমহিষী, সখী চেটী, কঞ্চুকী, পার্ব্বত্য লোক, বন্য লোক প্রভৃতি পাত্রভেদে, ভাষার ব্যবহার করিতে হয়। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রহসন লেখক অমৃত লাল বসু মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত প্রহসনাদিতে পাত্রভেদে যথাযোগ্য ভাষার ব্যবহার করিয়া-ছেন। তিনি প্রহসনে মাইকেল ও দীনবন্ধুর পরিহাস রসিকতার অনু-সরণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি তাঁহার প্রহসনাদিতে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসীর (বাঙ্গালের) উচ্চারিত ভাষা, উৎকল নিবাসীর (উড়ের) উচ্চারিত ভাষা, বিলাত ফেরত বাঙ্গালীর ইংরাজি "বুকনী" মিশ্রিত বাঙ্গলা, সহুরে ও পাড়া গেঁয়ের ভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র প্রভৃতি প্রকটিত করিয়া থিয়েটারের বর্ত্তমান নাটক লেখকদিগের মধ্যে বিশেষ রূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান রঙ্গসাহিত্যে যে এইরূপ ভাষাগত ব্যাভিচার দোষ ঘটিতেছে তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রকেই সবিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই। উদাহরণ স্বরূপ, কয়েক খানি প্রকৃষ্ট নাটক ব্যতীত অধুনাতন রঙ্গ সাহিত্যের তাবৎ নাটকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণে প্রীতিকর হইবে না বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম।

অনেকে বলিতে পারেন যে ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আবার নাটক রচনা কেন? কেন, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে!

আরও একটু বলা প্রয়োজন। পাত্র ও পাত্রীগণের নাম ও চরিত্র সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য; নতুবা নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য কি? যদি নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণের কথাবার্ত্তা শ্রবণে বা অভিনয় দর্শনে "ব্যক্তিগ্রহ" না হইল, তবে আর নাটক পাঠে বা অভিনয় দর্শনে ফল কি? এই কারণে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাটকের ভাষা "ভাষাবিবেক" নামে অভিহিত। "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" প্রভৃতি নাটকে এইরূপ পদ্ধতি অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। "নাটক দীপিকা" ও "নাটকদর্পণ" প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রে তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত, প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী, শৌরসেনী ও রাক্ষসী প্রভৃতি ভাষা কথনের নিয়মাদি বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। অবশ্য এখনকার দিনে ঐ সমস্ত মৃত-ভাষা বঙ্গ-রঙ্গ-সাহিত্য নিবদ্ধ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে; কিন্তু পাত্রভেদে এখনকার প্রচলিত সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ব্যবহার হওয়া উচিত এবং তাহাতে যে নাটকের সৌন্দর্য্য ও সুষমা বৃদ্ধি হয় একথা সাহিত্য-শিল্পীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। নাট্যকারকেও ঐ সমস্ত ভাষার উচ্চারণ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। নাটক লিখিবার সময় আধুনিক নাট্যকারদিগের নাটকীয় পাত্রও পাত্রীর ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নাটক প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

প্রিয়তমের প্রতি।

সখা!
যদি বারেক আসিতে একটু হাসিতে
সেই প্রভাতের বেলা,—
তোমার বদনে অরুণ রশ্মি
করিত যদি গো খেলা;
ফুটিত তাহাতে আশাভরা ছুটি
সোহাগ মিষ্ট কথা,
এ দীন চিত্তে নূতন করিয়া
উঠিত কি তবে ব্যথা?
এক অঙ্গুলি— এক ঝঙ্কার—
শত মুখরিত বীণ্,—
একটি মধুর বচনে তোমার
তেমনি হইত দীন।
ওগো! নিবিয়া গিয়াছে জীবন প্রদীপ,
ঝটিকা উঠেছে কবে,
আদরে তাহারে জ্বালাইছ তুমি
প্রেম নিষিক্ত রবে।
তবে হাত দুটি বেড়ি' দাঁড়াও আসিয়া
সাবধান মেলি' আখি,
নহে, শীর্ণ শিখাটি শূন্যে মিশাবে
ধূমময় দীপ রাখি'।

সখা! যদি ভালবাস কবিরে তোমার,
অধরে রাখিয়ো হাসি,—
আর রেখে দিয়ো বুকের ভিতরে
সোহাগ বাক্য রাশি;
নয়ন প্রান্তে রেখো রেখো সখা
একটি পুষ্প বাণ,
তুমি অবসর বুঝি' সে বাণ হানিয়া,
কাড়িয়া লইয়ো প্রাণ।
তুমি শুধু দেখা দিয়ো একটু হাসিয়ো
মধুর প্রভাত বেলা,
অরুণ কিরণ কৌতুকে তব
বদনে করিবে খেলা;
ফুটাইয়ো তাহে আশাভরা ছুটি
সোহাগ মিষ্ট কথা,—
তুমি মোহন মন্ত্রে ভুলাইয়ো দীনে
জুড়াইয়ো তা'র ব্যথা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কেন!

কেন এত ফোটে ফুল, শুকাতে না তুলিতে!
কেন এত ডাকে পাখী, ভুলাতে না ভুলিতে!
কেন এত বহে বায়ু, দুলাতে না দুলিতে!
কেন আঁখি অনিমিক! জ্বালাতেনা জ্বলিতে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

গীতি কবিতা ও তাহার গতিক্রম।

প্রথম প্রবন্ধ।

সাহিত্যের সর্ব্বাদ্য স্তর।

পৃথিবীর সর্ব্বাদ্য সাহিত্য, মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত সর্ব্বপ্রথম কবিতা-কাকলী, স্বভাবের স্বাগত গীতি। সে গীতি, গায়কের হৃদ্‌বৃত্তির আবেগ ময় উচ্ছ্বাস এবং অজ্ঞাত আত্ম-প্রকাশ; সে গীতি স্বভাবের স্বত-উদ্বেলিত ও ভয়-বিস্ময় সংবিষ্ট; আহ্লাদ-উদ্দীপ্ত বা বিষাদ-বিক্ষোভিত সুর লহরী। স্বাগত সুর-সন্দীপ্ত আত্মাভিব্যক্তি, অতএব তাহা গীতি, কোমল করুণ বা উচ্চ ও মহান বা রুদ্র ভাব পরিব্যঞ্জক ও সেই ভাব নিচয়ের বা সেই সেই ভাবোদ্ভাবক পদার্থ বা পদার্থগত শক্তি নিচয়ের কল্পনাময় মূর্ত্তি-জ্ঞাপক গীতি, অতএব তাহা কবিতা বা কবিতা-গীতি বা গীতি-কবিতা।

গীতের ও পূর্ব্বে, হয়ত গীতি কবিতার আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্তত গীত খাঁটি গীতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্য-কণ্ঠে গীতি কবিতা ধ্বনিত হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে, গীত বলিতে কথা-মিশ্রিত সুর লহরী নয়। নিছক সুর লহরীর সুনিয়ন্ত্রিত লীলাকেই গীতি বলি। গীত সুর, সুরের ভঙ্গী উত্থান পতন, তরঙ্গ, প্রকম্পন, সুরের সংঘাত ও বিক্ষোভ, এ সবই ভাবোদ্দীপক ও কল্পনার উদ্ভাবক বটে। সুর, ভাবোদ্দীপক ও কল্পনার-সঞ্চালক হয়, হওয়া চাই, সুরেরই স্বভাব ও স্বরূপের মাহাত্ম্যে। তাহা হইলেই, তবে সেই সুর লহরী প্রকৃত ও অমিশ্রিত গীতি। কিন্তু সুরের সহিত যখন, বাক্য বা কথা কোমল করুণ মধুরাদি ভাবোদ্দী-

পক, সুখ শোক ভয় বিস্ময়াদি ব্যঞ্জক কথা কল্পনা-উদ্ভাবক কথা মিশ্রিত হয়; অথবা কথার সহায়তা, অন্তত কতক পরিমাণেও, লইয়া, সুরকে যখন ভাবোদ্দীপন বা রস-সৃজন করিতে হয়, তখন সে সুর-লহরী কেবল গীতি নয়, কবিতাগীতি বা গীতি কবিতা।

সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথম গীতি কবিতায়, অথবা তাহার আর যে নামই দেওয়া হউক তাহাতে, সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দের বন্ধন না থাকিবারই সম্ভাবনা! কিন্তু তাহাতে সুর-মুখরতা নিশ্চয়ই ছিল। সুরমুখরিত হইয়াই তাহা উদ্ধৃত হইয়াছিল, এবং সেই সুরেরই লঘু গুরু পর্য্যায়ক্রমে ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বেদ গীতিতে বহু ও বিবিধ ছন্দ সংযুক্ত। ত্রিষ্টুব, অনুষ্টুব, গায়ত্রী জগতি, বৃহতি, পংক্তি, বিরজা প্রভৃতি পৃথক পৃথক ছন্দের পদ বিন্যাসে এক একটী যুক্ত ঋক্ বা স্তোত্র গীতি এক একটী ছন্দ একটী কাম্য পদার্থ ও সেই পদার্থ গত প্রাকৃতিক শক্তি বা দেবতার সহিত সংযুক্ত ছন্দ বিশেষ দ্বারা দেবতা বিশেষ উদ্বোধনীয় ও দ্রব্য বিশেষ প্রার্থনীয়। কাযেই ছন্দের প্রতি প্রগাঢ় লক্ষ্য। ছন্দ নিজেই উপাস্য। শব্দ, শব্দ সংযোজন নির্ব্বাচন ও উচ্চারণাদির উপরেও নিরতিশয় সাবধানতা সূচিত হয় সাহিত্যের প্রথম স্তরের কোন রচনাতেই এরূপ হওয়া সম্ভবে না। ঋগ্বেদের গীতি কবিতা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য হইয়াও সর্ব্বাদিম রচনা নয়।

গ্রীক সাহিত্যে "ইলিয়দ" ও "ওদেসীর" পূর্ব্বের কোন রচনাই বিদ্যমান নাই। ঐ দুই মহাকাব্যের রচনা এতাধিক পরিপক্ক, পরিপাটী এবং ছন্দ ও সাহিত্যাংশে, সম্যক যত যে, কাব্য সাহিত্যের সম্যক অভিব্যক্তি ও অনুশীলনের পরবর্ত্তী কাল ভিন্ন, ঐ রূপ কবিতার উৎপত্তি সম্ভাবিত হয় নাই। ইলিয়দ ও ওদেসীর প্রায় সামসমায়িক বা কিছু পরবর্ত্তী কালের রচনা অপর গ্রীক মহাকাব্য "হেসিয়দ"

ইলিয়াদি অপেক্ষা কাব্যাংশে অনেক নিকৃষ্ট। খৃঃ পূঃ ৬৯০—৪৭০, গ্রীক সাহিত্যে গীতি কবিতার উৎপত্তি। কলিনাস্, আরকিও-লোকাস, সেমনেডেস্ ও সোলন প্রভৃতি গ্রীক সাহিত্যের গীতি কবিতার প্রথম স্তরের গীতি কবি। শেষ স্তরে পীণ্ডরের রচনা গ্রীক গীতি-কবিতার পূর্ণ পরিণতি। পীণ্ডরের পরে গ্রীক সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গীতি কবিতা আর উৎপন্ন হয় নাই। রোমক গীতি কবিতা গ্রীক আদর্শে গঠিত।

এ কালের য়ুরোপীয় আদর্শ তিয়ুতনিক সাহিত্যের সকল শাখাই অল্পাধিক পরিমাণে গ্রীক ও রোমকের অনুকারী। উহার অন্যতম উচ্চতম (?) ও উত্তম শাখা—ইংরেজী সাহিত্যে সর্ব্বাদ্য কাব্য Beowulf. NP. কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম স্তরের পরিচায়ক কাব্য কোনটী? মানিক চন্দ্রের গান? এক জন লেখক ঠিক তাহাই ঠাওরাইয়াছেন বসিয়াছেন বটে। কিন্তু ঠাওর খানা যেন একবারেই মনেরে চোখ ঠারা ঠাওরের মত ঠেকে। মাণিক চন্দ্রের গানের গায়ের বৌদ্ধ গন্ধ কি না বৌদ্ধ দুর্গতির দুর্গন্ধ, ভিন্ন, তাহার প্রাচীনতার আবিষ্কার ও প্রচারের আর কোন পরিচয়ই ত পাওয়া যায় না। ঐ রূপ দুর্গন্ধ যুক্ত অন্যান্য রকমের ছোট বড় গান,—ইতর হস্ত রচিত, ইতর সমাজে গীত, ইতর দেবতার ছড়া নাচাড়ী ও পাঁচালী পালা-কি-পালা, বাঙ্গালা ও বিহারের বহুগ্রামে, হাড়ি, ডোম, দোসাদ মুশর ও মুচীদের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। অনুসন্ধান ও আয়াস স্বীকার করিলে, তাহা উদ্ধার হওয়া তত কিছু অসম্ভব নয়। পরন্তু, উদ্ধার হইলে কিছু-না-কিছু উপকারেও আসিতে পারে। তবে সব স্থলেই যে মেহনতের মূল্য পোষায়, এমনও বলা যায় না। কিন্তু, বৌদ্ধগন্ধ থাকিলেই প্রাচীন হইবে, আর ছ, দশটা আঁকা বাঁকা শব্দ মেশান ইতর রকমের রচনা হইলেই, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম

স্তরের রচনা, হইবে, খামাখা এমনতর সিদ্ধান্ত করিয়া, বসাই যে, "খুনখারাবি" বিড়ম্বনা। বৌদ্ধ প্রসঙ্গ, বৌদ্ধ যুগের বার হাজার বৎসর পরেও কি হইতে পারে না? আর বৌদ্ধ বিকারের উদ্গার কি শৈব, শাক্ত বা খ্রীষ্টীয় যুগে হইতে নাই? কিছু নিষেধ ছিল কি? না আছে? তেমন তরটা ত আকছার হইয়া আসিয়াছে, হইয়াই চলিয়াছে। দুনিয়ার কোন ব্যাপারেই ত তাহার দুর্ভিক্ষ দেখা যায় না। আর বাংলা মুল্লুকের প্রায় সব জেলারই আপন আপন উত্তরাধিকারাগত ও জলবায়ু জিহ্বাদি জাত অল্প বিস্তর আঁকা বাঁকা বুলি বা "জেলাগত জবান" তখনও যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তাহা তাজ্জব ভাবিয়া, তাহাকে আধুনিক বাংলার পিতৃলোক গত পূর্ব্বপুরুষ কল্পনা করার কোন কারণই "মজুদ" নাই। তবে এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনায় একটা বৃহদ্দ্ব চাপাইয়া, অয়স্কান্ত মণি আবিষ্কারের আহা-মরির মূর্চ্ছা যাওয়া ও সেটাকে একটা কলম্বাসী কাণ্ড করিয়া তুলা, একটা তাজ্জব ব্যাপার হইলেও আর তাজ্জব নয়,—আজ কাল ঘরে ঘরে "ঘেঁটু অবতারের মত" এটাও এত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিষ্টার গ্রিয়রসনের সংগ্রহ হইতে "মানিকচন্দ্রের" দুই চারি চরণ উদ্ধৃতই করা যাউক। আরম্ভের অতি নিকট হইতে অনির্ব্বাচনেই উঠান যাইতেছে। অথচ ইহা এমন স্থল যে "প্রক্ষীপ্ত" বলিবার অবসর নাই। ইহা তথাকথিত "প্রক্ষীপ্ত" হইলে আগাগোড়া সবটাই "প্রক্ষিপ্ত" হয়। আসল ও মূল মুলেই উজার হইয়া যায়।

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত কৈল কড়ী॥
আছিল দেড় বুড়ি খাজানা লৈল পোনার গণ্ডা।
লাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় অরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওআয়াল॥

রাঁড়ী কাঙ্গাল দুঃখিয় বড় দুষ্ক হইল।
থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল॥
ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই।
প্রধানের বরাবর সবে চল যাই॥
কি আজ্ঞে বলে প্রধান সকল।
যেত রায়ত পরামর্শ করিয়া প্রধানের বাড়ী বৈসে চৈলে গেল॥

ইহাই প্রচুর। এই রকমই আগা গোড়া। এখানে সেখানে এক আধটা করিয়া আঁকা বাঁকা শব্দও বড় ছোট লাইন আছে; সে বর্ত্তব্যের মধ্যেই আসিতে পারে না। তেমনতর শব্দ, সম্পর্কীয় জেলার মধ্যে, পূর্ব্ববৎ চলিত থাকাই সম্ভব এবং তাহা অপর জেলার লোকেরও একেবারে অবোধ্য নয়; অন্তত কতক লোকেরও বোধ্য। পরন্তু খাটো লাইনের লেজে ও প্রাচিনত্ব বাঁধা যায় না। তাহা অনেক স্থলেই প্রমাদ, প্রাচিনত্ব নয়। প্রমাদ শ্রুতিধরের বা লিপিকরের, অপরের ও নয়। উক্ত অংশে, অমন অন্ত্যজ ও সহজ পয়ারের পর, শেষ লাইনটার দড়ি ছেঁড়া দীর্ঘ দৌড় কেবল পরবর্ত্তীদেরই প্রমাদ প্রমাণ করে।.....তা উপরের ঐ রচনা বা ঐ রকমের রচনা, যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বা অতি প্রাচীন স্তরের রচনা হয়, তাহা হইলে কেবল কাত্তিবাস কাশিদাসাদিই বা কেন আমাদের এখনকার অনেকেও প্রথম বা অতি প্রাচীন স্তরের লেখক মধ্যে পরিগণিত হইয়া পূজিত প্রখ্যাত হইতে পারেন। পরন্তু ইতর শ্রেণীর অনেক গেয়ে "গায়েন" ও "গাঁথনদারকে" গা ঢাকা করিয়া, রাজা মান্ধাতার আমলে তাহাদের অস্তিত্ব ট্রানসফার ও কপিধ্বজের কালে তাহাদের কবিত্ব কায়েম করিতে হয়। ফলত তাহার অস্তিত্ব যদি একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া থাকে তবে আজও তাহার এমন কিছু অন্ধকার হইতে আলোকে আনীত হয় নাই, যাহাকে আমাদের ভাষার প্রথম

না হউক, খুব বেশী প্রাচীন স্তরের লেখা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে; ভাষাকে আমরা যে অবস্থায় পাইয়াছি, তাহাতে ও আধুনিক ভাষায় তত কিছুই তফাৎ নাই। সে অবস্থাকে আমরা এখন যতই প্রাচীন বলিয়া ধরি, তাহা আধুনিকেরই নিকটবর্ত্তী। সে অবস্থাতে, পৌঁছিতে ভাষাকে বহু বহু বহু যুগ লাগিয়াছিল। ক্রম-বিকাশের স্তর, পারাইয়া পারাইয়া শ্রীমতীর সে অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিতে, পাঁচ শত দশ শতাব্দীতেও কুলায় নাই, খুব সম্ভব তাহারও বেশি সময় লাগিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগেরও বহুপূর্ব্বে, বাংলা ভাষা বিদ্যমান ছিল না কে বলিবে? যদি কেহ বলেন তাহার বুকের পাটা ও বেকুবি দুইই খুব বেশি। উপস্থিত অতিমাত্র অপ্রচুর উপাদানে, খড়ি পাতিয়া বাংলা ভাষার বয়স গণিতে বসার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই হইতে পারে না।

আদিম প্রাচীন সাহিত্যে, গদ্য-গীতি বিরল নয়। গীতিময় গদ্যের পরিণতি ছন্দময় পদ্য। গদ্য নিজেও নেহাত ছন্দ-বিহীন নয়। "পদ্য-ছন্দ" ও "গদ্যছন্দ" কথা, অন্তত বাঙ্গালা ভাষায়, চলিত ছিল। ফলত গদ্যেও এক প্রকৃতির ছন্দ-পদ্ধতি, বিদ্যমান। এবং তাহাতে করিয়াই গদ্যের ভিন্ন ভিন্ন গতি-শীলতা ও গঠন-রীতি, অজ্ঞাতে নিয়মিত করে। "অজ্ঞাতে" কেননা উহার কোন লিখিত প্রণালী বা নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। লেখকের কর্ণ, কল্পনা ও অভ্যস্ত লিপিকৌশল অনুসারে, বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব ভেদে, উহা গঠিত হয় ও গঠন করে। যে সকল বক্তার ও গদ্য-লেখকের শব্দগত ও শব্দের ব্যবহার-গত স্বাভাবিক সুরবোধ ও সুরের সঙ্গতি বোধ নাই; এবং কথন ও লিখনের রীতিতে বাক্য প্রয়োগের ছন্দ ও মাত্রার সামাঞ্জস্য নাই, তাহারা রুচিৎ সুবক্তা ও সুলেখক মধ্যে পরিগণিত হন। গদ্যগত ছন্দের অপর নামইত ইংরেজীতে, "ষ্টাইল"। অর্থ একটু প্রসারিত করিয়া বুঝিলে, লেখার বাঁধুনিই ছন্দ।

আইস্‌লণ্ড সুয়েডেন-নরোয়ে প্রভৃতি দেশীয় উত্তর য়ুরোপের আদিম ও অতি প্রাচীন "এপিক" সাধারণত "সাগা" নামক আখ্যান কাব্য নিচয়, গদ্যে লিখিত। ইহারা পৃথিবীর প্রাচীন মহাকাব্য গুলির মধ্যে প্রধান আসন লাভ করিয়াছে। বৈদিক গীতি, বহু স্থানে, আকারে গদ্যবৎ।

সাহিত্যের সর্ব্বাদিম অঙ্গ—সর্ব্বপ্রথম ফল গীতি কবিতা। কিন্তু, সর্ব্বাদিম গীতি কবিতা, অন্তত সাহিত্যের প্রাথমিক যুগ নিচয়ের গীতি কবিতা পৃথিবীর কোনও প্রাচীন ও মৌলিক সাহিত্যে রক্ষিত নাই। আর্য্য সভ্যতা ও সাহিত্যের অতুল ও অক্ষয় ভাণ্ডার সংস্কৃত সাহিত্যে নাই এবং য়ুরোপের প্রাচীন ও প্রধান ভাষা সঞ্জাত গ্রীক সাহিত্যে নাই। পরন্তু, ইরাণ, অ্যাসিরিয়ান, চীন, ফিনিসিয়ান প্রভৃতি অতি প্রাচীন জাতির বা পুরাতন হিব্রু জাতির সাহিত্যেতিহাসে উহার অস্তিত্বের উল্লেখ থাকা দেখিতে ও শুনিতে পাই নাই। রোমক সাহিত্যের গীতি কবিতা গ্রীকেরই অনুকৃতি। ইহা খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্ব ও তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব আমলের কথা। পরন্তু খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভের সমসাময়িক ও তাহার পরবর্ত্তী প্রথম কয়েক শতাব্দী মধ্যে অর্থাৎ "মধ্য যুগে" য়ুরোপে ও এসিয়ায় উত্থিত কোন জাতির ও জাতীয় সাহিত্যের সর্ব্বাদিম বা অত্যন্ত প্রাচীন রচনা বিরল। যাহা সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া কথিত ও রক্ষিত, তাহা সাহিত্য যুগ প্রবর্ত্তন হওয়ার নেহাত কম পরবর্ত্তী কালের রচনা নয়।

ঋগ্বেদ সংহিতা পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন সাহিত্য। ইহা এখনকার য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু, ঋগ্বেদের গীতি কবিতাবলী কি মানুষের কণ্ঠ-নিসৃত সর্ব্বাদিম বা সর্ব্বাদিমের নিকটবর্ত্তী সাহিত্য? কি রূপে তাহা বলিতে পার? ঐ প্রকৃতির ও ঐ পর্য্যায়ের সাহিত্যের "শ্রুতি" ও "স্মৃতি" নামই তাহার অতলস্পর্শী পুরাতনত্ব

প্রচার করিতেছে। তথাচ তাহাকে সর্ব্ব প্রথম বলা যায় কি? বেদ মতের বিরুদ্ধে না হউক, তাহার কিঞ্চিৎ বাহিরে দাঁড়াইয়া বিচার করিলে, কিছুতেই তাহা বলা যায় না। ঋগ্বেদের গীতিগণ আপনারাই তাঁহাদের দেহ আয়তন এবং অতি পরিপক্ক, পরিমার্জ্জিত ও পাণ্ডিত্য প্রতিভায় প্রভাবিত গঠন দ্বারা তাহার প্রভূত প্রতিবাদ করিয়া তদ্বিপরীত কথাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বাদি সাহিত্য বলিলে, অন্তত সঙ্গতির অনুরোধেও অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ সকল গীতি অপৌরষেয় রচনা। কেননা দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্যানুশীলনশীল বহু যুগ ও বহু পুরুষ পরম্পরাগত শিক্ষাসম্মার্জ্জিত শক্তি ভিন্ন, মনুষ্য বংশ প্রসূত কোন "পুরুষ পুঞ্জই" প্রতিভা যতই প্রবল ও প্রখর হউক, সাহিত্য শিল্প প্রবর্ত্তিত হইতে হইতেই, তদ্রূপ রচনা উৎপন্ন করিতে পারেন না। ফলত বেদ "অপৌরষেয়" উক্ত হইবার নানা কারণ ও যুক্তি প্রমাণ আছে, যাহা বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, আদৌ উপেক্ষা করা চলে না, অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়াও দেওয়া যায়না। চিন্তাশীল ও সত্যানুসন্ধানোৎসুকের নিকট তাহা গভীর চিন্তা, অনুসন্ধান ও অধ্যয়নেরই বিষয় অথচ উহাদিগকে অবশ্যই "অপৌরষেয়" রচনা বলা চলে না।

ঋগ্বেদের গীতি কবিতা, সরলতা হেতু, সর্ব্বাদিমত্বের কোন লক্ষণেরই পরিচায়ক নয়। শৈশব সারল্য ও "স্বভাগতি" এই দুই স্বরূপে, সে লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু উহাদের সহিত স্বতন্ত্র ও সমুন্নত প্রকৃতির অপরাপর স্বরূপের সংযোগে, ঐ দুই স্বরূপকেও সর্ব্বাদিমত্বের লক্ষণাক্রমে বলা যায় না। অপিচ সরল বা স্বতোক্ষিত হইলেই বা সর্ব্বাদিম হওয়া কেমনে বুঝায়? "ঋক্" সকল শিশুহৃদয়ের স্বত-উত্থিত ও স্বত-সমাগত সঙ্গীতের ও সদ্ভাবের স্বরূপসমন্বিত মানব চিত্তের চাঞ্চল্য গীতি বা ইতর উদ্দাম অসংলগ্ন চিন্তার বিন্দু

বিসর্গের সহিতও সংযুক্ত নয়। উহা কোন অংশেই অনিয়মিত রচনা নয়। তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহাতে শৈশবের সরলতা আছে, কিন্তু অপরিপক্কতা নাই। স্বভাবোদ্ভবের ক্ষমতা আছে, অথচ শিল্প পরিপাটীর অভাব নাই। কাব্য কল্পনার সহিত দার্শনিক চিন্তা মিশ্রিত; উন্নত মহান, উজ্জ্বল ভাবাবলী। অসারতার লেশমাত্র নাই; বৈদিক গীতি পরমার্থ তত্ত্বের নামান্তর মাত্র। এক দিকে সরল নির্ম্মল জীবন ধারণোপযোগী দ্রব্যজাত সংস্থানের অন্য ঐশী শক্তির উদ্দেশে উপাসনা প্রার্থনা; অপর দিকে আপনার উন্নতি ও পরিত্রাণ কামনায় অনন্ত শক্তির স্তোত্র গীতি। উভয় দিকেই উহা স্বভাবের সারল্যময় সমুন্নত উক্তি,—ভগন্নিষ্ঠা নির্ভরতার নিদান। ঋগ্বেদ সংহিতা অসত্যের বা অন্ধ সত্যের সৃষ্টি বা সাহিত্যের প্রথম স্তরের রচনা কোন দিক দিয়াই হইতে পারে না।

উহা ছন্দ, যদি মাত্রাদির আদর্শ। বৈদিক গীতি মাত্রেই তাহার বরং বড় বেশী বাড়া-বাড়িই বিদ্যমান। ছন্দাদির প্রতি ততটা ঐকান্তিক নিষ্ঠা এ কালে বা অতি সভ্য ও সম্মার্জ্জিত কালে দৃষ্ট হইবে না। তাহা বৈদিক গীতিতে এত অধিক ও এমন প্রকৃতির যে, এখনকার দিনে, অনেকে, তাহাকে অন্ধ এক-নিষ্ঠতা বা ভ্রান্ত সংস্কার বলিতে পারেন। সাহেবরা বিশেষত পাদরী সাহেবরা হয় ত নিগূঢ় অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়াই সে কথা খুবই বলিয়া থাকেন।

ভাষা, কোন মূর্ত্তি হইতে ক্রমে কোন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত ইংরেজী ভাষা হইতে দেওয়া যাইতেছে।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কবি চশারের ইংরেজীর মূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, আরও একটু এখানে দেখুন। সে মূর্ত্তি এই :—

A clerk ther was of oxenforde also.
That unto logike hadde long ygo.
As lene was his hors as is a rake.
And he was not right fat I undertake;
But looked holwe and thereto soberly.

খুব আঁকা বাঁকা ও বিষম বিসদৃশ বানান বাঁকা হইলেও পাঠক তবুও ইহা কতক বুঝিয়াছেন। এখন ইহার সহিত স্পেনসারের ও সেক্সপীয়রের পরে মিল্টনের এবং সর্ব্বশেষে টেনিসনের ইংরেজীর বা এই সপ্তম এডওয়ার্ডের আমলে কিপ্লিঙের ভাষার তুলনা করুন এবং একে একে দেখুন, কোনটার কি মূর্ত্তি এবং শেষটার অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের ইংরেজীর সহিত আমাদের উদ্ধৃত ইংরেজীটার কি আসমান জমিন তফাৎ। অতঃপর ইংরেজী ভাষার খুব একটা প্রাচীনস্তরের ইংরেজী বারেক নিরীক্ষণ করুন। মূর্ত্তি খানি এই ;—

And deaw dri'as; on deage weoroes
windo geondsawen. (1)

কেমন! কিন্তু বুঝিলেন কি? ইহা হিব্রু, হিন্দুস্থানী, চীন কি ভেলা-পাক ভাষা? না তাহার কিছুই নয়, ইহাও ইংরেজের আপন বাপ দাদা, ইংরেজের খাঁটি ইংরেজী। ইংরেজী, তাহার এই মূর্ত্তি হইতে উপরি উদ্ধৃত চসারের ইংরেজীর মূর্ত্তিতে পৌঁছিতে ৮শত বৎসর লাগিয়াছিল। এখন মনে করুন ভাষার আদ্য কালের মূর্ত্তির সহিত মধ্য ও অন্তকালের মূর্ত্তির কতই তফাৎ এবং একটা হইতে আর একটা যাইতে কত কাল লাগে। সব ভাষা সম্বন্ধেই এই রূপ। বাংলা সম্বন্ধেও তাই। আমরা প্রাচীন বাংলা যাহা পাইয়াছি, তাহা বাংলা ভাষার মধ্য কালের বাংলাও নয়, আদি ত অনেক দূর।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

(১) ইহার আধুনিক ইংরেজী—এই ;—
And the dew-downfall; at the daybreak is winnowed by the wind.

শুভদৃষ্টি।

কোকিল ডাকিছে ঐ!—নীরব ধরণী
গভীর, গম্ভীর, স্থির নিমগন ধ্যানে।
লইয়ে অরুণ-আভা,—অনন্তগগণে
সুধীরে মিশিয়ে যায় বিমল তটিনী।
সুমন্দ বহিছে বায়ু; শীতল সুন্দর
"কুহু" রবে পুলকিত পরাণকন্দর।
জগতী সুষুপ্ত স্তব্ধ, কোলে প্রকৃতির
কেবল কাঁপিছে মোর নিশ্বাসসমীর!
এবে প্রেমমন্দাকিনী—এহৃদয়মধু—
ঢালি দিনু উষাপদে।—ক্ষণিকের পরে
মেঘছানি নেহারিনু, তাঁরি মুখ শুধু
স্বর্ণচূর্ণ লেগে গেল জলদের স্তরে!
এমন নির্জ্জনে আজি সুহাসিনী উষা
বিন্দু সুধা পিয়াইয়ে মিটাল পিয়াসা।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

অবশিষ্ট।

শিরে এ ত, কেশ নহে অযুত অঙ্গার
মালা নয়—জ্বালা সখি! গলে এ আমার;
নয়নে বিজলী নহে—অনল কেবল,
বুকে এ যে যাতনার আবিল গরল;

দেহে সখি! প্রাণ নাই; মরুভূ অপার,
করে এ ত, রাখি নহে, শৃঙ্খল-সম্ভার;
পোড়া মনে সুখ কোথা, শুধু যে বেদন,
গৃহ নহে এ আমার চির-নির্ব্বাসন;
সকলি গিয়াছে সখি! আশার মুকুল,
ঝরিয়াছে, টুটিয়াছে, সোহাগ নির্ম্মূল;
সম্পদ স্বপন এবে, ব্যথা সহচর,
আকণ্ঠ লাঞ্ছনা-বিষে জীবন জর্জ্জর;
সব গেছে শুধু সখি! আছে একজন,
প্রেম নহে, প্রীতি নহে, সে যে লো মরণ!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

হাসি।

ভাল নাহি লাগে তত চন্দ্রিকার খেলা
চঞ্চল বাহিনী বুকে—লহরে লহরে
জোছনার ছুটাছুটি। স্থির সরোবরে
ফুল্ল-কুমুদিনী-হাসি কৌমুদীর মালা
হৃদে ধরি,—তাও নহে তত প্রাণময়।
নিরজন বনময় কুসুমের হাসি
মৃদুল-চুম্বনে মৃদু, বড় ভাল বাসি,—
সে হাসিরাশিতে তবু হয়না হৃদয়
কখনো আপনহারা। নিকুঞ্জকাননে
উষাদেবী হাসে যবে, কত মনোহর
হয় সে যে, ছোটে তাহে সুধার লহর—
সে হাসি মলিন আজি আমার নয়নে।
আমি যে হেরেছি হাসি সে চাঁদ মুখের—
উচ্ছ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি আমার বুকের!

শ্রীইমদাদল হক্।

কবিতার অতীত ও বর্ত্তমান।

অতীত ও বর্ত্তমানে, প্রাচীন ও নবীনে, যে এক চিরন্তন বিরোধ আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে।

এই বিরোধের ব্যাপকতা সর্ব্বদেশে এবং সকল সময়ে দেখা যায়—এবং ইহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এই বিরোধের ফলে বর্ত্তমান যখন অতীত হইতে পুষ্ট ও পরিণত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন অতীত বেচারা অতি বৃদ্ধের মত রোষে ও দুঃখে ঘন ঘন মালা জপ করিতে করিতে বলেন "এখন রক্তের জোরে যাহা ইচ্ছা করিতেছে—প্রাচীনের প্রতি প্রগাঢ়-ভক্তিবিহীন পাষণ্ড গুলাকে আর আঁটিয়া উঠা গেল না" এবং ইহা ভাবিয়া যখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেন তখন একদল অতি প্রবীণ মধ্যস্থ আসিয়া বলেন, "বাপুহে রাগ করিয়া যাইও না, নিতান্তই যদি পৃথক হইয়া ঘর বাড়ী স্বতন্ত্র করিয়া করিবে, তবে মাল মশালাটা অন্তত পুরাণ বাড়ী হইতে লইও—তবু পূর্ব্ব পুরুষের কিছু নাম থাকিবে। পৃথক হইয়া অতি দূর প্রবাসে যাইতেছ যাও, কিন্তু পারত পূজার সময় এক এক বার আসিও, এবং মাসে মাসে চিঠিটা পত্রটা লিখিতে ভুলিও না"।

বর্ত্তমান তখন সস্মিতমুখে বলে, বিলক্ষণ তোমাদের সম্পর্ক কি একেবারে ত্যাগ করিতে পারি, আজ যে এই উচ্চপদ লাভ করিয়া এত বড় হইয়াছি, তোমাদের "নমিনেশন" এবং অনুরোধ পত্রইত তাহার মূল এবং আজ যদি চাকরি যায়, তাহা হইলে কালত তোমাদের ছায়াতেই আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু অতীত যখন বলে—বাপুহে! আজ না হয়

তোমাদের পদমর্য্যাদা বাড়িয়াছে—দুপয়সা আনিতে শিখিয়াছ, কিন্তু তাহা বলিয়া বনেদী চালচলন এবং ক্রিয়া কর্ম্মটা ছাড় কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি এই যে, তোমাদের চির পুরাতন জড়তাপূর্ণ চালচলন লইয়া থাকিলে, আমরা অগ্রসর হইতে পারি কই? তোমরা জীর্ণ পুরাণ পথে ঘুরিয়া যাইবে যাও, আমাদের শক্তি আছে, আমরা নিজের জন্য নূতন পথ করিয়া লইতে পারিব।

ফল হয় এই যে ইহাতে উপর উপর বিরোধ মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু যে মত-পার্থক্য এবং বিসংবাদ অনুদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা যেমনটী তেমনটীই রহিয়া যায়—সে বিরোধ মিটিবার নহে। স্বনীড় প্রতিপালিত পিকশাবককে বায়সকুল যতই তাহাদের আপনার বলিয়া পরিচিত করুক না কেন, সে যথাসময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি ও স্বকীয় মনোমোহিনী স্বরে নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিবেই করিবে এবং তাহা অন্যথা হইবার নহে।

এতকথা বলিবার কারণ এই যে, সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যে প্রাচীন ও নবীন কবিতার মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যথেষ্ট বিরোধ চলিতেছে। একদল বলিতেছেন, প্রাচীন কবিতার মধ্যে যথার্থ কবিত্বের লেশ মাত্র নাই খালি কথার সমষ্টি, উপরের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিও না, আর একদল বলিতেছেন, তোমাদের ঐ অস্পষ্ট অস্পষ্ট ছায়া ছায়া কোমল পদাবলী, উহারত আমরা অর্থই বুঝিয়া উঠিতে পারিনা—উহা আবার কবিতা! তাহা হইলে হেঁয়ালী মাত্রই অতি উচ্চ ধরণের কবিতা বল।

কিন্তু প্রাচীনের নামে এমন একটা মোহ ও মাধুর্য্য আছে যে, তাহার উপর হৃদয়ের টান স্বাভাবিক, তাহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না এবং যে নূতন ধরণের কবিতা প্রাচীনের স্থলে অপূর্ব্ব মোহ মহিমায় নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, তাহার ও দাবী দাওয়া অন্যায্য বলিয়া মনে হয় না। বরং নূতন কবিতা প্রাচীন প্রথার কবি-

তাকে যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—ইহাতে নূতন প্রথার কবিতারই শক্তি-সামর্থ্য বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে অল্পদিন ইহার সূত্রপাত হইলেও পাশ্চাত্য প্রদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বিপ্লব ঘটিয়া গেছে।

ইহার কারণও ছিল। আদিম যুগের সেই মহাকাব্য সৃষ্টির পর, মধ্যযুগে সৃজনী-শক্তিহীন সুধীবর্গ তাহার অন্ধ অনুকরণে মৌলিকতা ও নূতনত্ব মাত্র বিরহিত একঘেয়ে এবং বিকৃত কাব্য সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অসাময়িক এবং কৃত্রিম ভাবদুষ্ট কবিতায় প্রাচীন সাহিত্য ক্রমশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ছন্দের বৈচিত্র, সুন্দর বর্ণ যোজনা এবং কবিতাসুলভ সমগ্র শিল্প প্রযুক্ত হইল, এবং দার্শনিকের গাম্ভীর্য্য ধর্ম্মের বক্তৃতা, বৈজ্ঞানিকের যাথার্থ্য প্রয়োগে অনুষ্ঠানের ত্রুটী হইল না, কিন্তু তথাপি "ক্লাসিক"যন্ত্র হইতে অনবরত পিষিয়া পিষিয়া যে ক্রমাগত এক প্যাটার্ণের কবিতা বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেলনা। অথচ মানুষ সব তাতেই আপনার সত্তা অনুভব করিতে চায়, তাহার হৃদয় জড়ে তৃপ্ত হইবার নহে। এবং এই প্রবীণ মনুষ্য হৃদয়ের পক্ষে কাব্য-ক্রীড়নক লইয়া তৃপ্ত থাকাও অসম্ভব।

অথচ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে কোন শুভ্র উষালোকে মানস-বক্ষে যে পুষ্প ফুটিয়াছিল, এতদিন পরে আজিকার দুঃখজর্জ্জরিত সংশয়াকুল, বাসনা-কলুষ এবং বহুপরিবর্ত্তিত জীবনপ্রবাহে সে ফুল আর ফুটিবার সম্ভাবনা রহিল না। সুতরাং তাহা আমাদিগের নিকট অতি পবিত্র আদর্শতুল্য হইয়া দূরাগত চন্দ্রালোকের মত হৃদয় স্নিগ্ধ করিলেও, তাহা আমাদের নিতান্ত ঘরাও হইতে পারিল না।

কিন্তু সেই আদিম কালের উজ্জ্বল ফুলমালায় ঠিক তাহাদেরই অনুকরণে যে সকল কৃত্রিম ফুল কাটিয়া গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাদের না ছিল মনোহর সুবাস, না ছিল কোমলস্পর্শ, সুতরাং

তাহা তাৎকালিক সমালোচক চক্ষুকে ক্ষণিক প্রতারিত করিলেও দিন দিন শুষ্ক ও শ্রীহীন হইয়া জন হৃদয় অবসন্ন করিতে লাগিল।

কাব্যের প্রকৃতি বেশীদিন এমন রহিলনা এবং উষালোকে অপূর্ব্ব-বর্ণচ্ছটায় প্রাতঃ-সৌন্দর্য্যের আভাস যেমন ফুটিয়া উঠে ভাবরাজ্যে তেমনি একটা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত দেখা গেল। তানলয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ক্রমে স্বরমাধুরী ও সুরসামঞ্জস্যে আসিয়া পড়িতেছিল—এবং অতি প্রাচীন ভাস্করকার্য্যে নিপুণ চিত্রকর-সুলভ মোহন তুলিকা-স্পর্শ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম এই পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া গেল ইটালীতে—সেই কুসুম-প্রফুল্ল দ্রাক্ষাকুঞ্জ হইতে ডান্টের স্বর-লহরী যখন গগণ ছাপাইয়া উঠিতেছিল, এবং এরিষ্টো ও ট্যাসোর গানে যখন ললিত রাগিণী ফুটিতেছিল, তখন সমস্ত ইয়ুরোপ প্রাচী-লোকে এই উষার অস্ফুট বর্ণছটায় কাব্য রাজ্যে প্রভাতের প্রত্যাশা করিতে লাগিল।

এবং তাহার কারণও ছিল। ভার্জিলের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও ডান্টের কবিতায় কেমন একটু মোহমাধুর্য্য, মোহন তুলিকাস্পর্শ ছায়ালোক সম্পাতের অপূর্ব্ব বর্ণ-মাধুরী এবং হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মোহিনী সঙ্গীত শুনা গেল। এবং হোমরের সহিত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এরিষ্টোর কবিতা এবং সমালোচক কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইলেও ট্যাসো অজ্ঞাতসারে পাঠকের হৃদয় সম্মোহিত করিল।

এবং শুধুই কি কবিতায়? সমস্ত ললিতকলা এই নবভাবে অনুপ্রাণিত হইতে ছিল। অতুলনীয় গ্রীকভাস্কর্য্যের অন্ধ অনুকরণ স্থলে গথিক-প্রথা স্থাপিত হইল এবং র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জলো তাঁহাদের অতুলনীয় তুলিকাস্পর্শে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই ভাব জার্ম্মানিতে পৌছিতে কিছু দেরী হইল। জার্ম্মান ভাষার আদিম অপূর্ণতা তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেদিন এক উজ্জ্বল প্রতিভা গেটরূপে "ফাউষ্ট" এবং "রুইব্রাসে" এক অভূতপূর্ব্ব নূতন সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন, কাব্য এবং চিন্তাস্রোত সেইদিন বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। অন্ধ অনুকরণ-দুষ্ট ও কৃত্রিম-ভাবাপন্ন কবিতায় এক সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সঙ্গীত হৃদয়ের প্রতিধ্বনিরূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ঠিক ইহার কিছু পূর্ব্বেই রুষোর নবচিন্তা এবং নব কল্পনা ফরাসী জাতিকে প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। এবং তাহার পর ফরাসী বিপ্লবে ফরাসীজাতি যখন প্রাচীন প্রথার সর্ব্ববন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছিল তখন কাব্য-কলায় এই নবভাবের নবসঙ্গীত প্রবেশের পক্ষে সুবিধা হইয়া আসিল; ফলে ফরাসী সাহিত্য ভিক্টরহিউগো, লামার্টাইন, এবং মেসেটের নব কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এবং ইংলণ্ডে যখন প্রায় দেড়শত বৎসর কাল, ওয়ালার হইতে জন্‌সন্, এবং হব ও টম্পল্ হইতে রবার্টসন ও হিউম পর্য্যন্ত সমস্ত লেখক ও কবিকুল এই প্রাচীন প্রথার যূপমূলে সত্য ও সৌন্দর্য্যকে বলি দিতেছিলেন ঠিক সেই সময় দূরে জার্ম্মানি ও ফ্রান্সের কাব্য রাজ্যে প্রভাতের কোকিল-কাকলী শুনা গেল।

ক্রমশ এই পরিবর্ত্তন ইংলণ্ডেও আরম্ভ হইল। এবং অচিরে সাদে, স্কট, ওয়াড্‌সওয়ার্থ, সেলী, কীট্‌স্ ও বায়রণ অতি দুর্ব্বল জীর্ণ শীর্ণ কাব্যকে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যস্তন্যে পালন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার স্বাভাবিক লাবণ্য ও অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা ফিরিয়া আসিল। যে কাব্যকলা ইতিপূর্ব্বে জনকতক সুধীর আয়ত্তাধীন রাজতন্ত্রস্বরূপ ছিল, তাহার স্থলে ভাবের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল।

এবং ফ্রান্সের নবীন সভ্যতা ও রাষ্ট্র প্রণালীর বিরুদ্ধে জর্ম্মান ও ইংরেজ একত্র হওয়াতে এই পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিল। ফলে জার্ম্মানের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দার্শনিকচিন্তা ইংরেজ কবির দৃষ্টিকে আরও অন্তর্মুখী করিল।

প্রাচীন কবিতাকে এইরূপে নবভাবে উদ্দীপিত করিবার মূলে হৃদয়, কেননা কবি সেই সময়ের ভিতর দিয়া কিম্বা সর্ব্ব সময়ের অতীত হইয়া যে সত্য হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া লইয়াছেন, সেই সকল সত্যকে কোমলভাবময়ী ও গীতিময়ী করিয়া সৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলার নামই কবিতা। নিজ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে, সাহিত্য ও ললিত কলাকে নববল ও নবস্বাস্থ্য প্রদান করে, এবং তাহার উজ্জ্বল-মুখে নবীন লাবণ্য ফুটাইয়া তোলে; যে সাহিত্য ও ললিত কলার মূল মনুষ্য হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই তাহা মূলহীন মৃত্তিকালগ্ন কুসুমিত তরুশাখার মত কিছুক্ষণ মানবচক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদণ্ডেই তাহা শুকাইয়া ভূমিসাৎ হইবে ইহা নিশ্চিত! হৃদয়ের ভাব-শোণিতই সমগ্র সাহিত্য ও ললিত কলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে সুস্থ ও সবল করে এবং কৃত্রিম উপায়ে শোণিত প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহা আজিও বৈজ্ঞানিকের সন্দেহস্থল!

এই পরিবর্ত্তনও খুব স্বাভাবিক; সেই আদিম কালের শান্ত, পরিপূর্ণ, ও আনন্দ-বিহ্বল কবি-হৃদয় যে পবিত্র কাব্যালোকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সংসার বিষারণ্যে অনাসক্ত হৃদয়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত বিহগের মত, যে উদাত্ত স্বরে পবিত্র সঙ্গীত গান করিয়া ছিলেন, আজি কালিকার এই ঘোর জীবন সংগ্রামের দিনে, এই দুঃখজর্জ্জরিত-বাসনা-কলুসিত ও শোক-দুঃখ সংশয়-তমসাচ্ছন্ন অন্ধতম হৃদয়ে, সে আলোক এবং সঙ্গীতের প্রত্যাশা করা বৃথা। এবং তাহার অনুকরণে

কৃত্রিম সৃষ্টি ও নিরর্থক। কাব্যের মূল আদর্শে নহে, মনুষ্য হৃদয়ে, এবং হৃদয়ের ভাবেই তাহা সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট।

সুতরাং প্রাচীন কবিতা হইতে ইহা ক্রমশ বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া আসিবে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সর্ব্বকাল ও সর্ব্বযুগের অতীত মহাকবিদিগের শুভ অনন্ত মুহূর্ত্তে রচিত কাব্যকলার কথা ছাড়িয়া দিলে এই প্রাচীন ও নবীন কবিতার মধ্যে পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রাচীন কবিতা মহান্ ও পবিত্র দেব মন্দিরের মত অনন্ত আকাশ তলে বিরাজিত, তাহা ভাস্কর্য্যে অতুলনীয়, গঠনে সুন্দর ও সুস্পষ্ট, মূর্ত্তি বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব সুষমা-ময়ী, কিন্তু বর্ত্তমান কবিতা একটী সুন্দর চিত্রের মত, তাহার চতুর্দ্দিকের অতি সুন্দর দৃশ্যের মাঝে অরূপ প্রভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার বর্ণ উজ্জ্বলতা এবং ভাবের সূক্ষ্মরেখাটুকু পর্য্যন্ত ছায়ালোক-সম্পাতে অতি উজ্জ্বল অতি মোহন।

প্রাচীন কবিতা যেন বিস্তৃত জল রাশির মত ধীর স্থির প্রশান্ত অতি সুস্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। আধুনিক কবিতা যেন সঙ্কীর্ণা গিরি-নির্ঝরণীর মত বনান্তরালে দূর স্বপ্নরাজ্য দিয়া কল্লোলে কল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে। প্রাচীন কবিতা আপনার মাঝে আপনি তৃপ্ত, আধুনিক কবিতা আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

প্রাচীন কবিতা এক জাতির নিজস্ব জাতীয় সম্পত্তি, আধুনিক কবিতা বহু সভ্যতার সংমিশ্রণ-ফলোৎপন্ন।

প্রাচীন কবিতা বাহির হইতে অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করে আধুনিক কবিতা অন্তরের আলোকে চরাচর উদ্ভাসিত দেখে। প্রাচীন কবিতা সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে, আধুনিক কবিতা সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণে, রমণীয়।

প্রাচীন কবিতায় অর্থ সুস্পষ্ট, বর্ণনা উজ্জ্বল, এবং চিন্তা অতি সরল, আধুনিক কবিতা অস্ফুট, সূক্ষ্মচিন্তা এবং হৃদয়ের বিশ্লেষণে জটিল। অনেকে এই জন্য আধুনিক কবিতার পক্ষপাতি নহেন।

কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের দুইটা করিয়া দিক আছে, একটা দিক বেশ সুস্পষ্ট, আর একটা দিক অস্পষ্ট। কিন্তু এই দুটার উপরই সম্পূর্ণতা নির্ভর করে। অরণ্যের সম্মুখ হইতে তাহার উন্নত শাখা-প্রশাখা-কণ্টকপুষ্প-সমন্বিত-বন্য-জন্তুসঙ্কুল গম্ভীর দৃশ্য ও দূর হইতে মেঘরাজ্যে শ্যামলবর্ণাভা দুয়েরই অঙ্কণে চিত্রের সাফল্য, একই বস্তুর দুই রকম চিত্র, স্বর্গমর্ত্ত, উষা ও গোধূলী, মধ্যাহ্ন ও রাত্রি, স্পষ্ট অস্পষ্ট লইয়াইত পৃথিবী।

স্থির চক্র ও আবর্ত্তিত চক্র এ দুয়েরই বর্ণনায় চক্র বর্ণনা সম্পূর্ণ দুইজন দুই দিক দিয়া দেখেন মাত্র। সুতরাং কাব্য স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হইবেই।

কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যে আনন্দ অনুভব করেন তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি সমস্ত পৃথিবী ও চরাচরের মধ্যে যে এক অতি মহান সত্তার অস্তিত্ব হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করেন,—সংসারের সমস্ত পদার্থই যাহা ছায়া রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি,—কেমন করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিবেন? মৃত্যুর বর্ণনা তিনি স্পষ্ট ভাষায় দিতে পারেন বটে, কিন্তু সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে যে মৃত্যু চির দিনের জন্য বাসা বাঁধিয়াছে তাহার ছায়া অঙ্কিত করিতে গেলে ভাষা অস্পষ্ট হইবেই। বিরহ ও মিলন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা যায় বটে, কিন্তু বিরহের মাঝেও যে মিলনের সুখস্বপ্ন আমরা অনুভব করি, এবং মিলনের মধ্যেও যে অনেক সময় আমরা অতৃপ্তি ও বিরহের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারি, তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী

সুস্পষ্ট ভাষা কোথায়? শোক দুঃখ বরং চিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের রুদ্ধশ্বাস, ও অন্তরের আকুলি ব্যাকুলি রেখায় অঙ্কিত করিতে হইবে। সুতরাং কাব্য যে নিতান্ত সুস্পষ্টই হইবে তাহার কোনও কারণ নাই; স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুইটা দিক বর্ণনাই কবিতার সাফল্য!

আধুনিক কবিতা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হইবার কারণও ঘটিয়াছে। সেই প্রাচীন কালে শান্ত ও আনন্দালোকে যাহা উজ্জ্বল ছিল, আজ বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সমস্ত পদার্থের উপর কেমন একটা ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

সুশৃঙ্খল জগতের মাঝে বিশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য পার্শ্বে কুৎসিত, আলোকের পার্শ্বে ছায়া, হাসির পার্শ্বে অশ্রু, প্রণয়ে লালসা, স্বর্গে নরক, আশায় নিরাশ, কবির অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কাব্য ইহার প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না, কাজেই কবির এখন প্রধান আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট দিকের অনুসন্ধান, রহস্যের মীমাংসা, এবং প্রাণের নীরব সঙ্গীতের সঙ্গে বিশ্ব সঙ্গীতের সামঞ্জস্য নির্ণয়! ছায়ার সঙ্গীত ছায়ায় এবং আলোকের সঙ্গীতের উজ্জ্বলতাতেই তাহার সাফল্য!

প্রাচীন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাচীন কালের কাব্যের ভাবই সমস্তটা প্রকাশ করিয়া ফেলিত, শব্দের উপর ততটা ভরাভর না করিলেও চলিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও জীবনের রহস্য মীমাংসায় ভাব সমস্তটা বলিয়া উঠিতে পারে না সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের এক জাতি অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক সম্পূর্ণ সঙ্গীতের সৃজন করে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনুসারে আধুনিক কবিতায় ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দ নির্ব্বাচন নৈপুণ্যের উৎকর্ষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সূর্য্যালোকের মত, প্রৌঢ়া রমণীর রূপের মত, প্রস্ফুট কুসুমের সৌন্দর্য্য ও বসন্তের ললিত রাগিণীর মত, প্রাচীন তন্ত্রের কবিতা উপভোগ করা যায়; চন্দ্রালোকের মত, ঈষৎ-অবগুণ্ঠন-মুক্ত সলজ্জ যুবতীর কোমল চাহনীর মত, সন্ধ্যার ঈষদুদ্ভিন্ন কুসুমমুকুল ও মর্ম্মার স্নিগ্ধগম্ভীর অথচ অস্ফুটরাগিণীর মত, নব্যতন্ত্রের কবিতা অল্পে অল্পে এক অপূর্ব্বভাবে হৃদয় স্নিগ্ধ করে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নব্যতন্ত্রের কবিতা কিছু দুর্ব্বোধ, কিছু রহস্য-জটিল। কিন্তু ললিতকলামাত্রই তাহাই; হৃদয়ের উৎকর্ষ ও শিক্ষানুসারে, অনুশীলন ও অনুভূতির তারতম্যানুসারে, তাহা সুগম কিংবা দুর্ব্বোধ হইয়া আইসে। জড়মূর্ত্তির উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্য আমাদের সকলের চক্ষে পড়ে বটে, কিন্তু চিত্রে ছায়ালোকসম্পাতের অপূর্ব্ব-মাধুরী কয়জন বুঝিতে পারে? কিন্তু দুর্ব্বোধ বলিয়াই কি তাহা অনর্থক? চিত্রের মত আধুনিক কবিতা অতি অস্পষ্ট, অস্ফুট অংশ পর্য্যন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ করে, এবং যতটুকু প্রকাশ করে, তাহা অপেক্ষাকৃতের বেশী আকাঙ্ক্ষায় ও বহুভাবে হৃদয়কে জাগরিত ও মুখর করিয়া তুলে। এ স্থলে অস্ফুটতাই ইহার সৌন্দর্য্য, রহস্যেই ইহার মাধুর্য্য, এবং অস্ফুট তুলিকাস্পর্শেই লাবণ্য পরিপূর্ণ ফুটিয়া উঠে।

কবি তাঁহার বক্তব্য বিষয় অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিলেও যদি আমরা তাঁহার অন্তর্লীন গভীরভাব ও মোহন সঙ্গীত না বুঝিয়া হাল ছাড়িয়া দিই এবং প্রসাদগুণের একান্ত অভাব ও কবিত্বহীনতার জন্য যদি অনর্থক কবিকে গাল পাড়ি, তাহা হইলে কবি কেবল চতুরাননকে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে নিষ্ফলপ্রার্থনা মাত্র করিয়া মনে মনে আমাদের জন্য পাঁচালী ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন! নহিলে অরসিকের সহস্র উপেক্ষা সত্ত্বেও ললিত কলা তাহার অপূর্ব্ব মাধুরী

লইয়া চির উজ্জ্বল থাকিবে, সকলেই যে বুঝিতে পারিবে, তাহার কোন অর্থ নাই—সমুদ্র মন্থন করিয়া সকলের ভাগ্যেই সুধা উঠে নাই—কাহারও কাহারও ভাগ্যে গরল ত উঠিয়াছিল। তাহাতে মন্থনের দোষ যতটা, সমুদ্রের দোষ ততটা নহে।

শুধু তাহাই নহে, পৃথিবী ও জীবনচিন্তায় সর্ব্বদাই নিমগ্ন থাকায় নবীনতন্ত্রের কবিগণ সকল বিষয়েই নিজের সত্তা অনুভব করেন। তাই ফলপুষ্প-শাখা-সমন্বিত শ্যামময় তরু-অন্তরালে কবি নিজ হৃদয়ের ছায়া অনুভব করেন, বিকচকুসুম তাঁহার চক্ষে অশ্রুসঞ্চার করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাত-বিষাদে ভরিয়া আইসে। তাঁহার দৃষ্টি গভীর ও অন্তর্মুখ বলিয়া তিনি চরাচরের অসীম সৌন্দর্য্য-সম্পদের মাঝে থাকিয়াও বুদ্ধদেবের মত সাশ্রুনয়নে অসীমের কূলে বিবাগী হইয়া যান, এবং সেখান হইতে যে অসীম জ্ঞান ও ভাব সংগ্রহ করিয়া আনেন, তাহা চিরদিনের মত মনুষ্য-হৃদয়কে নবভাবে সঞ্জীবিত করে।

সেইজন্যই আধুনিক কবিতার সুর বড় করুণ হইয়া আসিতেছে—এবং তাহা না হইয়াই পারে না। আধুনিক কবিগণ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে যখন দূরে মনোভিরাম শ্যাম-স্নিগ্ধ-প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন, তখন ইহাদের অন্তরে আপনার এক বিরাট্ সত্তা অনুভব করিয়া সমস্ত প্রকৃতিকে প্রণয়ের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধনে চির আবদ্ধ করিয়া ফেলেন,—এবং তাহার হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া প্রকৃতির রহস্যময় এক মোহন সঙ্গীত অনুভব করিয়া তাহাই ফুটাইয়া তুলেন।

আর একটা পার্থক্য এই যে প্রাচীন তন্ত্রের কাব্যে আদ্যন্ত যে একটা প্রবাহ ও একনিষ্ঠতা ছিল, আধুনিক তন্ত্রের কবিতায় বহুলক্ষাভিমুখ ভাবস্রোতে তাহা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে

এবং আধুনিক ঘাত-প্রতিঘাতপরিপূর্ণ মনুষ্যহৃদয়ের অনুরূপে তাহা একতা ও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ নহে। বরং আবর্ত্তসঙ্কুল ও ফেনিলোচ্ছ্বল ভাবধারা পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এতদূর যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় বুঝান কঠিন হইবে না যে, প্রাচীনতন্ত্র ও নবীনতন্ত্র, এই উভয়বিধ কবিতারই সাফল্য আছে। দুই জন কবি দুই দিক্ দিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। ফেনিলনীলাম্বুরাশি-কল্লোলিত অসীম-সমুদ্রের প্রসারও অঙ্কিত করিতে হইবে, আবার জ্যোৎস্নালোকশুভ্রশীর্ষ নীল-তরঙ্গের আলোক-রেখা, তাহার উজ্জ্বল মাধুর্য্য, উদ্দাম গতি ও কম্পনটুকু পর্য্যন্তও আঁকিতে হইবে। ভাব ও কল্পনার প্রাচুর্য্যে এক বিরাট মনুষ্যত্বও যেমন অঙ্কিত করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নর হৃদয়ের ইথিরীয় ভাবের তরঙ্গটুকু পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পৌষ-প্রখর শীত ও শরতের হিমানী, উভয়বিধ বর্ণনাতেই চিত্রের সাফল্য।

সুতরাং প্রাচীন ও নবীনতন্ত্র, এই উভয়বিধ কবিতারই প্রয়োজন। নহিলে কাব্যকলা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কেবলমাত্র ছায়া কিংবা কেবলমাত্র আলোক হইলেই চলিবে না। আলোকের পার্শ্বে ছায়াই অধিকতর শোভনীয় এবং উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া সম্পূর্ণ।

দুয়ের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও বিরোধ নাই। অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ই এক মহাকালের বিভিন্ন অংশ, প্রাচীন ও আধুনিক কবিতাও সেই একই মহাকাব্যের বিভিন্ন দিক্ মাত্র। তাই বাঙ্‌লায় ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের এক হিসাবে যেমন সার্থকতা, বিদ্যাপতি-

চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিবর্গ, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের অপরদিকে তেমনি সার্থকতা!

উভয় তন্ত্রের কবিই প্রতিভাবান্ এবং উভয় তন্ত্রেই কবিত্ব আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বিরোধ কেবল অনুকরণকারীদের লইয়া। অন্ধ অনুকরণে প্রাচীন তন্ত্রের কবিতা যেমন কেবলমাত্র কৃত্রিম ভাবহীন পদাবলীতে পরিণত হয়, নব্যতন্ত্রের কবিতাও তেম্‌নি অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতায় ও ভাবাতিসারে অর্থহীন অসম্বদ্ধ প্রলাপ-মাত্র হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেও তাহাই হইতেছে। মাই-কেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অন্ধ অনুকরণে কাব্যনামে যে এক কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথের এক ছিন্ন তন্ত্রী লইয়া সমস্ত ভাব-প্রবণ তরুণ কবিবর্গ যে অতি অভূতপূর্ব্ব বেসুরা আওয়াজ করিতেছেন, তাহাতে বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যকে অতি আকুল হইতে হইয়াছে। তাঁহাদের ভীষণ কবল হইতে কবিতা-দেবীকে উদ্ধার করিলে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন, এমনি অবস্থা!

তাই পাশ্চাত্য দেশে classicismএর বিরুদ্ধে Romantic স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্লাসিক ও রোমাণ্টিকের মধ্যে প্রাধান্যলাভ লইয়া কখনও বিবাদ চলিয়াছিল বলিয়া আমার জানা নাই। বিরোধ হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কেননা দুইটীই অধিকারভেদে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বস্তুগত পার্থক্যও যথেষ্ট। তবে সময়ে সময়ে একটীর উপর কবির দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হইতে পারে বটে কিন্তু অনুদিন কবিমুখে এই দুই ভাবে কবিতা নিঃসরিত হইয়া বসুধাকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে—কাব্যে চিত্র ও বর্ণনাকে সম্পূর্ণতা প্রদান করিবার জন্য উভয়ই তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় এবং ভাবামৃতে চির-সঞ্জীবিত সন্দেহ নাই।

কৌতুকময়ী।

ইমন্‌কল্যাণ—একতালা।

(মম) যৌবন-বন-সারিকা,
সঙ্গীত-ধন-সাধিকা,
ফুটালে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে মালতী যূথি সেফালিকা!
তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ,
তুমি কি বহ্নি, আমি পতঙ্গ?
জ্বলো জ্বলো এ জীবনে, অয়ি উজ্জ্বল দাহিকা!
কুটীর দ্বারে ভারে ভারে সাজাইছ বসি অর্ঘ্য,
মনোমন্দিরে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিছ স্বর্গ;
কে তুমি, অয়ি কৌতুকময়ী,
কে তুমি আমার গো!
দুলিছে দু'খানি চরণ-ভঙ্গে আমার জীবন মরণ রঙ্গে;
কণ্টকে ফুলে গাঁথি'
কণ্ঠে পরাও মালিকা।

কথা ও সুর—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

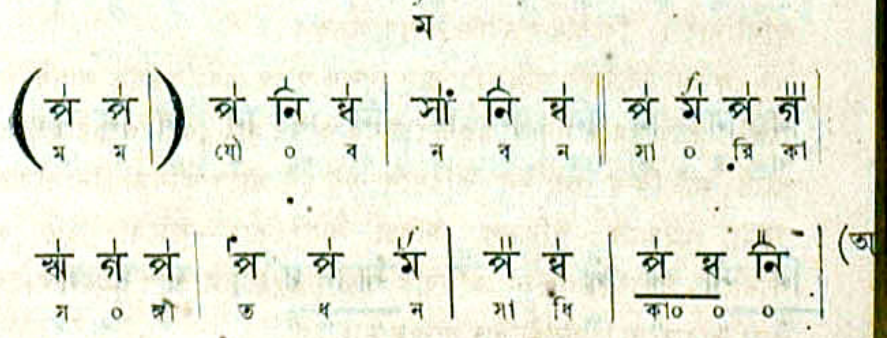

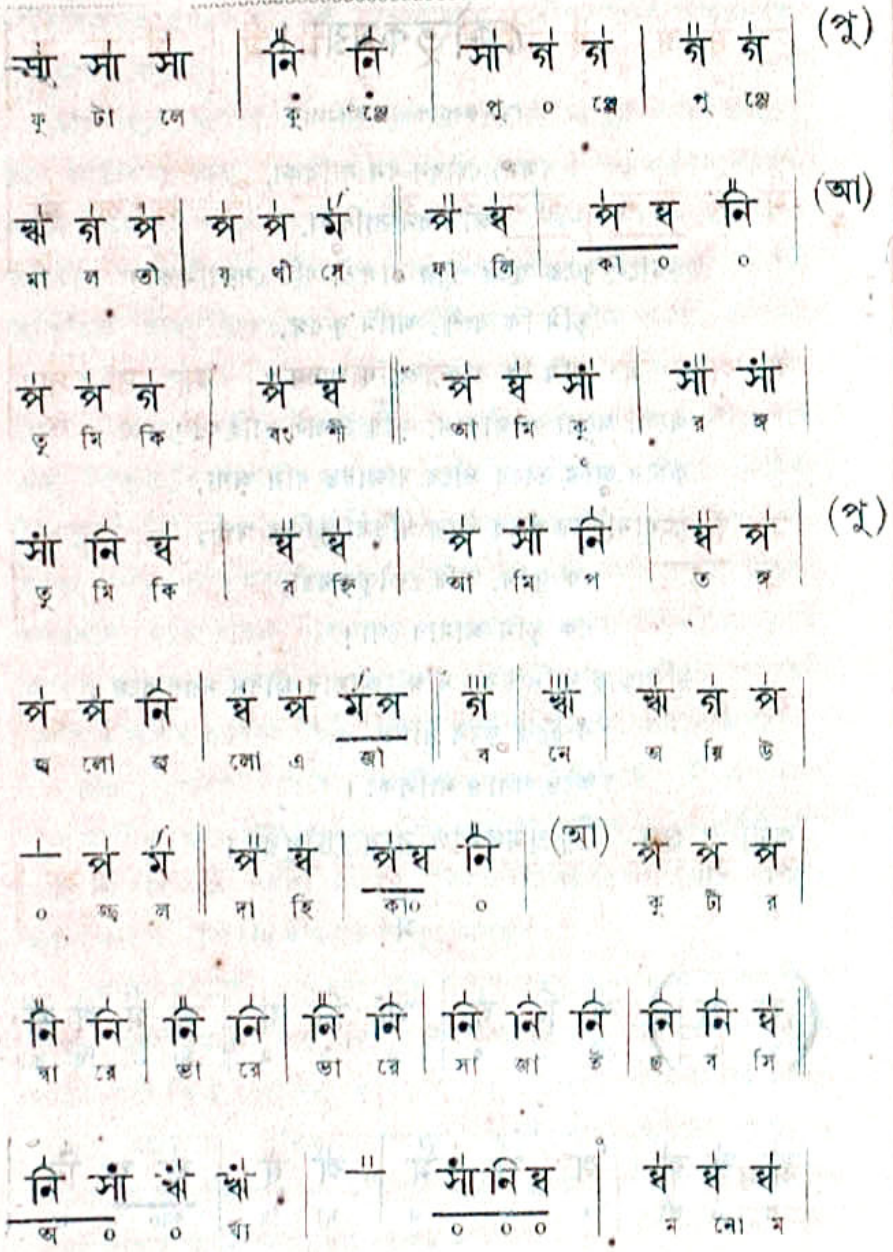
(পু)
ফু টা লে
কু ঞ্জে
পু ঞ্জে
(আ)
মা ল তী
যু থী সে
ফা লি
কা ০
তু মি কি
বং শী
আ মি কু
র ঙ্গ
(পু)
তু মি কি
ব ঙ্কি
আ মি প
ত ঙ্গ
ব লো ব
লো এ
জী
ব
নে
অ ঞ্জি উ
০ ঙ্গ ল
দা হি
কা০ ০
(আ)
কু টী র
ঝা রে
ভা রে
ভা রে
সা জা ই
ছ ব সি
অ ০ ০ ঘা
০ ০ ০
ম নো ম

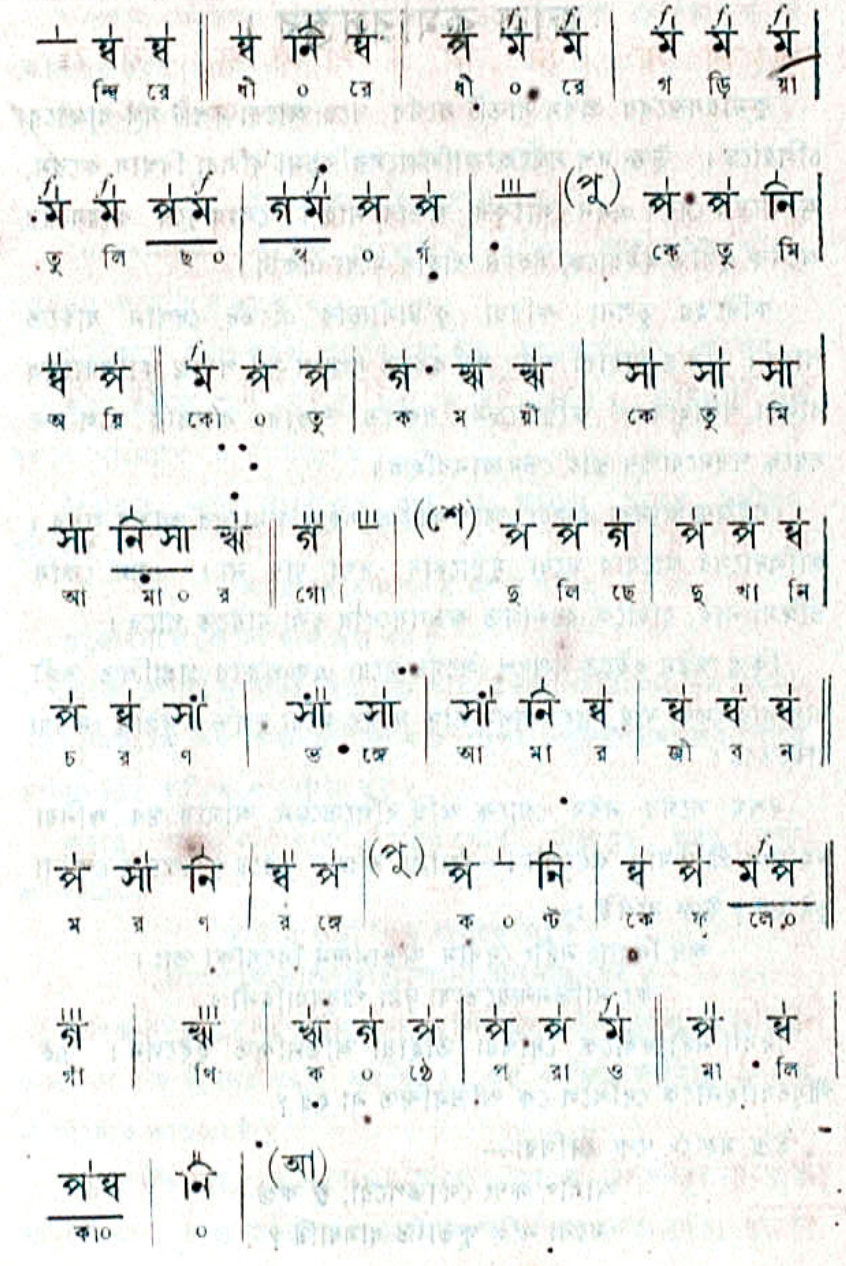
ঝি রে
ধী ০ রে
ধী ০ রে
গ ড়ি য়া
তু লি ছ ০
ব ০ গ
(পু)
কে তু মি
অ য়ি
কো ০ তু
ক ম য়ী
কে তু মি
আ মা ০ র
গো
(শে)
ছ লি ছে
ছ খা নি
চ র ণ
ভ ঙ্গে
আ মা র
জী ব ন
ম র ণ
র ঙ্গে
(পু)
ক ০ ষ্ট
কে ফ লে ০
গা
গি
ক ০ ষ্ঠে
প রা ও
মা লি
কা০
০
(আ)

জাল কুমারসম্ভব।

কুমারসম্ভবের প্রথম সাতটি সর্গের পরে আরো দশটি সর্গ বাজারে চলিয়াছে। উক্ত দশ সর্গকে কালিদাসের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নাই। লোকমুখে কবিবরের অনেক দুর্গতি হইয়াছে, ইহাও তাহার মধ্যে একটা।

কবিত্বের তুলনা করিয়া ঝুঁটাসাঁচ্চার প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা অষ্টম সর্গ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত কালিদাসের বলিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছেন, সম্ভবত তাঁহারা কাব্যের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পরমযোগীর ন্যায় ভেদজ্ঞানরহিত।

সেইজন্য আমরা একটা অপেক্ষাকৃত সহজ প্রমাণের আশ্রয় লইব। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে মুদ্রাদোষ দেখা যায় না। এমন কোন ভঙ্গিমা নাই, যাহাকে রচনাগত অভ্যাসদোষ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গের মধ্যে একপ্রকার প্রশ্নাশ্রিত ভঙ্গী বারংবার দেখা যায়, যাহা প্রথম সাত সর্গের মধ্যে দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

দশম সর্গের নবম শ্লোকে অগ্নি বলিতেছেন, আমার স্তব শুনিয়া মহাদেব প্রীতিমান্ হইলেন।—স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে? স্তোত্রে কে না তুষ্ট হয়? উক্ত সর্গেই :—

অথ দিব্যাং নদীং দেবীম্ অভ্যানন্দন্ বিলোক্য তাঃ।
কং নাভিনন্দয়ত্যেষা দৃষ্টা পীযূষবাহিনী॥

দিব্যা নদীদেবীকে দেখিয়া তাঁহারা অভিনন্দিত হইলেন। এই পীযূষবাহিনীকে দেখিলে কে অভিনন্দিত না হয়?

ইন্দ্র মহাদেবকে দেখিয়া—

আসীৎ ক্ষণং ক্ষোভপরো, নু কস্য
মনো নহি ক্ষুভ্যতি ধামধাম্নি?

ক্ষণকাল ক্ষোভপর হইয়া রহিলেন, তেজোধামকে দেখিয়া কে না ক্ষোভপর হইয়া থাকে?

প্রভুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া

প্রাপোপবিশ্য প্রমদং সুরেন্দ্রঃ
প্রভুপ্রসাদো হি মুদে ন কস্য?

উপবেশনপূর্ব্বক সুরেন্দ্র প্রমোদিত হইলেন, প্রভুপ্রসাদে কাহাকেই বা প্রমোদিত না করে?

কার্ত্তিককে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাভিলাষ ইন্দ্র প্রমোদপরায়ণ হইলেন—

ধ্রুবমভিমতে পূর্ণে কো বা মুদা ন হি মাদ্যতি? অভিলাষ পূর্ণ হইলে আমোদে কে না মত্ত হয়?

শৈলসুতা আর কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া পুত্রের সমীপস্থ হইলেন—

পুত্রোৎসবে মাদ্যতি কা ন হর্ষাৎ

পুত্রোৎসবে কে না হর্ষে মত্ত হয়?

পুত্রকে দেখিয়া পার্ব্বতী সহস্র চক্ষু পাইতে ইচ্ছা করিলেন—ন নন্দনালোকনমঙ্গলেষু ক্ষণং ক্ষণং তৃপ্যতি কস্য চেতঃ—পুত্রদর্শনমঙ্গলব্যাপারে কাহার চিত্ত প্রতিক্ষণে তৃপ্ত না হয়?

কুমার বাললীলা দ্বারা গিরিশ-গৌরী উভয়ের হৃদয় হরণ করিলেন—

মুদে ন হৃদ্যা কিমু বালকেলিঃ?
হৃদ্যা বাল্যলীলা কাহাকে না আমোদ দেয়?

মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কুমারকে দেখিয়া যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—ন কস্য বীর্য্যায় বরস্য সঙ্গতিঃ? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গলাভ কাহার না বীর্য্যের কারণ হয়?

আরো কি প্রমাণের প্রয়োজন আছে? কাব্যে উপমা-তুলনা দ্বারা ভাবকে পরিস্ফুট ও পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করা হইয়া থাকে,

কিন্তু বারংবার এমন অনাবশ্যক প্রশ্নের খোঁচা মারিয়া পাঠককে ব্যস্ত করিয়া তোলা কালিদাসে কোথাও ত দেখি নাই। কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের মধ্যে এমন মূঢ়ের মত প্রশ্ন একটিও কেহ বাহির করিতে পারিবেন না। উপরি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে দেখা যাইবে, প্রশ্নের দ্বারা যে কথাগুলাকে আলোড়িত করিয়া তোলা হইয়াছে, সে কথাগুলা অতি সামান্য, তাহাতে কোন পাঠকের সংশয়ের অবকাশমাত্র থাকিতে পারে না। মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি হইলেন,—ইহার পরে যদি কোন কবি প্রশ্নস্বরূপে পুনর্ব্বার লেখেন, কোন্ মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি না হন্? তবে তিনি কালিদাসের সিংহচর্ম্ম পরিয়া আসিলেও কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়েন। উপরের প্রশ্নমালা যদি কালিদাসের রচনা হয়,তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার কাব্য হইতে আরো এমন সহস্র প্রশ্ন হারাইয়া গেছে—সেগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যেমন হরকোপানলে—ভস্মাবশেষং মদনং চকার,—এই খানে থাকা উচিত ছিল, অনলে কে না ভস্ম হয়? যেখানে রতি বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা, সেখানে লেখা উচিত, বিলাপকালে কোন্ রমণীর মাথার চুল ঠিক থাকিতে পারে?

সমালোচনা।

বঙ্কিমবাবুর সময় যে সমালোচনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া নবীন বঙ্গ-সাহিত্যকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতেছিল, ইদানীং তাহা অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এবং সেই রুদ্ধ-স্রোতে সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি হইতে যে একপ্রকার অতি অস্বাস্থ্যকর দূষিত বাষ্প উঠিয়া সমস্ত সাহিত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইহার কারণও খুঁজিতে হইবে না। প্রথমত সমালোচনা সম্বন্ধে

একটা প্রকৃত ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই, সমালোচনা করিবার শক্তি আরও অল্প, অথচ আমাদের মধ্যে সমালোচক কে নহে?

কিন্তু পাঁচালীকার বা কবিতা-লেখক মাত্রেরই 'কবি' আখ্যার মত, তাহাদের সমালোচক আখ্যাও নিতান্ত নিরর্থক হইয়া উঠিতেছে, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে দুই প্রকারের সমালোচনা প্রচলিত, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এক প্যারা মাত্র, তাহাতে অতি সংক্ষেপে দু এক লাইনের মধ্যে পুস্তক বা প্রবন্ধের উপর মতামত প্রকাশিত হয়। এবং দ্বিতীয়টি সাধারণত কয়েকপৃষ্ঠাব্যাপী হইলেও প্রায়ই পুস্তকের গুণাগুণ অপেক্ষা লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর বেশী মাত্রায় নির্ভর করে।

এখন, সমালোচনা কাহাকে বলে? এক কথায় বইখানি বা প্রবন্ধটিকে ভাল কি মন্দ বলা সমালোচনা নহে, এবং তাহাতে বিশেষ ক্ষমতা বা গবেষণার আবশ্যক হয় না। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন বলিলে, বা উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ দেখিয়া প্রভাত হইয়াছে বলিলে সমালোচকের সূক্ষ্মবুদ্ধি বা বিচক্ষণতার বিশেষ কোন আভাস পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত মতামত ও "পুস্তক খানি আমার কেমন লাগে" এই ধুয়া ধরিয়া সমালোচনা করা আজি কালিকার দিনে বিরল না হইলেও, সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য বড় কম। তাহার কারণ এই যে তাহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে এবং তাহাতে একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; এবং অনেক স্থলেই সূর্য্যালোকপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নকে সমালোচক মহাশয় তাহার অজস্র তর্কজালে ও তামসী বাক্যছটায় অন্ধকার প্রতিপন্ন করিতে চাহেন বলিয়া তাহা হাস্য উদ্রেক করে মাত্র!

এমন এক দিন ছিল, যখন পরস্পর কদর্য্য ভাষায় গালাগালি ও বিদ্রূপেই লোকে সমালোচনার আনন্দ উপভোগ করিত। উদাহরণ স্বরূপ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ও ৺গৌরী কান্ত ভট্টের সংগ্রাম, রাম প্রসাদ ও আজু গোসাঁইর পাল্টা গান, ৺রাজা রাম মোহন রায় ও তাৎকালিক পণ্ডিতবর্গের বাদ প্রতিবাদ, সর্ব্বোপরি সপ্তদশ শতাব্দীতে সুসভ্য পাশ্চাত্য প্রদেশে মিলটন ও সালমেসিয়সের (Salmasius) মধ্যে পরস্পরের প্রতি ছাপার অক্ষরে যে বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত হইয়া ছিল, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সেকালে আর এক দল লোক ছিলেন তাঁহারা নূতন বা মৌলিক কিছুই সহ্য করিতে পারিতেন না। মান্ধাতার আমলের প্রাচীন প্রথার "পান হইতে চুণ টুকু খসিলে" আর রক্ষা ছিল না।

ইংলণ্ডে এই প্রাচীন প্রথার অন্ধকূপ হইতে জনসনই সমালোচনাকে প্রকৃত সাহিত্যের উষালোকে আনয়ন করেন। সাহিত্যের উপর প্রভূত প্রভাব, স্বাধীন এবং দৃঢ়চিত্ত, অসীম জ্ঞান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁহাকে সমালোচনা কার্য্যে বহুদূরে অগ্রসর করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সমালোচনাও ব্যক্তিগত কুসংস্কার ও সংকীর্ণ মতামতের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ইহা হইতেই সমালোচকের কঠোর দায়িত্ব অনুভব করা যায়।

জনসনের পর "এডিনবরা রিভিয়ু" মুখ্যত ইংলণ্ডে সমালোচকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের মূলনীতি এই ছিল যে, একজন অযোগ্য লেখক সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশ করা অপেক্ষা বহুপ্রতিভা ও ক্ষমতাবান লেখকের অযথা নির্য্যাতনও শ্রেয়স্কর। তাহা ছাড়া ইহা তাৎকালিক "হুইগ" নামক রাজনৈতিক দলের মুখপত্র ছিল।

ফল হইয়াছিল এই যে, যে পুস্তক, সমালোচকদের ভাল না লাগিত

তাহার আর নির্য্যাতনের সীমা ছিল না, পক্ষান্তরে যাহা দৈবাৎ তাঁহাদের ভাল লাগিত অথবা কোনও হুইগের লেখনীপ্রসূত হইত তাহার অযথা সুখ্যাতি ও অতিরঞ্জিত সমালোচনা হইত। ক্রমান্বয়ে এই অত্যাচারের ফল হইল Quatorly Review এর সৃষ্টি। অপর পক্ষ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে খেউড় আরম্ভ করিলেন।

এই Quaterly Reviewএর সমালোচক শীর্ষে Macaulay কে দেখা যায়। Macaulay প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি বাক্যবিন্যাসে যতটা নিপুণ ছিলেন সমালোচনীশক্তির তাদৃশ অধিকারী ছিলেন না। বিষয় বর্ণনে যতটা কৃতী ছিলেন, চরিত্র অঙ্কণে ততটা সিদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার ওজস্বী মনোমোহিনী ভাষায় তিনি যখন Southeyকে উপহাস করিয়া, অজ্ঞাতনামা Fanny Burney কে ঔপন্যাসিকের প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেছিলেন, তখন সমালোচনায় তাঁহার একদেশদর্শিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সমালোচনা স্থলে জজীয়তি করা যতটা শ্রেয়, ওকালতী ততটা নহে।

কিন্তু ফরাসি সাহিত্যে সমালোচনা তখন অনেকটা সাফল্যলাভ করিতেছিল।

মাসিক বা ত্রৈমাসিকে সমালোচনার নিম্নে সমালোচকের নামস্বাক্ষর প্রথা হইতেই এই শুভফলের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডের সমালোচক যখন মেঘনাদের মত পত্রিকান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অজস্র বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে ছিলেন, তখন ফরাসী সমালোচককে শক্তিশেলের সম্মুখে থাকিয়া অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিতে হইত। সুতরাং ইংলণ্ডে রিভিয়ুয়ের দায়িত্বহীন সমালোচকবর্গ আক্রমণের আশঙ্কা মাত্র না করিয়া, তাঁহাদের সৌভাগ্যবান প্রিয়পাত্র লেখকের উপর যখন অজস্র সুখ্যাতি বর্ষণ করিতেছিলেন, কিম্বা বিদ্বেষকলুষিত ও অক্ষম সমালোচনায় যখন বায়রণকে মদগর্ব্বিত যুবক, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

কবিতাকে বিফলতার আদর্শ, কীট্‌সকে প্রবন্ধক ও টেনিসনকে অতি অক্ষম কবি রূপে নির্দ্দেশ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তখন ফরাসী সমালোচককে সমস্ত দায়িত্ব নিজস্কন্ধে লইয়া সভয়ে ও সযত্নে গ্রন্থাবলীর সৌন্দর্য্য ও কুৎসিতাঙ্গ, সাফল্য ও বিফলতা সবিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দোষ ও গুণের সার্টিফিকেটের জন্য সাহিত্য সমাজে ধরিতে হইয়াছিল। এই খানেই ফরাসী সাহিত্যে প্রকৃত সমালেচনার সৃষ্টি।

বস্তুত প্রকৃত সমালোচনার দায়িত্ব অতি গুরুতর। সমালোচককে নিরপেক্ষচিত্তে জগতে যাহা কিছু মহৎ, সত্য এবং সুন্দর তাহাই সযত্নে পাঠক সম্মুখে ধরিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয় অতি সতর্কতার সহিত ওজন করিয়া দেখিতে হইবে; সত্যই তাঁহার লক্ষ্য এবং যুক্তিই তাঁহার আশ্রয়। জ্ঞানই তাঁহার বল, স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তাই তাঁহার নির্ভর। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় রমণীয় হইবে, বিনয় ও সহৃদয়তায় তাহা কমনীয় করিতে হইবে, তবেই সমালোচনার সাফল্য। সমালোচককে দেখাইতে হইবে পুস্তক বা প্রবন্ধ কেমন করিয়া পড়িতে হয়, এবং সাধারণের কি ভাবে পড়া উচিৎ। তাঁহাকে সমস্ত পুস্তকে বিক্ষিপ্ত কণাকণা সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণমূর্ত্তিতে পাঠকসম্মুখে ধরিতে হইবে, গ্রন্থের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থকারও পুস্তকের সাফল্য বিচার করিতে হইবে, এবং অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত অংশ সকলকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া সাহিত্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহার সাংক্রামিক প্রভাব হইতে জাতীয়জীবন ও সাহিত্যকে রক্ষা করিতে হইবে। এবং "নিজে ক্ষমতাশালী হইলে যে পরিমাণে জনসমাজের উপকার করা হয়, আর দশজন সুধী ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পরিচিত ও অগ্রসর করিয়া দিলে, আরও বেশী উপকারের সম্ভাবনা" রাস্‌কিনের এই মহতী উক্তিও তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

কিন্তু প্রকৃত সমালোচনার বিঘ্নও বড় কম নহে। প্রথমত ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা ও মনের পরিণতি বিভিন্ন; সমালোচকের উপর তাহার প্রভাব ও নিতান্ত অল্প নহে। তাহা ছাড়া প্রাচীন ক'লের মোহ-আবরণ তাৎকালিক লেখকদিগকে এক অতি বিভিন্ন মোহিনী প্রকৃতি প্রদান করে, এবং বর্ত্তমান কালের সুপ্রতিষ্ঠিত কিম্বা সমসাময়িক লেখকগণের সম্মোহন ব্যক্তিগত প্রভাব অলক্ষিতে সমালোচকের চক্ষুকে এক অপূর্ব্ব অনুবীক্ষণে পরিণত করে, যাহা পাঠকের ও ততোধিক সাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশত দোষ দেখিবার সময় অলক্ষিতে উল্টাইয়া যায়, সুতরাং সমালোচনাটী ভক্তের স্তোত্রগানে পরিণত হয় মাত্র! আবার যিনি সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া প্রকৃত সমালোচনা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, অদৃষ্টের তীব্র উপহাসবশত তাঁহার হয়ত মোটেই সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি নাই। পুস্তক বা প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে বুঝান যাইবে কিরূপে? তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রাণপণ পরিচালনায় তাহা হইতে একটা অতি অননুভূত পূর্ব্ব সমাজতত্ত্ব বা বিকট ধর্ম্মতত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমালোচনাংশে তাহা অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। আর ও দুঃখের বিষয় এই যে সৌন্দর্য্য নামক জিনিষটা কোনও সংজ্ঞা দিয়া বুঝান যায় না; তাহার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই অনুভব করিতে হয়। ইহারা কুসুমসুকুমার সৌন্দর্য্যকে আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের তীব্র ছুরিকায় যথাশক্তি ছিন্ন ও বিনষ্ট করিয়াও ইহার অন্তর্লীন, অতি মোহন, অতি মধুর প্রাণের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন না; হয়ত অতি গভীর অতি পবিত্র ভোগবতীর হিমধারার অন্বেষণে গমন করিয়া ভূগর্ভস্থ প্রস্তর-কঙ্কাল দেখিয়া মাত্র ফিরিয়া আসেন। ইহাতে বিরক্তি ও গাত্রদাহ উভয়ই দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া যায় মাত্র!

কেহ কেহ আবার এমন ও আছেন, যাঁহারা একটা দিক দেখিয়াই

সমালোচনার কশাঘাত বা বন্দনা-গান আরম্ভ করেন। কেহ হয়ত বাহিরের রূপ ভাল বাসেন, আবার কাহারও হয়ত ভিতরের গুণটুকুই ভাল লাগে। কেহ তাই ললিত পদাবলীর সমষ্টিমাত্রকেই অতিমধুর কবিতা জ্ঞানে বাহিরের চাকচিক্য ও গিল্টী কার্য্যে তন্ময় হইয়া অতি মোহান্ধ চক্ষে দোষ দেখিতে পান না, আবার কেহ হয়ত ভিতরের অজস্র ভাবপ্রবাহ সত্ত্বেও বাহিরের দোষেই তন্ময় হইয়া পড়েন। কিন্তু উভয়েই ভুলিয়া যান যে, রূপগুণ, আকৃতি প্রকৃতি, লইয়াই মানুষ এবং প্রত্যেক বিষয়েরই দুইটা করিয়া দিক আছে। এই দুইটা বিষয়ের সম্পূর্ণতাতেই সাফল্য নির্ভর করে।

কিন্তু ইহাপেক্ষা আর এক প্রকারের সমালোচনা বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল অক্ষম সমালোচকবর্গ বন্ধুত্বের স্নেহে, ভক্তের অনুরোধে, কিম্বা আরও কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণ স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ মাত্রেই মাইকেলের সৌন্দর্য্য, উপন্যাস মাত্রেই বঙ্কিম বাবুর অতুলনীয় চরিত্রসৃষ্টি এবং অতি জঘন্য নাটকে সেক্সপীয়রের কবিত্ব দেখিয়া আত্মহারা হয়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, জ্ঞানদেবী সরস্বতীর চিরপবিত্র মন্দির এইরূপে কলঙ্কিত করিবার বিরুদ্ধে পিনাল কোডের কোনও ধারা নাই, এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবীর হস্তেও অস্ত্রের মধ্যে বীণা মাত্র!

অতএব দেখা যাইতেছে প্রকৃত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে এবং বিঘ্নও বিস্তর। অথচ তাহাই সাহিত্যের গঠন ও পরিণতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের সমালোচনা-প্রণালী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, একদিকে ফরাসী সাহিত্য ও অপর দিকে জর্ম্মাণ কবি-সমালোচক গেটেপ্রমুখ জর্ম্মাণলেখকদিগের প্রভাবই ইহার কারণ। তাহারই ফলে ইংরাজী সাহিত্য Matthew Arnoldকে সমালোচকরূপে লাভ করিয়াছে। তিনি সমালোচকের শান্ত সংযত বুদ্ধি, দার্শনিকসুলভ আলোচনা শক্তি, কবির মত সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং ঋষির মত উদারহৃদয় লইয়া অপক্ষপাতে সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাফল্য সর্ব্ববাদীসম্মত।

বঙ্কিম বাবুও এইরূপ সমালোচনা শক্তি লইয়া সাহিত্য-সংসারে আসিয়াছিলেন, তাই সেই সময় বঙ্গদর্শনে "উত্তরামচরিত" প্রভৃতি সমালোচনার মত সমালোচনা দেখিয়াছিলাম। এবং ঠিক এই কারণেই পূর্ণবাবুর কাব্য সমালোচনা, বান্ধবে "দশমহাবিদ্যা" সমালোচনা এবং সাধনায় রবীন্দ্র বাবুর রাজসিংহ সমালোচনা এবং সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে "মেঘদূত", "কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা" আলোচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই সমালোচনার আত্মকৃত্য সম্পাদিত হইতেছে। হয় বিজ্ঞাপন স্তম্ভ, না হয় বিদ্বেষবর্ষণ ইহা ব্যতীত সমালোচনার যেন অপর উদ্দেশ্য নাই। ফলও হইয়াছে সেইরূপ। সমালোচনায় আর কেহ আস্থা স্থাপন করে না, ইহা অত্যন্ত শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ইহার অক্ষম চীৎকারকে লোকে উপহাস করে, এবং করুণ রোদনে কর্ণপাত করে না। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষম রচনায়, অসার আবর্জ্জনায় বঙ্গ সাহিত্য দিন দিন পরিপূর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

আদর্শ কবিতা।

অম্বর যবে নীলাম্বর, আসে গো ধীরে বরষা
ওহে চঞ্চল চিরন্তন মেদুর-মেঘ-সরসা,
ফেনিলোচ্ছল সুধা-রঞ্জিত হৃদি-ভরসা,
প্রেম সিঞ্চিত প্রাণে কম্পিত তুমি একা,
কেন অসীমের কূলে অজ্ঞাতে দিলে দেখা!

তুহিন-কণাস্নিগ্ধ শীতল করুণ কোমল পরশে,
মানস-কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে পুষ্পপুলক বিকশে,
হৃদি কন্দরে প্রেম নির্ঝর বহে উছাসে,
নিমীলিত যেন পুষ্পিত তনু কনকবর্ণে আলা,
বেতসকুঞ্জে জম্বু পুঞ্জে শিরীষ গন্ধ ঢালা!
চুম্বিত-জানু কুন্তলরাজি সমীর ঘায় চঞ্চলা,
নির্ম্মল মুখকান্তি কিবা প্রেম-কিরণ-উজ্জ্বলা,
লজ্জারুণ তরুণ গণ্ড কুঞ্চিত মধু অঞ্চলা,
যেন পবনস্পর্শে আকুলহর্ষে পুষ্পকানন শিহরে,
মধুর ঊর্ম্মি, পড়িছে চূর্ণি পাথারে।
সুরভি মলয় কম্পিত যেন পুষ্পকানন শিরশি,
গগনাঙ্গনে দীপ্ত তারকা যাহে চন্দ্রমা উলসি,
শিথিল আকুল শরীর বন্ধ হৃদয় প্রাণ দহসি
সর্ব্বযতন-মন্থন এস অন্তরে
স্তব্ধ আজিকে দগ্ধ প্রাণে মৃদুলমন্দ মন্থরে!
জ্যোস্নাপ্লাবিত যমুনা যেন স্তব্ধ শুনি এ বাঁশরী,
দোদুল নীপবল্লরী গাহে কোকিল স্বরে কুহরী,
চকিত রাধার চরণে উঠে অভিসার পথ শিহরি,
বিরহছিন্ন হৃদয় প্রান্তে অরুণ রক্ত লেখা!
আলসে লালসে, কোন প্রেমাবেশে, মগ্ন হয়
আজি একা!

শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।
অমরাবতী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৮। | ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

লেখক ও সমালোচক।

জগতের সাহিত্যেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে সাধারণত অহি-নকুল সম্বন্ধ। কোথাও হয়ত লেখক তাঁহার সমালোচককে সকরুণ ঘৃণা ও অবহেলা এবং উপহাসের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন অন্যত্র হয়ত লেখক তাহার সুতীব্র ক্রোধ-বজ্র উদ্যত করিয়া সমালোচক-কুল ধ্বংশ করিবার জন্য প্রচণ্ড বেশে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার কোথাও হয়ত লেখক অতি মাত্রায় মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া সমালোচককে বলিতেছেন, "দেখ তুমি এ ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া মৌলিক কিছু লিখিতে সুরু কর; একাজটা ভাল নয়; পর নিন্দা পর-চর্চ্চা ছাড়িয়া দাও—ইহাতে ইহকালে উপহাস এবং ঘৃণা লাভ এবং পরকালে বিস্মৃতির গভীর সাগরে ডুবিবার অত্যধিক সম্ভাবনা, ব্যতীত আর কিছুই লাভ নাই। আর একদল লেখক আছেন (তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য কম) যাঁহারা সমালোচকের উপর বিরক্ত হইয়া শুধু বলিয়াছেন—"তোমরা এখন আমার লেখার প্রতি অবিচার করিলে বটে কিন্তু ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা নিশ্চয়ই

আমার আদর করিবে—এমন দিন আসিবে যথন আমি আমার প্রকৃত সম্মান লাভ করিব। কত লোক নিশ্চয়ই জগতে জন্মিবে যাঁহাদের নিকট তোমাদের সমালোচনা পৌছিবে না কিন্তু আমার লেখা তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিবে—"কালোহ্যয়ম্ নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী।"

সমালোচকদিগকে যে সকল লেখক সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহি। প্রথম, যাঁহারা সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে রুষ্ট বা ব্যথিত হইয়া সমালোচকের সমালোচনা করিয়াছেন; দ্বিতীয়, যাঁহারা সমালোচকের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন।

মনুষ্য চরিত্র সকল দেশে সকল সময়ে প্রায় একই উপাদানে ঘঠিত; মোটের মাথায় কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই এ প্রবন্ধে সাধারণত বৈদেশিক সাহিত্য হইতেই উদাহরণ দেওয়া হইবে। খুঁজিয়া দেখিলে আমাদের দেশেও তাহার প্রতিরূপ পাওয়া যায়। বৈদেশিক উদাহরণের সঙ্গে আমাদের দেশের দু-একটা উদাহরণও দিব। বাহুল্যভয়ে বেশী দিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

প্রথমেই আমাদের উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীরই উল্লেখ করিতে হয়। প্রসিদ্ধ লেখক Kingsley তাঁহার মনের ভাব লুকাইতে না পারিয়া The Harveys নামক গ্রন্থে অবান্তর কথার মধ্যে লিখিয়াছেন—"Critics are those who have failed in literature and in arts."

Goldsmith এর দুঃখময় জীবনের প্রারম্ভে তিনি সে সময়ের সমালোচক মণ্ডলীর নিকট বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে তাঁহার রচনার, শুধু লেখক নূতন ও অজ্ঞাত-

নামা বলিয়াই, কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে তাঁহারা কোন গুণই দেখিতে পান নাই। সে সকল সমালোচকের নাম বা তাঁহাদের সমালোচনা আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌছে নাই কিন্তু Goldsmith,—"the natural destroyer of polite learning" বলিয়া সমালোচকের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। তিনি তাঁহার Citizen of the World গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "If any choose to be critics, it is but saying that they are critics; and from that time forward they become invested with full power and authority over every caitiff who aims at their instruction or entertainment." সুলেখক Landor এর Imaginary conversationএ ঠিক এই উক্তিরই প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা আরও তীব্র এবং আরও হাস্যকর। তিনি বলেন—"The readiest made shoes are boots cut down and the readiest made critics are cut-down poets."

এইখানে একটা কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। Goldsmith এবং Landor এর উপহাসোক্তির মর্ম্ম ঠিক একই। তাঁহারা বলিতে চান—হে সমালোচক-প্রবর তুমি আঙ্গুরকে কখনই তিক্ত বলিতে না যদি তাহা লাভের আশা তোমার থাকিত। তুমি যে লেখক হইতে চেষ্টা কর নাই এ কথা আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় এবং আমাদের কপালগুণে তোমার সে ক্ষমতা নাই—তাই পরছিদ্রান্বেষণ করিয়া হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং হস্ত কণ্ডূতি নিবারণ করিতেছ। এবং বিধাতার দোষ না দিয়া গরীব আমরা আমাদের লেখার আদ্য শ্রাদ্ধ করিতেছ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ কণিকায় যে লিখিয়াছেন;

"বোলতা কহিল এযে ক্ষুদ্র মৌচাক।
এরি তরে মধুকর করে এত জাঁক।
মধুকর কহে তারে তুমি এস ভাই
আরো ক্ষুদ্র মৌচাক্ রচ দেখে যাই।"

ইহারও মূল উদ্দেশ্য তাই।

কবি Byron এর তরুণ বয়সের প্রথম কবিতা পুস্তক যখন বাহির হয় তখন Jeffery প্রভৃতি সমালোচকগণ তাহার যে তীব্র সমালোচনা করেন তাহা আমাদের তেমন পরিচিত নহে, কিন্তু সেই তরুণ কবির English Bards & Scotch Reviewers সাহিত্য সেবী মাত্রেরই সুপরিচিত। আমরা তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"A man must serve his time to every trade
Save censure—critics are all ready made,
* * * * *
A mind well skilled to find or forge a fault
A turn for punning call it Attic salt
* * * * *
Fear not to lie 'twill seem a lucky hit
Shrink not from blasphemy 'twill pass for wit
Care not for feeling pass your proper jest
And stand a critic hated yet caress'd.

এই কবিতায় Byron তাঁহার তীব্র ভাষা এবং প্রদীপ্ত উদ্দাম তরুণ কল্পনা কিরূপ ভাবে সমালোচক ধ্বংসে প্রয়োগ করিয়াছিলেন দেখিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এবং সমালোচক ও তাঁহার কার্য্যের উপর স্বতই ঘৃণার উদ্রেক হয়। বাস্তবিক সে সময়কার এক-দেশদর্শী বিদ্রূপগর্ভ অন্ধ সমালোচনা পড়িলে Byronকে তাঁহার এ কবিতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না বরঞ্চ মনে হয় ইহাতে সাহিত্যের অন্তত সাময়িক উপকারিতা আছে।

কবিবর রবীন্দ্র নাথের কবিজীবনের প্রভাত কালের ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে কবির

সেই বাল্য কবিতাগুলি এক শ্রেণীর পাঠক মণ্ডলীর নিকট কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। উদাহরণ নাই-ই দিলাম।

এই শ্রেণীর সমালোচকের উদ্দেশেই বোধ হয় কবি মানসীতে লিখিয়াছেন,

এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে মর্ম্মকুসুম মম
আসিছে পান্থ যেতেছে লইয়া স্মরণ চিহ্ন সম,
কোন ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া কোন ফুল বেঁচে রবে,
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা কালিকার কাণে কবে,
তুমি কেন ভাই বিমুখ এমন নয়নে কঠোর হাসি,
দূর হতে যেন ফুঁসিছে সবেগে উপেক্ষা রাশি রাশি।
কঠিন বচন জরিছে অধরে উপহাস হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ ঘৃণার অনল জ্বলে,

এ কবিতায় Byron এর তাচ্ছিল্য বা উপহাসের চিহ্নমাত্র নাই। ইহা বিক্ষুব্ধ কবি হৃদয়ের গভীর আক্ষেপের তরঙ্গ মাত্র। কবি, হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সমালোচকের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্য বর্ণ মাত্রে গণ্য এবং সুতীব্র উপহাসের কারণ হইয়াছে—তিনি পথের প্রান্তে যে ক্ষুদ্র পুষ্প স্মরণচিহ্ন সম পাঠক মণ্ডলীকে উপহার দিয়াছেন তাহা সামান্য হইতে পারে কিন্তু তাহা উপেক্ষা, উপহাস বা ঘৃণার সামগ্রী নহে—তাহা কবির দগ্ধ হৃদয়েরই মর্ম্মকুসুম। তথাপি তিনি অবিচারের জন্য সমালোচককে কঠিন ভৎর্সনা করেন নাই। কিন্তু কবির আধুনিক কবিতায় তিনি আর সমালোচক-কে ক্ষমা করেন নাই। এখন আর তা'র কৈশরের দ্বিধানম্র অভিমান নাই কেন না এখন তিনি তার সমালোচকের অনেক উচ্চে এবং সেই ভাবেই সমালোচকের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

কাণাকড়ি পিঠতুলি কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোল আনা মাত্র নহ পাঁচশিকে।
টাকা কহে আমি তাই মূল্য মোর যথা
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশী কথা।

আমাদের উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথমেই কবিবর Wordsworth এর নাম করিতে হয়। কোটেশন-কণ্টকিত এই প্রবন্ধ পাঠে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় এজন্য আর অধিক উদাহরণ না দিয়া তাঁহারই মত-মাত্র উদ্ধৃত করিব—কেন না তাঁহাকে এই শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"The writers of these publications (the Reviews) while they prosecute their inglorious employment can not be supposed to be in a state of mind very favorable for being affected by the finer influences of a thing so pure as genuine poetry."

কথাটা কতদূর প্রকৃত বলিতে পারি না। Gervinus, Dowdon, Matthew Arnold, Ruskin প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাব্যরসজ্ঞ সুধী সমালোচকগণের মানসিক অবস্থা কি এতই শোচনীয়? আমাদের ত মনে হয় যে মহাত্মা একজন প্রধান কবিকে ঠিক বুঝিতে এবং সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন সেইকবির নিম্নেই তাঁহার আসন। Wordsworth অন্যত্রে বলিয়াছেন,"If the quantity of time consumed in writing critiques on the works of others were given to original composition of whatever kind it might be it would be much better employed." আমরা মুখবন্ধে ঠিক এই উক্তিরই উল্লেখ করিয়াছি। কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতে হইতেছে। এ স্থলে দুইটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথম, সমালোচনা জিনিষটা মৌলিক রচনা কি না। আমাদের মনে হয় সমালোচনার এই উন্নতির যুগে সমালোচনার মৌলিকত্ব কেহ অস্বীকার করিবেন না। Dowdon প্রভৃতির বিশ্লেষণ মূলক (Analytical) সমালোচনা এবং আধুনিক Germany এবং England এর Matthew Arnold প্রভৃতির আশ্লেষণ মূলক (Synthetical) সমালোচনা যদি মৌলিক না হয় তাহা হইলে মৌলিক কথার অর্থ

বোধ আমাদের নাই। যাহা হউক্ এ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা বাহুল্য। দ্বিতীয়ত সমালোচনার মৌলিকত্ব না হয় নাই মানিলাম কিন্তু সমালোচনা অপেক্ষা নিজস্ব যা কিছু ছাই পাঁশ তাহাও বাঞ্ছনীয় একথা ঠিক কি না। Johnson যদি Lives of the poets এর মত সমালোচনা পূর্ণ প্রবন্ধ না লিখিয়া Irene এর মত অসার অকিঞ্চিৎকর পুস্তকই লিখিতেন অথবা স্বয়ং Wordsworthই যদি তাঁহার সুবিখ্যাত মুখবন্ধ (Preface) না লিখিয়া Ecclesiastical Sonnets এর মত তাঁহার পুণ্য লেখনীর অযোগ্য কবিতাগুচ্ছ লিখিয়াই তৃপ্ত হইতেন তাহা হইলেই কি তাঁহাদের সময়ের সদ্ব্যয় করা হইত! উক্ত মুখবন্ধ একটী উৎকৃষ্ট সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় তিনি একজন উচ্চদরের সমালোচক ছিলেন। দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে তিনি এদিকে বড় উদাসীন ছিলেন। জানি না তাহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে। আমাদের দেশে কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনা' নামক গ্রন্থ এবং ভারতী ও সাধনায় বিবিধ সমালোচনা এবং বঙ্গদর্শনে সম্প্রতি মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন তিনিও একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক। কাযেই আমাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে তাঁহারা কেহই প্রকৃত সমালোচনার বিপক্ষ নহেন তবে সাময়িক একদেশদর্শী বিদ্বেষ বা স্বার্থ প্রণোদিত সমালোচনার অপকার নির্দ্দেশ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক দেখিতে গেলে লেখক জাতির সহিত সমালোচক-জাতির এরূপ বিরোধের কোন কারণ নাই। তত্রাপি যে কেন এই অকারণ বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ প্রবন্ধান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

গোয়েন্দা কাহিনী।

বেমালুম চুরি (সঙ্কলিত)

(২)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাবু একখানি সাদা কাগজে নিজ কার্য্যস্থলের চিত্র অঙ্কিত করিয়া হরিদাস গোয়েন্দার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"এইটি আমার কার্য্যস্থলের চিত্র! ভিতরের ঘরে আমি বসিয়া থাকি। বাহিরের ঘরে আমার কর্ম্মচারিগণ কাজ করে।

হরিদাস গোয়েন্দা বেশ মনোযোগের সহিত কার্য্যস্থলের চিত্রটি দেখিলেন। তার পর বলিলেন—"আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার ঘরের মধ্যস্থলে যে টেবিল্ কাছে, তাহারই টানার ভিতর আপনার আদর্শ পত্রখানি ছিল; যে ঘরে বসিয়া আপনার কর্ম্মচারিগণ কার্য্য করে, সে ঘরে ছিল না।"

বিনোদ। না।

হরিদাস। বেলা দশটা হইতে বেলা বারটার মধ্যে, আপনি একবারও কার্য্য স্থল পরিত্যাগ করেন নাই—আপনি কক্ষ মধ্যে বসিয়া থাকিলেও, আপনার চোখের উপর কে তাহা চুরি করিয়াছে, আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই এই কথা কি আপনি বলিতে চাহেন?

বিনোদ বাবু তাহাই স্বীকার করিলেন।

বিনোদ বাবুর কার্য্যস্থলের চিত্র।

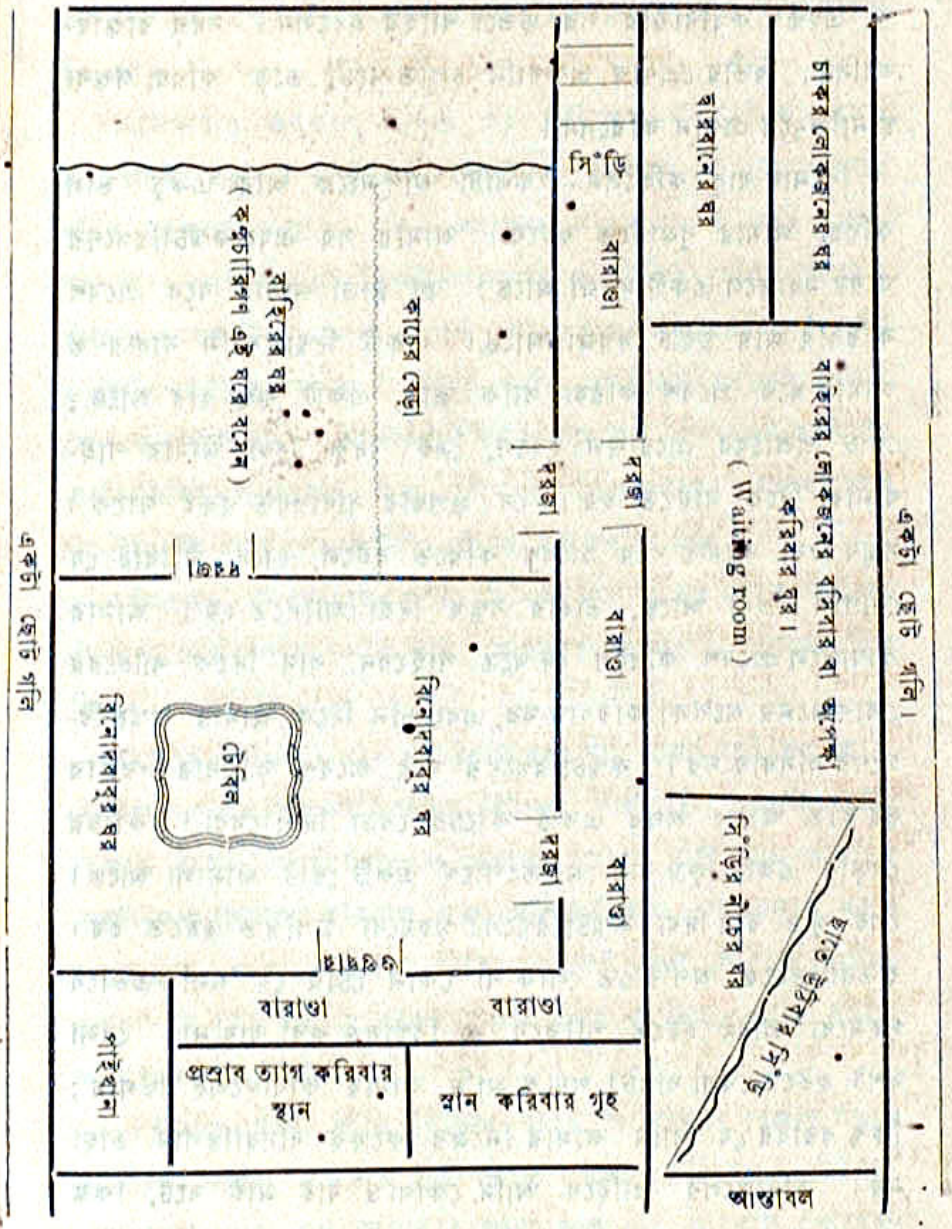

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয়ে বাহির হইলেন। সদর রাস্তায় আসিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি চল্‌তি গাড়ী ভাড়া করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিনোদ বাবু কহিলেন—"কথাটা আপ্‌নাকে আর একটু ভাল করিয়া আমায় বুঝাইতে হইবে। আমার ঘর এবং কর্ম্মচারিগণের ঘরের মধ্যস্থলে একটি দরজা আছে। তা' ছাড়া আমার ঘরে প্রবেশ করিবার আর দুইটি দরজা আছে। একটি দিয়া আমি সাধারণত আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকি আর, একটি গুপ্ত দ্বার আছে; শৌচ প্রস্রাবের প্রয়োজন হইলে, সেই দিক দিয়া আমার পাইখানার দিকে যাইতে হয়। সে গুপ্তদ্বার সাধারণত বন্ধই থাকে। সম্মুখ দিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে, ছাদে উঠিবার যে সোপান শ্রেণী আছে, তাহার সম্মুখ দিয়া আসিতে হয়। আমার কার্য্যস্থলে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন, বাম দিকে বাহিরের লোকজনের অপেক্ষা করিবার ঘর, এবং ডান দিকে আমার কর্ম্মচারিগণের বসিবার ঘর। কর্ম্মচারিগণের ঘরে প্রবেশ করিবার দরজার ছয় হাত অন্তরে অপর একটি কাচের বেড়া দিয়া ঘেরা। কাঁচের বেড়ায় একটি ক্ষুদ্র দ্বার ও তৎপার্শ্বে একটি ছোট জানালা আছে। সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া কর্ম্মচারিগণের গৃহমধ্যে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং সহজে অপরিচিত লোক বা কোন চোর যে অলক্ষিতভাবে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে, এ বিশ্বাসও করা যায় না। বেলা দশটা হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত আমি আমার কার্য্যস্থলেই ছিলাম; কিন্তু বরাবর যে আমি আমার নিজের কক্ষেই বসিয়াছিলাম তাহা নয়। কার্য্যস্থলের বাহিরে আমি কোথাও যাই নাই বটে, কিন্তু আবশ্যক মত এঘর ওঘর করিয়াছি।"

হরিদাস। বেলা দশটা হইতে বেলা বারটার মধ্যে, বেশীক্ষণের জন্য আপনি একবারও আপনার কক্ষ ছাড়িয়া কোথাও গিয়াছিলেন কি না?

বিনোদবাবু ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন—"মিনিট পাঁচেকের জন্য আমি একবার বাহিরের, লোকজন আসিয়া যে ঘরে আমার সহিত সাক্ষাতাভিপ্রায়ে বসিয়া অপেক্ষা করেন, সেই ঘরে গিয়াছিলাম। সেই ঘরে দুই তিনটি আলমারি ও টেবিল চেয়ার আছে। আমার আবশ্যকীয় অনেক কাগজ পত্র ও পুস্তকাদি সেই আলমারি ও টেবিলের ভিতর থাকে। সময়ে সময়ে প্রয়োজন পড়িলে আমায় সে ঘরে যাইতে হয়। আজও একখানি পুস্তকের প্রয়োজন হওয়াতে আমি মিনিট পাঁচেকের জন্য সেই ঘরে গিয়াছিলাম। গৃহ-মধ্যস্থলে যে টেবিলটি আছে তাহার ভিতরেই সে পুস্তকখানি ছিল।

হরিদাস। সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন বাহিরের লোক আসিয়া থাকে তাহা হইলে আপ্‌নার তাহা জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল কি?

বিনোদ। ছিল। সে সময়ের মধ্যেও যদি কেহ বাহিরের লোক আসিত, তাহা হইলে আমি তাহা দেখিতে পাইতাম; কেননা, আমি দরজার দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম; রাখাল সেই সময় আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছিল। সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল,—আমি তাহার দিকে চাহিয়াই কথা কহিতে ছিলাম; সুতরাং সে সময় যদি বাহিরের লোক কেহ আসিত, তাহা হইলে আমার নজরে পড়িত।

এই সময় গাড়ীখানি বিনোদ বাবুর আপিসের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। বিনোদ বাবু অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন, হরিদাস গোয়েন্দা

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আপিসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাবু হরিদাস গোয়েন্দাকে লইয়া তাঁহার নিজ কক্ষে গেলেন।

বিনোদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি রাখাল ও যদুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন কি?

হরিদাস। হাঁ—প্রয়োজন হইলেই করিব।

এই বলিয়া হরিদাস গোয়েন্দা বিনোদ বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া, কর্ম্মচারিগণের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বেড়ার বাহিরে, গৃহের এক কোনে একগাছি লাঠি ও একটি ছাতা রহিয়াছে, আর দেওয়ালের গায়ে দুইটি চাপকান ঝুলিতেছে।

হরিদাস গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ চাপকান দুইটি বোধ হয়, আপনার কর্ম্মচারিগণের?"

বিনোদ বাবু উত্তর করিলেন—"হাঁ"

হরিদাস। লাঠি ও ছাতা তাহাদেরই?

বিনোদ। হাঁ।

হরিদাস। এ সকল চাপকানের পকেটগুলি ভাল করে দেখছেন তো?

বিনোদ। হাঁ।

হরিদাস। এ ঘরের টেবিল আলমারি প্রভৃতিও বেশ ভাল করে দেখা হইয়াছে?

বিনোদ। সেতো আমি আপনাকে বলেছি। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি সুদ্ধি যে প্রকার থাকে—আমার যে তাহা নাই, তাহা নহে। সেই বুদ্ধি অনুসারে যে ভাবে যে রকমে অনুসন্ধান করা সম্ভব, আমি তার কিছুই ত্রুটি করি নাই। এখন আপনাদের ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধিমান গোয়েন্দা ব্যতীত আমায় এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই।

হরিদাস গোয়েন্দা বিনোদ বাবুর এ সকল কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আদর্শ পত্রখানি আপনি কোথায় রাখিয়াছিলেন, তাহা আপনার কর্ম্মচারিগণ ভিন্ন অপর কেহ জানিত?"

বিনোদ। না।

হরিদাস। আপনার আদর্শ পত্র খানিতে যেরূপ প্রকারের আঁকা জোকা ছিল, তাহা একবার দুইবার বা পাঁচবার দেখিলেও কি এক-জনের পক্ষে সহজে বুঝিয়া লওয়া সম্ভব?

বিনোদ। না। তাহাতে এত রকম কাণ্ড কারখানা, এত রকম গোলমেলে আঁকা জোকা, এত রকম মার পাঁচ আছে যে, একজন ভাল লোকও সহজে চোখের দেখায় দু'পাঁচবারে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই রূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া কাচের বেড়ার ধারে দণ্ডায়মান হইলেন। হরিদাস ও বিনোদ বাবু সে সময় কর্ম্মচারিগণের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনোদ বাবুর ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দুই ঘরের মধ্যস্থলের দরজাটী খোলাই ছিল। সুতরাং হরিদাস গোয়েন্দা আগন্তুক ভদ্রলোক-টিকে বেশ দেখিতে পাইলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনোদ বাবু আপিসে আছেন কি?"

একজন কর্ম্মচারী উত্তর করিল—"আছেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হ'বে না। তিনি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন; আজ আর তাঁর বাহিরের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার সময় হইবে না। আপনার যদি কোন কথা বলিবার থাকে, আপনি আমায় তাহা বলিয়া যাইতে পারেন।

আগন্তুক। না—সে কথা আপ্‌নাকে বলিলে আমার কোন ফল হইবে না। আজ দুবার আমি বিনোদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম দুবারই দেখা হইল না।

কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নাম কি মহাশয়?"

আগন্তুক। আমার নাম হলধর বর্দ্ধন। তা নাম শুনিয়া আর কি হইবে? যখন তিনি আপিসে থাকিতেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, তখন আর নাম শুনিয়া কি লাভ?

হলধর বাবু (আগন্তুক) কাচের বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন। বেড়ার গায়ে যে কাটা দরজা তাহার ভিতর দিকে বিনোদ বাবুর কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান ছিলেন; অর্থাৎ কর্ম্মচারী (কাচের বেড়ার ভিতর দিকে) ঘরের ভিতর ছিলেন এবং আগন্তুক ঘরের বাহিরে ছিলেন। কাচের বেড়ার কাটা দরজাটি খোলা ছিল বলিয়া হরিদাস গোয়েন্দা ভিতরকার ঘর হইতেও তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন।

বিনোদ বাবুর সহিত দেখা হইল না বলিয়া হলধর বাবু যেন কত-কটা নিরাশ চিত্তে, দেয়ালের কোণ হইতে আপনার ছাতাটি লইয়া চলিয়া গেলেন।

হরিদাস গোয়েন্দা বঙ্কিমদৃষ্টিতে হলধর বাবুর প্রতি চাহিয়াছিলেন এবং তাহার কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। গর্ব্বিত ভাবে যেন চিন্তাযুক্ত হৃদয়ে ধীর অথচ সতর্কিত পাদবিক্ষেপে হলধর বাবুকে বাহিরে

যাইতে দেখিয়া, হরিদাস গোয়েন্দা দাণ্ডায়মান হইলেন। কর্ম্মচারি-গণের কক্ষ মধ্যস্থিত উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর দেখিতে লাগিলেন। হলধর বাবু দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে পর, তিনি বিনোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটির সহিত পূর্ব্বাবধি আপনার আলাপ পরিচয় ছিল কি?

বিনোদ বাবু বিস্মিত ভাবে গোয়েন্দার মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন—"না, উহাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার এখানে কত রকমের লোক আসে যায়—ওদিকের বন্দোবস্ত কি করিবেন, আগে তাহাই সিদ্ধান্ত করুন। আমার কর্ম্মচারিগণকে আপনি এখন কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন কি?

হরিদাস। না, বোধ হয় সে কার্য্যের ভারটা আমি আপনার উপ-রই দিয়া যাইব। আপ্‌নিই আপনার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করুন।

বিনোদ বাবু বিস্মিতনেত্রে হরিদাস গোয়েন্দার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন—"আমি? আমি কি জিজ্ঞাসা করিব?"

হরিদাস। হাঁ, বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আপ্‌নার কর্ম্মচারিগণকে ডাকিয়া আনিয়া, এই ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আপ্‌নি কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্ত্তা কহিতে থাকুন। আমি সেই সময়ের মধ্যে এই বাটীর অন্যান্য ঘর ও স্থান গুলি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষন করিব।

বিনোদ। কিন্তু কর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিবার আরতো আমার কোন কথাই নাই; আমার নিজের বুদ্ধিমত যাহা জিজ্ঞাসা করিবার সে সমস্তই আমি করিয়াছি।

হরিদাস। অন্তত তাহাদিগকে লইয়া বাজে কথায় আপনাকে কতটা সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। আজ সকাল হইতে তাহারা প্রত্যেকে কে কি কার্য্য করিতেছে, কয়জন লোক সকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আসা যাওয়া করিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকার কথার

ছলে খানিকটা সময় কাটাইয়া দিতে পারিলেই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে। সমস্ত বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখা হইলেই আমি পুনরায় আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।

এই বলিয়া হরিদাস গোয়েন্দা সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রমশ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্থূলমর্ম্ম।

অতি ইতর জন্তু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই একটি বস্তুর জন্য লালায়িত, ব্যগ্র, ব্যতিব্যস্ত। তাহা সুখ।

আমরা যাহা কিছু কাজ করি, যাহা কিছু চিন্তা করি সকলেরই মূলে এই অতি প্রবল সুখতৃষ্ণা। জগতে যত কিছু সুকর্ম্ম, যত কিছু কুকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার প্রায় সমস্তই এই সুখতৃষ্ণা-সঞ্জাত।

কেন আমরা প্রাণপাত করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতে যাই?—সুখের জন্য—তা' সে সুখ জ্ঞান-লাভ জনিত সুখই হউক আর জ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত অন্য উপায়ের দ্বারা লব্ধ সুখই হউক!

এই যে দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাম্ প্রভৃতি ইহাদের আবিষ্কার—কেন? মানুষের সুখ-বৃদ্ধি হইবে বলিয়া। এই সকল আবিষ্কার যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের আমরা ধন্য ধন্য করি

---

* বড় দুঃখের বিষয়—এই প্রবন্ধ-লেখক, অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী আমাদের প্রীতি-ভাজন শরৎচন্দ্র সরকার মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি সাহিত্য সেবার প্রবল আশা অতৃপ্ত রাখিয়াই রোগ-ভোগে সহসা জীবনের মধ্যপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মহাভারত ও পুরাণাদি সংকলনে ব্রতী ছিলেন,—তাঁর জীবনের সে মহৎ উদ্দেশ্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল। সঃ সঃ

কেন? তাঁহারা আমাদের সুখ-বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া।

ফলত আমাদের প্রায় সমস্ত কার্য্যেরই মূলে যে এই অতি প্রবল সুখস্পৃহা—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আমি উত্থাপন করিতে চাহি না কারণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারি কি না এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ।

কিন্তু এই সুখতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অহরহ কার্য্য করিয়াও বাস্তবিক সুখের সন্ধান পাইতেছি কি?

আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গোযান ভিন্ন যাতায়াতের উপায় প্রায় ছিলনা বলিলেই হয়।

কিন্তু আজিকালিকার বায়ুগামী বাষ্পীয় যানে আরোহণের অধিকারী হইয়াও আমরা আমাদের গোযানগামী পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা কতটুকু সুখী হইয়াছি? কতটুকু শান্তি পাইয়াছি? এই ত্বরিত গমনে সুখ কই? বাষ্পীয় রথে আরোহণে অধিকারী হইয়াই আমরা বলিতেছি "এ আর ভাল লাগে না—আরও জোরে, আরও জোরে।" যদি ইহার পর বিদ্যুৎবলে শকট চালনের উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহাতেই কি আমরা সুখী হইব? বোধ হয় না। তখন আবার বলিব "আরও জোরে, আরও জোরে" বাস্তবিক কিছুতেই তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। ধনে আশঙ্কা বাড়ে, বিদ্যায় সংশয় বৃদ্ধি হয়—সুখ কোথায়? বৈষ্ণব বলেন, সুখ আছে। যেমন সমুদ্রাভিলাষিণী তরঙ্গিণীর সম্মুখে যাহা কিছু পড়ে, তরঙ্গিণী কাহাকেও চাহে না, মৃত্তিকা, বৃক্ষ, প্রাণী কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, তাহার সুখ, তাহার শান্তি সেই অনন্ত সাগর সঙ্গমে; মানুষের পক্ষেও তাই। মানুষেরও সুখতৃষ্ণা-রূপিণী প্রবল তরঙ্গিণী তেমনি উদ্দামভাবে তেমনি বেগে তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত

সাগরসঙ্গমোদ্দেশে ছুটিয়াছে। ধন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়—বলে "আমি তোমার সেই সাগর"—তরঙ্গিণী বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু কতক্ষণের জন্য? মুহূর্ত্ত পরে ধনকে ভাসাইয়া তেমনি প্রবল বেগে তেমনি খর-স্রোতে আবার বহিয়া যায়। বিদ্যা বলে "আমি তোমার অভিলাষের ধন, আকাঙ্ক্ষার বস্তু।" তরঙ্গিণী আবার একটু অপেক্ষা করে, ক্ষণকাল পরে বলে "কই, তোমাতে আমার তৃপ্তি কই?" আবার জ্ঞানকে ঠেলিয়া প্রবলবেগে বহিয়া চলে! এইরূপে, ইন্দ্রিয় সুখ, যশ, কীর্ত্তি, মান, কেহই এই খরতোয়া স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করিতে পারে না। কিছু-তেই এই সুখ-লালসা তৃপ্ত হয় না। সে তাহার সাগর সঙ্গম চাহে। সেই সাগর কে? শ্রীকৃষ্ণ, কারণ তিনি আনন্দ স্বরূপ "আত্মা বৈ রসঃ।" আনন্দ বা সুখ নহিলে সুখ-লালসার পরিতৃপ্তি কোথায়? এই অতৃপ্ত অনির্ব্বাপ্য সুখ লালসা তাঁহার বাঁশরী-নিনাদ। এই চিত্ত-মুগ্ধকর হৃদয় বিমোহন বাঁশরী ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা নিরন্তর উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটিতেছি। দুর্ভাগ্যক্রমত বাদকের সন্ধান পাইতেছি না। তাই অর্থ, যশ, মান, জ্ঞান, ইন্দ্রিয় সুখ সকলের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—"তুমিই কি আমার এই অসুখের কারণ, আমার হৃদয় কি তুমি হরণ করিয়াছ?" ক্ষণকাল তাঁহার সেবা করিয়া বুঝি-তেছি, আমার হৃদয়হারী সে নহে তখন আবার অন্যদিকে ছুটিতেছি। এই উদ্দাম ছুটাছুটি, এই উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ ইহাই মনুষ্য জীবন—ইহাই মানব হৃদয়ের ইতিহাস।

এইখানে জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞান আমাদের এই উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা চক্ষুর উপর আপন আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করে। সেই আলোকে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আকাঙ্ক্ষার ধন—প্রার্থনার বস্তু ধন নহে, জ্ঞান নহে, মান নহে, ইন্দ্রিয় সুখ নহে—আমাদের আকা-ঙ্ক্ষার ধন, জীবনের সাধ্য—আনন্দময়, অনন্ত, অপরিমেয়, পরিপূর্ণ

ভগবান্। এইরূপে জ্ঞানের আলোকে জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি আমাদের পরম পুরুষার্থ, সর্ব্বদুঃখ নাশের উপায়, অনন্ত তৃপ্তি লাভের কারণ ভগবানে আত্মসমর্পণ। কিন্তু এই আত্ম-সমর্পণ সহজে করা যায় না। ইহাতে অভ্যাস চাই, শিক্ষা চাই। ভালবাসিলে আত্মসমর্পণ করা বড় সহজ হয়। আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার জন্য হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি। সতী নারী হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে সহমরণ যায়। সুতরাং সহজে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রেমের কিকাশ প্রয়োজন।

এই প্রেম, কিরূপে বিকশিত হইতে পারে সে জন্য বৈষ্ণব মহা-জনেরা অজস্র নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সকলের উল্লেখ করা আমার আলোচনার বিষয় বহির্ভূত।

প্রেমের প্রথম বিকাশে দাস্য প্রেমের উদ্ভব হয়। তখনো উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রেমিক তাহার প্রণয় ভাজনের প্রতি অনুরক্তা হয় বটে, কিন্তু তাহাকে আপনার সমকক্ষ বিবেচনা করিতে পারে না। সে তাহাকে ভালবাসে কিন্তু তাহার নিতান্ত নিকটে যাইতে সাহস করে না।

প্রেমের অধিকতর বিকাশে এ পার্থক্য ঘুচিয়া যায় পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়—দাস্য প্রেম সখ্যে পরিণত হয়।

আরও অধিক আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে মধুর রসের উৎপত্তি হয়। তখন আর একদণ্ড প্রেমিককে না দেখিয়া থাকা যায় না। উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। ধন মান লোকনিন্দা কিছু মনে থাকে না। তখন আত্মসমর্পণ ভিন্ন সুখ নাই—প্রণয় পাত্রের সঙ্গে মর্ম্মে মর্ম্মে না মিলাইয়া গেলে তৃপ্তি নাই। সাগরসঙ্গমোৎসুকা নদী—সাগরের নিকটবর্ত্তিনী হইলে যেমন অপ্রতিহতবেগা প্রচণ্ড-বলশালিনী হইয়া উঠে, হৃদয়ের চির-অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আনন্দ সাগরের কূলে

আসিয়া তেমনি প্রবল, তেমনি উদ্দাম হইয়া উঠে। তখন কাহার সাধ্য এই প্রচণ্ডা তরঙ্গিণীকে সাগর সঙ্গম হইতে দূরে রাখে?

তখন জটিলার তাড়না, কুটিলার নিন্দা কেহই তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।

প্রেমের এই চরমোৎকর্ষ বৈষ্ণবের রাধিকা। এখন একবার কাব্যের চরমোৎকর্ষ, কবিত্বের আধার রাসলীলার কথা স্মরণ করুন।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। ফুলে ফুলে বন আলো হইয়া উঠিয়াছে—কোকিল পাপিয়ার কলঝঙ্কার আকাশ ভাসাইয়া বর্ষিত হইতেছে। মলয়ের মৃদুচুম্বনে কুসুমিতা লতা ঈষৎ কাঁপিতেছে; প্রকৃতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী। প্রেমিকের চক্ষে সব সুন্দর। প্রেমই পরশমণি। প্রেমের স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়। কদাকারা কুৎসিতাও প্রেমিকের চক্ষে পরম লাবণ্যময়ী—কজ্জলবর্ণ শিশু মার চক্ষে কষিত-কাঞ্চন-বর্ণ।

আজ জীবনের লক্ষ্য নির্ণীত হইয়াছে। জীবনেশ্বরের প্রতি প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে, প্রণয়ের আবেগ যতদূর প্রবল হইবার হইয়াছে। আজ জীবরূপিণী রাধিকার গতিরোধ কে করিবে? মধুর বাঁশরী অবিরাম বাজিছে। বাঁশী "আয় আয়" বলিয়া মধুর স্বরে আহ্বান করিতেছে। এতদিন বংশীবাদকের সন্ধান পাই নাই, চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছি। আজ শুধু বংশী বাদকের সন্ধান নয়, তাহার সঙ্গে প্রণয় হইয়াছে, আজ সংসারে কোন্ পদার্থ আছে যাহা প্রেমিককে প্রণয় পাত্র হইতে দূরে রাখিবে। রাধিকা ছুটিয়াছেন—লোক নিন্দা, মান লজ্জা ভয় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কেবল মনে আছে সেই আকাঙ্ক্ষার ধন সুখলালসার মিলন সমুদ্র, বাসনা অনলের শান্তি জল সেই অনন্ত সুন্দর প্রেমিক, অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ, জীবনের স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। অনন্যমনা অনন্যশরণা মিলনাকুলা রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তবু তৃপ্তি

কই, চির আকাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া না গেলে সুখ কই? প্রাণেশ্বর আরও কাছে আরও কাছে। প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে শরীরে শরীরে সংযোগ হইল। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত বিহার করিলেন। বিহার শব্দ শুনিয়া শিহরিবেন না। প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে শরীরে শরীরে মিলনের উপমা এই বাক্যে—যেমন প্রকাশিত হইয়াছে—প্রার্থিব আর কোন বাক্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে আমার মনে হয় না। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম।

প্রত্যেক জীবই সুখতৃষ্ণা দ্বারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে—তবে অজ্ঞাত ভাবে। জ্ঞান এই অজ্ঞতা দূর করিয়া দেয়। জীব বুঝিতে পারেন সকল আকাঙ্ক্ষার ধন সকল লালসার বস্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ। তখন সে তাঁহারই দিকে চলিতে থাকে। স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রেমে পরিণত করিতে চেষ্টা করে—প্রেম সুপুষ্ট হইয়া মহাভাবে পরিণত হয়—তখন সে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে। ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন।

প্রিয়তমের সকল জিনিসই প্রেমিকের ভাল লাগে। তাঁর পৃথিবী, তাঁর সৃষ্ট জীব জন্তু সকলি ভক্তের কাছে পরম রমণীয়—সম্পূর্ণ প্রেমের পাত্র। তাই ভক্তির বিকাশে হিংসা দ্বেষ চলিয়া যায়, অজ্ঞান আর তাহাকে অন্ধ করিতে পারে না, আত্মপর বিভেদ থাকে না, বিমল আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়।

তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম—ভক্তির ধর্ম্ম। প্রেমের আলোচনাতেও সুখ, প্রেমিককে না পাইলে তাহার ভাবনাতেও সুখ, তাই ভক্তির পথ সুখের পথ।

জ্ঞান যতক্ষণ না চরম বিকাশ প্রাপ্ত হয় যতক্ষণ না জীবের সকল অজ্ঞতা দূর করিয়া দেয়, ততক্ষণ তাহার সুখ নাই। মধ্য পথে কেবল

চিন্তা, কেবল সংশয়, কেবল বিভীষিকা। তাই ভক্ত জ্ঞান পথকে শুষ্কপথ বলিয়া উপেক্ষা করেন।

জ্ঞানের পথে শুধু নিজের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভক্তকে ভগবান আকর্ষণ করেন। তাই জ্ঞান পথে যতটা পতনের ভয় ভক্তির পথে ততটা নহে।

ফ্রেজারী বাবা।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কদাপা (Cuddapah) নগরী অতি প্রাচীন কাল হইতে সাধুদিগের নিকটে সুপরিচিতা। এই জেলার সর্ব্বত্র সুন্দর সুন্দর পর্ব্বত, সুন্দর সুন্দর অরণ্য, মনোমোহন জনপ্রস্রবণ এবং রমনীয় তপোবন সমূহ বিদ্যমান থাকায় পুরাকাল হইতে ব্রহ্মদর্শী তপস্বীগণ স্থানে স্থানে বাস করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা সচরাচর সংসারী মানবদিগের নয়ন গোচর হয়েন না। প্রায় ষড়বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে কদাপার জনৈক সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত, সদাচারী এবং ধর্ম্মভীরু হিন্দু ডেপুটী কালেক্টর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কদাপা জেলার অন্তর্গত মদনপল্লী (Madnapalle) নামক সুপ্রসিদ্ধা উপনগরীতে গমন করিয়াছিলেন। মদনপল্লী হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং বন আছে। সায়ংকালে ডেপুটী মহাশয় তাঁহার কয়েকটী বন্ধুর সহিত প্রান্তরে পদচারণা করিতে করিতে দেখিলেন, পর্ব্বতের গাত্র হইতে প্রভূত ধূম সহ অগ্নিশিখা সমূহ প্রজ্বলিত হইয়া আকাশের দিকে উড়িতেছে, অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের দিকে যাইতে যাইতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বুঝিলেন, পর্ব্বতের স্থান বিশেষে প্রজ্বলিত হুতাশন পরিবেষ্টিত কোনও মনুষ্যাকৃতি জীব

দণ্ডায়মান আছেন। আরও নিকটে যাইয়া দেখিলেন, এক মহাপুরুষ প্রদীপ্ত অনল মধ্যে দাঁড়াইয়া তপঃসাধন করিতে করিতে দুইটী আজানুলম্বিত বাহু তীব্রবেগে স্পন্দন করিতেছেন। ডেপুটী এবং তাঁহার বন্ধুরা ঐ অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র সেই পরম রমণীয় কান্তি-বিশিষ্ট তপশ্চারী অগ্নি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উর্দ্ধে গিরিশিখরে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাঁরা ঝটিতি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পবিত্র পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "হে দেব! সৌভাগ্য ও সুকৃতি বলে আজি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কানন ও পর্ব্বতকে পবিত্র করা আপনাদের নিত্যকর্ম্ম ও ধর্ম্ম, কিন্তু মায়াবী মানবের পর্ণকুটীর পবিত্র করিতে আপনারা কি নিষিদ্ধ? যদি লোকালয়ে গমন না করেন তাহা হইলে আমাদের ন্যায় পাতকীবৃন্দের উদ্ধারের উপায় কোথায়? আপনারা নিত্যই অনিকেতনী কিন্তু নরনিকেতনকে চরণ ধূলি দ্বারা পূত করিতে আপনাদের ন্যায় পুণ্যচেতা ব্রহ্মর্ষিগণই সমর্থ।" যাহা হউক, অনেক অনুরোধের পরে ঐ সাধু মহাত্মাকে শ্রীযুক্ত ডেপুটি মহাশয় তাঁহার বাসা বাটীতে আনিয়া পরম যত্নে ও সমাদরে আসন প্রদান করিলেন। দুই দিবস পরে, সরকারী কার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ায়, ডেপুটী ঐ মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া কদাপা নগরীতে আগমন পূর্ব্বক তথাকার বাসা-বাটীতে সসম্ভ্রমে স্থান দিলেন!

যে সাধুর কথা বলিতেছি, তাঁহার ঠিক বয়স কেহই ঠিক করিতে পারে নাই কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে পঞ্চাশ বর্ষের অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। ইংরাজি, পারস্য, আরবী, হিন্দি, উর্দ্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কটিদেশে গৈরিক বহির্ব্বাস, গায়ে কৃষ্ণবর্ণ কম্বলের আলখাল্লা, গলায় পিতলের মোটা শৃঙ্খল এবং হাতে লম্বা লৌহ দণ্ড ছিল। তিনি খুব স্থূল বা খুব পাতলা

ছিলেন না কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বড় সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোকে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। মৎস্য কিম্বা মাংস তিনি নিত্য ভক্ষণ করিতেন না কিন্তু যখন মাংস খাইতেন আট দশ সের ছাগমাংস অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়া সহজে হজম করিয়া দিতেন। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক তোলা অহিফেন, ষোল ছিলিম গাঁজা, তিন ছিলিম চরশ এবং তদ্ভিন্ন অনেক ছিলিম তামাকু সেবন করিতেন। একদিন তিনি একাদশ বোতল বিলাতী ব্রাণ্ডি (Exshaw No. 1) বিনা জল সহযোগে, দুই ঘণ্টার মধ্যে পান করিয়াছিলেন অথচ নেশার চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাত খাইতে বসিলে সাধারণত অর্দ্ধপোয়ার অধিক আহার করিতেন না অথচ দেহখানি তপ্তকাঞ্চনবৎ প্রতীয়মান হইত। ইনি বড় বড় বিষাক্ত ভূজঙ্গ ধরিয়া আনিয়া তাহাদের মুখ নিজের মুখের ভিতর স্থাপন করিয়া বিষপান করিতেন। রাত্রিতে কিম্বা দিবাকালে সেই জিতনিদ্র পুরুষকে কেহ নিদ্রিত দেখে নাই, দিবসে অন্নাহারের পরে আরাম চেয়ারের উপর পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল মাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতেন।

ক্রমে ক্রমে কদাপা নগরীর সর্ব্বত্র সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচারিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, বহুদূর হইতেও স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতে নিরানন্দ হইত না। এ দিকে সহরের জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার, সিবিলসার্জ্জন, জমিদার, সওদাগর, উকিল, মুন্সেফ, সদর আলা, শিক্ষা বিভাগের লোকেরা আগমন করিয়া সাধুর দর্শন লাভ করত, চমৎকৃত ও কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সাধুজী সকলের সহিত সদ্ব্যবহার ও সুমিষ্ট ভাষণ দ্বারা অতীব যশস্বী হইয়া উঠিলেন।

কদাপা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ফ্রেজার সাহেব (Fraser) এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গমন করায় তাঁহার সাধু দর্শন হয় নাই। মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগের তদ্ভিন্ন অনেক লোকের মুখে এই হিন্দুস্থানী সাধুর কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী ছিলেন কিন্তু অনবকাশ বশত দুই এক দিবসের মধ্যে সাধু সমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরে অকস্মাৎ পথিমধ্যে তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ফ্রেজার সাহেব এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী একদিবস সায়াহ্নে রাজপথে বায়ু সেবনোপলক্ষে পদচারণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে আসিতেছিলেন এমত সময়ে সবান্ধব ডেপুটী মহাশয় এবং ঐ সাধু ঐ পথের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণদিকাভিমুখে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সাধুর দর্শন লাভ হইল। জয়েণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "ডেপুটী সাহেব! শুনিতেছি, আপনার বাসায় একটী ভাল সাধু আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আছি, ইনিই কি সেই সাধু?" ডেপুটী বলিলেন "হাঁ, ইনিই সেই সাধু।" সাধুর দিকে চাহিয়া ফ্রেজার কহিলেন "মহাশয়! শুনিয়াছি সাধু পুরুষেরা ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত বলিয়া দিতে পারেন, অন্তত ভবিষ্যতের অনেক কথা তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া দেন। আপনাকে আমার একটা ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাস্য আছে। বলিতে পারেন আমার কবে বিলাত যাওয়া হইবে?" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন "অদ্য হইতে একমাস কাল মধ্যে আপনি বিলাত যাইবেন।" জয়েণ্ট সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার সহিত কথোপকথন করিবার পূর্ব্বে আপনার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল কিন্তু এখন আপনার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা অভক্তি ও ঘৃণার উদ্রেক

হইয়াছে"। এই কথা বলিয়া ডেপুটীর দিকে তাকাইয়া ফ্রেজার কহিলেন "আমরা সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী, ভারতবর্ষে ছয় বৎসর কাল চাকুরী করিলে ছয় মাস ছুটি পাই, গত বৎসর আমি ছুটি লইয়া বিলাত গিয়াছিলাম, প্রায় দেড়মাস হইল ইংলণ্ড হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছি, আবার ছয়বৎসর অতীত না হইলে আমার বিলাত যাওয়া সম্ভব নয়, তদ্ভিন্ন বিলাত যাইবার আমার এখন ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। সুতরাং এই সাধুর বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইতেছে। একমাসের মধ্যে আমার বিলাত যাওয়া কেমনে সম্ভব হইতে পারে?" এই কথা শেষ হইলে সাধুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন "তোমার বাক্য প্রলাপীর বাক্যের সমতুল্য, তুমি নিশ্চয়ই পাগল।" রোষকষায়িত লোচনে মহাপুরুষ বলিলেন "ফ্রেজার! ফ্রেজার! এই পাগলোমীর জন্যই অদ্য হইতে একমাস কাল মধ্যে তোমাকে বিলাত যাইতে হইবে, ইহা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।" ঝটিতি সেই সাধু ফ্রেজারের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। জয়েণ্ট সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হাসিতে হাসিতে স্বভবনের দিকে প্রস্থান করিলেন। ডেপুটী ও তাঁহার বন্ধুগণ সত্বরে আসিয়া সাধুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইহার দুই দিন পরে মহাপুরুষ কদাপা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কোথায় গেলেন তাহা কেহই জানিল না, জানিবার উপায়ও রহিল না। কিন্তু ফ্রেজার সাহেবকে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা সকলেরই স্মরণ রহিল।

এই ঘটনার ঠিক চতুর্দ্দশ দিবস পরে, শ্রীমান ফ্রেজার সাহেব এজ্‌লাসে বসিয়া একটা মার পিটের মোকর্দ্দমার বিচার করিতেছিলেন। ফরিয়াদী ও আসামীর এজাহার শেষ হইয়াছে, সাক্ষীদিগের জবানবন্দী সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, উকিল ও মোক্তারদিগের বক্তৃতার উপসংহার

হইয়াছে, কেবল রায় (Judgment) লিখিতে বাকি আছে। সাহেব রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলম ধরিবামাত্র তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, অনেক কষ্টে দশ ছত্র লিখিলেন, তদনন্তর তাঁহার বুকে ভয়ানক বেদনা বোধ হইতে লাগিল এবং ঘোরতর পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। ঝটিতি খানসামারা লেমনেড্ ও বরফ আনিয়া সাহেবকে পাণ করিতে দিল। অতি কষ্টে রায়ের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি রায়ের কাগজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে চেয়ার-পরিত্যাগ পূর্ব্বক গায়ের কোট, ওভার কোট প্রভৃতি খুলিয়া নগ্নগাত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মুখ দিয়া অজস্র অশ্লীল গালি নির্গত হইতে লাগিল। সাহেবের এই ভাব দেখিয়া কাছারীর লোকেরা ভীত ও চমৎকৃত হইল। তদনন্তর মহাবীরের ন্যায় লম্ফ দিয়া এজ্‌লাস হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া একজন কনেষ্টবলকে নির্দ্দয়ের মত প্রহার করিতে লাগিলেন, নিরপরাধী কনেষ্টবল প্রাণভয়ে ও শারীরিক যন্ত্রণায় নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। নাজির, পেস্কার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি দৌড়িয়া আসিল শেষে সাহেব বাহাদুর তাহাদিগকেও প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে পাণ্টলুন পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে কাছারীর হলে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া ফ্রেজার সাহেবকে ধরাধরি করিয়া শোয়াইয়া দিল। এ দিকে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট, জজ, সিবিল সার্জ্জন পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সাহেবেরা সত্বরেই ফ্রেজারের কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন "ইহা এক প্রকার উন্মত্ততা বলিয়াই বোধ হইতেছে।" প্রায় একঘণ্টা মধ্যে ফ্রেজার তাঁহার বাঙ্গলো মধ্যে আনীত হইলেন। রোগের উপশম হইল না, দিনে দিনে তাহা বাড়ীতে লাগিল। মান্দ্রাজ নগরে জয়েণ্ট

সাহেব চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইলেন, সেথানকার পাগলথানার বড় বড় ডাক্তারেরা আসিয়া বলিলেন "বিলাতে গিয়া যথারীতি চিকিৎসা না করাইলে এরূপ উৎকট রোগের—মহামারাত্মক উন্মত্ততার—আরোগ্য হওয়া সুকঠিন অথবা অসম্ভব। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সমীপে যথাসময়ে রিপোর্ট প্রেরিত হইল, গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও পরামর্শে ফ্রেজার সাহেব ছুটি প্রাপ্ত হইয়া ঠিক অষ্টবিংশ দিবস অপরাহ্নে বিলাতী জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক ইংলণ্ডে (বিলাতে) রওনা হইলেন। সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে এই অদ্ভুত ঘটনার সম্বাদ প্রচারিত হইয়া গেল; সেই বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের অভিশাপের ফল ফলিয়াছে দেখিয়া লোকে বিস্ময় ও আতঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হইল।

বিলাতে যথারীতি চিকিৎসা করাইয়া ফ্রেজার সাহেব রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্ত হইয়াই, জগদ্বিখ্যাত টাইম্‌স্ (Tmes) নামক সম্বাদ পত্রে এই অত্যদ্ভুত ঘটনা ছাপাইয়াছিলেন। টাইম্‌স্ সম্পাদক ফ্রেজারের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ কস্মত প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও সন্দিগ্ধচেতা হইয়া প্রবন্ধটি প্রকাশ না করিয়া ফ্রেজারকে ডাকাইয়া পাঠান, পরে তাঁহার মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তোষ সহকারে ঐ প্রবন্ধকে স্থান দেন। এই সময়ে ফ্রেজার সাহেব বিলাত হইতে কদাপার ডেপুটী কালেক্টরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

(ফ্রেজারের পত্র)

প্রিয় ডেপুটীজী,

আপনারা বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন, ঈশ্বর প্রসাদে আমি এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়াছি। আপনার বাসা বাটীতে যে হিন্দুস্থানী সাধু অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিকই ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ,

আমি এমন অসাধারণ মনুষ্য (Extraordinary man) আর কখনও দেখি নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সাধুর একখানি ফটো পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে আমি Illustrated London News নামক সংবাদপত্রে তাঁহার ছবি ছাপাইয়া দিব। তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত দিলেও ভাল হয়। টাইম্‌স্ পত্রে ঐ সাধুর বিবরণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ভবদীয়

ফ্রেজার

ইহার উত্তরে ডেপুটী মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই—

(ডেপুটীর পত্র)

প্রিয় মিষ্টার ফ্রেজার!

আপনার পত্র এবং রোগমুক্তির সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। আপনার বিলাত গমনের অনেক পূর্ব্বে সেই মহাপুরুষ কদাপা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহ জানে না, জানিবার কোন সুবিধাও নাই। তাঁহার জীবন চরিত আমি সংগ্রহ করি নাই, এরূপ মহাপুরুষদিগের জীবনী সংগ্রহ করাও সুকঠিন; কারণ এই যে, সাধু মহাত্মারা প্রায়ই আত্ম-পরিচয় দেন না। তাঁহার একখানি ফটো তুলাইয়াছিলাম, ফটো খানি আমার নিকটে আছে, কিন্তু ফটো খানি ভাল ফটোগ্রাফারের হাতের তৈয়ারী না হওয়ায় সুন্দর হয় নাই। আমি সত্বর মান্দ্রাজ যাইব, সুবিধা হইলে ইহার খুব ভাল নকল করাইয়া আপনার নিকটে পাঠাইতে বিস্মৃত হইব না। ভরসা করি আপনার সর্ব্বৈব কুশল।"*

* বিলাতে ঐ ছবি পাঠান হয় নাই। এই মহাপুরুষের ছবি আমি অনেকের গৃহে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রথম ফটোখানি এখনও মজুদ আছে।—লেখক।

ছুটি শেষ হইলে, ফ্রেজার সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া আবার কদাপাতেই উপস্থিত হয়েন। কদাপায় অবস্থান কালে ঐ মহাপুরুষের তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পান নাই। তিনি এতদূর সাধুভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পথে ঘাটে হাটে মাঠে গাছতলায় যেখানেই হউক সাধু আগমনের সম্বাদ পাইলে, ঝটিতি লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলোতে আনিতেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরে তাঁহার সেবা ও সাহায্য করিতেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন কালে আমি কদাপা ও মদনপল্লী নগরীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলাম। এই ঘটনার কথা আমি তথায় বহুসংখ্যক লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি; যাঁহারা এই ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এখনও জীবিত রহিয়াছেন। যাঁহাদের মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের কেহ কলেজের প্রিন্সিপাল, কেহ জজ, কেহ ডেপুটী কলেক্টর, কেহ রাজোপাধিক জমিদার, কেহ উকিল, কেহ গ্রন্থকার, কেহ বা তত্ত্বদর্শী সাধু। ঐ মহাপুরুষের ফটো আমি অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইনি মান্দ্রাজ অঞ্চলে "ফ্রেজারী বাবা" নামে বিখ্যাত। এই মহাত্মা স্বয়ং বলিতেন "সংশয়াত্মার অত্যন্ত অধঃপতন হইয়া পরিণামে নাশ হয়।"

বঙ্কিম বাবুর প্রভাব।

এক একটা যুগের উপর, এক একজন মহাপুরুষের প্রভাব অতি বিচিত্র!

সেই প্রবল প্রভাব সমস্ত যুগটীকে যেন চতুষ্পার্শস্থ বায়ু-মণ্ডলের মত ঘেরিয়া আছে, যুগান্তর্বর্ত্তী মানবজীবন প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অল্পে অল্পে অজ্ঞাতসারে তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়ে।

মনে হয় সেই এক মহাপুরুষের ভাব শোণিত-পুষ্ট লক্ষ লক্ষ মনুষ্য হৃদয় সজীব রহিয়াছে, তাঁহার প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের আর চলিবে না। সেই একই জীবনী-শক্তি শতভাবে এবং বহু আদর্শে মানব চরিত্রের উপর কার্য্য করিয়া জাতীয় জীবনকে সংগঠিত করিয়া তুলে এবং মহিমান্বিত সভ্য ও জ্ঞানালোকে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ ও অপূর্ণতা বিদূরিত করিয়া তাহা অরূপ সৌন্দর্য্য এবং বিমল আনন্দের কনক-কিরণে উদ্ভাষিত করিয়া দেয়।

শাস্ত্রমতে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন দেবতার অধিকার ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে মানব জীবন তাহাতে অজ্ঞাতসারে শাসিত হইয়া থাকে। হিন্দু জ্যোতিষ মতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবও অনতিক্রমনীয়। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে বিভিন্ন গ্রহ ভাগ্যের উপর আধিপত্য করে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই।

মনে হয় তেমনি এক একজন মহাপুরুষ যুগে যুগে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত আগমন করেন, যুগের শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে সর্ব্বশুভ বিধান ও ক্ষীণ দুর্ব্বল জাতীয় হৃদয়কে সুস্থ ও সবল করিয়া আমাদিগকে আদর্শের অভিমুখে পরিচালিত করেন। অবশেষে আর এক মহা-

পুরুষের উপর সমাপ্ত অসমাপ্ত সমস্ত কর্ত্তব্যের ভারার্পণ করিয়া যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন আর এক জনের যুগ আরম্ভ হয়।

বাংলায় রামমোহন রায়ের যুগের পর ঠিক এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

কিন্তু রাম মোহন ও বঙ্কিম চন্দ্রের প্রভাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যক্তিগত আদর্শের প্রভাব এবং সাহিত্যিকের সাহিত্যগত প্রভাব দুই বিভিন্ন এবং পৃথক ভাবে কার্য্য করে।

আদর্শ মহাপুরুষের প্রভাব দৃষ্টান্তে, ভাবে এবং কার্য্যে তাঁহার সমসাময়িক জাতিকে উন্নত করিয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যিকের প্রভাব সুদূরগামী জাতি হইতে জাতি যুগ হইতে যুগান্তর দেশ হইতে দেশান্তর সেই প্রভাব চলিতে থাকে। ব্যাস বাল্মিকীর প্রভাব, কালীদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত মহাকবিদিগের প্রভাব সমস্ত দেশ, সমস্ত মানব মন ব্যাপিয়া আছে। কত কাল, কত ধর্ম্ম কত আন্দোলন কত বিপ্লব চলিয়া গেল কিন্তু আজিও সেই প্রভাব অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

ব্যক্তিগত আদর্শ জনিত কার্য্য অতি শীঘ্র হয় কিন্তু সাহিত্যগত প্রভাবের কার্য্য কিছু বিলম্বে হয় কিন্তু ইহার ফল বহুদূর-ব্যাপী। কালে মহাপুরুষের জীবনে অলৌকিকতা ও অবতারত্বেরও অনেক খানি অসাধারণত্বের সমাবেশ করিয়া মানব মন তাহা হইতে পিছাইয়া আসে কিন্তু সাহিত্যিকের সাহিত্যগত প্রভাব চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে। কর্ম্মী মহাপুরুষ তাহার আদর্শ জীবন দিয়া যান, কবি তাঁহার সত্য ও সৌন্দর্য্য-ভূষিত চির সজীব চরিত্রাবলী রাখিয়া যান। এই দুই বিভাগ লইয়া রাম মোহন ও বঙ্কিম চন্দ্রের প্রভাবের পার্থক্য কতকটা ঠিক করা যাইতে পারে কিন্তু সবটা নহে। তাহার কারণ এই যে রাম মোহন রায় কর্ম্মী পুরুষ হইয়াও কতকটা সাহিত্যিক প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন

এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও আবার সাধারণ সাহিত্যিক-অসুলভ কতকটা প্রভাব ছিল। রাম মোহনের যুগে সবেমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। বহুদিন যে সমস্ত বহুযুগ সঞ্চিত কলুষ আবর্জ্জনা-রাশি এতদিন আত্ম গোপন করিয়াছিল, সেই আলোকে তাহা দেখা গেল। ইতিপূর্ব্বে জাতীয় গৌরবের সর্ব্বোচ্চশিখরে অবস্থিতি করিয়া আমরা পরমানন্দে ঐশ্বর্য্য-স্বপ্নে বিভোর ছিলাম, জাগিয়া এখন দেখিলাম বিস্তর পশ্চাতে পড়িয়া আছি এবং ছায়ালোকে যাহা পরম ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল,—তাহা অতীত পূর্ব্বপুরুষের ধন রত্নের অতি-হীন বহিরাবরণ মাত্র!

যাহা হউক, বহুকাল অবসাদের পর নবজাগ্রত বাঙ্গালী চক্ষু মেলিল। সম্মুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার সুবর্ণোজ্জ্বলছটা! পশ্চাতে বহু-বর্ষ ব্যাপী জড়তা ও অজ্ঞানের ঘনান্ধছায়া!

সেই সময় রাম মোহন যে শক্তিতে জাতীয় উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিলেন, যে উদার হৃদয়ে দেশের জন্য সর্ব্ব নির্য্যাতন সহ্য করিলেন, যে অসীম প্রেমে দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন এবং অসহায় স্বদেশবাসীকে নিজ হৃদয়ে টানিয়া লইলেন, সেই মহৎ চরিত্র, সেই সত্যের প্রতি প্রাণপণ নিষ্ঠা, সেই জ্ঞানের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেশে রহিয়া গেল। তাহার পর যে সমস্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহারাও তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিগত প্রভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্ষণ-জন্মা তাঁহার সেই মহান্ আদর্শ অনুকরণ করিবার মত শক্তি অনেকের ছিল না। সকলে সেই দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে অতিসন্তর্পণে জ্ঞানালোক জ্বালিয়া জাতীয় ধন রত্ন বুঝিয়া লইতে পারিল না। শুধু অন্ধকার হইলে বরং হইত, যে বিশাল আবর্জ্জনা ও মিথ্যাচারে তাহা লুক্কায়িত ছিল, কে তাহার উদ্ধার চেষ্টা করিবে?

রাম মোহন প্রাণপণ যত্নে সেই সমস্ত জাতীয় সম্পত্তি বণ্টন করিতে

চাহিলেন, সকলে তাঁহার সে সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। যাহারা বুঝিল তাহারা তাঁহার সহিত যোগ দিল, যাহারা তাঁহাকে না বুঝিল কিম্বা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিল, তাহারা স্বদেশ স্বজাতি ছাড়িয়া পাশ্চাত্য সভ্যতায় আত্মসমর্পণ করিল। রাম মোহন এবং বিদ্যাসাগরের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তাহাদিগকে ঘরের দিকে টানিয়া রাখিতে পারিল না।

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীষণ স্রোত প্রাচীন বন্ধন ছিন্ন করিয়া খরবেগে বহিয়া চলিল! ঠিক এমন সময় রাম মোহনের যুগ শেষ হইল।

পরিবর্ত্তন যুগের এই ধ্বংশকারী শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে অনেকটা প্রহত হইল। তাহার স্থলে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হইল। এই জাতীয় সংগঠন কার্য্যেই বঙ্কিম বাবুর স্বকীয়তা ও প্রভাব সম্যক দেখা যায়।

বঙ্কিম বাবু যে সময়ে দেখা দিলেন, সে সময়ে শিক্ষিত প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ ও মোহান্ধ। কেহ তাঁহাকে আয়ত্ত করে না সকলেই তাঁহার অনুকরণে ব্যস্ত। বাংলা ভাষা তখন ছিন্ন-বসনা, দীনা, দরিদ্রা, ইংরাজীভাষা মহিমাময়ী, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী, সকলেই তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন এবং বঙ্গভাষাকে ঘৃণায় পদদলিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে ঘোর অরাজকতা, ক্রিয়া কলাপ, মিথ্যাচার পরিপূর্ণ, নবালোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত কে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? যাঁহাদের নৈতিক সাহস বড় বেশী প্রবল তাঁহারা খৃষ্টিয়ান হইয়া গেলেন, কেহবা আপনাদের আদর্শানুরূপ ধর্ম্মপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। ওদিকে মিশনারীরা এ 'সুবর্ণ সুযোগ' উপেক্ষা করিলেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য লক্ষ লক্ষ লোক তখনও অন্ধকারে পড়িয়া রহিল।

সামাজিক অবস্থা তখন আরও শোচনীয়, সেই বিবর্ত্তন যুগে কেহ বা ইহার আমূল সংস্কার করিতে গিয়া বিতথ-প্রযত্ন হইলেন, কেহবা বিস্তর "বহ্বারম্ভ" করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, এবং কেহ কেহবা বিলাতী ও দেশীয় সমাজ মিশ্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন! একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষম অনুকরণে যখন একদল আমাদিগকে অতি শীঘ্র 'কালা সাহেব' করিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিতেছিল, অপর দিকে তেমনি মুনি ঋষিগণের জনকতক অযোগ্য বংশধর তাঁহাদিগের বহুকালানুষ্ঠিত মিথ্যাচার এবং অযথা ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিবার জন্য তুমুল চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সমাজ ও জাতীয় আচার ব্যবহারের সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন করিয়াই একদল নিজেকে উন্নত মনে করিতেছিলেন, ধর্ম্মের মিথ্যা আবর্জ্জনার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আর একদল আপনাদের আর্য্যবংশের সুযোগ্য বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেছিলেন। সমাজহৃদয়ে তখন এই ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল।

ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেমন মুগ্ধ, স্বদেশ ও স্বদেশীয়ের প্রতি তেমনি ঘৃণা পরবশ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যখন অগ্রসর হইলেন, তখন জাতির গতি ও প্রকৃতি আদৌ নির্ণীত হয় নাই, ঘোর বিশৃঙ্খলা এবং অত্যন্ত হীনাবস্থা। তিনি পূর্ব্বযুগের বিচিত্র উপাদান অতি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া জাতীয় জীবন সংগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই তিনি বুঝিলেন যে জাতিকে উন্নীত করিবার জন্য লোকশিক্ষার প্রয়োজন।

পরিবর্ত্তন যুগের এই উচ্চ আশা আকাঙ্খা, জ্ঞান গৌরব, জনকতক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে চলিবে না, ইহার প্রভাবে সমস্ত জাতিকে তরঙ্গায়িত করিতে হইবে। নূতন আলোকে সমস্ত জাতিকে জাগ্রত করিতে হইবে—সত্যে তাহাকে জীবিত, জাতীয়তায়

তাহাকে রক্ষিত এবং জ্ঞানে দীক্ষিত করিতে হইবে। জাতীয় উন্নতির মূলে, লোকশিক্ষা।

কিন্তু তাহা জাতীয়ভাষায় হওয়া আবশ্যক, অথচ ভাষার তখন নিতান্ত দুরবস্থা। সেই দুরভিগম্য অনুস্বার বিসর্গমাত্র হীন সংস্কৃত বাংলায় বা যাবতীয় ভাষায় সংমিশ্রনজাত কিম্ভুত কিমাকার চলিত ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য বিষয়াবলী বুঝান যাইতে পারে না। বঙ্কিম নূতন ভাষার সৃষ্টি করিলেন, ভাবের রাজতন্ত্র স্থলে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল।

নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রীতিমত পাঠক সমাজ ছিল না। লেখকগণকে ইতিপূর্ব্বে রসজ্ঞ কোনও ধনী কিম্বা বিশেষজ্ঞ সুধীবর্গের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে হইত। ইহাতে অনেক সময়ে লেখকের স্বাধীনতার অযথা সঙ্কোচ এবং বাধ্য হইয়া আশ্রয় দাতার মনোরঞ্জনে সত্যের অপলাপ করিতে হইত। বঙ্কিম বাবু লেখকদিগের জন্য স্বতন্ত্র পাঠক সমাজ সৃষ্টি করিলেন। এবং ব্যক্তিগত প্রভাব হইতে লেখকদিগকে উদ্ধার করিয়া উদার স্বাধীনতার মুক্ত প্রান্তরে আনয়ন করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে লেখকগণকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিবার জন্য "বঙ্গদর্শন" প্রবর্ত্তন করিয়া লেখক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহাদিগকে নব নব বিষয় আলোচনার পথ প্রদর্শন করিলেন এবং প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ভাব সংগ্রহের পথ সুগম করিয়া দিলেন।

এইরূপে লোকশিক্ষা আরম্ভ হইল।

কিন্তু যাঁহারা লোকশিক্ষার গুরুভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে যেমন প্রভূত অজ্ঞান অন্ধকার এবং যাবতীয় কুসংস্কার মানব মন হইতে দূর করিতে হইবে, তেমনি নব নব জ্ঞান ও নব নব শিক্ষা যাহাতে নির্দ্দোষ হয় তাহারও বিধান করিতে হইবে।

বঙ্কিম বাবু তাহাই করিলেন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ গুণ আলোচনায় মন দিলেন। কল-বার্ত্তাবহ ষ্টীমইঞ্জিন-সঙ্কুল পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্ব্বাবয়বে এবং সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে যে আমাদের জাতীয় আদর্শের অনুকূল নহে, তাহা তিনিই প্রথম মোহান্ধ জাতিকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

একদিকে তিনি যেমন উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য গ্রন্থালোচনায় ও অন্যান্য বিষয়ে মন দিলেন, ও তাহার উৎকর্ষ প্রদর্শনে আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিলেন, অপরদিকে তিনি তেমনি ইহার ভ্রম প্রমাদ ও কুফল হইতে সতর্ক করিয়া দিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার কুৎসিতাংশ সযত্নে ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু মহৎ, হিতকর ও সুন্দর তাহাই তিনি জাতির জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।

পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি দীনহীন জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না, কিন্তু তাঁহার সমস্ত ভাব-প্রবাহ দীনা জন্মভূমির জন্য উৎসারিত হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি প্রাণপণে জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার জন্য জাতীয় আদর্শের অনুকূলে গঠন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার ব্যবহারে যাহা কিছু জাতীয়তার বিঘ্নকর তাহাতে সুফল ফলিবে না। তাই সূর্য্যমুখী যখন ইংরাজী শিক্ষিত ধনী পরিবারের গৃহবধূ হইয়াও নগেন্দ্রনাথের সহিত বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন গেট্ পর্য্যন্ত না গিয়াই গাড়ী অন্দরাভিমুখে ফিরাইতে হইয়াছিল। তাই বিধবা বিবাহে চিরাচরিত একনিষ্ঠতা লোপের জন্য বাঙ্গালায় যখন ভীষণ আন্দোলন চলিতেছিল, তখন বঙ্কিম বাবু অশ্রুম্লান কুন্দনন্দিনী-চিত্রে বিধবা বিবাহে গৃহে গৃহে কি "বিষবৃক্ষ" ফলিতে পারে তাহা সবিশেষ দেখাইয়াছিলেন। আদর্শ হিন্দু রমণীর চিরক্ষুণ্ণ পথ হইতে সরিয়াছিল, তাই ভ্রমর, অতি দুঃখে মরিল।

শৈবলিনীর Romantic love এর শিরে বঙ্কিম বাবু কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অপরদিকে নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলাল, প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষিত হইয়াও জাতীয় আদর্শের অনুকূল। প্রবৃত্তির পথে না গিয়া নিবৃত্তিতেই তাহাদের পূর্ণ পরিণতি।

ইহা ছাড়া বঙ্কিম বাবু যে সমস্ত আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় চরিত্র। পাশ্চাত্য ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে ও ছায়ালোকে তাহা সৃষ্ট বা অঙ্কিত হইলেও তাহার মূল-ভিত্তি জাতীয়তার উপর স্থাপিত। তাহা পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় আদর্শকে অতিক্রম করে নাই।

শুধু তাই নহে, যখন পাশ্চাত্য নবীন আলোকে আমাদের দীনা বঙ্গ-ভূমির রুগ্নবেশ ও মলিনমূর্ত্তি দেখিয়া শিক্ষিত যুবকেরা ঘৃণায় ও বিরাগে মুখ ফিরাইতে ছিলেন, এবং ইংরাজ ঐতিহাসিকের রচিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নিজ জাতির কলঙ্কিত ইতিহাস পড়িয়া যখন তাঁহাদের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান খর্ব্ব হইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রই তখন দেখাইয়াছিলেন যে চিরদিন আমাদের এমন দশা ছিল না, আমাদের সুধী তত্ত্বজ্ঞ, কবিদার্শনিক, শাস্ত্রকার, নৈয়ায়িক, এই সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা-বঙ্গদেশ এক-দিন অলঙ্কৃত করিত, আমাদের শিল্পী, ব্যবসায়ী, সৈন্য সামন্ত একদিন জগতের বিস্ময় আকর্ষণ করিত। এবং যখন ক্রমাগত এইরূপ ঐতি-হাসিক লিখিত চিরভীরুতার অপবাদে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনিই প্রথম আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে অষ্টাদশ মাত্র অশ্বারোহী বঙ্গদেশ অধিকার করে নাই।

জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। আমাদেরও তাই হইয়াছিল। ধর্ম্মের স্থলে অপধর্ম্ম তাহার শাখা প্রশাখায় বিস্তর কুসংস্কার, মিথ্যা ক্রিয়াকলাপ ও ভ্রষ্টাচার বহুদিনের

জন্য আশ্রয় দিয়াছিল, এবং সেই শাখা হইতে এক বিষাক্ত নিশ্বাসে জাতীয় জীবনকে ক্রমশ অবসন্ন ও নিস্তেজ করিয়া তুলিতেছিল।

বঙ্কিম এমন দিনে ধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এবং আমাদের দেবতা ও জাতীয় আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার ভ্রম ও দৈন্য হইতে উদ্ধার করিয়া চিরভাস্বর মূর্ত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিত্র। এবং চন্দ্রশেখরের মত ব্রাহ্মণের আদর্শ।

এবং জড় ও অধর্ম্ম-পরায়ণ জাতি যখন বৈরাগ্যের ভানে যুগযুগান্তর ধরিয়া আলস্যের বিরাম শয়নে বিশ্রাম করিতেছিল স্বয়ং কর্ম্মশীল বঙ্কিমচন্দ্র তখন চিরসত্য, চির পুরাতন অথচ নিত্য নূতন গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের আলোচনায় এই হতভাগ্য জাতিকে জাগ্রত করিতে-ছিলেন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রবুধ্যত।"

তাঁহার সরলতা, তেজস্বীতা ও নির্ভীক হৃদয়ের প্রভাব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমস্ত জাতীয় জীবনে অল্পাধিক সংক্রামিত হইয়াছে। সাহিত্যে নূতন বিষয় আলোচনা, গভীর গবেষণা এবং স্বাধীন মত প্রচার ইহা বঙ্কিম বাবুর প্রভাবের ফল!

তাঁহার সমালোচনা ও বিবিধ চরিত্র বিশ্লেষণ হইতে জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও দোষ নির্ণয়ের ক্ষমতা জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। এবং যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর তাহার সুমধুর আদর্শ সমস্ত জাতীয় মনকে এক অতি অপূর্ব্ব অমরলোকে লইয়া গিয়াছে, সেখানে ভাব-মন্দাকিনী প্লাবিতা, পারিজাত কুসুমকুঞ্জে আমরা সৌন্দর্য্য দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, এবং সমস্ত জাতির মন হইতে কুৎসিতাংশ অল্পে অল্পে নিরাকৃত হইতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে রসিকতার যে আদিরসঘটিত অপূর্ব্ব

ভাঁড়ামী প্রচলিত ছিল, সমালোচনার নামে যে শ্রুতিকটু কদর্য্য গালি-গালাজ ব্যবহৃত হইত এবং তর্কে যে সমস্ত অকথ্য ভাষার প্রয়োগ হইত, বঙ্কিমবাবুর প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তাহা প্রায় বিদূরিত হইয়াছে এবং তাঁহার অতি বিশুদ্ধ, অতি মনোরম হাস্যরস সঞ্চারে ভাষা সরস হইয়া উঠিতেছে।

এবং আজি এই যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মূলেও সেই বঙ্কিমের প্রভাব বড় কম কার্য্যকারী নহে। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা পুস্তকের প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে হৃদয়ের শোণিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত আদর্শচরিতে তাহা বিকশিত, বাক্য-চিত্রে তাহা প্রতিফলিত এবং দেশের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাহা চিরোজ্জ্বল এবং চিরভাস্বর! এবং তিনি এই দুঃখজর্জ্জরিত,অবশ অসাড় জাতীয় জীবনের আশা ও আশ্বাসের বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া "শোভন-শস্য-উজ্জ্বল-শ্যামভূষণা" বঙ্গভূমির স্নেহে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছেন

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

আর একটা কথা এই যে, তিনি আমাদের দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত ও চির-দৈন্যময় জাতীয়জীবন দেখিয়াও ইহার মধ্যে সুখসমৃদ্ধির স্নেহ-লালিত চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন।

যে জাতি উন্নত, তার গুণও যেম্‌নি মহান্, দোষও তেম্‌নি উজ্জ্বল। তেমন জাতিকে তাহার দোষ দেখাইয়া বাস্তব মূলক (Realistic) উপন্যাস লিখিলে এবং দোষের কিংবা সামাজিক ও নৈতিক ভ্রমপ্রমাদের উপর তীব্র কষাঘাত করিলে তাহাতে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু যে জাতি অতি হীনাবস্থ এবং চিরপদানত তাহাকে যদি তাহার ছিদ্র ক্রমাগত বড় করিয়াদেখান হয়, এবং ক্রমাগত তাহার কর্ণে তাহার দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তারস্বরে ঘোষণা করা হয় তাহা হইলে তাহা চির

দিনের মত হতাশ হইয়া পড়ে, এবং তাহার ভবিষ্য উন্নতির আশামাত্র থাকে না। তাই, মনে হয়, বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে সুন্দর চরিত্র উন্নত অবস্থা, বিশাল হর্ম্ম্য, মর্ম্মর প্রাসাদ, সুন্দরী যুবতী স্ত্রীচরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া, সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের চিত্তকে সমধিক উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন।

এবং আমাদের মনে হয় ঠিক সেই কারণেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বাস্তব-মূলক উপন্যাস অপেক্ষা আদর্শ মূলক উপন্যাসের সমধিক উপকারিতা। শুষ্ক উপদেশের পরিবর্ত্তে সরস চরিত্রের প্রয়োজন।

তাই বঙ্কিম চন্দ্র আমাদের সম্মুখে কেবল আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া জীবন সঞ্চয় করিয়াছেন, "life is the pursuit of Ideal" তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে কৃষ্ণ চরিত্রের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, এবং উপন্যাসে নব নব আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং সমস্ত উপন্যাসে এক অতুল সমৃদ্ধি, ললিত লাবণ্য, সুশোভন দৃশ্য, সবল স্বাস্থ্য পরিপূর্ণ মন, সুন্দর সুঠাম গঠন, সমস্ত বাস্তব নগ্নতা, দৈন্য, দুঃখ দুর্দ্দশা, দুর্ব্বল দুস্থ হৃদয়ের উপর এক মোহন আবরণ প্রদান করে। তাঁহার অতুলনীয় সোনার কাঠি স্পর্শে তরঙ্গে তরঙ্গে সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠে যাহা কিছু হীন, কুৎসিৎ, তাহা দূরে অতিদূরে সরিয়া যায়—এবং এই অবনত দুর্ব্বল জাতির শোক-দুঃখ-কলুষতাসঙ্কুল হৃদয় রমণীয় সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে উন্নত হয়, এবং স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠে—তাই তাঁহার উপন্যাসে সংসারের বাস্তব চরিত্র অতি বিরল।—তাহাতে কুৎসিতা নাই, বৃদ্ধা নাই, দারিদ্র্য নাই, পর্ণকুটীর নাই, অনাহার অনশন নাই। যেথানে সাতমহল বাড়ী, বিস্তৃত উপবন, মর্ম্মরমণ্ডিতপ্রাঙ্গন, ষোড়শীযুবতীনায়িকা, সুন্দর বিদ্বান যুবক নায়ক। যুবতীরা সন্তান সন্ততি লইয়া আদৌ বিব্রত নহে, এবং যুবকবর্গকে ১০ টা ৪ টা আফিস্ করিতে হয় না! বিস্তৃত জমিদারী

অসামান্য বৈভব। সেখানে জ্বালাযন্ত্রণা প্রণয় লইয়া সাংসারিক অসচ্ছলতা লইয়া নহে। তথায় বনবালিকা কপালকুণ্ডলাও অসামান্য সুন্দরী, ভ্রমর কাল হইলেও অতি সুশ্রী এবং স্বামীর হৃদয় আলো করে, এবং কানা ফুলওয়ালী রজনী, সেও পরমাসুন্দরী এবং চম্পক কোরক সদৃশ কোমল অঙ্গুলিতে বীনা ঝঙ্কারবৎ স্পর্শ অনুভব করে, এবং আপন মনে উচ্ছ্বাসে গাহিয়া উঠে

"এত সাধের প্রভাতে সই ফুটলনাকো ফুল!"

বঙ্কিম চন্দ্র এইরূপে জাতিকে সংগঠিত করিয়া, তাহার সম্মুখে নবসত্য ও নব আদর্শ প্রদর্শন করিয়া, তাহার হৃদয়ে সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগ্রত করিয়া তাহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। আজিও তাঁহার পূর্ণ প্রভাব চলিতেছে, এখনও তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

ভিক্ষুক।

১

সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে আফিস হইতে বাসায় আসিতেছিলাম। বহুবাজারের মোড় পার হইয়াছি মাত্র এমন সময়ে দেখিলাম যে একজন বেশ সভ্য ভব্য প্রবীন ভদ্রলোক একজন দীন হীন দরিদ্রকে কি বলিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বাবুটি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আচ্ছা মহাশয়, আপনি বলুনত, এই লোকটি বলিতেছে যে আজ সমস্ত দিন ইহার আহার হয় নাই। ইহার মুখ দেখিয়া কি বোধ হয় যে এ আজ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে?"

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না। একজন চোগাচাপকান চেন চসমাধারী স্থূলকলেবর প্রাচীন ভদ্রলোক একজন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দীনহীন পথের ভিক্ষুকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; তর্কের কারণ বোধ হয় একটি পয়সা! ভিক্ষুক একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিয়াছিল, বাবুটি বৃথা অপব্যয়ের পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহার সহিত তর্ক করিতেছেন আর আত্মসমর্থনের জন্য আমাকে মধ্যস্থ মানিতেছেন! আমি বাস্তবিক কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না, বাবুটিকে অপব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিব, না ভিক্ষুকের অন্নে বাধা দিব?

আমি বাবুর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া ভিক্ষুককে বলিলাম "কি ঠাকুর তোমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই?"

সে বলিল "না বাবা।"

আমি তাহাকে বলিলাম "কাছেই আমার বাসা, আমার বাসায় এস তোমাকে খাবার দিব কাছে কিছু পয়সা নাই।"

এই বলিয়া বাবুটির দিকে ফিরিয়া দেখি বাবু আমার কাছে নাই একখানি ধাবমান ট্রাম গাড়ির উপর উঠিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছেন। বাবুটি অকস্মাৎ পলাইলেন কেন? ভিক্ষুককে দেখিয়া, আমাকে দেখিয়া, না ট্রাম গাড়ী দেখিয়া?

বাবুটিকে আমি বিপদমুক্ত দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া নিজের বাসার অভিমুখে চলিলাম; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল।

বাসায় উপস্থিত হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলাম। ঘুনসী হইতে চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিলাম—"ঝি"

বৃদ্ধা দাসী নীচে হইতে বলিল—"যাইগো।"

আমি অর্দ্ধ অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার আফিসের ধড়া

চূড়া ছাড়িতেছি এমন সময় দেখি আমার সেই অতিথি ভিক্ষুক ঠাকুর অন্ধকারেই সন্ধান করিয়া চকমকী হইতে কয়লা, তামাক্ বাহির করিয়া তামাকু সাজিতেছে। ঝি একটা কেরোসিনের ডিপে জ্বালিয়া আলোকের সহিত দুর্গন্ধ এবং ধূম বিকীর্ণ করিতে করিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিল ও আমার ঘরের প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া ভিক্ষুককে দেখিয়া বলিল,

"ওমা এ আবার কে? এ গুলিখোর ঠাকুর এখানে কেন?"

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর বলিল—

"বাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। গরীব ব্রাহ্মণ বলে দয়া হয়েছে।"

আমি বলিলাম "ঠাকুর তুমি গুলি খাও?"

সে অতি ভাল মানুষটির মত বলিল—

"আগে অভ্যাস করেছিলেম বটে তবে সে অভ্যাস এখনও যায়নি।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ঝি জল আনিয়া দিল আমি হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম এবং ভিক্ষুককে বেশ করিয়া একবার দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম ব্রাহ্মণ বেশ সুপুরুষ। অথবা এক সময়ে বেশ সুপুরুষ ছিল। এক্ষণে নেসা এবং দারিদ্র্যের পীড়নে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়া যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাকেও বেশ সুশ্রী বলিতে পারা যায়। বয়স বোধ হয় ৪০ হইতে ৪৬ এর মধ্যে। আমি ধূমপান করিতে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"ঠাকুর তোমার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায়, আমরা স্বভাব কুলীন কানাই ছোট্ ঠাকুরের সন্তান।"

আমি শ্রীমন্মথ নাথ বসু নিজে কায়স্থ তার উপর ইংরাজী শিখিয়া

সাহেবের আফিসে চাকুরী করিয়া খাইতেছি ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মর্য্যাদার বড় ধার ধারি না। তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—

"ঠাকুর তোমার চেহারা দেখিয়া বেশ ভাল লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার এ দুর্দ্দশা কেন? আমার শুনিতে বড় কৌতূহল হইতেছে।"

এমন সময় ঝি আমার জল খাবার লইয়া আসিল। আমি ঝিকে আর চারিটা পয়সা দিয়া ঠাকুরের জন্যও কিছু খাবার আনিতে বলিলাম। ঝি একটু অনিচ্ছায় আবার গিয়া খাবার লইয়া আসিল। ঠাকুরের হাতে ঠোঙ্গাটি দিয়া আমি খাবার খাইতে লাগিলাম। জল পান করিয়া একটু স্নিগ্ধ হইয়া আর এক ছিলিম তামাক বেশ করিয়া তাওয়া দিয়া প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে তাহার ইতিহাস বলিতে অনুরোধ করিলাম। ঠাকুরও আর এক কলিকা তামাকু সাজিয়া লইয়া বলিল :—

২

বর্দ্ধমান জেলার কাঁকুড়বেড়ে গ্রামে আমাদের পৈত্রিক নিবাস। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা খুব ধনবান ছিলেন। গ্রামটা তাঁহাদের নিজের তালুক ছিল। বর্দ্ধমান রাজাদের অনেক তালুক তাঁরা পত্তনি নিয়ে খুব বড় মানুষী করে গিয়েছেন। সাড়ে ছয় বিঘা জমীর উপর আমাদের বাস্তবাটী ছিল। এখনও সাবেক পঙ্কের কাজকরা সাতকুকুরে ঠাকুর দালান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। গ্রামে প্রবেশ করিলে প্রথমেই শ্বেত নরকঙ্কালের ন্যায় সেই ছাদহীন দালান পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজা ভিন্ন কাঁকুড়বেড়ের মুখুয্যেদের তুল্য ক্রিয়াবান আর কেহ ছিল না। দোল দুর্গোৎসব বার মাসে তের পার্ব্বন, কিছুরি অভাব ছিল না। সাবেক কর্ত্তারা দাতাও ছিলেন খুব। গল্প শুনেছি আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ টাকার

উপর ব্যয় করে কাঁকুড়বেড়ের বাঁধ নির্ম্মাণ করেন। রাজার অজ্ঞাতে এই টাকাটা ব্যয় করাতে তদানীন্তন রাজা নাকি বলিয়া ছিলেন—

"মুখুয্যে আমাকে না বলে এতটা টাকা খরচ কল্লে আগে একবার আমার মতামত নিলে না?"

তাহাতে কর্ত্তা উত্তর করিয়া ছিলেন—

"মহারাজ, সামান্য টাকার জন্য আর আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হই নাই। অধিক টাকা হ'লে মহারাজের সাহায্য লইতে হইত বটে; আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ অধিক টাকা কোথায় পাইব?" যাক্ সে সাবেক বড় মানুষীর ফাঁকা গল্পে আর লাভ কি? তাঁহারা পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু দেশের লোকের মুখে তাঁহাদের নাম আজিও গীত হইতেছে।

এই প্রকার বড় মানুষী আমার পিতামহ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। আমি যখন অতি শিশু তখন আমার পিতা এবং মাতার মৃত্যু হয়। গাছের ডাল কাটিয়া গাছ করিবার জন্য অপর জমিতে রোপন করিয়া মালীরা যেমন গাছটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে অনেক পরিশ্রম করে আমার পিতামহ সেই প্রকার পিতামাতা হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম সহকারে আদর যত্ন করিতেন। তাঁহার স্নেহবারি সিঞ্চনে আমি অল্প দিনের মধ্যেই খুব বাড়িয়া উঠিলাম। আমার যখন পনর বৎসর বয়স তখন লোকে আমাকে দেখিলে ২০। ২২ বৎসরের বলিয়া মনে করিত। সুতরাং যৌবনে পদার্পন করিবার পূর্ব্বেই আমার পিতামহ আমাকে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। আমার পিতামহ লোকের কাছে আমাকে দেখাইয়া বলিতেন—

"আমি মনে করিয়াছিলাম যে অন্তিমকালে কাশীবাস করিব কিন্তু

এই রাম তারণ আমার পায়ের শিকল হয়েচে আমার কোথাও নড়িবার ক্ষমতা নাই।"

আমার এখন মনে হয় আমি তাঁহাকে মায়াশৃঙ্খলে বাঁধিয়া ছিলাম না তিনি আমাকে স্নেহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ছিলেন? আমি তাঁহার স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলাম না তিনি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন? কেবল স্নেহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে সাহসী হয়েন নাই তাই আবার বিবাহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়া ছিলেন। বাল্যকালে যদি কতকটা স্বাধীনতা পাইতাম তাহা হইলে হয়ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র লোক হইতে পারিত।

আমার বিবাহের পর, দিন কতক বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। "কোকেন" বলে একটা ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার নাকি অদ্ভুত গুণ। কোনও স্থানে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইলে দুষ্ট স্থানে অগ্রে কোকেন লাগাইয়া দিলে সে স্থানটা অসাড় হইয়া যায়। চিকিৎসক ইচ্ছামত অস্ত্র প্রয়োগ করেন রোগী জানিতেও পারে না। পরে যত কোকেনের প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে ততই সে তীব্র যাতনা অনুভব করে। এখন আমি এক একবার মনে করি আমাদের বিবাহটা সেই প্রকার একটা অস্ত্র চিকিৎসা মাত্র। একটী নববধূরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আমাদের জীবনের অনেকটা স্বাধীনতা কাটিয়া ফেলা হয়। পাছে আমরা যাতনা অনুভব করি তাই সেই অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে বাদ্যভাণ্ড গীতনৃত্য এবং অব্যবহিত পরেই বাসরগৃহে রূপসীগণের বিদ্যুৎকটাক্ষে, হাস্যে, গল্পে, কৌতুকে, রহস্যে, রঙ্গে ভঙ্গে, সঙ্গীতে আমাদিগকে এমন অসাড় করিয়া দেয় যে আমরা বুঝিতেও পারিনা যে আমাদের জীবনের উপর কত বড় একটা অস্ত্র প্রয়োগ হইয়া গেল। বিবাহের নব নব রসাস্বাদ যত কমিতে থাকে ততই আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যাহা হউক আমার

ষোড়শ বৎসর এবং নববধূর দশবৎসর বয়সে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

আমরা খুব বড় মানুষ ছিলাম বটে কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় ধনী ছিলেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গৃহে ধনবানে ধনবানে কুটুম্বিতা হইবার বড় উপায় নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর একাসনে স্থান সঙ্কুলান হয় না তাহার উপর যদি আবার বল্লাল সেন খানিকটা দখল করিতে চাহেন তাহা হইলেই মুস্কিল। একাসনে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং বল্লাল সেনকে বড় দেখিতে পাই না। বলা বাহুল্য যে কৌলীন্যাভিমানী আমার বৃদ্ধ পিতামহ লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে এক কথায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু বল্লালী মর্য্যাদা ছাড়েন নাই। তিনি মনের মত কুলীন কন্যা পাইয়া ছিলেন বটে কিন্তু দরিদ্রের গৃহে। তাহাতে কি আসে যায়? কুলত ঠিক রহিল!

সৌভাগ্য বশত আমার বধূটি দরিদ্রের কন্যা হইলেও বেশ সুশ্রী ছিলেন। দরিদ্রের গৃহে ওপ্রকার দুই একটা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার সব পরিচয় দেওয়া হইল কেবল বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। চাকুরি করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হইবে একথাটা আমাদের বংশে কাহারও মাথায় আসে নাই তাই আমার পিতামহ অর্থকরী ইংরাজী না শিখাইয়া আমাকে জ্ঞানকরী সংস্কৃত শিখাইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। মুগ্ধবোধের কিছু, রঘুবংশের ২ অধ্যায় এবং ভট্টির খানিকটা এবং সামান্য বাঙ্গলা এই আমার বিদ্যার দৌড়। শারীরিক পরিশ্রম নীচজনোচিত এবং মানসিক পরিশ্রমের বিশেষ আবশ্যক ছিলনা তাই শরীর এবং মন আমার দুইটাই অপরিপক্ক ছিল। তার উপর পিতামহের স্নেহবারি সিঞ্চিত হওয়াতে আমি একেবারে গলিয়া দ্রব হইয়া পড়িলাম।

৩

আমার বিবাহের ছয় মাস পরে আমার পিতামহ স্বর্গে গমন করেন। আমি একেবারে জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিলাম। সংসারের কিছুই জানিনা, চিরকাল পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম, পিতামহকে হারাইয়া চারিদিক শূন্য,বিস্তৃত, অতি বিস্তৃত পৃথিবীর ঠিক মাঝ খানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিবাহের অল্পদিন পরেই আমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আমাদের একটু মনান্তর হয়। সমান অবস্থাই হউক আর অসমান অবস্থাই হউক বিবাহের পর কুটুম্বের সহিত মনান্তর হয়না কোন বাঙ্গালীর? আমাদের উভয়ের মধ্যে যখন অবস্থাগত আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে তখন যে আমার শ্বশুর মহাশয়দিগের সহিত আমাদের মনান্তর হইবে না এ আশা করা অন্যায়। এই মনান্তর নিবন্ধন আমার পিতামহ আমার শ্বশুরকে বড় অগ্রাহ্য করিতেন। দরিদ্র শ্বশুর, ২।১ বার তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু অতি সন্তর্পণে। আমার পিতামহ জানিতে পারিয়া কোনও আপত্তিও করেন নাই অথবা কুটুম্বোচিত সমাদরও করেন নাই। শ্বশুর মহাশয় দীনহীন বেশে আসিয়া আমাদের গোমস্তার নিকট বসিয়া তামাকু খাইতেন আর কন্যার সহিত দেখা করিয়া প্রস্থান করিতেন। গোমস্তার অবস্থাও আমার শ্বশুরের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যুর পর দিন হইতেই আমার শ্বশুর আমার অভিভাবক হইলেন। যিনি বৎসরে বোধ হয় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না তিনি একেবারে তাঁহার অতুল ধনবান বালক জামাতার অভিভাবক হইলেন। শুনিয়াছি আমার পিতামহের মৃত্যুর সময় আমাদের বাৎসরিক আয় প্রায় লক্ষ টাকার উপর ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (আমার শ্বশুর) অধ্যক্ষতায় বিশেষ সমারোহে এবং অশেষ বিশৃঙ্খলায় পিতামহের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। পিতামহ সেকালের

লোক ছিলেন তাঁহার পিণ্ডে বড় বিশ্বাস ছিল তাই আমাকে ঠিক পিণ্ড দিবার উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। আমিও যথারীতি পিণ্ড দিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিলাম এবং অবশেষে আমার নিজের পিণ্ডের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইলাম।

আমার নূতন অভিভাবকের আমলে পুরাতন চাল অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। অনেক প্রাচীন কর্ম্মচারী বিনাদোষে অথবা অল্পদোষে তাড়িত হইল আর তৎপরিবর্ত্তে নূতন লোক সকল নিযুক্ত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে এই সকল নব নির্ব্বাচিত লোক আমার শ্বশুর মহাশয়ের আনীত। যাহারা বিতাড়িত হইল তাহারা কেহ কেহ ৫।৭ পুরুষ আমাদের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। পদচ্যুত কর্ম্মচারীরা আমার নিকট নালিশ করিতে আসিত কিন্তু আমি কি করিব? আমার পিতৃতুল্য শ্বশুর তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়াছেন, আমি শ্বশুরের উপর কথা কহিতাম না। তখন আমার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। আমাদের বাটীতে যে সকল স্বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোক বাস করিতেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু সে জন্য বাটিতে স্ত্রীলোকের অভাব হইল না। আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যথেষ্ট পরিমাণে কুটুম্বিনী আমদানী করিতে লাগিলেন। ২।৩ মাসের মধ্যেই মাসী পিসি, মামী ইত্যাদির আসন মাসশাশুড়ী, পিসশাশুড়ী ও মামীশাশুড়ী প্রভৃতির দ্বারা অধিকৃত হইয়া গেল। ফলত আমার পিতামহের মৃত্যুর পর এক বৎসর পূর্ণ না হইতে হইতেই আমদের সদর বাটী ও অন্দর মহল সম্পূর্ণ এক দল নূতন লোক দ্বারা আচ্ছন্ন হইল এবং আমি, আমার পৈত্রিক বাটীতে বাস করিয়াও এক প্রকার গৃহজামতা হইয়া পড়িলাম। যে দিকে চাহিতাম সেই দিকেই আমার শ্বশুর বাটীর লোক। ২।১ বার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কিছু বলিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমার

মনের ভাব জানিতে পারিলেই আমাকে বলিতেন "বাবাজী তুমি বালক মাত্র, ও সকল কিছু বোঝ না।" আমি বুঝি আর না বুঝি কিন্তু আমি যে বালক মাত্র এ যুক্তির প্রতিকূলে কোনও কথা বলিতে পারিতাম না।

এই ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন কথায় কথায় শুনিলাম সময়ে রাজস্ব দেওয়া হয় নাই তাই বর্দ্ধমানের রাজারা নাকি আমাদের একটী তালুক আটক করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপারটা কি?" তিনি বলিলেন "ও কিছুই নহে, জমীদারী রাখিতে হইলে ও সকল হইয়াই থাকে, আমি সব বন্দোবস্ত করিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" অগত্যা আমি নিশ্চিন্ত থাকিলাম। ক্রমে ক্রমে শুনিলাম রাজাদের সহিত নাকি মোকর্দ্দমা করিতে হইবে। পিতামহের আমলের প্রাচীন দেওয়ানজী এক দিন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—

"মহাশয় আমি আপনাদের পুরাতন ভৃত্য এখন যদিও পদচ্যুত হইয়াছি তথাপি আপনাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী; আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। মহারাজার সহিত মোকর্দ্দমা করিবেন না। মহারাজ মহাতাপ চাঁদ অতি সদাশয় এক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তার মৃত্যু হইতে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিলে তিনি দয়া করিবেন অধিকন্তু তিনি আপনার অভিভাবক স্থানীয় হইবেন। যদি অনুমতি হয় আমি আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি। স্বর্গীয় কর্ত্তার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া আমি মহারাজের নিকট পরিচিত হইয়াছি।"

দেওয়ানজীর কথায় আমার ইচ্ছা হইল যে মহারাজার নিকট এক বার যাই আবার মনে হইল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত জানা উচিত। তাঁহার অজ্ঞাতে যাওয়া কেমন করিয়া হইতে পারে? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেওয়ানজীর প্রস্তাব বলাতে তিনি একেবারে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—

"বালক বলিয়া তোমাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। যাহার সহিত মোকর্দ্দমা হইতেছে তাহার নিকট যাইব কেন? হইলইবা বর্দ্ধমানের রাজা, ইংরাজের রাজত্বে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই। তোমার দেওয়ানের কিছু একটা মতলব আছে। রাজার নিকট যাওয়া উচিৎ বিবেচনা করিলে কি আমি যাইতাম না? যে বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ সে বংশের কেহ বিপদে পড়িয়া কাহারও দ্বারস্থ হয় নাই।" সুতরাং মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। আমার শ্বশুর মহাশয়কে আমমোক্তারনামা দিয়াছিলাম তিনিই আমার হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন আমাকে কিছু দেখিতে হইত না। এক-দিন শুনিলাম বর্দ্ধমানে আমার হার হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "হউক হাইকোর্ট আছে।"

মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে আপিল হইল। মোকর্দ্দমা তদ্বির করিবার জন্য শ্বশুর মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। মাসিক ১ শত টাকা ভাড়া দিয়া একটা বাটী লওয়া হইল। বাটী সুসজ্জিত হইলে আমি সপরিবারে অর্থাৎ পত্নী ও পত্নীর মাতাকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

কলিকাতায় এই আমার প্রথম পদার্পণ। বর্দ্ধমানের কোন পল্লীগ্রাম কাঁকুড়বেড়ের যুবক জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ মুখো-পাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছেন এ সম্বাদ কি করিয়া প্রচারিত হইল বলিতে পারিনা কিন্তু আমার আগমনের তিন চারিদিন পরে দেখিলাম যে আমি কলিকাতায় নিতান্ত অপরিচিত নহি। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সংখ্যা কলিকাতায় নিতান্ত অল্প নহেন। যাঁহাদের অস্তিত্বও আমি দশদিন পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না তাঁহারা আজ আমার মোকর্দ্দমা লইয়া দিন রাত মস্তিষ্ক চালনা করিতে-ছেন। এমন কি সূর্য্যোদয়ে শশধরের ন্যায়, তাঁহাদের নিকট আমার শ্বশুর মহাশয় পর্য্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে জানিতাম চট্টো-

পাধ্যায় মহাশয় আমার একমাত্র শুভানুধ্যায়ী। এবং তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান। এখন দেখিলাম যে কলিকাতায় বুদ্ধিমান এবং অযাচিত শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা যথেষ্ট।

এইসকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনের নাম ছিল কমল লোচন চক্রবর্ত্তী। তিনি আমাপেক্ষা প্রায় ১০।১২ বৎসরের বড় ছিলেন। যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম তখন দেখিলাম যে তিনি আমার শ্বশুরকে "দাদা" সম্বোধন করিতেছেন এবং আমার আগমন মাত্র আমাকে জামাতা ধরিয়া নিতান্ত আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার বাটী হইতে মধ্যে মধ্যে আমার বাসায় তত্ত্বতালাস আসিতে লাগিল। তাঁহার সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা আমি জানিতাম না এবং বোধ হয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও জানিতেন না।

মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। যে দিন মোকর্দ্দমার দিন নির্দ্ধারিত হয় সে দিন আহারাদির পর আমি রাজপুত্রের ন্যায় পোষাক পরিয়া অনুচর পরিবৃত হইয়া হাইকোর্টে যাই আর সমস্ত দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাসায় ফিরিয়া আসি। এইভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। মোকর্দ্দমা শেষ হইলনা বটে কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরমায়ু শেষ হইল। জানিনা তাঁহার নিজের কি তাঁহার জামাতার মোকর্দ্দমা তদ্বির করিবার জন্য উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। বিসূচিকা রোগে তাঁহার ইহজীবনের লীলাখেলা শেষ হইল।

৪

সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতেই যেমন মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া থাকে সেইপ্রকার আমার এক অভিভাবকের তিরোধান হইবার পূর্ব্ব হইতেই অপর অভিভাবক সঞ্চিত হইয়াছিল। পিতামহের মৃত্যুর পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার অভিভাবক হইলেন এক্ষণে তাঁহার

মৃত্যুতে তাঁহার "ভায়া" কমল লোচন স্বেচ্ছায় আমার অভিভাবক হইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিলেন। তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি আমার আমমোক্তার হইলেন। আমাকে কোনও ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইল না। মোকর্দ্দমা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন অভিবকের বন্দোবস্তে আমাকে এক দিনের জন্যও অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করিতে হইল না। অর্থের আবশ্যক হইলেই তিনি এক খানা কাগজে আমার স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া দুই হাজার পাঁচ হাজার টাকা আনাইয়া দিতেন, আমিও জলের ন্যায় টাকা খরচ করিতে লাগিলাম। সে সময় কলিকাতায় ন্যাশানাল থিয়েটারের বড় নাম। যত দিন শ্বশুর মহাশয় জীবিতছিলেন ততদিন একদিনও থিয়েটার দেখিতে যাই নাই। কমল লোচন বাবু আমাকে মধ্যে মধ্যে থিয়েটারে লইয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে আমার পত্নীও যাইতেন। শেষে এমন নেসা হইয়া উঠিল যে নিতান্ত শরীর অসুস্থ না হইলে আর কোনও সপ্তাহে আমার থিয়েটার দেখা কামাই হইত না। ঘন ঘন রাত্রি জাগরণে যদি শরীর একটু অসুস্থ হইত তাহা হইলে কমল লোচন বাবু একটা ঔষধ আনিয়া দিতেন সে ঔষধ সেবন মাত্র বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতাম। শেষে ঔষধ না হইলে আমার দিন কাটিত না। আমি পাকা মাতাল হইয়া পড়িলাম।

একদিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া বলিলেন "বাবু এই বাড়িটা মেরামত হইবে। বাড়িওয়ালা আজ বলিয়া গিয়াছে। দিন কয়েকের জন্য অপর বাটীতে যাইতে হইবে। আমি বাটীর বন্দোবস্ত করিয়াছি।" ইহাতে আর আমার বক্তব্য কি আছে? বাড়িওয়ালা বাড়ি মেরামত করিবে তাই উঠাইয়া দিতেছে। আমি বলিলাম এ আসবাব পত্রগুলার কি হইবে?" তিনি বলিলেন "তাহার জন্য ভাবনা কি? আপাতত কতক ব্যবহারের মত আপনার নূতন বাসায় পাঠাইয়া দিব আর কতক

না হয় আমার বাটিতে আপাতত রাখিয়া দিব। আবার এ বাড়িতে আসিলেই সব লইয়া আসা হইবে। আমার বাড়িতেও স্থানাভাব তা কি করা যায় দিন কয়েকের জন্য রাখিতেই হইবে। না হয় একটু কষ্ট হইবে।"

দুই চারি দিনের জন্য আমরা নূতন বাড়িতে উঠিয়া গেলাম। বাড়িটা ছোট ত্রিশ টাকা মাত্র ভাড়া।

বৈশাখের অপরাহ্নে যখন পশ্চিম গগনে মেঘমালা সঞ্চিত হইতে থাকে তখন যেমন সকলের মনে কেমন একটা আসন্ন প্রলয়ের শঙ্কা উদিত হয় সেই প্রকার আমার মনেও কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট প্রলয়ের ভাব উদয় হইতে লাগিল। অবশেষে সেই সঞ্চিত মেঘ হইতে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

ইদানী আর মোকর্দ্দমার দিন আমি হাইকোর্টে বড় যাইতাম না। ইংরাজীতে বক্তৃতা বুঝিতে পারিতাম না; কেবল লক্কা পায়রার ন্যায় সাজিয়া গুজিয়া এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়ান ভাল লাগিত না।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় বসিয়া আছি আমার স্ত্রী মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত দুই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী এখন কাকুড়বেড়েতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা দুই স্ত্রী পুরুষে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় কে একজন নিম্ন হইতে আমাকে আহ্বান করিল। কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য পথে আসিয়া দেখিতে পাইলাম একজন বাবু একজন বাঙ্গালী ইংরাজ পুলিষ কর্ম্মচারী এবং দুইজন খোট্টা পাহারাওয়ালা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি নীচে গিয়া বাবুটীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বাবুটি বলিলেন "আপনার নাম?"

"রামতারণ মুখোপাধ্যায়।"

নাম শ্রবণ মাত্র সাহেবের দুই জন কনষ্টেবল আমার দুই হাত ধারণ

করিল। আমিত একেবারে অবাক! ব্যাপার কি? নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। বাবুটি বলিলেন "বর্দ্ধমানের রাজার সহিত মোকর্দ্দমায় যে সমস্ত দলীল আদালতে দাখিল করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৩ খানা জাল দলীল আছে। জাল প্রমাণ হওয়াতে আপনার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। আপনাকে পুলিশে যাইতে হইবে।"

আমি কিছু বলিতে যাইতে ছিলাম কিন্তু সাহেব কিছু বলিতে দিল না। বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে লইয়া চলিল। আমার স্ত্রী দ্বারের অন্তঃরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তার পর তাঁহার দশায় কি হইল আর কিছুই জানিতে পারি নাই।

তার পর আর কি বলিব? পরদিন পুলিশ আদালতে শুনিলাম মোকর্দ্দমার যে সকল দলীল দাখিল করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে তিন খানি জাল। এক খানাতে আমার পিতামহের এবং দুই খানাতে মহারাজ মহাতাপ চাঁদের নাম জাল করা হইয়াছে।

একজন উকিলের দ্বারা আমার সেই "খুড়শ্বশুর" কমললোচন চক্রবর্ত্তীর অনুসন্ধান করাইলাম কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। হাকিম এবং সরকারী উকিল আমাকে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন কি উত্তর দিব? আমি প্রকৃতই কিছু জানিতাম না, সকল প্রশ্নেই বলিলাম "আমি কিছু জানি না।" অবশেষে আমি হাইকোর্টের শেসনে সোপরর্দ্দ হইলাম এবং জেলখানায় প্রেরিত হইলাম। কেহই আমার জামিন হইল না। কে হইবে?

যথাসময়ে হাইকোর্টের বিচারে আমার দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল।

প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে, পরে হুগলী এবং অবশেষে আলিপুর জেলখানায় ছিলাম। বাহিরে আসিয়া কমল লোচন বসুর সন্ধান

লইলাম কেহ তাহার খবর বলিতে পারিল না। বাসায় (এখনও বাসা বলিতেছি!) গিয়া দেখি সেখানে এক প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথায় যাইব? কে আশ্রয় দিবে? জেলখাটা জালিয়াৎকে কে আশ্রয় দিবে? জেলে আমার দৃষ্টি শক্তি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

ভিক্ষা করিয়া যাইতে যাইতে পদব্রজে বর্দ্ধমানে গেলাম। সেখানে গিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম। ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান লইলাম সাড়ে আট লক্ষ টাকা দেনার দায়ে রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় কুসংসর্গে পড়িয়া হাণ্ড নোটের টাকা ধার করিয়াছিল। তার পর একটা জাল মোকর্দ্দমায় পড়িয়া তাহার দশ বৎসর জেল হয়। জেল খানায় তাহার মৃত্যু হয়। রাম তারণের স্ত্রীর কথা কেহ ঠিক বলিতে পারিল না। কেহ বলিল সে আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বলিল তাহাকে কুলী করিয়া আসামের চা বাগানে চালান করিয়াছে আবার কেহ বলিল—থাক সে কথায় আর কাজ নাই।

জেলে আমার মৃত্যু হইয়াছে এই জনরব শুনিয়া এত দুঃখেও আমার বড় আনন্দ হইল। তাহা হইলে আমার আর কলঙ্কের ভয় নাই। জীবনের সহিত আমার কলঙ্কেরও অবসান হইয়াছে।

একবার জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হইল। একদিন ছদ্মবেশে চুপে চুপে গিয়া দেখিলাম প্রাচীন অট্টালিকা পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর দালানের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কেবল সাদা সাদা কয়টা থামের উপর খিলান গুলা রহিয়াছে। আমার অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষ ইষ্টক লইয়া অন্যলোকে গৃহ নির্ম্মান করিতেছে। দেখিলাম আমার মৃত্যুতে অনেকের উপকার হইয়াছে।

দেশ বিদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে আবার কলিকাতায় আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণের ছেলে ভিক্ষা করিয়া খাই আর কি করিব? লেখা পড়া জানি না যাহা জানি তাহাতে কাজ চলে না, আর কাজ চলিলেই বা দিবে কে? আমাকে কে জানে? শারীরিক পরিশ্রম? দশ বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট করিয়াছি আর খাটিয়া খাইতে ইচ্ছা করে না। এখন ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই তাহাতে আমার বেশ সচ্ছন্দে চলিয়া যায়। আজ রাত্রি হইল তবে আসি মহাশয়!

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলাম।

৪। ৫ মাস পরে একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় আসিতেছি এমন সময় দেখিলাম সেই চোগা চাপকান চেন-চসমাধারী প্রৌঢ় ভদ্র লোকটি ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া আমি বলিলাম "মহাশয়ের সহিত সে দিন আলাপ করিবার সময় পাই নাই মহাশয়ের নামটি কি?"

তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে একখানি কার্ড আমার হস্তে দিয়া এক ট্রাম অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আমি একটা গ্যাসের আলোকের নিকট গিয়া দেখি কার্ডে লেখা আছে।

"Kamal Lochan Chakerburtty.
General Order Supplier & Agent."

এমন সময় দূরে একজন ভিক্ষুক সুর করিয়া বলিতেছিল :—

"বাবু অক্ষম ব্রাহ্মণকে একটা পয়সা দিন বাবু আজ সারা দিন খাওয়া হয় নি।"

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রেমের লক্ষণ।

শ্রীমতী মান কুমারী যথার্থই বলিয়াছেন বাঙ্গালীর পক্ষে "প্রেমই ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল।" গীতি কবিতা যদি ব্যক্তিগত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস লহরী হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী কবির হৃদয়ে প্রেমের আসন কিরূপ সুদৃঢ় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে কারণ বাঙ্গালী গীতিকবিতা-কার অতি অল্পই আছেন যিনি প্রেম ভিন্ন অন্য কাহারও গুণগান করিয়াছেন।

অবশ্য আমাদের সেকালে এতটা ছিল না। প্রেম ছিল না একথা বলিতে পারি না—তবে ঘরে দুয়ারে প্রেমের এতটা ছড়াছড়ি ছিল না। সুকবি রবীন্দ্র নাথ যেদিন অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে "বৈকুণ্ঠের পথ" হইতে ভগবদুদ্দেশে নিবেদিত প্রেমের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন (রবি বাবুর "বৈষ্ণব কবিতা" দেখুন) সেই দিন হইতেই প্রেম আমাদের নিতান্ত ঘরের লোক হইয়া উঠিল। তারপর তাঁর শিষ্যগণের আদরে আদরে প্রেম আজ কাল এমনি হৃদয়-দুলাল হইয়া উঠিয়াছেন—যে তাঁহাকে ঠেলিয়া অন্যান্য ভাবের হৃদয়ে প্রবেশ করা এক দুরূহ ব্যাপার। তাঁহার প্রতাপ আজ কাল অপ্রতিহত এবং রাজত্ব সর্ব্বদেশে প্রচারিত। এত দিন যুবকদের উপরই তাঁহার প্রভুত্ব ছিল, আজ কাল আবার স্কুলের ছোকরা মাণিকলালের উপরেও তিনি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন (প্রভাত বাবুর "প্রণয় পরিণাম" দেখুন)।

এ অবস্থায় প্রেমকে উপেক্ষা করিবার আর উপায় নাই। এখন যাহাতে প্রেমের সঙ্গে কোনও প্রকার বিরোধ না ঘটে এইরূপ পথে চলাই আমাদের প্রয়োজন। প্রেমের সঙ্গে বিরোধ ঘটিলে বাঙ্গালীর

হৃদয়ে কিরূপ বেদনা অনুভূত হয় তাহা স্বয়ং ভুক্তভোগী না হইলেও কতকটা অনুভব করিতে পারি বৈ কি!

উন্মুক্ত গগণতলে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সৌধশিরে কোকিল পাপিয়ার কলকাকলি-উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রিয়তমার হাত দুইটী ধরিয়া "প্রিয়ে, কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি" বলিতে গিয়া "প্রেমকম্পিত" যুবক যদি সুন্দরীর ব্রীড়ারক্তিম গণ্ডস্থলের পরিবর্ত্তে নয়নে মুখে কেবল নিদারুণ উপেক্ষা ও মর্ম্মভেদী পরিহাস অঙ্কিত দেখে তাহা হইলে তাহার হৃদয় কেমন করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়—"ধূলি কণা যথা"—তা এ প্রাচীন বয়সেও কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি বৈ কি!

কলেজের পড়া কামাই করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার করিয়া, তিন বার কালী ফেলিয়া, সাত বার কাগজ ছিঁড়িয়া, ৪ ঘণ্টা রাত্রি জাগিয়া সুদীর্ঘ প্রেম পত্রিকা রচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে প্রেমিক যুবক যদি প্রিয়তমার কাছে একটী মিষ্ট কথাও না পায় তাহা হইলে তাহার কি হয় তাহা আমাদের একেবারে কল্পনাতীত নহে।

তাই কেবল লোক হিতৈষণা নহে—কতকটা সমবেদনার বশবর্ত্তী হইয়াই আজি অবিবাহিত প্রেমিক যুবকগণের মঙ্গলার্থে আমার জ্ঞানসমুদ্রের দু একটী তরঙ্গ—তাঁহাদের উপহার দিতেছি। যদি কন্যা পছন্দ করিবার সময় এগুলির দিকে লক্ষ্য রাখেন তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের প্রেমাক্ত হৃদয় অপ্রেমিকার হাতে পড়িয়া মাঠে মারা যাইবে না। তাঁহাদের বাঙ্গালী জন্ম নিস্ফল হইবে না।

কি কি লক্ষণ দেখিয়া প্রেমিক অপ্রেমিক স্থির করা যায় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিবাহের সময় স্বর্ণ-রজতের চাকচিক্যে বা ঘটক ঠাকুরের বাক্যছটায় এগুলি বিস্মৃত হইবেন না। বিস্মৃত হইলেই জীবনটী একটী হতাশের আক্ষেপে পরিণত হইবে।

১ম লক্ষণ। নিম্নমস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগের

মধ্য হইতে ১½ ইঞ্চি আন্দাজ একটা রেখা টানিলে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় তাহার নাম সেরিবেলাম (Cerebellum)। ইহাই কন্দর্প দেবের প্রিয় বাসভূমি রতিদেবীর লীলা নিকেতন। সুতরাং এই স্থানের পূর্ণতা অপূর্ণতা, পরিপুষ্টি সংকীর্ণতা দেখিয়া প্রেমের অল্পাধিক্য বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই স্থানটী প্রেমের অস্তিত্ব নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সুন্দরীর এইস্থান প্রায়ই "মনমোহিনী কবরীতে" আবৃত থাকে, কিন্তু এই মনমোহিনী কবরীর নিম্নে মন্মথ দেবের কুসুমশয্যা সম্প্রসারিত আছে কিনা তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

২য় লক্ষণ। নেত্র। এইখানে মন্মথ দেবের অস্ত্রাগার। সুতরাং তাঁহার শক্তির অল্পাধিক্য এইস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। সুন্দরীর প্রধান সৌন্দর্য্য নয়নে। অন্ধা, অনিন্দ্য-সুন্দরী হইলেও সহজে কেহ মুগ্ধ হয় না, কিন্তু মৃগনয়নার অঙ্গ-সৌষ্ঠব তত অধিক না হইলেও, তাহার আঁখিই অনেকের "মরমে সিঁধ কাটিতে" ও "নয়নের নিদ কাড়িতে" সমর্থ হয়।

সাধারণতঃ প্রায় পাঁচ প্রকার চক্ষুই দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) কৃষ্ণ (২) পিঙ্গল (৩) কৃষ্ণ-পিঙ্গল (৪) নীল এবং (৫) কটা। আমরা বাঙ্গালী জাতি "কালো" চোখেরই বেশী পক্ষপাতী। মৃগনয়নই আমাদের সুন্দর চক্ষুর আদর্শ। কিন্তু এই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নকে বড় বেশী বিশ্বাস করিও না। এখানে মন্মথ দেবের কেবল ফুলশর থাকে না, মর্ম্মভেদী শরও দু একটা থাকে। কৃষ্ণ নয়নার হৃদয়-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়—প্রেমেও যেমন তীব্রতা থাকে আবার কোনও প্রকারে তাহার প্রেম অপমানিত বা লাঞ্ছিত হইলে অপ্রেমিকের দণ্ডবিধানের জন্য প্রতিহিংসা দাবানলও তেমনি গগনস্পর্শী হইয়া উঠিতে পারে। যদি মৃগনয়নার রূপে মুগ্ধ হইয়া থাক তাহা হইলে সর্ব্বদা সাবধানে

থাকিও তাহার হৃদয়ে যেন আঘাত না লাগে। সে অনাদৃতা হইলে "কুন্দনন্দিনীর" মত বিষ খাইয়া মরিবে না, "জরৎকারুর" মত হৃদয়ের রক্তশোষণ করিয়া অপমানের প্রতিফল দিবে।

পিঙ্গল, কৃষ্ণ-পিঙ্গল। আমাদের দেশে আমরা সাধারণত মনে করি—শতকরা প্রায় ৯৯ জনের চক্ষুই কৃষ্ণ বর্ণ। কিন্তু ইহা ভ্রম। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে শতকরা ৯৯ জনের চক্ষুই কৃষ্ণ বর্ণ নহে পিঙ্গল বা কৃষ্ণ-পিঙ্গল।

পিঙ্গল-চক্ষুশোভিনীগণ সাধারণত মৃদুস্বভাবা হইয়া থাকে। ইহাদের প্রেমেও তত তীব্রতা থাকেনা আবার কুপ্রবৃত্তিও তেমন হয় না। সাধারণত অধিকাংশ স্ত্রীলোকের চক্ষুই এইরূপ।

কৃষ্ণ-পিঙ্গল, পিঙ্গল ও কৃষ্ণের মধ্যবর্ত্তী—গুণেও মাঝামাঝি—মোটের উপর ইহারা আদর্শ স্বরূপা না হউক সাধারণ গৃহধর্ম্মের পক্ষে বেশ উপযোগিনী।

নীল। নীল চক্ষুও অতি সুন্দর। অনেক কবি বলেন নীলচক্ষুর মধ্যে আকাশ ও ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচক্ষু-ধারিণী অপেক্ষা নীল চক্ষুধারিণীর ধর্ম্মভাব প্রায়ই প্রবল হইয়া থাকে। ইহাদের প্রেম বিশুদ্ধ—রিপুস্পর্শ কলঙ্কিত নহে। ইহারা স্নেহময়ী ক্ষমাময়ী করুণাময়ী; বোধ হয় ইহারাই আদর্শরমণী হইবার যোগ্যা। সুভদ্রা শৈলজা কুন্দনন্দিনীর চক্ষু বোধ হয় এমনি ছিল।

কটা। কটা চক্ষুকে আমরা স্বভাবতই ঘৃণা করিয়া থাকি বাস্তবিক ইহারা বড় বেশী আদর পাইবার যোগ্য নহে। কটাচক্ষুধারিণীরা প্রায়ই চঞ্চল স্বভাব হয়, ইহাদের প্রেম স্থায়ী হয় না। উচ্চভাব ইহাদের হৃদয়ে প্রায়ই স্থান পায় না। রিপু সকল প্রবল হয়। ইহারা সহজেই কুপথে যাইতে পারে।

৩য় লক্ষণ—অধর। বিম্বাধর কোন্ প্রেমিক বাঙ্গালীর হৃদয় হরণ

না করে? বাস্তবিক বিম্বাধরের সৌন্দর্য্য শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্য নহে ইহা আভ্যন্তরীন গুণেরও বিবরণ স্থল; অধরের রক্তাংশের আধিক্য ও প্রসারের উপর প্রেমের আধিক্য নির্ভর করে। সরস রক্তিম, সুপুষ্ট অধর প্রেমের প্রিয় লীলাভূমি। সুদৃঢ় অধ্যবসায়, মানসিক বল, বিলাসে অনিচ্ছা তাহাকে পুরুষোচিত তেজ ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করে। এই সকল রমণী পুরুষের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না এবং নিজেরাও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়। সুতরাং প্রেমপূর্ণ হৃদয় ইহাদের চরণে উৎসর্গ করিলে প্রেমিকের দুরবস্থার সীমা থাকে না। প্রণয় কুসুম নিষ্ঠুর চরণে বিদলিত হয়।

কিন্তু রক্তিম সুপুষ্ট অধর অনেক সময়ে আবার বিশুদ্ধ প্রেমের চিহ্ন না হইয়া ইন্দ্রিয় লালসার চিহ্ন হয়। সুতরাং ইহা প্রেমের লক্ষণ কি কামের লক্ষণ তাহা অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হয়।

৪র্থ লক্ষণ—চিবুক। আমরা স্নেহ ও প্রেমের আবেগে প্রায়ই চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া থাকি। চিবুকেও প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়।

সুগঠিত দীর্ঘ ও বিস্তৃত চিবুক প্রেমাধিক্যের লক্ষণ। চিবুকের বিস্তারে প্রেমের বিস্তার ও দৈর্ঘ্যে প্রেমের শক্তি সূচিত হয়। চিবুক নানা প্রকারের হয়।

(১) গোলাকার (২) সূক্ষ্ম (৩) মধ্যে বিভক্ত ও (৪) বিস্তৃত গোলাকার। বিস্তৃত-চিবুক-ধারিণীরা অপরের ভালবাসা পাইবার জন্য বিশেষ যত্নবতী হয়। সুতরাং ইহারা স্বামীকে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা ও যত্ন করে এবং প্রিয়বাদিনী হয়।

সূক্ষ্ম-চিবুকধারিণীদের ভালবাসা অতি বিশুদ্ধ হয়। ইহাদের রিপু সকল নিস্তেজ হয় এবং জ্ঞান লালসা প্রবল থাকে।

৫ম লক্ষণ। হস্ত। হস্তের গঠন ও রেখা দেখিয়াও প্রেমের অল্পাধিক্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। হস্তের অঙ্গুলি যদি সুগোল ও সূক্ষ্মশীর্ষ হয় তাহা হইলে প্রেমের অস্তিত্ব সূচিত হয়। হস্ততলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্নদেশ হইতে তর্জ্জনীর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে রেখা থাকে, সেই রেখাকে হৃদয় রেখা কহে. এই রেখা সূক্ষ্ম অখণ্ডিত ও গোলাপী বর্ণের হইলে প্রেমের প্রাবল্য সূচিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ বেশ সুপুষ্ট ও উন্নত হয় তাহা হইলে প্রেম আরও প্রবল হয়।

প্রেমের আরও নানা প্রকার লক্ষণ আছে। কিন্তু এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া ভাল। কারণ ইহাপেক্ষা অধিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে সেই সকল লক্ষণ একাধারে প্রায় কোন কুমারীতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে না, সুতরাং পাত্রপক্ষের মনোনীত না হওয়ায় মেয়েদের বিবাহ হওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এবং এস্থলে কন্যাকর্ত্তার অভিশাপ এই হতভাগ্য লেখকের উপরেই পড়িবে সন্দেহ নাই।

ভগবতী প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, তাঁহার মাতা ভগবতী দেবীও তেমনি মহা গুণবতী মহিয়সী রমণী, জগতের মধ্যে বাস্তবিকই একটী দুর্লভ সামগ্রী। বঙ্গদেশের সৌভাগ্য বশত এই ভগবতী দেবীর জন্ম হইয়াছিল। আর তাঁহার স্বামী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বড় সাধারণ লোক ছিলেন না; তিনি

দুঃখী ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতা নগরে আগমন করেন। কলিকাতায় তিনি জগর্দ্দুর্লভ সিংহ নামক জনৈক ধনির বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সওদাগর আফিসে চাকুরীর জন্য ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুরদাস কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া এমন কি সময়ে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া ইংরাজি শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে এক সওদাগরি আফিসে প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার কয়েক বৎসর পরে পাঁচ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ঠাকুরদাসের যখন মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরী হইল, তখন তাঁহার দুঃখিনী মাতা দুর্গা দেবীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না! তখনকার আট টাকা বেতন যেন এখনকার আশি টাকার সমান বলিয়া বোধ হয়!! বিশেষ যিনি দরিদ্র সংসারের জন্য চরকায় সুতা কাটিয়া অহোরাত্র পতি পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়ের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেই গুণশালা জননী দুর্গাদেবী মনে করিলেন যে আজ হইতে তাঁহাদের সংসারের দুঃখের অবসান হইল। আর তাঁহাকে চরকায় সুতা কাটিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না; আট টাকা বেতন ভোগী পুত্র ঠাকুরদাস আজ হইতে সে ভার গ্রহণ করিলেন। আর ঠাকুরদাস জননী দুর্গাদেবী পুত্রের সেই আট টাকা বেতনের উপর নির্ভরকরিয়া সানন্দে পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরদাসের বয়স ২৩।২৪ বৎসর মাত্র।

ঠাকুরদাস চরিত্রে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সদাশয়তা সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার ভূষণস্বরূপ ছিল।—দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুরদাস এমন গুণসাগর ও সদাশয় পুরুষ না হইলে পুত্র বিদ্যাসাগর কখনই এমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও দয়ার-সাগর বলিয়া সভ্যজগতে কীর্ত্তিত হইতেন না।

এই সময় গোঘাট নিবাসী পণ্ডিত রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় বালিকা কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। ভগবতী নাম্নী এই মহীয়সী রমণী রত্নই ক্ষণজন্মা প্রথিতনামা সাহিত্য-মহারথী প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জননী। ঈশ্বর জননী ভগবতী দেবী বাল্যে পাতুল গ্রামে (তাঁহার মাতুলালয়ে) প্রতিপালিত হন; কারণ ভগবতী দেবীর পিতা রামকান্ত তর্কবাগীশ শবসাধনায় সিদ্ধ হইতে গিয়া উন্মাদগ্রস্থ হন; এই কারণে ভগবতী দেবীর মাতামহ তাঁহাদিগকে স্বীয় ভবনে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারে স্বামী ও স্ত্রী।

কেবল পুরুষ লইয়া সমাজ হয় না, রমণীকুলের সহিতও সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দুরমণী শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে দুঃখে শিরায় শিরায় জড়িত। আতিথ্য, দেবসেবা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র কথিত কর্ম্মকাণ্ডগুলির ন্যায় মহীয়সী রমণীরত্নের কীর্ত্তিকলাপও হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত।

হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে ধর্ম্মচর্য্যার জন্য ভার্য্যা, এই কারণে ভার্য্যার অপর নাম "সহধর্ম্মিণী"। সংসার রূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইলে বাস্তবিকই দেবতার প্রয়োজন। যেমন যজ্ঞ, বিধাতা তেমনই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও প্রদান করিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্র সীতারূপী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) রূপী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবা করিয়া ভীষণ বনবাস রূপ মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ ভিখারী মহাদেব অন্নপূর্ণা দেবীর সহায়ে তাঁহার চির-দারিদ্র্য-পূর্ণ সংসারেও সুখ শান্তি স্থাপন করিয়া ধনপতি কুবেরেরও পূজ্য হইতে পারিয়াছিলেন। আর বিদ্যা-

সাগর মহাশয়ের পিতা শিবতুল্য ঠাকুরদাস ও ভার্য্যা ভগবতী-রূপী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গুণে চির-দারিদ্র্য-পূর্ণ ও কষ্ট সাধ্য সংসার-ধর্ম্মরূপ মহাযজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে ভগবতী দেবীর শিক্ষা লেখা পড়া ও চরিত্রালোচনা করিয়া দেখিবার আবশ্যক করে না অথবা কোন পাশ্চাত্য বিদুষী রমণীর সহিত তুলনা করিবারও আবশ্যক করে না। কেবল দেখা উচিৎ যে প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী ভগবতী যে জ্ঞান ও যে সাংসারিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি সাংসারিক কোন কার্য্য অর্থাৎ সন্তান পালন, শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা, আতিথেয়তা, পরদুঃখকাতরতা ও ভগবানের পূজা প্রভৃতি মানবোচিত ধর্ম্মে আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন কি না। তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ভগদ্ভক্তি নিস্বার্থতা সর্ব্বভূতে সমদয়া প্রভৃতি গুণাবলী লইয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার ন্যায় রমণীরত্ন নারী-জাতিতে দুর্লভ। সহস্র সহস্র নরনারীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের জন্য যাঁহার স্নেহময় হৃদয় সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত ও তাহার প্রতিকার করিতে সদা নিয়োজিত থাকিত, যাঁহার কৃপাহস্ত সদাই প্রসারিত থাকিত সেই গুণবতী দেবীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে তিনি আত্মসুখের জন্য কখন ব্যগ্র হইতেন না।

কথিত আছে যে ভগবতী দেবী অতিশয় মানিনী ছিলেন, আর তাঁহার স্বামী ঠাকুরদাস, সদাশয় ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঠাকুরদাস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলে মানিনী গৃহিণীর সঙ্গে রঙ্গালাপে সময় ক্ষেপণ করিতেন আর মানিনী ভগবতী দেবী কর্ত্তা ঠাকুরদাসের সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেন; এবং সময়ে সময়ে ক্রোধভরে অনশনে একাকিনী শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিমানে শয়ন করিয়া থাকিতেন। ভগবতী দেবীর এই বিষম মান-ভঞ্জনের ঔষধ

স্বামী ঠাকুরদাস বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এই কারণে রঙ্গপ্রিয় সরল হৃদয় ঠাকুরদাস, গৃহিণীকে রাগাইয়া দিয়া সেই মহৌষধ অন্বেষণে বহির্গত হইতেন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া মানময়ী রাধাস্বরূপিণী ভগবতী দেবীর শয়ন কক্ষের অর্গলবদ্ধ দ্বারদেশে সেই মহৌষধ প্রয়োগ অর্থাৎ এক বৃহৎ রোহিত, মৃগেল কিম্বা কাতলা মৎস্য সজোরে সেই অর্গলবদ্ধ দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিতেন। বৃহৎ মৎস্য পতনের শব্দে মানময়ী ভগবতী দেবীর দুর্জ্জয় মান কোথায় পলায়ন করিত। দ্বার খুলিয়া ঈষৎ হাসি হাসি মুখে আঁইশ, বঁটী ও ভস্ম লইয়া সেই মৎস্য কুটীতে আসিতেন। কর্ত্তা ঠাকুরদাস মানভঞ্জনের মহৌষধ ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় সফল হইল দেখিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে আড়াল হইতে গম্ভীর ভাবে আপনা আপনি ঠিক এই কথাগুলি বলিতেন "খবরদার, মাছে হাত দিও না বলচি, ভাত খাওত মাছে হাত দিতে পাবে"।* মানিনী গৃহিণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মাছ কুটিতে অগ্রসর হইতেন; আর ঠাকুরদাসও সময় বুঝিয়া নানা প্রকার রঙ্গভঙ্গে তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেন। ভগবতী দেবী তাঁহার রঙ্গদর্শনে হাসিয়া ফেলিতেন। কর্ত্তাও মানভঞ্জনে কৃতকার্য্য হইয়া হাসিতে হাসিতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। কথিত আছে যে ভগবতী দেবী বড়মাছ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; এমন কি বাড়ীতে বড় মাছ আসিলে আপনি তাহা কুটিয়া পাঁচজনকে খাওয়াইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গল (শুভ), বারে বঙ্গসাহিত্যগুরু দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধরাধামে অবতীর্ণ হন। কথিত

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবুর মুখে এইরূপ শুনিয়াছি।

আছে যে গর্ভাবস্থায় তাঁহার জননী ভগবতী দেবী উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। উন্মাদ অবস্থায় নানাপ্রকার ঔষধ ও মেয়েলী টোটকা ব্যবহার করিয়াও তাঁহার রোগের কিছুই উপশম হয় নাই। কিন্তু যে দিন ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতে প্রসূতি ভগবতী দেবীর উন্মাদভাব ক্রমশ দূর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবপ্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দিন হইতে উন্মাদিনী ভগবতী দেবীকে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বাটীর ও প্রতিবেশী আত্মীয় সকলে চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে উদয়গঞ্জ নিবাসী জ্যোতিষী ভবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসন্ন প্রসবা উন্মাদরোগগ্রস্থা ভগবতী দেবীর কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইহার গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারই তেজঃ প্রভাবে ইনি (ভগবতী দেবী) অধীরা হইয়াছেন; ইহা উন্মাদের লক্ষণ নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে তাঁহার তীর্থ পর্য্যটনকারী ধর্ম্মপরায়ণ পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোন সময়ে কেদার পাহাড়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার বংশে এক পুরুষরত্নের জন্ম হইবে। সে স্বপ্নে তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইলে সিদ্ধপুরুষ পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিহ্বা তলে আলতায় কি লিখিয়া দিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন যে "এই শিশু উত্তরকালে মহা দিগ্বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইবে। যে জন্য এই মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য আমিই তাঁহার দীক্ষা গুরু হইলাম।*"

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের সহিত বঙ্গের পণ্ডিতরত্ন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। জগন্নাথের পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশের আর্থিক অবস্থা

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যিনি জ্ঞানবান, বিদ্বান্ পরিণতবয়স্ক উন্নতমনা ও মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত তাঁহার পত্নী চিরকালই সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা আর তাঁহার সন্তান সন্ততি মধ্যে প্রায় সকলেই সুপ্রস্ফুটিত ও সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ। তবে কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়; যেমন বিদ্যালয়ে একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইয়াও ছাত্রদিগের মধ্যে ভাল মন্দ দেখা যায় সেই রূপ একই মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পিতার নিকট প্রতিপালিত হইয়া পাঁচটা পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস জ্ঞান বিদ্যা ও মহৎ গুণে মহিমান্বিত আর তাঁহার পত্নী ভগবতী দেবীও সৌন্দর্য্য এবং নানাপ্রকার সদ্‌গুণের প্রতিমা স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রও যে একটা সুপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা তেমন হইতে পারেন নাই।

দরিদ্রসন্তান হইয়া বিদ্যাসাগর পরিশেষে যে "দয়ার সাগর" নাম লাভ করিয়াছিলেন সে কেবল দয়ার মূর্ত্তিমতী জননী ভগবতী দেবীর শিক্ষাগুণে। স্বীকার করি মানবের সদ্‌গুণাবলী স্বাভাবিক; কিন্তু শিক্ষা সাপেক্ষ, শিক্ষারূপ ইন্ধন না পাইলে জ্ঞান ও বিদ্যাগ্নি

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসের মত নিতান্ত হীন ছিল না বটে কিন্তু বড় স্বচ্ছলও ছিলনা। রুদ্রদেব শাস্ত্র ব্যবসায়ী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। যজমানদিগের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে তাঁহার বৃহৎপরিবারের ভরণ পোষণ হইত; এই কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। এই রূপ প্রবাদ আছে যে রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণ সম্পন্ন পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা জনৈক ভবিষ্যদ্বক্তার কথা। ইহা শুনিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী নামে এক ব্যক্তি সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ রুদ্রদেবকে স্বীয় 'ভগবতী' নাম্নী কন্যারত্ন প্রদান করেন। বাসুদেব সন্তান কামনায় শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া নানা দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। পরে স্বপ্নে তাঁর প্রতি এই রূপ প্রত্যাদেশ হয় যে তোমার পত্নীর গর্ভে এক নররত্নের জন্ম হইবে, তাহার নাম জগন্নাথ রাখিও। এই শিশুই পণ্ডিতাগ্রগন্য সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

প্রজ্জ্বলিত হয় না। শৈশব কালে জননী ক্রোড়েই বিদ্যাসাগরের এই মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষারূপ ইন্ধন তাঁহার জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল এবং সেই শৈশব শিক্ষা হইতেই তাঁহার হৃদয়ে দয়াবীজ অঙ্কুরিত হইয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহত্বেরও বৃদ্ধি করিয়াছিল।

হিন্দুর "আতিথেয়তা" ও "মুষ্টি ভিক্ষা" মহাপুণ্যকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে মাতৃক্রোড়ে জননী দেবীর এই দৈনিক পুণ্যকর্ম্ম দেখিতেন ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। বোধ হয় এই মুষ্টিভিক্ষা পদ্ধতি হইতেই বিদ্যাসাগর-হৃদয়ে দয়াবীজ অঙ্কুরিত ও বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। সেই কর্ম্মবীর তেজীয়ান পুরুষ বিদ্যাসাগর, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লইয়া জননী ভগবতী দেবীর সেই দুর্লভ স্নেহ মিশ্রিত দয়াকন্দর হইতে "দয়ার সাগর" দাতাকর্ণ রূপে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রকৃত দয়া স্ত্রীজাতীর বিশেষত্ব বটে; কিন্তু তাহার সহিত স্নেহের সম্মিলন না হইলে সে দয়া সকল স্থলেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ভগবতী দেবীর নির্ম্মল দয়া স্নেহের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল।

মনুষ্য জাতির মধ্যে দয়াবৃত্তি রমণীমণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রমণী জাতির দয়া পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ, তাহাতে স্বার্থরূপ মলিনতার লেশমাত্র নাই; বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর দয়া কিন্তু সাধারণ রমণী হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল। তাঁহার দয়া অলৌকিক, তাহা কোন প্রকার শাস্ত্র বা লোকাচার প্রথায় আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার অকুণ্ঠিত দয়াপ্রবণতা বীর সিংহ-গ্রাম ও তৎপার্শ্বস্থ প্রতিবেশী মণ্ডলীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত—তাঁহার সেই উন্নতহৃদয় সদাই রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শোকাতুরের শোকে নিয়তই শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ চন্দ্র কলিকাতায় যাইবার কালে বাটীর কোন অভিভাবককে সঙ্গে না লইয়া একাকী কখনই যাইতেন না। তিনি সচরাচর পিতামহ ঠাকুরদাসের সহিত যাইতেন। কখন কখন পিতামহীর সহিতও যাইতেন। একদা পিতামহী ভগবতী দেবীর সহিত তিনি কলিকাতায় আসিতেছিলেন; তৎকালে বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিবার পথ অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। পিতামহীর সহিত আসিবার কালে তাঁহারা কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিলেন যে জনৈক গৃহস্থের গৃহে হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে; ক্রন্দন শুনিয়া দয়ার মূর্ত্তিমতী ভগবতী দেবী পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, "দাঁড়াতো এ বাড়ীতে কেন কাদ্‌ছে শুনিয়া আসি" এই বলিয়া ভগবতী দেবী বালক নারায়ণ চন্দ্রকে তথায় সাবধান থাকিতে বলিয়া সেই গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বালক নারায়ণচন্দ্র একাকী কিয়ৎকাল তাঁহার অপেক্ষায় সেই পথের ধারে বসিয়া রহিলেন। পিতামহীর বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বিলম্বের কারণ কি জানিবার জন্য নারায়ণচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে পিতামহী ঠাকুরাণীও সেই অপরিচিত গৃহস্থদের ক্রন্দনে যোগ দিয়াছেন। পৌত্র নারায়ণ চন্দ্রকে যে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত কাঁদিতে বসিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।* এই প্রকার অপরিমেয় দয়া-গুণেই তিনি বীরসিংহের আপামর সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভগবতী দেবী দুঃখীকে অন্নদানে সদাই আনন্দ অনুভব করিতেন। ঠাকুরদাস হাট বাজার করিয়া আনিতেন আর গৃহের অন্নপূর্ণারূপিনী গৃহিনী ভগবতী দেবী অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে গৃহস্থ অন্যান্য আত্মীয়দুঃখীপরিজনদিগকে পরিবেশন করিয়া পরিতোষ রূপে আহার

* এই ঘটনাটি আমরা নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি।

করাইতেন। গ্রামের হাট হইতে গরিব দুঃখীরা হাট করিয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া যাইবার কালে যদি কেহ তাঁহার সম্মুখে পড়িত অমনি তাহাকে শুষ্ক মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "আহা! আজ বুঝি বাছা তোর খাওয়া হয় নাই, আয়, বাছা, আমার বাটীতে খাবি আয়"। এই বলিয়া তাহাদের ডাকিয়া লইয়া গিয়া অপার আনন্দে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পরিতোষরূপে তাহাদের আহার করাইতেন।

গ্রামের কৃষকদের অর্থের অনাটন হইলে ভগবতী দেবী তাহাদের টাকা ধার দিতেন। কেহ দেনা পরিশোধ করিতে একেবারে অক্ষম হইলে আসল টাকা পর্য্যন্ত লইতেন না। তিনি বলিতেন "উহাদের অভাব দূর করিবার জন্যইত টাকা ধার দেওয়া, অর্থের সঞ্চয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়." তাঁহার এমনি দয়ার শরীর ছিল যে অক্ষম দেনাদারগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিলে তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিতেন "অবস্থা ভাল হয়, দিবি, না হয় না দিবি, তার জন্যে আর কাঁদিস্ কেন?"*

ভগবতীদেবী এইরূপে দেশের ইতর শ্রেণীর অনেককে টাকা ধার দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ একবার করিয়া তাগাদা করিয়া বেড়াইতেন। কেহবা তখন হলুদ বাটিয়া তাঁহাকে মাখাইয়া দিত, কেহবা তাঁহার অঞ্চলে মুড়ি কিম্বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য বাঁধিয়া দিত। দয়াবতী ভগবতী দেবী তাহাদের যত্নে টাকা আদায়ের কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং যাইবার সময় বলিতেন "আজ তোরা আমার বাড়ীতে প্রসাদ পাস্।" এইরূপে প্রত্যহই টাকা আদায়ের পরিবর্ত্তে বাড়ী বাড়ী

* নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে ভগবতী দেবীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সকল টাকা আদায় না করিয়া প্রতিবেশী খাতকদিগকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করেন।

নিমন্ত্রণ করিয়া অবশেষে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইতেন। টাকার তাগাদা হইত মাত্র আদায় এক পয়সাও হইত না। তাঁহাদের বাটীর সকলের আহার শেষ হইলে যদি কোন খাতক আহার করিতে আসিত, ভগবতী দেবী তখন তাহাকে দেখিয়া জিব কাটিয়া বলিতেন "তাইত বাবা আমার মনে ছিল না। একটুখানি বস আমি আবার ভাত রাঁধিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া দয়াশীলা ভগবতী দেবী তৎক্ষণাৎ আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

কাব্যের সংজ্ঞা।

কাব্যসংজ্ঞা নিরূপণ অতিশয় দুরূহ। কতকগুলি বিষয় আছে যাহার অনুভব ও আস্বাদন হয়, কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহার সম্যক প্রকাশ বা তাহার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ দুরূহ। সৌন্দর্য্যবোধ মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু সৌন্দর্য্যের যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন কাব্য ত অনেক পড়ি, প্রকৃত কবি কে তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব? তদুত্তরে আমি বলি—কোনও কবির কাব্যের কোন অংশ পাঠ কর পাঠ করার পরেও যদি মনে হয় ইহাতে কবিত্ব আছে কিনা? তবে খুব সম্ভব তাহার মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব নাই।" পরে প্রাচীন আলঙ্কারিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা "অনিদিতগুণাপি সৎকবের্ভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।" পরে সুগৃহিনীর পরিপক্ক ব্যঞ্জন আস্বাদনের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন "শরীরে

যেমন একটা রসনা আছে যাহা বস্তুর স্বাদ চাখে, আত্মারও তেমনি যেন একটা রসনা আছে যাহা সৌন্দর্য্য চাখে!"

বলা বাহুল্য ইহা দ্বারা সংজ্ঞা নিরূপণ কিছুই হইল না। প্রথমত দেখা যাউক কাব্যের অভিপ্রায় কি। অভিপ্রায় নির্ণয় দ্বারা প্রকৃতি নিরূপণের সহায়তা হইবে। সুধীগণের মতে কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের অবতারণা দ্বারা চিত্ত বিনোদন। লোক শিক্ষা সমাজে সুনীতি স্থাপন ইত্যাদিও কাব্যের অভিপ্রেত বটে, কিন্তু গৌণভাবে। কাব্য দ্বারা মনোবৃত্তি সমূহের কোমলতা সম্পাদন হয়, রাম যুধিষ্ঠিরাদি মহৎ জীবনের মাহাত্ম্য প্রদর্শনে লোকের মন ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয়, সমাজের দুর্নীতি বিদূরিত হয় এবং মানব মনে উন্নতভাবের ও উন্নত চিন্তার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কাব্যের এই সকল প্রথমত লক্ষ্য নহে, ইহা কাব্যের আনুষঙ্গিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল। সংস্কৃত কাব্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহাররিদে শিবেতরক্ষতয়ে সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে" কাব্যদ্বারা সদ্য প্রীতি লাভ হয়, এবং "কান্তাসম্মিতয়া" এই কথার ধ্বনিতে উপদেশ বা শিক্ষা কল্পেও আদৌ কোমলতা এবং চিত্তবিনোদনের ভাব আসিতেছে, এবং সূচিত হইতেছে যে কাব্যের ফল প্রথমতঃ চিত্তবিনোদন ও আনুষঙ্গিক ফল লোকশিক্ষা। কাব্যের প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যাবতারণা দ্বারা চিত্ত বিনোদন এবং তাহার নিত্যফল লোকশিক্ষা। সুতরাং কাব্যের অভিপ্রায় নির্ণয়ে কাব্যের একটী প্রধান উপকরণ পাইলাম "সৌন্দর্য্য।"

সৌন্দর্য্য কি তাহা বিশ্লেষণ দ্বারা সম্যক নিরূপণ করা সুকঠিন অথচ ভাবুক ও রসজ্ঞ মাত্রেই সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। স্থূলত যাহা আনন্দদায়ক তাহাই সুন্দর; সৌন্দর্য্য বোধ ও সৌন্দর্য্য অনুভবে প্রীতিলাভ মানব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই

বিশ্ব সংসারে সমস্ত বস্তুই ভাবুকের চক্ষে সুন্দর। নদ নদী পর্ব্বত নির্ঝর সমুদ্র ইত্যাদি বাহ্য বস্তু এবং সৃষ্টির সার-ভূত মানবমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। প্রকৃতি বৈচিত্রময়ী প্রকৃতির নব নব ভাবে নব নব সৌন্দর্য্য। অরুণোদয়ে সীমন্তের রক্তিম শোভা দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই, নক্ষত্র খচিত আকাশতল দর্শনে প্রীতিলাভ করি এবং কৌমুদীচুম্বিত লহরীমালার শোভায় প্রফুল্ল হই। আবার কখনও বাত্যাসন্তাড়িত প্রচণ্ডতরঙ্গভঙ্গসঙ্কুল সিন্ধু গর্জ্জনে বিদ্যুৎ বিলাসিত ভীমূতমন্দ্রে প্রশান্ত সাগরের উদার গাম্ভীর্য্যে ভাবুকের মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে পরিপ্লুত হয়। বাহ্য প্রকৃতির ন্যায় অন্তর্জ্জগৎও বৈচিত্র-পূর্ণ। নৈসর্গিক লীলার অনন্ত বৈচিত্রে অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং এই অনন্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত প্রীতির আকর।

কিন্তু যদিও সৌন্দর্য্যের তর্ক শাস্ত্র সম্মত অভ্রান্ত, অসন্দিগ্ধ ও অনন্যবৃত্তি সংজ্ঞা নির্ণয় সুকঠিন, তথাপি সৌন্দর্য্যের স্বরূপ নির্ণায়ক কতকগুলি লক্ষণ নিরূপণ করা যাইতে পারে। যদিও সমাজ ও রুচিভেদে সৌন্দর্য্যবোধেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি সৌন্দর্য্যের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে যাহা সৌন্দর্য্যের নিত্যধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, উক্ত নিয়ম সকলের অন্যথায় বা ব্যভিচারে আমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানে গুরুতর আঘাত লাগে। ঐ সকল নিয়ম নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে সাধারণত দেশকালাদি অবস্থানুসারে শক্তিযোগ্যতা, উপযোগিতা এবং ফলোপধায়কতার ভাব নিহিত থাকে। মানব শরীরে যে সমস্ত অবয়ব রহিয়াছে তাহার প্রত্যেক অঙ্গের উক্তরূপ যোগ্যতাদি ভাব নিহিত রহিয়াছে। অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অঙ্গে সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়া থাকে। অবয়বী মাত্রেই

এই কথা খাটে। প্রত্যেক অবয়বের সুস্থতা ও শক্তিমত্তা অবয়বী মাত্রেরই সৌন্দর্য্যের প্রধান কারণ।

২। অবয়বীর প্রত্যেক অঙ্গ যেমন সুস্থ ও শক্তিযুক্ত হইবে, তেমন আবার তাহাতে যথাযথ পরিমাণ সংস্থান ও সুবিন্যাস থাকিবে। অবয়বসমূহ সুসংস্থিত সুপরিমিত এবং সুবিন্যস্ত না হইলে বক্রদর্পণে ফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় কুৎসিৎ মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩। অবয়বী ও সমস্ত অঙ্গের মধ্যে পরস্পর একটী সাপেক্ষ ভাব এবং সর্ব্বাঙ্গীন একটী ঐক্যের ভাব নিহিত থাকা আবশ্যক। প্রকৃতি মধ্যে সর্ব্বত্র বৈষম্য ও বৈচিত্র, অথচ তন্মধ্যে একটী সাম্য ও ঐক্যের ভাব রহিয়াছে। তদ্রূপ অবয়বীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর সাপেক্ষ ভাব এবং সর্ব্বাঙ্গীন একটী ঘনিষ্ঠ সমবায় সম্বন্ধে নিবদ্ধ থাকিবে। ফলতঃ সৌন্দর্য্যতত্ত্বও "সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও সামঞ্জস্য নীতির" অনুসরণ করিয়া থাকে।

৪। বর্ণ, সৌন্দর্য্যের এক প্রধান উপকরণ। পীত লোহিতাদি বর্ণ অবস্থা ভেদে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে এবং বৈচিত্র গুণে এবং পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে অবস্থান সম্ভূত তুলনায় (Contrast) উক্ত সৌন্দর্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে।

৫। অবস্থা ভেদে স্থিতি অপেক্ষা গতি অধিকতর শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ। অশ্বের গ্রীবা ভঙ্গ, বালকের চপলতা, বিদ্যুতের বক্রগতি, চন্দ্রালোকে লহরীলীলা অতিশয় সুন্দর।

৬। সৌন্দর্য্য মাত্রেই প্রকৃতিগত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের ভাব রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মাত্রেই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নীতির অনুসরণ করে। যুধিষ্ঠিরের নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম বুদ্ধির "ইতি গজস্থে" পরিণতি, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের গুপ্তভাবে বালী-বধ, প্রশান্ত সাগর বক্ষে কুমুদকহ্লার পরিশোভিত উপবনে অধিষ্ঠিতা ষোড়শী রূপসী

কমলে কামিনীর হস্তিগ্রাস ইত্যাদি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য জ্ঞানের বিঘ্নকর বলিয়া সৌন্দর্য্যের হানিকারক।

উক্ত নিয়মানুসারে উপলব্ধি হইবে যে যদিও মনুষ্য মাত্রেই সৌন্দর্য্যে অল্পাধিক প্রীতিলাভ করে, তথাপি উন্নত সৌন্দর্য্যবোধ ও উন্নত সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা সভ্যতার উন্নতি সাপেক্ষ। অসভ্য সমাজে অলঙ্কার প্রিয়তার আতিশয্য দ্বারা এবং শরীরের শোভা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বাঙ্গীন রংলেপন এবং মস্তকে পালক ধারণ ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের সুন্দর হইবার প্রবলবাসনা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সৌন্দর্য্য বোধ সম্বন্ধে তাহাদের অতি অপকৃষ্ট রুচি ও একান্ত বিচারবিমূঢ়তা দৃষ্ট হয়। উন্নত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও উপভোগ করিতে তাহারা তুল্যরূপে অসমর্থ। সুরুচি ও সুকল্পনা ব্যতীত উন্নত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও উপভোগ হয় না, এবং কল্পনা ও রুচিরও শিক্ষা আবশ্যক, সুতরাং কল্পনাশ্রিত সৌন্দর্য্য অসভ্য সমাজের অনুপযোগী।

যাহা হউক দেখা গেল আনন্দ ও সুখ সৌন্দর্য্যের নিত্য সহচর. সৌন্দর্য্য মাত্রেই মানব মনে সুখের উদ্রেক করে ও তাহাতে মানব মনে হর্ষ বিস্ময়াদি ভাবের উপজয় হয়। সুতরাং বলিতে হইবে সৌন্দর্য্যের ক্রিয়াস্থল মানবের মন। নৈসর্গিক শোভা দর্শনে মানবমনে হর্ষ-বিস্ময়াদি ভাবনিচয়ের উদ্রেক হয়। সৌন্দর্য্য এবং মানব মনে হর্ষাদি-ভাব পরস্পর কার্য্য সম্বন্ধে নিবদ্ধ। সুতরাং কাব্য লক্ষণে একদিকে যেমন সৌন্দর্য্য অপর ভাবে দেখিতে গেলে তেমন হর্ষাদি ভাব। এই হর্ষাদি ভাব অলঙ্কারশাস্ত্রে অবস্থা ভেদে রস ও স্থায়ী ভাব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কাব্য সংজ্ঞা নিরূপণে সৌন্দর্য্য এবং রস উভয়ই কাব্যলক্ষণান্তর্গত করিতে হইবে।

আর একটী কথা। প্রাকৃতিক লীলা জনিত সৌন্দর্য্য আমরা দুই প্রকারে অনুভব করি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। আমরা কখনও

স্বয়ং প্রাকৃতিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া হর্ষ বিস্ময়াদি অনুভব করি, কখনও বা সমবেদনা এবং সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে অন্যের অনুভূত হর্ষাদি ভাবের অনুভব করিয়া থাকি। রাধার বিরহ, রামের বনবাস কর্ণের বীরদর্প ইত্যাদির চিত্র বা আখ্যায়িকা মাত্রে উক্তরূপে আমাদের শোকাদি ভাবরাশির উদয় হয়। কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমুদ্র বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সমুদ্র প্রত্যক্ষ না করিয়াও তৎপাঠে হর্ষাদি সুখানুভব করিয়া থাকি। তদ্রূপ স্বয়ং হিমালয় না দেখিয়াও আমরা চিত্রকর অঙ্কিত হিমালয় দর্শনে সুখানুভব করি। এবং আমাদের মনে হর্ষাদি ভাবের উদ্রেক হয়। অর্থাৎ আমরা স্বয়ং প্রাকৃতিক লীলা অনুভব না করিয়াও কোন প্রখরঅনুভূতিপরায়ণ কবি বা চিত্রকরের অনুভূত সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া হর্ষাদি ভাবে আপ্লুত হই ফলতঃ উন্নততর সৌন্দর্য্য প্রায়শঃই আমরা এই শেষোক্তরূপে অনুভব করি। অনুভব প্রখরতা এবং তন্ময়তার অভাবে উন্নততর সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষভাবে কল্পনা ও তাহার রসাস্বাদ করা অতি অল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত ; কিন্তু রসজ্ঞ ভাবুকের অনুভূত সৌন্দর্য্য বাক্যে বা চিত্রে প্রকটিত হইলে তাহা অনুভব করিয়া প্রীতিলাভ করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত বটে। ইহা হইতেই কাব্য ও চিত্রাদি অনুকৃতি মূলক বিদ্যার উৎপত্তি।

সৌন্দর্য্যজনিত সুখ অতিশয় বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়স্পর্শ শূন্য এবং শারীরিকভোগ স্পৃহা কলুষাতীত। স্থায়ীত্বের এবং দুঃখের অমিশ্রতায় প্রখর ক্ষণস্থায়ী ও উত্তেজনাপূর্ণ ইন্দ্রিয়সেব্য ভোগ বিলাসাদি হইতে উৎকৃষ্ট। সৌন্দর্য্য জনিত সুখে বিরাগ বিতৃষ্ণা নাই ইহার অনুশীলনে উত্তরোত্তর সুখের বৃদ্ধি ও মনোবৃত্তি সমূহের কোমলতা সাধন হয় ইত্যাদি হেতুতে সভ্য সমাজে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে, এবং ভাবময়ী প্রকৃতির বৈচিত্র-পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ-সাধক

প্রকৃতির অনুকৃতিমূলক চিত্র স্থাপত্য কারুকার্য্য ভাস্কর্য্য এবং কাব্য, এই সকল সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

দেখা যাইতেছে সৌন্দর্য্য লক্ষ্যতায় কাব্যচিত্রাদি সূক্ষ্ম শিল্পের সমধর্ম্মী; এবং কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্প সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার অন্তর্গত। এখন দেখা যাউক কাব্যের বিশেষত্ব কোথায়, নচেৎ সংজ্ঞা নিরূপণ হইতে পারে না। কাব্যের বিশ্লেষত্ব সাধনে সৌন্দর্য্য প্রকটন দ্বারা মনোমুগ্ধ করা সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার সাধারণ ধর্ম্ম; কিন্তু ইহাতে কাব্যের সাধন ভাষা এবং চিত্রাদির সাধন বর্ণ ইত্যাদি। ভাষা মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়; মানবের ইহা একটী দুর্লভ শক্তি। এই সাধনের উৎকর্ষগুণে কাব্য সূক্ষ্ম শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্মশিল্প মাত্র বাহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্যের অনুকারী। সত্য বটে চিত্রে এবং ভাস্কর খোদিত মূর্ত্তির মুখাবয়বে অন্তর্নিহিত ভাবের সন্নিবেশ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা অন্তরের ভাব সমূহের ক্ষণিক রেখাপাত মাত্র। অন্তর্জ্জগতের রহস্য তাহাতে সম্যক প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নহে। মানুষের অনেক সময়ে মুখভাব অন্তরের পরিচায়ক নহে; এবং মনোভাবসমূহ নিদাঘচপল মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। অপিচ সূক্ষ্ম শিল্প কেবল স্থিতিশীল সৌন্দর্য্যের অনুকরণে সমর্থ। গতি ও ক্রিয়া প্রদর্শনে সমর্থ নহে।* কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ তুল্যরূপে কাব্যের আয়ত্তাধীন, স্থিতি ও গতি অন্তঃ ও বহিঃ এবং উভয়ের

* গতি ও ক্রিয়া কাব্যে কেমন উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ হইতে পারে, নিম্নশ্লোকে তাহা প্রকাশ পাইবে:—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংসিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রযাতি॥

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক।

ঘাত প্রতিঘাতে ভাব বিপর্য্যয় ইত্যাদি নৈসর্গিক লীলা মাত্রই কাব্যের আয়ত্তাধীন বলিয়া সূক্ষ্ম শিল্প অপেক্ষা কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। কাব্য সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার সারভূত।

দেখা গেল নৈসর্গিক লীলা দর্শনে সহৃদয় কবির হৃদয় আন্দোলিত হয় এবং তাহার মনে ভাবলহরী খেলিতে থাকে; তখন তিনি অনুরূপ তরঙ্গায়িত ভাষা অবলম্বনে নিজ হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া রসজ্ঞ শ্রোতার মনে হর্ষ বিস্ময়াদি ভাবরাশির উদ্রেক করেন। এই উদ্রিক্ত ভাবরাশি "রস"। এবং অবস্থা বিশেষে "স্থায়ীভাব" নাম প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য কবি স্বয়ং রসজ্ঞ না হইলে এবং তাহার প্রখর অনুভব না থাকিলে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তন্ময়তা না জন্মিলে তাঁহার ভাষা (কবিতা) প্রাণস্পর্শী হয় না, এবং তাহাতে শ্রোতার মনে রসের সঞ্চার হয় না। কবির প্রখর অনুভূতি ও তন্ময়তা জনিত বাক্যাবলি যাদুমন্ত্রের ন্যায় রসজ্ঞ শ্রোতারও তন্ময়তা জন্মাইয়া থাকে।

এখন কাব্যের আমরা দুইটী লক্ষণ পাইলাম; (১) সৌন্দর্য্য (২) সৌন্দর্য্যক্রিয়াজনিত মানবমনে সঞ্চারিত হর্ষাদি ভাব বা "রস"। কাব্যের সাধন ভাষা বা অর্থযুক্ত শব্দ। কাব্যের সাধন ভাষা বা বাক্য। কিন্তু ভাষা বা বাক্য কি? বাক্য অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি মাত্র। শব্দ অর্থযুক্ত বা অভিপ্রায় ব্যঞ্জক কিরূপে হয়? শব্দ বোধ কিসে জন্মে? "জল" এই শব্দোচ্চারণে দ্রব দ্রব্য বিশেষ বুঝায় কেন? পদ ও শব্দ মধ্যে বাচ্য বাচকত্ব সম্বন্ধ কিরূপে হয়? পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে ও অপরাপর কয়েকটী কথার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ক্রমশ।

কবিতা-গুচ্ছ।

অন্তিম প্রেম।

ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী,
লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছ্বসি' উল্লসি'
আমারে কি পেতে চাস্ চির আলিঙ্গনে ?
শুধু এক মুহূর্ত্তের উন্মত্ত মিলনে
তোর বক্ষোমাঝে চাস্ করিতে বিলয়
আমার বক্ষের যত সুখ দুঃখভয় ?
আমিও ত কতদিন ভাবিয়াছি মনে
বসি তোর তটোপান্তে প্রশান্ত নির্জ্জনে,—
বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মুখরা
শাণিত অসির মত ভীষণ প্রখরা,
অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,—
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্দ্ধ রজনীর
বাসর ঘরের মত নিসুপ্ত নির্জ্জন ;—
সেথা কার তরে পাতা সুচির শয়ন ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনভিজ্ঞ।

শুধু একখানি মুখ অদৃশ্য থাকিলে
কে জানিত এ সুন্দর উজল নিখিলে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা অন্ধকার হবে :—
একটি কণ্ঠের স্বর থাকিলে নীরবে

প্রতি দিবসের কথা, কৌতুকের হাসি
শঙ্খের মঙ্গল রোষ, উৎসবের বাঁশী,
চির জীবনের যত আনন্দের ধ্বনি,
কে জানিত, চিরতরে থামিবে আপনি !

নিরুপম।

তোমার মুখের মত অমন সুন্দর,
তব প্রিয় কণ্ঠসম, হেন সুধাস্বর,
এ চোখে দেখিনি কভু, শুনিনি শ্রবণে,
তোমা ছাড়া আর তাহা পাব না জীবনে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রাতঃ প্রবুদ্ধা।

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল !
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল।
কুন্তলে তোর বিকলকুসুম,
পাখামেলি' যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে কোন্ অজানা গগন তল !
বল সখি তোর স্বপনের কথা বল !

কখন তোমার হৃদয়ে তুলিলে বাস,
অরুণ অধরে হাসিয়া মধুর হাস'—

স্খলিত আঁচল তুলি' দিলে রাখি'
উরঃকলি পরে, সযতনে ঢাকি'
বিগত নিশার কি গোপন অভিলাষ ?
—আপনার রসে হাসিয়া মধুর হাস' !

ফুলসম তোর কপোল ফুটেছে দুটি,
নয়ন ভৃঙ্গ তদুপর পড়ে লুটি'।
আভাময় অতি ললাট কিশোর,
সারা মুখখানি আলোকরি' তোর
ঈষৎ হাসির কিরণ পড়েছে টুটি'
ফুলসম দুটি কপোল উঠেছে ফুটি !

বল সখি, তোর স্বপনের কথা বল
দেখেছিস তুই নিশার গভীর তল ?
রতন আলয়ে ত্রিদশ কিশোর
হাত ধরাধরি চলেছে কি তোর !
চুমি' নেছে হরি' বরষের আঁখিজল ?
বল বল তোর স্বপনের কথা বল !

পরিত্যক্তের প্রতিজ্ঞা।

প্রিয়ে — এত অভিমান কিসের লাগিয়া
এদাসের পরে তব
আমি — যত প্রেম মোর সঞ্চিত ছিল
দিয়াছি চরণে সব !

হেথা — সকলে আমায় ত্যেজিয়াছে দেবি,
তোমারে কেমনে ছাড়িব ?
আমি — উদাস আকাশে চাহিয়া তাহ'লে
কার মুখখানি আঁকিব !
এযে — বারিহীণ মহা প্রান্তর, হেথা
তুমি মোর চির সম্বল
আমি — তিলেকের তরে তোমারে হারালে
তাই হই এত বিহ্বল।
দুঃখে — অন্তর মোর আকুল হয়েছে
তৃষায় শুষ্ক তালু
মোর — চারিপাশে যেগো নাহি বারিকণা
শুধু "ধূ ধূ" মরু বালু।
হেথা — তোমারে বুকেতে রেখেছি ঢাকিয়া
নির্ম্মল বারিবিন্দু,
তুমি — ক্ষুদ্র আমার অন্তর তলে
উদার মহান্ সিন্ধু !
তুমি — আমার হৃদয় আসনে বসিয়া
আমারে বেসেছ ভাল
তুমি — আঁধার আমার হৃদয়ের মাঝে
জ্বেলেছ অনল আলো !
তুমি — নিরাশাকাতর ব্যথিত পরাণে
আনিয়া দিয়েছ সান্ত্বনা,
তুমি — আমারে ভাসায়ে সন্তোষনীরে
ভুলায়ে সকল যন্ত্রণা।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

নিমীলিতা নয়না।

কেন, কেন, নিমীলিত নয়ন পল্লব
অসহ্য কি শুভ বর্ত্তমান ?
নয়নে নয়নে এই হৃদি অনুভব
প্রাণে প্রাণে আকুল আহ্বান।

একি লাজ ? কই কোথা আরক্ত কপোল
কই কোথা সকাতর হাস ?
সুধার সাগরে সেই', সুধার হিল্লোল,
মিলনের জড়তা বিনাশ।

এযেরে অন্তর দৃষ্টি, সংঘর্ষ বিষম
বর্ত্তমানে ভবিষ্য সন্ধান,
মুছি রবি শশী তারা, সুখ দুখ ভ্রম
মুহূর্ত্তের প্রাধান্য প্রদান।

কি দেখিলে, কি বুঝিলে, বল বল প্রিয়ে,
প্রণয়ের কোন্ পথ শ্রেয় ?
জীবন যৌবন ওই তুলা দণ্ডে দিয়ে
এ প্রতীক্ষা অতি ঘৃণ্য হেয় !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

আকাশের মত।

আকাশের মত যদি হইতে উদার
রমণি ! অমনি স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া ধরি'
বহিতে নরের পরে ; ঢালি জ্যোৎস্না-ধার
পৃথিবীর অন্ধকার দিতে অপসরি !
বিদ্যুতে কটাক্ষ হানি', ঢালি বারিধার
শ্মশানের চিতা ভস্ম দিতে ধৌত করি' ;
অমনি অসীম স্নেহে ব্যাপি দুই ধার
স্বর্গ মর্ত্ত্য-ব্যবধান রহিতে আবরি !

দেখিতাম রৌদ্ররূপ মধ্যাহ্নে তোমার,
সায়াহ্নে কোমল কান্ত—তব মুখচ্ছবি !
এ বিশ্ব রহিত চাহি মুগ্ধ অনিবার
তব পানে ; সীমা তব পাইত না কবি !
যখন যেখানে থাকি, রহিতে গো ঘিরে,
অমনি উদার প্রেমে জন্ম-মৃত্যু-তীরে !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

আসলে জীবিত।

(Victor Hugo হইতে)

এই এরা রহে হেথা—ওরা চলি যায় ;
কি মানব কিবা ধূলি উড়ায় ঝঞ্ঝায়।
এই ভবসংসারের অন্ধকার বেয়ে
একই প্রলয়ের বায়ু চলিয়াছে ধেয়ে

মানুষের মাথার উপরে ধায় চলি,
ধায় তাহা বনের পল্লব দল দলি।

যেই যায় তারে ডাকি' বলে যেই থাকে :—
"হতভাগা! পড়েছিস্ কি ঘোর বিপাকে!
আহা! তোরা কোন কথা পাবি না শুনিতে
আকাশ তরুর শোভা পারি না দেখিতে,
ঘুমাইবি একলাটি শ্মশান মাঝারে,
ঘিরিবে চৌদিকে আসি' নিশীথ আঁধারে॥"

যেই থাকে, তারে ডাকি' বলে যেই যায়ঃ—
"তোদের কিছুই নাই—অশ্রু সাক্ষী তায়।
সুখ যশ সেতো মিছে ছলনা কেবল,
মৃতেরাই পায় রাজ্য সম্পদ আসল;
জীবন্ত! তোরা তো সবে উপছায়া—মৃত,
আমারাই জানিবিরে আসলে জীবিত॥"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সম্বন্ধে সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১ম বর্ষের "বঙ্গদর্শনে" যে মন্তব্য প্রকাশিত করেন, আমরা আমাদের গ্রন্থ সমালোচনার ভূমিকা স্বরূপ তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত

প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রমসংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এইসকল কারণে আমরা যেসকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশে আমাদিগকে গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐসকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদের কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ. সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।"

"সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" এই পদ সম্বন্ধে একটা কথা উঠিতে পারে,—সে কথাটা এই যে সম্যক আলোচনার নামইত সমালোচনা—তবে তার আগে সংক্ষিপ্ত কথাটা বসে কি করিয়া? সংক্ষিপ্ত হইলে আর "সমালোচনা" কথাটার সার্থকতা থাকে কই? এ কথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে মহাজনেরা যে কথা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন,

এবং বাংলায় যাহা এপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, আমরাও সে ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কারণ দেখি না।

আর ভূমিকার প্রয়োজন নাই তখন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। বর্ণজ্ঞানই সকলের আগে, আমরাও বর্ণজ্ঞানের সম্মান যথার্থ আশু সরল বর্ণজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করিলাম।

সরল বর্ণজ্ঞান—ডাক্তার শ্রীব্রজনাথ সাহা প্রণীত। মূল্য ১০ আনা। Kindergarten শব্দের অর্থ "শিশুদিগের উদ্যান"—জার্ম্মানীতে শিশুদিগকে সহজে অক্ষর পরিচয় এবং নিম্ন শিক্ষাদিবার জন্য এই নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার পর ইংরাজীতে এই অভিনব বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর বহুল প্রচলন হয়। আজ কাল যে নূতন প্রকার শিক্ষা দিবার ধুয়া উঠিয়াছে এবং বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার মূলে এই "কিণ্ডার গার্টেন।" ডাক্তার ব্রজনাথ বাবু শুধু অক্ষর পরিচয়ের জন্য এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাংলা অক্ষরে কতকগুলির মধ্যে একটা আকার গত সাদৃশ্য লইয়া তিনি শ্রেণী বিভাগ করিয়া একশ্রেণীর অন্তর্গত অক্ষরের এক একটা মনোগ্রাম করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে সেই শ্রেণীর সমস্ত অক্ষর শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হাতে কলমে এই প্রণালী কতদূর সাফল্য লাভ করিবে তাহা যাঁহারা শিখাইবেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে আমাদের মনে হয় এটা বেশ বিজ্ঞান সম্মত উপায়। জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে যাঁহারা Kindergarten প্রণালীতে পড়ান তাঁহারা এ বিষয়ে শিক্ষিত আর আমাদের দেশে ছেলেদের শিক্ষার ভার অনেক স্থলেই, হয় কতকগুলা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য গুরু মহাশয়ের উপর না হয় বাংলার নভেল পাঠনিরতা গৃহলক্ষ্মীদিগের হাতে। কাজেই ব্রজনাথ বাবুর প্রণালী তাঁহাদের হাতে পড়িয়া কি অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে তাহা ভাবিবার কথা। যদি তাঁহারা নিজে বুঝিয়া

পড়ান তাহা হইলে প্রথম দৃষ্টিতে এ পুস্তক যত কঠিন মনে হয় সেরূপ হইবার আশঙ্কা নাই। ছেলেদের কিন্তু এ রকমে পড়াইতে পারিলে আমোদ ও শিক্ষা দুইই লাভ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীর মূল উদ্দেশ্যও তাই।

বঙ্গ মঙ্গল (মূল্য ১০) লেখকের নাম নাই। নাই থাকিল—নামে কি আসে যায়? পুস্তক লিখিয়া—তাতে আবার কবিতা পুস্তক লিখিয়া যে, বঙ্গদেশের কোন মঙ্গল হইবার আশা নাই তাহা লেখকও জানেন আমরাও জানি—তথাপি কবি বলিতেছেন "চাহি কবি, কর্ম্মবীর, অবতার চাই—"। এই "Sentimental nonesne" প্লাবিত দেশে যদি কতকগুলা বিরহের হা হুতাশ ও অশ্রুজলের কবিতা না লিখিয়া "বঙ্গ বঙ্গলের" কবির ন্যায় দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি, কামনায় কবিতা লেখা হয় তাহা হইলে উপকার হউক বা না হউক অন্তত অপকারটা কম হয়। "বঙ্গ মঙ্গল" দোষশূন্য উচ্চঅঙ্গের কাব্য একথা আমরা বলি না। কবিতা হিসাবে যাহাই হউক উদ্দেশ্য যে মহৎ তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। কবিবর রবীন্দ্র নাথের পদাঙ্ক অনুসরণে বঙ্গমঙ্গলের কবি দেশের জন্য স্বদেশীয়দিগকে যে আহ্বান করিয়াছেন তাহা প্রসংশনীয়। তবে তিনি এই পুস্তিকার শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবন মনমোহিনী"র অনুকরণে বঙ্গমাতার যে স্তবগান রচনা করিয়াছেন—তাহার তেমন প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তাহাতে শব্দ চয়নের চেষ্টা, ললিত ছন্দের ঝঙ্কারের অকারণ বাহুল্য আছে—কিন্তু যে সজীবত্ব যে আগ্রহ যে তন্ময়তা কবিতার প্রাণ তাহার কিঞ্চিৎ অভাব। লেখা দেখিয়া বোধ হইল ইহাই কবির প্রথমোদ্যম—তাই আশা হয়, যদি তিনি স্বাধীন ভাবে বাগ্দেবীর সাধনা করেন তাহা হইলে এই স্বদেশ প্রেমিক কবি কালে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। আমরা এই পুস্তিকা হইতে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"তিনি তো তাঁহার পূর্ণ সুধার ভাণ্ডার
অবারিত করেছেন আমাদের তরে।
কতবার ডাকিছেন কত স্নেহ ভরে!
হায়রে, অবোধমোরা সদা অসন্তোষে
ভাবি তাঁরে নিষ্করুণা। আপনার দোষে,
সহিতেছি অহরহঃ দৈন্য দুঃখ জ্বালা।
কর্ম্মহীন, শ্রমহীন বসিয়া নিরালা
আকাশ কুসুমে গাঁথি মালা। জানি না সে,
সঞ্জীবনী-সুধাপানে অজেয় উচ্ছ্বাসে
মানবত্ব পূর্ণ করে মানব কেমনে
বিকাশে ঐশিক শক্তি আত্ম উন্মেষনে"

মঞ্জীর—শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১।০। সমালোচ্য পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার। ইহার অধিক কি বলিব? বলিলেও তেমন প্রীতিপ্রদ হইবে না। বহিরাকার দেখিয়া সুখ্যাতি করার নাম যদি সমালোচনা হইত তবে আমরা এই খানেই এই সমালোচনার উপসংহার করিতাম। এবং সমালোচক ও লেখক মধ্যে বেশ সদ্ভাব থাকিত। কিন্তু হায়! বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। কোন কবিতা পুস্তকের সমালোচনা করিতে গেলে অনেক কথা প্রথমে ঠিক করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হইতে হয়। কবিতা কাহাকে বলে—কবিতার প্রাণ কি—কবিতার উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি। "শুধু কথার গাঁথুনী আর কাহুনীর পালা", ছন্দবৈচিত্র্য ও ঝঙ্কারমাধুর্য্য, যদি কবিতা হইত তাহা হইলে আমাদের দেশের আজকাল কবির ও কবিতার অভাব ত নাই-ই বরঞ্চ আর কোন দেশে কোন এক সময়ে এত কবির ও কবিতার এক সঙ্গে আবির্ভাব কখন যে হইয়াছিল, ইতিহাস তাহা লেখে না। যাহাকিছু সংসারের মনুষ্য অভিজ্ঞতার বাহিরে, যাহা শুধু উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদ কল্পনা-প্রসূত, তাহাই যদি কবিতা

হইত তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বিশেষ আশাপ্রদ মনে করিতাম।

এত কথা লেখার পর পুস্তকখানি কেমন হইয়াছে যদি বলিয়া দিতে হয় তবে বৃথা এ সমালোচনা লিখিলাম।

ঝান্সির রাজকুমার—শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দিউস্কর প্রণীত মূল্য ।৵০। ঝান্সির রাজকুমার শ্রীল দামোদর রাওয়ের বিচিত্র দুঃখ কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেউস্কর মহাশয় প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিরপক্ষপাতিতা ও নির্ভীকতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল প্রশংসনীয় এমন নহে, ঐতিহাসিকের অনুকরণীয়। এই পুস্তকে, ঝান্সির রাজকুমারের মাতা রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কথা, কথা প্রসঙ্গে উঠিয়াছে, সেই সূত্রে অশ্বারূঢ়া রাণীজির রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিও গ্রন্থকার ইহাতে দিয়াছেন। সেই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সেই স্বদেশের হিতে উৎসর্গীকৃতা রমণীর চিত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনেক কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে,——কিন্তু সেসব কথা এখন থাক্। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে রাণীজির সম্পূর্ণ জীবনচরিত জানিতে বড় কৌতূহল হয়, সখারাম বাবু সাধারণের সেই কৌতূহল পূর্ণ করিবেন কি? তাঁহার মত ধীর স্থির নির্ভীক্ ঐতিহাসিকের নিকট বঙ্গসাহিত্য অনেক আশা করে। যাহাহোক সমালোচ্য গ্রন্থখানির বর্ণিত ঝান্সির বীর রমণী লক্ষ্মীবাই—যিনি অবলা হইয়াও, স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থে মহাবল পরাক্রান্ত ইংরাজের সহিত স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্মীবাইয়ের পুণ্য চরিত গ্রন্থের ও তাঁহার দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী যে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আদৃত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাজীরাও—সখারামবাবুর আর এক খানি স্বাধীন গবেষণা পূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ; মূল্য বার আনা। বাজীরাও সম্বন্ধে সাধারণের

যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, এ গ্রন্থ পাঠে তাহা বিদূরীত হইবে। বাজী-রাওয়ের ন্যায় কর্ম্মবহুল মহৎব্যক্তির জীবনী পাঠে আমরা অনেক শিখিতে পারি। এই প্রকার জীবন চরিত যত রচিত হয় তাহাই মঙ্গল! মহারাষ্ট্রবাসী হইয়াও সখারাম বাবু যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে এতটা পরিশ্রম করিতেছেন—এই প্রকার দেশীয় মহার্ঘ মণি মুক্তা দিয়া যে বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডার উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতেছেন এজন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু কেবল মুখের কৃত-জ্ঞতায় সখারাম বাবুকে আপ্যায়িত করিয়াই কি আমরা ক্ষান্ত থাকিব?

সখারামবাবুর সমালোচ্য দুই খানি গ্রন্থ হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব, প্রথমে আমাদের এ বাসনা ছিল, কিন্তু উদ্ধৃত করিতে গিয়া দেখি সে সাধ মিটে না, কারণ অধিকাংশ স্থলই যে তুলিতে হয়। তাই কতক সৌজন্যের খাতিরে, কতকটা আইনের ভয়ে, কতক বা স্থান সংক্ষেপের ওজরে আমরা সে চেষ্টা হইতে বিরত হই-লাম,—রসগ্রাহী পাঠক মূল গ্রন্থ হইতে রস গ্রহণ করিবেন। আমরা যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়াছি যে, মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের একখানি সুন্দর মানচিত্রও গ্রন্থকার এ গ্রন্থে দিয়াছেন।

পীঠি দর্‌পীঠী। নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস। দেবনাগরী অক্ষরে মূল ও বঙ্গানুবাদ। পুঁথির আবিষ্কারক ও তাহার বঙ্গানুবাদক শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। ভূমিকা—শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর। মূল্য ৸৹ বার আনা।

ভূমিকা পড়িয়া অবগত হওয়া যায় যে, রাজপুতনায় মাধোপুর নামে একটা নগর আছে। তত্রত্য জনৈক বৃদ্ধ হিন্দুর নিকট হস্ত-লিখিত কতকগুলি জীর্ণ পুঁথি ছিল। নগেন্দ্র নাথ বাবু সেই গুলির মধ্যে এই ইতিহাস খানি পাইয়াছিলেন। পুঁথিখানি জয়পুরী হিন্দি ভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ছিল। আবিষ্কারক নগেন্দ্রনাথ

বাবু মূল পুঁথি এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য ঋতেন্দ্রনাথ বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 'পুণ্য' নামক মাসিক পত্রে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিতও হইয়াছিল। এক্ষণে মূল, বঙ্গানুবাদ এবং ঋতেন্দ্র বাবুর লিখিত ভূমিকা একত্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবিষ্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি খানি জীর্ণ হইলেও ইতিহাস খানিকে খুব পুরাতন বলা যায় না, কেননা মোগল বাদসাহ শাহ আলমের কথাও ইহাতে আছে। ঋতেন্দ্র বাবুও ভূমিকাতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে,—"এইটুকু বুঝা-যায় যে কোন প্রাচীন হিন্দু ইতিহাস অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে।" ঋতেন্দ্র বাবু যে কিসে ইহা বুঝিলেন, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই, কোন প্রমাণ প্রয়োগও করেন নাই। পুস্তক পড়িয়া আমরাও এমন কিছু দেখিতে পাই নাই, যাহাতে ঋতেন্দ্র বাবুর কথায় সায় দিতে পারি। তবে, এই ইতিহাস পাঠে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখানি ইংরাজের লিখিত ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত নহে। ইহা হিন্দুর স্বাধীন রচনা।

বঙ্গানুবাদে এই ইতিহাস খানি মোট চব্বিশ পৃষ্ঠা। এই কয় পাতাতেই পাণ্ডবদিগের সময় হইতে শাহ আলম বাদসাহ পর্য্যন্ত অনেক সম্রাটের কথার উল্লেখ আছে। ইহাকে কি ইতিহাস বলা যায়? ইহা পড়িয়া কি কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে?

আর একটা কথা। এই চব্বিশ পাতার ইতিহাসের সূচিপত্র ও ভূমিকা মোট তেইশ পাতা। ঋতেন্দ্র বাবু বোধ হয় স্বজাতি-প্রীতি ও বন্ধু প্রীতি নিবন্ধনই এই বাড়াবাড়িটা করিয়াছেন। কিন্তু যদি এই ইতিহাস ও এই ভূমিকা সম্বন্ধে কাহারও মনে 'বার হাত কাঁকুড়ের' কথাটা উদয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বদেশ-দ্রোহী কোন মতেই বলা চলে না। বাদশাহ দিগের যে ছবিগুলি এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য ঋতেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্য-রথী স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার বঙ্গদর্শনে জ্ঞানাঙ্কুরের সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেই হইতে মাসিক পত্রে মাসিক পত্রের সমালোচনা আরম্ভ হয়। তারপর "সাধনা" সাময়িক সাহিত্যের বিস্তারিত সমালোচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ক্রমে অনেক মাসিক পত্রেই মাসিক পত্রের সমালোচনা চলিতেছে। আমরাও এখন হইতে সে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এবার স্থানাভাব সে জন্য দুই একখানি মাসিকের উল্লেখ মাত্র করিলাম।

ভারতী—১৩০৯, বৈশাখ। ভারতী-সম্পাদিকা ভারতীর উন্নতিকল্পে যে নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। এ উদ্যম, এ যত্ন অবশ্য প্রশংসনীয়। ভারতীতে এবার আলোচনার যোগ্য একাধিক রচনা আছে, তাহার আলোচনা আগামী বারে করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতী হাতে করিয়াই দেখি, ষড়বিংশতি (?) বর্ষ! প্রথমে ত মনে করিয়াছিলাম, বুঝিবা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত অনুযায়ী করিবার এই এক নূতন চেষ্টা! কিন্তু যখন দেখিলাম, কিছুতেই ভারতীর এ "তি"র ব্যবহার শুদ্ধ হয় না, তখন বুঝিলাম, ইহা নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষ!

সাহিত্য—১৩০৮, পৌষ। সাহিত্যে সাহিত্য প্রকাশে এতটা অনিয়ম দেখিয়া আমরা দুঃখিত। সাময়িক পত্রিকাকে এতটা অসাময়িক করিলে অত্যাচার করা হয়। আশা করি, সম্পাদকমহাশয় ভবিষ্যতে এ শৈথল্যের এতটা প্রশ্রয় দিবেন না।

মুকুল—১৩০৮, ফাল্গুন। বালক বালিকাদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র। মুকুলখানি বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। এ পত্রিকা পাঠে আমোদ ও শিক্ষা দুইই হয়। আমরা ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

সমালোচনী।

মাসিক পত্র।

(জ্যৈষ্ঠ)

৫ম সংখ্যা।

১৩০৯।

কলিকাতা
৯৮ হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সৌন্দর্য্যরহস্য ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি,এ,	১৭৯
গোয়েন্দা-কাহিনী ...	স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সরকার ...	১৮৪
বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ...	শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭
রণরঙ্গিণী	শ্রীঅপ্রকট-চন্দ্র-ভাস্কর ...	২০৫
ভগবতী-প্রসঙ্গ	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু ...	২১৫

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা ১৲, উত্তরচরিত ১।০, রত্নাবলী ৸০, মালতী-মাধব ১।৵০, মুদ্রারাক্ষস ১।০, মৃচ্ছকটিক ১৷৷০, মালবিকাগ্নিমিত্র ৸০, বিক্রমোর্ব্বশী ৸০, মহাবীরচরিত ৸০, চণ্ডকৌশিক ৸০, বেণীসংহার ১।৵। উক্ত গ্রন্থকারের মনোহর প্রহসন হঠাৎ নবাব ।৵০।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন কাব্য—নৈবেদ্য ১৲, রবিবাবুর—নূতন ও পুরাতন ছোট ছোট গল্প একত্রে সংগ্রহ "গল্পগুচ্ছ" দুই খণ্ড উত্তম বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা ৪৷৷০, "কাব্যগ্রন্থাবলী" কুড়িখানি কবিতাপুস্তক ৬৲ স্থলে পাঁচ টাকা, গল্পগুচ্ছ ও কাব্যগ্রন্থাবলী একত্রে লইলে আট টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"ফুলজানি"—(২য় সংস্করণ) উপন্যাস। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য বাঁধা ১।০, কাগজে ১৲।

শ্রীশবাবুর অন্যান্য উপন্যাস—শক্তিকানন ১৲। বিশ্বনাথ ১৲, কৃতজ্ঞতা ৸০, রবীন্দ্র বাবুর—নূতন ধরণের কাব্য—কথা ১৲, কাহিনী ১৲, কল্পনা ১৲, ক্ষণিকা ১।০, কণিকা ৷৷০।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী (ঈশান বাবুর) দুইখানি বিভিন্ন বয়সের ছবি সমেত, মূল্য ৷৷০। কণ্ঠমালা—উপন্যাস সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন সংস্করণ মূল্য ১।০।

প্রাপ্তির স্থান—

মজুমদার লাইব্রেরি।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

মেধাকর রসায়ন।

মেধাকর রসায়ন, মেধা ও স্মৃতিবর্দ্ধক, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাসম্পাদকস, বল ও পুষ্টিকারক, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা-নিবারক, সকল প্রকার মানসিক দোষের (অপস্মার, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির) নিবারক এবং সুনিদ্রাপ্রদায়ক, আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষিত মহৌষধ। প্রনষ্ট ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি করিতে, ইহার মত প্রত্যক্ষফলদায়ক ঔষধ আর নাই; সুতরাং ইহা বিদ্যার্থীর প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। মেধাকর রসায়নের, মূল্য সাতদিনে দেড়, পনরদিনে আড়াই এবং এক মাসে সাড়ে চারি টাকা।

সুকল্যাণ তৈল।

সুকল্যাণ তৈল, ঊর্দ্ধজত্রুগত বাত ও পিত্তজাত শিরোরোগ নিবারক। ইহাতে উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি রোগের উপশম হয়, মনের অস্থিরতা দূর হয়, মাথাঘোরা বা কামড়ান নিবারিত হয়, এবং সত্বর সুনিদ্রার সঞ্চার হয়। ইহা অতিশয় স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট। মূল্য বড় শিশি দুই এবং ছোট শিশি দেড় টাকা।

অম্লশূলান্তক ১৫ দিনে ১৲। ক্ষুধাসাগর ১৫ দিনে ১৲।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত,—"আমার ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান্ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থের ঔষধ আমার বহুপরীক্ষিত। ইহার ঔষধে রোগীর প্রকৃত উপকার হইবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস। অম্লশূলান্তকে অম্ল ও শূলরোগের তীব্রবেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক; ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উহা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ।

১৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ বিডন্ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অমৃতবল্লী কষায়।—আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, উপদংশ দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয়, দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া, শরীর পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারক। ইহা সকল সময় সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ আনা।

কুটজারিষ্ট।—(রক্তাতিসার, আমরক্ত ও গ্রহণীর মহৌষধ।)
ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তাতিসার, আমরক্ত, গ্রহণী, শোথ ও তৎসঙ্গে অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত জ্বর সত্বর উপশমিত হয়।

২ সপ্তাহের ব্যবহারোপযুক্ত ১ শিশি ঔষধ ও দুই প্রকার বটিকার মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ দশ আনা।

অগ্নিদীপক।—ইহা সেবনে প্রবল অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বার অজীর্ণ ও তজ্জন্য তরল মলনির্গম, দম্‌কা ভেদ, উদরাধ্মান, অম্লোদ্গার প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব আশু নিবারিত হইয়া, অগ্নির উদ্দীপ্তি, আহারে রুচি, সম্যক পরিপাক, কোষ্ঠশুদ্ধি, শরীর হাল্কাবোধ, মনের প্রফুল্লতা প্রভৃতি সুন্দররূপে উৎপন্ন হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৷৵০।

অশোকারিষ্ট।—ইহা সেবনে বাধক, রজঃ অনির্গম, অতিরিক্ত রজঃনির্গম, প্রদর, শ্বেতপ্রদর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, আর্ত্তবের বিবর্ণতা, উদরের বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া জরায়ু পরিশোধিত হইয়া থাকে, এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক শিশি অশোকারিষ্ট ও এক কৌটা (১৬টী) বটিকার মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ দশ আনা। ভিঃ পিতে লইলে ২৷৷০ সোয়া দুই টাকা মাত্র।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৯। | ৫ম সংখ্যা।

সৌন্দর্য্যরহস্য।

"প্রেমের লক্ষণের" পর সৌন্দর্য্যরহস্য না লিখিলে, ভাবিয়া দেখিলাম, কাজটা কিছু পক্ষপাতদূষিত হইয়া পড়ে;—তাহা হইলে লেখকের কন্যাপক্ষ অপেক্ষা বরপক্ষের উপরেই যেন টানটা কিছু বেশীমাত্রায় প্রকাশ পায়। কিন্তু এটা আমার মোটেই অভিপ্রেত নহে। আজকালকার অতি বিপন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা এবং কিশোর হইতে পিতামাতার মনোভাব বুঝিয়া শিশিরপরিম্লানশ্রী ইন্দীবরের ন্যায় বিরসবদনা কন্যকামূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় স্বভাবতই কন্যার দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য মনে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মে।

স্ত্রীলোকের প্রধান শক্তি সৌন্দর্য্যে। সৌন্দর্য্যে প্রেমের অভাবও ঢাকিয়া যায়। মূঢ় পুরুষের চক্ষু একবার সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত শিখায় ঝলসিয়া গেলে, তাহার আর "প্রেমের লক্ষণ" নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকে না—সে সৌন্দর্য্যদাবানলে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরে। জুলিয়াস্ সিজারের মত মহামনস্বী ক্লিওপেট্রার রূপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, আর

আমাদের “[illegible]” “[illegible]” “সীতারাম” [illegible] মূর্খ অপদার্থ-গুলার কথা তুলিয়া আর কাজ কি ?

এই সৌন্দর্য্যের প্রভাব পুরুষের মনের উপর এত অধিক যে, পুরুষ-দের রচিত কাল্পনিক স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির মধ্যেও প্রায় একটাও কুৎসিত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। “কালো ভোমরা”—সে-ও সুন্দরী, “কাণা ফুলওয়ালী”—সে-ও সুন্দরী, “ভিখারিণী গিরিজায়া,” “পরিচারিকা হীরা”—তাদেরও “পদ্মপলাশলোচনে” সৌন্দর্য্যের বিদ্যুৎ খেলে—তাদেরও “আগুলফ-লম্বিত” কুঞ্চিত অলকদামে ফণিভ্রম হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকের এই মহাস্ত্র যদি শানাইয়া রাখা যায়, যদি এই সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে কোন্ পক্ষকে যে পরাজয় মানিতে হয়, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে কেন ? সুতরাং এই সৌন্দর্য্য কিরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়া আমি পক্ষপাতদোষ হইতে বিমুক্ত ও সুন্দরী পাঠিকাদের প্রসাদলাভে কৃতার্থ হইবার ভরসা রাখি।

সাধারণত মনে হইতে পারে, মানুষ জন্মিয়া অবধি সুশ্রী বা বিশ্রী হয়—সৌন্দর্য্য বা কদাকারত্ব চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। কথায় বলে—“ঘষে-মেজে রূপ, আর কেঁদে-কেটে সোহাগ” ;—এ উভয়ই হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু এ ধারণা অভ্রান্ত নহে। বেশী কথা না বলিয়াও অনায়াসে দেখান যাইতে পারে যে, Pear's soap বা Milk of rose অনেকের সৌন্দর্য্য অন্তত কিয়ৎপরিমাণেও বর্দ্ধিত করিয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, Pear's soap বা Milk of rose এর বিজ্ঞাপন প্রচার করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কারণ সৌন্দর্য্য শুধু বর্ণের গৌরত্বের উপর নির্ভর করে না ; করিলে, “কালো” ভ্রমর, শ্যামাঙ্গী হীরা, কৃষ্ণাঙ্গী গিরিজায়া—ইহারা সুন্দরী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। আমরা শুধু দেখাইলাম যে, চেষ্টা দ্বারা

সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া তোলা অসম্ভব ব্যাপার নহে—প্রত্যুত অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক।

সৌন্দর্য্য বলিতে আমরা সাধারণত শারীরিক সৌন্দর্য্যই বুঝিয়া থাকি কিন্তু এই শারীরিক সৌন্দর্য্যেরই ভিতর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপকরণ নিহিত থাকে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য শরীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া শারীরিক সৌন্দর্য্যের পরিপুষ্টি করে। সুতরাং আমরা সৌন্দর্য্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই তিনটি অঙ্গেরই আলোচনা করিতে বাধ্য।

১। শারীরিক।—তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, ইন্দীবরলোচন, ভ্রমরকৃষ্ণ অলকদাম, এসব রুচির কথা ছাড়িয়া দিয়া একটা সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইলে দেখা যায় যে, শারীরিক সৌন্দর্য্যের মূল ভিত্তি স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্য।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ কাহারও প্রিয় হইতে পারে,—কাহারও বা তুষার-ধবল, কাহারও বা গোলাপী, কাহারও “দুধে আল্‌তা,” কাহারও শ্যাম, কাহারও কৃষ্ণ; কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ অলকদাম কাহারও পক্ষে প্রেমের নিগড় হইতে পারে,—কাহারও বা স্বর্ণোজ্জ্বল, কাহারও বা কৃষ্ণপিঙ্গল, কাহারও বা আরক্তিম ; আকর্ণবিশ্রান্ত ঘনকৃষ্ণ চক্ষুর কটাক্ষ কাহারও পক্ষে সাংঘাতিক হইতে পারে,—কাহারও বা বিড়ালাক্ষির, কাহারও বা নীলনয়নের, কাহারও বা কপিলচক্ষুর ; “খগরাজ পায় লাজ” নাসা কাহারও প্রেমসমুদ্রের মন্থনদণ্ড হইতে পারে,—কাহারও বা বাঁশরীপ্রতিম, কাহারও বা “চন্দ্রের কলঙ্ক নত-নাসিকা কেবল।” সুতরাং ইহার মধ্যে একটা সাধারণ আদর্শ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্য জনিত যে শারীরিক শোভা, তাহা সকলেরই লোভনীয়। যে কোনপ্রকার সৌন্দর্য্যই হউক না কেন, স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্যের উন্নতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেই।

সুতরাং শারীরিক-সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির প্রধান রহস্য স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্যের বিকাশসাধন।

উন্মুক্ত বায়ুসেবন, পরিমিত আহার, নিয়মিত পরিশ্রম, এই সকল যে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান সহায়, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। সর্ব্বাঙ্গের সমান চালনায় সামঞ্জস্যবৃদ্ধি হয়। ইউরোপীয়গণের ন্যায় কটিদেশকে অস্বাভাবিক সঙ্কুচিত করা বা চীনবাসীদের ন্যায় চরণ-দুইটিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলা, এ উভয়ই সামঞ্জস্যের অন্তরায়।

যদি স্বভাবত কোন অঙ্গের বিকাশে সামঞ্জস্যহানি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত ব্যায়াম দ্বারা সে ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা আলোচনা করিবার স্থান এ নহে। মোটের উপর কন্যাপক্ষীয়েরা স্মরণ রাখিবেন, স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্যের যাহা হানিকর, তাহাই সৌন্দর্য্যের শত্রু এবং তাহাই তাঁহাদের কন্যার বিবাহের প্রতিবন্ধকবিশেষ।

২। মানসিক।—কিন্তু এই শারীরিক সৌন্দর্য্য একাকী অনেক সময়ে মানুষের, বিশেষত সুসভ্য মানুষের চিত্তহরণে অক্ষম। ইহার সঙ্গে মানসিক সৌন্দর্য্যের সংযোগ আবশ্যক।

উন্মাদিনীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কয়জন বিমুগ্ধ হয়? নির্ব্বোধ জড়বৎ সুন্দরী কয়জনের হৃদয় আকর্ষণে সমর্থ? "চোখের বালি"র বেচারা "আশা"ও ত সুন্দরী, তবু "মহেন্দ্র" উন্মত্তের মত "বিনোদিনী"র পশ্চাতে ছুটিয়াছে কেন? "বিনোদিনী" সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী, "আশা" শুধুই সুন্দরী।

সুতরাং মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রধান—বুদ্ধিজনিত সৌন্দর্য্য। প্রতিভা থাকিলে তাহার একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি যে সৌরকরবিভাসিত কমলের ন্যায় মনুষ্যের মুখমণ্ডলকে একটা ঔজ্জ্বল্য এবং লাবণ্য প্রদান করে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উপন্যাসের নায়িকা-

গণের মধ্যে কেহই বুদ্ধিহীনা নহে। সুতরাং মানসিক-সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য বুদ্ধির বিকাশ প্রয়োজন। বুদ্ধির বিকাশ শিক্ষাদ্বারা সংসাধিত হয়, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন।

৩। আধ্যাত্মিক।—লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, অনেকসময় অত্যন্ত প্রতিভাশালী রমণীবৃন্দের সৌন্দর্য্য পুরুষের চিত্তাকর্ষক হয় না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কিছু অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য—অতিরিক্ত তেজ প্রদান করে, যাহা দ্বারা সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্যহানি ঘটিয়া থাকে, এবং যাহা দ্বারা পুরুষের চিত্তে ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদ্রেক হইলেও প্রেমের উদ্রেক হয় না।

এই অতিরিক্ত তেজ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিষেধক প্রেম। হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হইলে, ভগবান্ ও জীববৃন্দের প্রতি পবিত্র অনুরাগের সঞ্চার হইলে, বদনমণ্ডলে এমন সুন্দর একটা কমনীয়তা ও লাবণ্যের বিকাশ হয় যে, তাহা দেখিয়া অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। অথচ এই মোহ উন্মাদক হয় না, ইহা পবিত্র প্রেমের সুশীতল ছায়াহিল্লোলে মনোরম হইয়া উঠে।

সুতরাং এই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের বিকাশের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। যদি স্ত্রীলোকের এই ত্রিবিধ সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া তোলা যায়, যদি শরীর সুস্থ ও সামঞ্জস্যের আশ্রয়ভূমি, চিত্ত বুদ্ধির লীলানিকেতন, হৃদয় প্রেম ও ভক্তির বিমল বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়, তাহা হইলে আয়ত বিলোলচক্ষু থাকুক বা না থাকুক, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদাম গুল্‌ফ চুম্বন করুক বা না করুক, গাত্রে সৌদামিনীর স্বর্ণচ্ছটা বিকশিত হউক বা না হউক, সে স্ত্রী পুরুষের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেই হইবে।

আমাদের এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই একদিন এই সৌন্দর্য্যরহস্য

লোকে সম্যক্ অবগত ছিল। তাই কন্যাদিগকে গার্হস্থ্যকার্য্য-সম্পাদন-জনিত শারীরিক পরিশ্রম এবং শাস্ত্রাদিশ্রবণ ও ব্রতপরিপালন জনিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশ দ্বারা এমন স্নিগ্ধ-শান্ত-পবিত্র সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া তোলা হইত, যাহা আধুনিক বিলাসলালসা ও তজ্জনিত হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত, শ্রমবিমুখতাবশত স্বাস্থ্যহীন, রুক্ষ, পাউডার্ ও নানাবিধ কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের উপকরণ সংগ্রহে লোলুপ রমণীসমাজে দেখিবার আশা করাই দুরাশা।

ইহাতেও দেখা গেল, শারীরিক সৌন্দর্য্যেরও চরম বিকাশ প্রেমের পরিপুষ্টিতে—সুতরাং এইরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশে, পুরুষ ও রমণী, উভয়েরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা—এবং এই মতের অনুসরণ করিলে এই ক্ষুদ্র লেখক উভয় পক্ষেরই নিকট আশীর্ব্বাদলাভের আশা রাখেন।

গোয়েন্দা-কাহিনী।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস-গোয়েন্দা যাহা বলিয়া গেলেন, বিনোদবাবু সেইমতই কার্য্য করিলেন। পনেরো মিনিট পরে হরিদাস গোয়েন্দা চাকরকে দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে, বাহিরের লোকজন কেউ আসিয়া যে ঘরে অপেক্ষা করে, তিনি সেই কক্ষে বিনোদবাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাখাল ও যদুকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে বলিয়া, তিনি ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে বাহির হইতেই আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহারই মধ্যে কি আপনার অনুসন্ধানকার্য্য শেষ হইল?"

হরিদাস-গোয়েন্দা এইসময় কতকগুলি আঁকা-জোকা কাগজ

লইয়া নিবিষ্টচিত্তে কি দেখিতেছিলেন। বিনোদবাবুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তিনি সেই কাগজগুলি তাঁহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখুন দেখি, এই কাগজগুলিই আপনার সেই আদর্শপত্র কি না?"

আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, দ্বারদেশ হইতে লম্ফপ্রদানে বিনোদবাবু হরিদাস-গোয়েন্দার পার্শ্বদেশে গিয়া, তিনি যে কাগজগুলি নিবিষ্টচিত্তে দেখিতেছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"হাঁ এই! এই তো! এই তো আমার সেই আদর্শপত্রই বটে! আপনি কেমন করিয়া পাইলেন? কোথায় পাইলেন? কি সর্ব্বনাশ! আমি যে সারা আপিস্‌টা তোলপাড় করিয়াও ইহা খুঁজিয়া পাই নাই।"

মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে হরিদাস কহিলেন—"আনন্দে অধীর হ'বেন না। আপনি যা' ভাব্‌ছেন, তা' নয়। এ আদর্শপত্র এতক্ষণ আপনার এই আপিসের ভিতর ছিল না।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হরিদাস-গোয়েন্দার দিকে তাকাইয়া বিনোদবাবু কহিলেন—"তবে কোথায় ছিল? কোথা হইতে আসিল? আপনি কেমন করিয়া ইহা পাইলেন?"

হরিদাস। সে সকল কথা পরে হইবে। এখন তার জন্য অত ব্যস্ত হ'বেন না। আপাতত আমাদের সময় বড় মূল্যবান্! একমিনিট কালও আমরা বৃথা বাক্যব্যয়ে কাটাইতে পারি না। আমি এখন আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

বিনোদবাবু বিশেষ আগ্রহের সহিত কহিলেন—"করুন। আপনি আমার নিকট হইতে কি জানিতে চাহেন, বলুন? আজ আপনি আমার যা উপকার করিলেন—"

বাধা দিয়া হরিদাস কহিলেন—"থাক্, ও সকল কথা আমি এখন কিছুই শুনিতে চাহি না। যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিব, তখন

আপনার মুখে আমার নিজ প্রশংসা শুনিব। এখন আপনি বলিতে পারেন, আপনার এই আদর্শপত্রের কাপি প্রস্তুত করিতে কতক্ষণ সময় লাগে? অর্থাৎ কাগজগুলির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর কতক্ষণ সময় লাগিতে পারে?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বিনোদবাবু বলিলেন—"যে লোক এ কাজে বেশ পরিপক্ক ও বহুকাল ধরিয়া আদর্শপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তাহাকে অন্তত দুই তিন-দিন একাদিক্রমে পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে সে ইহার একখানি চলনসই গোছের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে পারিবে।"

হরিদাস। তাহা হইলে আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। ফটোগ্রাফিক্-যন্ত্র-সাহায্যে আপনার এই আদর্শপত্রের কাগজগুলির নকল তুলিয়া লইয়াছে। বিনোদবাবু! এ চোর ধরা পড়িলেও আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, বলিতে পারি না। দু'চারদিন পরে যদিও চোর ধরা পড়ে, তাহা হইলেও হয় তো আপনার কোন ফল ফলিবে না। ফটোগ্রাফিক্ যন্ত্রাদি সরাইয়া ফেলিয়া যদি সেই চোর আদর্শপত্রগুলির একখানি প্রতিলিপি লইয়া গিয়া যথাস্থানে পঁহুছিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছে, জানিবেন। যতটুকু সময় ইহা আপনার হাতছাড়া হইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে যদি একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করা-ও সম্ভব হইত এবং চোর সেই উপায় অবলম্বন করিত, তাহা হইলেও বিশেষ চিন্তার কোন কারণ থাকিত না—কেন না, তাহার নিকট হইতে প্রতিলিপিগুলি হস্তগত করিতে পারিলেই, চোরের সকল আশা-ভরসা ফুরাইয়া যাইত; কিন্তু ফটোগ্রাফিক্ যন্ত্রে যদি আপনার আদর্শপত্রের ছবি তুলিয়া লইয়া থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একখানির স্থলে দশখানি প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এখন যদি আমরা সেই চোরকে

ধরিয়া তাহার যন্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি, তবেই ভাল, নচেৎ তাহার নিকট হইতে প্রতিলিপিগুলি কাড়িয়া লইলেও আর কোন ফল নাই—কেন না, মনে করিলেই সে একখানির পরিবর্ত্তে দশখানি প্রস্তুত করিতে পারিবে। তবে এরূপ কাজ করিতে হইলে হয় তো আমায় গুটিকতক আইনবিরুদ্ধ কাজও করিতে হইবে। চোরকে "চোর" প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাহার বাটীতে প্রবেশ করা বা তাহার কোন জিনিষপত্র নষ্ট করাও আইনবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

বিনোদ। আপনার নিজের কোন বিপদ্ না ঘটে, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে বলাই এখন আমার উচিত; কিন্তু আমার মনে এত ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে যে, দুষ্টের দমনের জন্য আমি এখন দু'দশহাজার টাকা খরচ করিতেও প্রস্তুত আছি। সুতরাং একটু-আধটু আইনবিরুদ্ধ বা অবৈধ কাজের ভয়ে আপনি চোরকে ধরিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইহাতে যাহা হয়, তাহাই হইবে—আপনাকে বিপদ্মুক্ত করিতে যদি আমার যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়, তাহাতেও আমি কাতর হইব না, জানিবেন।

হরিদাস। আপনার উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনিয়া আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু, সত্যসত্যই আপনি মনে করিবেন না যে, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, আমি সহসা কোন আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়া ফেলিব। কেন না, যদি তাহা করি, তাহা হইলে আপনার অর্থবলে হয় তো এ যাত্রা আমি অনায়াসে বিপদ্মুক্ত হইতে পারিব, কিন্তু তাহাতে যে সুযশ ও সুখ্যাতি হারাইব, তাহা আর ফিরিয়া পাইব না। সহসা একটা অন্যায় কাজ করা আমার স্বভাবও নয়। সে যাহা হউক, আমার যতদূর সাধ্য, আমি চোর ধরিতে চেষ্টা করিব। এখন আপনার কর্ম্মচারী যদুকে একবার আহ্বান করুন,

দেখি। সেই বিশ্বাসঘাতকই আপনার এই আদর্শপত্রচুরির প্রধান উদ্যোগী।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনোদবাবু কহিলেন—"অ্যাঁ, বলেন কি? যদু? যদু এ কাজ করেছে?"

হরিদাস। ব্যস্ত হ'বেন না—চীৎকার কর্‌বেন না। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সপ্রমাণ করিবার উপায় এখনও হয় নাই। যে সূত্র আমি পাইয়াছি, যে সূত্রবলে আমি আপনার আদর্শপত্রখানি বাহির করিয়াছি, সেই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া যাহার উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে, আমি তাহারই নাম করিয়াছি। কিরূপে, কেমন করিয়া, কি প্রমাণ করিতে হইবে, সে বিষয় আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করুন। আমি যাহা বলি এবং যাহা করি, আপনি কেবল তাহাই দেখিয়া যান; আপনাকে কোন কথা কহিতে বা কোন কাজ করিতে হইবে না। যদুর সঙ্গে আমায় একটু চাল চালিতে হইবে। যে সকল কথা আমি এখনও জানিতে পারি নাই বা যাহা জানিবার আমার কোন উপায় নাই, তাহাই যেন জানিতে পারিয়াছি, এরূপভাবে ধাপ্পা দিয়া কথা কহিতে হইবে। আপনি তাহাতে কোন কথা কহিবেন না বা কোনপ্রকার বিস্ময়ের ভাব দেখাইবেন না। এখন এই আদর্শপত্রের কাগজগুলি সরাইয়া ফেলিয়া, আপনি যদুকে এইখানে একবার ডাকিয়া পাঠান।

দশম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস গোয়েন্দা যেরূপ উপদেশ দিলেন, বিনোদবাবু তাহাই করিলেন। তিনি প্রথমে রাখালকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখ রাখাল! আদর্শপত্র খোঁজাখুঁজি করিতে আমার ঘরের যে সকল কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে হইয়াছে এবং যেরূপ গোলমাল হইয়াছে, সেইগুলি

আবার যথাস্থানে সাজাইয়া-গুজাইয়া রাখ গে'। আর যদুকে একবার আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া রাখাল চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই যদু আসিয়া হরিদাস-গোয়েন্দা এবং বিনোদবাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

হরিদাস-গোয়েন্দা তাহাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তোমার নাম যদু? হলধর কর্ম্মকারের সঙ্গে তোমার কারকারবার সব ধরা পড়েছে, তা' জানো? বিনোদবাবু এবং আমি তোমার সমস্ত ব্যাপারই জান্‌তে পেরেছি। বুঝ্‌তে পেরেছ? আমার নাম হরিদাস গোয়েন্দা।"

সেই মুহূর্ত্তে যদি সেই কক্ষে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও যদু যতটা ভীত ও সঙ্কুচিত না হইত, বিখ্যাত হরিদাস-গোয়েন্দার নাম শুনিয়াই তাহার অন্তরে তদপেক্ষা অধিক ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহার মুখভাব বিভিন্ন আকার ধারণ করিল।

তাহার এই ভাব দেখিয়া ও কথার কোন উত্তর না পাইয়া, হরিদাস-গোয়েন্দা পুনরায় কহিলেন,—"আমার কথায় তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছ দেখ্‌ছি। এত শীঘ্র ধরা পড়িবে, তাহা তুমি মনে কর নাই, কেমন?"

একে যদু যথার্থই অপরাধী, তাহার উপর হরিদাস-গোয়েন্দা তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট, কাজে কাজেই সে আর কোন উপায় না দেখিয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে হরিদাসের মুখের দিকে চাহিল। আত্মপক্ষসমর্থনার্থ কি একটা কথা বলিবে মনে করিতেছিল, কিন্তু বলিবার সময় পাইল না।

হরিদাস কহিলেন—"দেখ এমন কাঁচা কাজ আর কখনও করো না। বাহিরের লোকের সঙ্গে বুঝেসুঝে কারকারবার করো। তোমার ষড়্‌যন্ত্র, তোমার কার্য্যকলাপ, তোমার কি-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, তা' যদি এত সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

তা' হ'লে তুমি ধরা পড়্বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? হলধর বর্দ্ধনকে তোমার প্রভুর আদর্শপত্রের যে কাগজগুলি তুমি দিয়েছ, তাহা সম্ভবত এখনও তাহারই কাছে আছে, কেমন? তুমি জান না, এরকম কাজ কর্‌লে কি-রকম কঠোর সাজা হয়?"

যদু ভাবিল, হরিদাস-গোয়েন্দা এখনও তাহা হইলে আদর্শপত্র-খানির আপিসে ফিরিয়া আসার কথা জানিতে পারেন নাই। তাই সে ধরা পড়িয়াও একটু চাতুরী খেলিবার চেষ্টা করিল।

কাঁদকাঁদ ভাবে যদু কহিল—"আপনি যতদূর অনুমান করিতেছেন, আমি ততদূর অপরাধী নহি। আদর্শপত্রের কাগজপত্র আমি কাহাকেও দিই নাই—সে সব আপিসেই আছে। আমি লোভে পড়ে সেগুলো লুকিয়ে রেখেছি বটে, কিন্তু এখনও আপিসের বাহিরে যায় নাই। আপনি যদি চাহেন, আমি এখনি তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি।"

মনে মনে হাসিয়া হরিদাস-গোয়েন্দা কহিলেন—"বটে! আচ্ছা যাও দেখি, সেগুলো নিয়ে এস দেখি। তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, তা' আর আমি দেখিতে চাহি না। পালাবার চেষ্টা করো না—এ বাড়ী থেকে এখন আর পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত বেরিয়ে যাবার জো নাই—তুমি পালাবার মৎলবে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা' দিলেই ধরা পড়িবে।"

অবনতমস্তকে যদু সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সম্মুখস্থ (কর্ম্মচারিগণের) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিদাস-গোয়েন্দা সেই কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া তাহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা, পাছে যদু সদর দরজা দিয়া পলায়ন করে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ম্মচারিগণের কক্ষমধ্য হইতে যদু নিষ্ক্রান্ত হইল। সেসময় তাহার মুখভাবের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে,

তাহাকে দেখিলে আর সেই যদু বলিয়া মনে হয় না। একবার যদু সদর দরজার দিকে চাহিল, অম্‌নি তৎক্ষণাৎ হরিদাস তাহার একটি হাত ধরিয়া একটানে তাহাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বলিলেন—"পাগ্‌লামি করো না—পালাবার কোন উপায় নাই। পালালে তুমি আমার হাত থেকে এড়াতে পার্‌বে না। আদর্শপত্রের কাগজপত্রগুলি চুরি গিয়েছে—তুমি বেশ জান, এ কাজ তোমার দ্বারাই হয়েছে। এখন আমি যা' বলি শুন। তুমি যে হলধর বর্দ্ধনের সঙ্গে এ কাজ করেছ, তার প্রকৃত নাম কি ও সে কি ধরণের লোক, তা' আমি বিশেষ জানি। তুমি যদি জান্‌তে যে, সে লোকটা কতবারের জেল-ফেরৎ আসামী, তা' হ'লে তা'র ফাঁকা কথায়, বাজে আশ্বাসে ভুলে, কখনই তোমার এমন সদাশয় মনিবের সর্ব্বনাশ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে না। তোমার জাতও গিয়েছে, পেটও ভরে নি। তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমার বন্ধু হলধর বর্দ্ধন যদি এ কাজে সফলমনোরথ হ'তে পারে, তা' হ'লে তোমায় তার লাভের এক-পাই অংশও দিবে না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যদু কোন কথা বলিতে পারিল না—অবনতমস্তকে সেই স্থলে দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

হরিদাস কহিলেন—"ও-রকম কান্না দেখ্‌লে আমাদের প্রাণে মায়ার সঞ্চার হবে না। এখন যা' বলি, তাই কর। তোমার বন্ধু হলধর বর্দ্ধনকে যা'তে এখন আমরা সহজে "কিস্তিমাৎ" কর্‌তে পারি, তার উপায় করে দাও দেখি। ঐখানে কলম, কালি, কাগজ, সবই আছে। আমি যে-রকম বলি, সেইরকম করে' একখানি চিঠি লেখ দেখি।"

যদু দেখিল, উপায় নাই—নিস্তার নাই। কাজে কাজেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কলম হাতে করিল।

হরিদাস বলিলেন, "তোমার বন্ধুকে লেখ যে, তোমরা যে পরামর্শ করেছিলে, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বার পক্ষে একটা বিষম বাধা পড়েছে। আর সেই সঙ্গে অনুরোধ কর, যেন সে অবিলম্বে আজকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারপর চিঠিখানা সই করে' খামের উপর হলধর বর্দ্ধনের নাম ও ঠিকানা লিখে পত্রখানা আমার হাতে দাও। পত্রখানা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত আমরা করবো এখন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হলধর এখানে না আসে, ততক্ষণ তুমি তোমার প্রভু বিনোদবাবুর ঘরে কিংবা তোমার নিজের বস্‌বার জায়গায় গিয়ে বসে থাক। পালাতে চেষ্টা কর্‌লেই মারা পড়্‌বে। এই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আমার লোক আছে জান্‌বে—সাবধান!"

পত্রখানি লিখিত হইলে পর, যদুকে বিদায় দেওয়া হইল। হরিদাস তখন বিনোদবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আমি এখনই হলধর বর্দ্ধনের সন্ধানে চলিলাম। যদুকে পত্র লেখানটা কেবল আমার ছল মাত্র। এ পত্রে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। হলধরের ঠিকানা জানিবার জন্যই আমার এই ফন্দী! এখন এই ঠিকানায় গিয়ে কতদূর কি করিতে পারি, সেই চেষ্টায় আমি চলিলাম। ইহার মধ্যে যদি হলধর ফিরিয়া আসে, তবে তাহাকে আটক করিবেন; কোনপ্রকারে ছাড়িয়া দিবেন না। একজন পাহারাওয়ালা ডাকিয়া তাহাকে পুলিসের হাতে দিবার ভয় দেখাইতেও ছাড়িবেন না। হলধরকে তাহার বাসস্থানের বাহিরে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া যদি আমি তাহার ঘরদ্বার সন্ধান করিবার সুবিধা পাই, তাহা হইলে অতি সত্বরেই কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য আপনাকে বলিতেছি, যদি সে এখানে পুনরায় আসে, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে হউক, তাহাকে

বন্দী করিবেন। যদুর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন! কি জানি, যদি সে হলধর বর্দ্ধনের ঠিকানা ঠিক না দিয়া থাকে।"

এইপ্রকার উপদেশ দিয়া হরিদাস-গোয়েন্দা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা ছয়টার সময় হরিদাস-গোয়েন্দা বিনোদবাবুর কার্য্যস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাসিহাসি মুখ দেখিয়া বিনোদবাবুর মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল।

একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া হরিদাস কহিলেন—"বিনোদবাবু! আপনাকে প্রথমেই একটা সুসংবাদ প্রদান করি। আমি যে উদ্দেশ্যে এখান হইতে বাহির হইয়াছিলাম তাহা একপ্রকার সফল হইয়াছে। এখন আর আপনার চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। ফটোগ্রাফিক্ যন্ত্রের নেগেটিভ্‌গুলি আমি লইয়া আসিয়াছি—আপনি গ্রহণ করুন। ইচ্ছা হয়, নষ্ট করিয়াও ফেলিতে পারেন। আমি এ সকল চুরি করিয়া আনিয়াছি।"

বিনোদবাবু কহিলেন—"আপনাকে যে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব এবং কি বলিয়া যে আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এখন যদুর বিষয় আপনি আমায় কিরূপ আদেশ করেন? আপনার হলধর বর্দ্ধন তো ইহার মধ্যে আর এখানে আসে নাই।"

হরিদাস। হলধর বর্দ্ধন এখানে না আসাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। বেচারা এখন যে জালে পড়েছে, তা' হতে উদ্ধার পাওয়া সহজ নয়। অভাগার অদৃষ্টে চতুর্দ্দশবৎসর দ্বীপান্তর লেখা আছে। অন্য কোন একটা ভয়ানক কার্য্যে সে এমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, এবার আর তাহার উদ্ধার হইবার কোন আশা নাই।

বিনোদ। ব্যাপার কি?

হরিদাস। ক্রমে সকল কথাই জান্‌তে পার্‌বেন। এখান হইতে বাহির হইয়া আমি বরাবর হলধর বর্দ্ধনের ঠিকানায় পঁহুছিলাম। বহুবাজারের একটা প্রকাণ্ড বাসাবাড়ীতে তিনি থাকেন। সে বাড়ীতে আরও অনেক লোক আছে। একজন দাসী বাড়ীর ভিতর হইতে বাজারের চেঙারি হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, তাহাকেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ গা! এখানে হলধরবাবু কোন্ ঘরে থাকেন, বলিতে পার?" দাসীকে আমার প্রতি অবাক্‌নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আমি অনুমান করিলাম—'বোধ হয় শ্রীমান্ হলধরবাবু এখানে অন্য নামে পরিচিত'—তাই দাসী কোন কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিলাম—"নামটা তার হলধরবাবু কি না, আমার ঠিক মনে হইতেছে না—তবে—" দাসী জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁর চেহারাটা কিরূপ, বলুন দেখি?" দাসীর কথায় আমি হলধর বর্দ্ধনের রূপ বর্ণনা করিলাম। দাসীর মুখভাব দেখিয়া আমি বুঝিলাম, আমি কাহার অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা সে অনুভব করিয়াছে। দাসী কহিল—"হাঁ—হাঁ—বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন আমার ঠিক্ মনে হয়েছে। সেদিন ডাক্‌পেয়াদা এসে আমায় ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করাতে, আমি প্রথমে বল্‌তে পারিনি। তার পর উপরের ঐ বারাণ্ডা থেকে একজন বাবু মুখ বাড়িয়ে ডাক্‌পেয়াদাকে ডাক্‌লেন। ডাক্‌পেয়াদা উপরে চলে গেল, আমিও বাজার কর্‌তে চলে গেলেম। জানি না, সেই বাবুটিই হলধরবাবুর নামের চিঠিখানা নিলেন কি না। আপনি তাঁর যেরূপ বর্ণনা কর্‌লেন, তাতে তাঁকেই হলধরবাবু বলে' বোধ হয়, কিন্তু এ বাসায় তাঁর নাম যোগেন্দ্রবাবু।" আমি দাসীর কথায় হলধরবাবুর চাতুরী বুঝিতে পারিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ ঘরে যোগেন্দ্রবাবু থাকেন?" দাসী আমাকে ঘর দেখাইয়া

দিল। আমি তাহাকে একটি সিকি বক্‌সিস দিয়া উপরে উঠিলাম।

বিনোদ। উপরে আর কেহ ছিল না?

হরিদাস। না। বাসায় এক একটা ঘরে এক এক জন ভদ্রলোক থাকেন। কেহ বা বিদ্যালয়ের ছাত্র, কেহ বা কেরাণী। কেহই তখন বাসায় ফিরিয়া আসেন নাই। কাজেই উপরে উঠিয়া আমি কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। দাসী যে ঘর দেখাইয়া দিয়াছিল, সেইখানে গিয়া দেখিলাম, ঘরের দরজা ভিতর দিক্ হইতে বন্ধ। অথচ ভিতরে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজাটি একটু উন্মুক্ত হইল। আমি দেখিলাম, শ্রীমান্ হলধর বর্দ্ধন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিলাম, তাহার গায়ে জামা নাই—কোঁচার খোঁটটি ঘুরাইয়া একটি হাত ঢাকা দিয়া ঘাড়ের উপর তোলা। আমার সন্দেহ হইল, যেন তাহার সেই ঢাকা হাতের ভিতর সে কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম—"আমি যোগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি—"

"হাঁ—হাঁ—আমি বুঝেছি—বুঝেছি—এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি"—এই বলিয়া হলধর বর্দ্ধন ত্বরিতপদে নীচে চলিয়া গেল।

হাতে পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব কি না, একবার ভাবিলাম। হয় তো হলধর ওরফে যোগেন্দ্র এই সুযোগে আমায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তার পরেই আমি স্থির করিলাম যে, হলধরের পশ্চাদনুসরণ করার চেয়ে, ঘরের ভিতর থাকিলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

ঘরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া আমি ভিতর দিক্ হইতে অর্গল প্রদান

করিলাম। দেখিলাম, ঘরের মেজেতে নানাপ্রকার জিনিষ ছড়ান রহিয়াছে। একদিকে একজনের শয়নোপযোগী একখানি ছোট খাট ও অপর দিকে ক্যাম্বিসের পরদা দিয়া ঘেরা আর একটি ছোট কাম্‌রা। মনে মনে অনুমান করিলাম, ইহাই তাহার ফটোগ্রাফি তুলিবার অন্ধকার-কক্ষ। এই অন্ধকার-কক্ষে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, এই বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। অন্ধকার-কক্ষের দরজাটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া, উক্তকক্ষমধ্যে কিছু কিছু আলোক প্রবেশ করিতেছিল, সুতরাং ভিতরের জিনিষ-পত্রগুলি দেখিবার পক্ষে আর বিশেষ কোন অন্তরায় রহিল না।

ইতিমধ্যে যোগেন্দ্র ওরফে হলধর ফিরিয়া আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিতে থাকিল। ক্রমে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। তথাপি আমি কোন উত্তর দিলাম না। অনেক অনুসন্ধানের পর আপনার আদর্শপত্রের ফটোগ্রাফ্ তোলার নেগেটিভ্‌গুলি পাইলাম। তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তগত করিয়া কাগজে মুড়িয়া পকেটস্থ করিলাম।

হলধর তখন বাহির হইতে আমায় গালাগালি দিতেছে, পুলিস ডাকিয়া আমায় ধরাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। আমি তাহার কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাহার কুক্রিয়ার পদার্থ-গুলির ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি করিয়াও হলধর যখন কোন সুবিধা করিতে পারিল না, তখন ঘরের দরজা ছাড়িয়া পাশের দিকের একটা ছোট জানালায় সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল এবং ঘাড় বেঁকাইয়া সেইখান দিয়া, আমি ঘরের ভিতর কি করিতেছি, তাহাই দেখিতে লাগিল। বোধ হয় পুলিস ডাকিবার সাহস তাহার ছিল না বলিয়াই, সে আপনা-আপনি কতকটা নরম হইয়া আসিল।

এদিকে আমি ঘরের ভিতর, সন্দেহজনক পদার্থমাত্রই নষ্ট করিয়া

ফেলিতে লাগিলাম। সহসা একটি ছোট যন্ত্র আমার চক্ষে পড়িল। বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে যন্ত্রটিতে নোট জাল করা হয়। হলধর ওরফে যোগেন্দ্র যে দশকর্ম্মান্বিত, এই যন্ত্রটি দেখিয়াই, আমার তাহা ধারণা জন্মিল। সেই যন্ত্রটির তলদেশে একটি ছোট বাক্স ছিল। বাক্সর ডালাটি তুলিয়া কয়েকখানি জাল-নোট দেখিতে পাইলাম। সেগুলি পকেটস্থ করিয়া যন্ত্রটি ভাঙিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলাম। স্থির করিলাম, 'এখন শ্রীমান্ হলধর যদি পুলিস ডাকিয়া কোন হাঙ্গামা করিতেও চেষ্টা করে, তাহা হইলেও আমার কিছু করিতে পারিবে না এবং তাহার পক্ষেও বড় মঙ্গলজনক হইবে না।"

যখন আমি দেখিলাম, আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে এবং দুষ্ক্রিয়াভিলাষী হলধরের অভিলষিত-কার্য্যসাধনের সকল যন্ত্র-তন্ত্র, আস্‌বাব্-পত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে, তখন আমি দরজা খুলিলাম। হলধর তখন অদৃশ্য হইয়াছে। সে বাড়ীতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আর কোন আশা নাই। যথারীতি নিকটস্থ পুলিসে সংবাদ দিয়া তাহাদের হস্তে হলধরের জিনিষপত্র ও ঘরের ভার অর্পণ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ।

আমার জীবনের আদর্শদেবতা মাতামহ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত অনেক ঘটনাই আমাদিগকে গল্পচ্ছলে বলিতেন। সে সকল ঘটনায় মাতামহদেবের অসীম সাহসিকতার সহিত উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বিস্ময়পূর্ণ ঘটনা বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণ জানিতে নিশ্চয়ই উৎসুক হইবেন, মনে করিয়া সেগুলি আমি লিপিবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক হই।

সেইজন্য আজ প্রায় দুইবৎসর হইল, "বঙ্কিমের সাহস" নামে একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়কে দিই। সম্পাদক-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি বলেন, শীঘ্রই উহা সাহিত্যে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ দুইটি বৎসর অতীতের বিরাট্ গর্ভে লীন হইয়া গেল, তবু সম্পাদক-মহাশয়ের 'শীঘ্র' আর আসিল না। বারবার তাগিদ দিয়া প্রবন্ধটিও ফেরত পাইলাম না, প্রবন্ধটির দশা কি হইয়াছে, তা-ও জানি না। সম্পাদকের নীতি আমার জানা ছিল না, সেজন্য সে প্রবন্ধের নকলও আমি রাখি নাই, সুতরাং আবার আমায় নূতন করিয়া সেই প্রবন্ধ লিখিতে হইল, কিন্তু সেটির নকল করিবার সুবিধা হইল না। মূল প্রবন্ধই 'সমালোচনী'-সম্পাদক মহাশয়ের হাতে দিলাম—প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্যের উপদেশ অবহেলা করিয়া মুণ্ডিত মস্তক আবার বিল্বমূলে উপস্থিত হইল। দেখি 'সমালোচনী'-সম্পাদকেরও সেই একই রা কি না।

কিন্তু আজ আর ভূমিকায় কাজ নাই, অপ্রাসঙ্গিক কথা ছাড়িয়া এখন আসল প্রসঙ্গে উপস্থিত হওয়া যাক্। সে প্রসঙ্গটা এই।

বঙ্কিমবাবু যখন কাঁথির (Contai) হাকিম, তখন এই ঘটনাটি ঘটে। কাঁথিতে থাকার সময় তাঁহাকে প্রায়ই মফস্বলে তদারকে যাইতে হইত। তিনি রৌদ্রের উত্তাপ কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। যখনি কোথাও যাইতেন, হয় অতি প্রত্যূষে, না হয় সন্ধ্যায় যাইতেন। কাঁথি হইতে মফস্বলে যাইবার সময় সন্ধ্যায় বাহির হইতেন।

একবার একটা বড় জরুরী তদারকে তাঁহাকে কাঁথি হইতে ৭।৮ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। তিনি বৈকালেই পাল্কীর ডাক বসাইয়া রওনা হইলেন। ইচ্ছা, শীঘ্রই কাজ সারিয়া রাত্রেই বাসায় ফিরিয়া আসিবেন। সঙ্গে যাইল খানসামা মুরলী, দুইজন বরকন্দাজ, আরদালি ও পাচক ব্রাহ্মণ। রাত্রি ৮টার মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলেন।

কর্ম্ম করিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। সেই দেশে হাকিম আসিলেই জমিদারের বাগানবাড়ী হাকিমকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বঙ্কিমবাবুও সেইখানে গিয়া উঠিয়াছিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ আহারাদি প্রস্তুত করিয়াছে, সুতরাং আহারাদি সেইখানেই হইল। আহারাদির পর তিনি পাল্কী আনিতে হুকুম দিলেন। বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় অনেক গণ্যমান্য লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই অমাবস্যার রাত্রিতে জনহীন দস্যু-প্রপীড়িত প্রান্তরের মধ্য দিয়া অতটা পথ অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবুর সে রাত্রি সেইখানেই থাকা স্থির হইল। কিন্তু তিনি পাল্কী বিদায় করিলেন না—পাল্কী হাজির থাকিল।

বাড়ীটির বর্ণনা আমি যেরূপ দাদাবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি।

বাড়ীটি তিন-মহল। চারিদিকে বাগান, বাগান উচ্চপ্রাচীরে বেষ্টিত। বাড়ী হইতে বাগানের ফটক অনেক দূরে। দিনমানেই, ফটকে মনুষ্য প্রবেশ করিলে, বাটী হইতে ঠাওর হইত না,—অতি খর্ব্বাকৃতি দেখাইত। সেই ফটকের সম্মুখেই একটা বাদাম-গাছ ছিল। বাড়ীটির পশ্চাতে একটি ছোট দরজা। সেটি খিড়কি। তাহার পরেই ঘনবৃক্ষসমাচ্ছাদিত বাগান। খিড়কির দোর দিয়া বাহির হইয়া খানিকটা উত্তরমুখে গেলেই একটি বৃহৎ-পুষ্করিণী, তাহাতে বাঁধা ঘাট। তথা হইতে পশ্চিম মুখে ফিরিলেই একটি ক্ষুদ্র পথ। পথের দুধারি তালবৃক্ষের শ্রেণী, একদিকে গোলাপের রাশি, অপরদিকে অন্যান্য যাবতীয় পুষ্পের গাছ। সেই পথ ধরিয়া বরাবর গেলেই বাগানের শেষ সীমায় প্রাচীরে একটি দরজা আছে। সেই দরজা দিয়া বাহির হইলেই সদর রাস্তায় পড়া যায়। সদর রাস্তাটি বেশী চওড়া নহে। তাহার অপরদিকে একটি ক্ষুদ্র খাল। তাহার পরই মস্ত মাঠ ধূধূ করিতেছে।

বাড়ীটির প্রথম মহল পার হইয়া দ্বিতীয় মহলে যাইতে হইলে একটি বৃহৎ উঠান পার হইতে হয়। উঠানের মাঝখানে একটি শিউলিফুলের গাছ। দ্বিতীয় মহলের শেষ সীমায় ঘরটি বেশ বড়। সেই ঘরে এক-খানি পালঙ্কে বিছানা প্রস্তুত। দাদাবাবু সেই ঘরেই রাত্রিযাপন করিবেন, স্থির করিলেন। মুরলী সেই গৃহে জমিদারবাবুর গৃহ হইতে প্রেরিত একটি বৃহৎ সেজ জ্বালিয়া দিয়া গেল। আল্‌বোলায় তামাকু সাজিয়া দিল। ফিরিয়া যাইবার সময় মুরলী কহিল—"হুজুর, আমরা কি তা হলে পাশের ঘরেই থাকিব—আপনি যদি রাত্রে ডাকে—রাত্রে যদি কোন দরকার পড়ে।" দাদাবাবু বলিলেন "না, তোদের আর তায় দরকার নাই। প্রথম মহলে যে ঘরটায় আমি বসিয়াছিলাম, সেই ঘরটায় তোরা থাকিস্। এই উঠান পার হইলেই সেই ঘর। রাত্রে তোরা একটু সজাগ থাকিস্—এক ডাকেই যেন উত্তর পাই।"

মু। যে আজ্ঞে—আমি তা হলে এখন যাই।

এই বলিয়া মুরলী চলিয়া গেল, দাদাবাবুও দরজায় খিল দিয়া আসিয়া পালঙ্কে শুইয়া শটকায় তামাকু টানিতে টানিতে নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন। তার পর—তিনি বলেন—তাঁহার বেশ নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে দরজায় সবলে আঘাত—দুম্, দুম্, দুম্। তিনি মহা-বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, হয় ত মুরলী আবার কোন দরকারে আসিয়াছে—তিনি রাগিয়া মুরলীকে ধম্‌কাইতে ধম্‌কাইতে দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কাছেই বাতি ছিল, তাহা জ্বালিয়া গৃহের বাহিরে চারিদিকে খুঁজিলেন, মনুষ্যসমাগমের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। একটু বিস্মিত হই-লেন। আসিবার সময় একটা বড় কুকুর পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিলেন, এ শব্দ

কোথা হইতে আসিল! হয় ত অপর কোন বাটীতে কেহ দরজায় আঘাত করিয়া থাকিবে—রাত্রিকাল, শব্দ বড় নিকট শোনায়—তাহা-তেই হয় ত আমি এ দরজায় আঘাত মনে করিয়াছিলাম। আবার নিদ্রা-ভিভূত, পুনরায় দরজায় আঘাত—দুম্, দুম্, দুম্। আবার তিনি উঠি-লেন, মনে মনে মহা-বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, সেই যে কুকুরটাকে বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছি, হয় ত সেই কুকুরটা এ গৃহে রাত্রিকালে থাকে। অন্য দরজা বন্ধ থাকায় আসিতে পারিতেছে না, সুতরাং দরজায় আঘাত করিতেছে। কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিবার মানসে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু এবারে কুকুর বা অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল, দরজা খুলিবামাত্র কে যেন দ্রুতপাদবিক্ষেপে দরজার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। তিনি এবার অধিকতর বিস্মিত হইলেন। কিছু না বলিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এ বাটীটা কি চোর-ডাকা-তের বাসস্থান। জমিদারবাবুর বাটী চাবিবন্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, কেহ থাকে না, এমত অবস্থায় চোর-ডাকাতের বাসস্থান হওয়াই বা বিচিত্র কি? যাই হোক্, এবারে আর দরজা খুলিতেছি না। যদি খুলি, তবে সাবধান হইয়া খুলিব। যখনি তিনি কোন মফস্বলে রাত্রিযাপন করিতেন, সঙ্গে একখানি ছোরা রাখিতেন, সেখানি বাহির করিয়া নিকটেই রাখিলেন। পুনরায় দরজায় আঘাত। এবারকার আঘাত অতি কোমল, অতি মৃদু। দাদাবাবু ভাবিলেন, বাঃ, রহস্য ত মন্দ নয়। একি, আমি সমস্ত রাত্রিই কি দরজা খুলিব ও দিব। যাই হোক্, দেখি কি ব্যাপার। এই ভাবিয়া এক হাতে বাতি, এক হাতে ছোরা লইয়া দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিবামাত্র দেখিলেন, একটি সুন্দরী খর্ব্বকায়া যুবতী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটি দ্রুত তথা হইতে পলাইয়া তৃতীয় মহলের দিকে গেল।

দাদাবাবু ত অবাক্। ভাবিলেন, ব্যাপারখানা কি? নিকটেই জমিদারবাবুর বসৎ-বাটী। এ স্ত্রীলোকটি কে? চেহারায় বোধ হয় কোন বড় মানুষের বাড়ীর মেয়ে। তবে কি এ জমিদারবাবুর বাটীর কোন কুলকলঙ্কিনী, প্রত্যহ রাত্রিতে এ বাটীতে আসিয়া নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করে? আবার ভাবিলেন, তাই যদি হয়, তবে পুরুষমানুষ কৈ? স্ত্রীলোকটি ত একা। এই গৃহেই হয় ত উহারা রাত্রি-বিহার করে। আমি অদ্য রাত্রি এখানে থাকিব শুনিয়া পুরুষটি হয় ত অদ্য আসে নাই। স্ত্রীলোকটি অত শোনে নাই, তাহার নায়ক আসিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত হয় ত আসিয়াছিল। আমায় দেখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ও মহলে কেন গেল? যাই হোক্, উহাকে ধরিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অকুতোভয়ে দীপহস্তে সেই মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি সেই মহলের বারাণ্ডার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে-ও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন তিনি অতি নিকটে যাইলেন, তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "মহাশয়, আপনি আমার পিছনে পিছনে আসিয়াছেন কেন? আমি ত আপনার কোন অনিষ্ট করি নাই।"

দাদা। তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই, তাহা আমি জানি। আমার কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। তুমি স্ত্রীলোক, আমার কি অনিষ্ট করিবে?

স্ত্রীলোক। আপনার যদি সেই ধারণা, তবে আর আমার পিছনে কেন? যান না, আপনি শয়ন করুন গে না। আপনি ত বঙ্কিমবাবু?

দাদা। হাঁ, আমি বঙ্কিমবাবু—আমার নাম তুমি কিপ্রকারে জানিলে? আর এত রাত্রে তুমি একাকিনী এই জনশূন্য বাটীতে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ? জান, আমরা হাকিম। এরূপ অবস্থায় যখন

তোমাকে পাইয়াছি, তখন তোমায় অমনি ছাড়িতে পারি না। তোমায় ধৃত করিব।

স্ত্রীলোক। আমার পরিচয় আপনি পাইলে ও আমি কি অভিপ্রায়ে এত রাত্রে এখানে আসিয়াছি জানিতে পারিলে কি আপনি আমায় ছাড়িয়া দিবেন?

দাদা। সে কথা পরে বিবেচ্য। এখন বল দেখি, তোমার নাম কি? তুমি যে জমিদারবাবুর বাটীর মেয়ে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছি।

স্ত্রীলোক। তবে শুনুন। আমার নাম "বিরহ", আমি জমিদারবাবুর মধ্যম পুত্রবধূ। আমি প্রত্যহ রাত্রে এখানে আসি। যে গৃহে আপনি শয়ন করিয়াছিলেন, ঐ গৃহে আমি রাত্রিবাস করি। আমি কি অভিপ্রায়ে আসি, কেন আসি, তাহা বলিব না, আপনি চেষ্টা করিলেও তাহা জানিতে পারিবেন না। আপনি নিষ্ফল আমার পিছনে পিছনে আর আসিবেন না। আমারও সময় হইয়া আসিল, আমি চলিলাম। আমি যে এখন কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই।

দাদা। তোমাকে আমি অমনি ছাড়িতে পারি না। আমার হাত হইতে কোথায় পলাইবে। কল্য প্রাতে জমিদারবাবুর মধ্যম পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমায় তাঁহার জিম্মা করিয়া দিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিব।

স্ত্রীলোক। আপনি বৃথা চেষ্টা করিবেন। আপনি আমায় ধরিতে পারিবেন না।

এই কথা শুনিয়া দাদাবাবু তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, হাত গিয়া দেয়ালে লাগিল, স্ত্রীলোকটি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া দাদাবাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইল। দাদাবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে তাহার দিকে ফিরিলেন। সে তখন

দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, দাদাবাবুও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। স্ত্রীলোকটি বরাবর যাইয়া খিড়কী খুলিয়া বাগানে পড়িল। দাদাবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বরাবর পুকুর ছাড়াইয়া তালগাছের ভিতর দিয়া বাগানের দরজা খুলিয়া একেবারে সদর রাস্তায় পড়িলেন। আগে আগে স্ত্রীলোক, পশ্চাতে দাদাবাবু, একেবারে বাগানের প্রথম ফটকের সম্মুখে। বাদামতলায় পাল্কী, পাল্কীর ছাদে একজন বাহক ঘুমাইতেছে। বাদামগাছের পশ্চাতেই একটা চাঁপাগাছ। চাঁপাগাছের কাছে আসিয়া আর স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন না। চাঁপাগাছটা বাতাসে দুলিতেছে—অতিশয় দুলিতেছে। এইবারে তাঁহার মনে একটু ভীতিসঞ্চার হইল। মনে হইল, এই সম্মুখে স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছিলাম—চাঁপাগাছের কাছে আসিয়া আর নাই। এখন কৈ, তেমন বাতাস নাই—চাঁপাগাছই বা অত দোলে কেন? তবে ত আমি একটা ছায়ামূর্ত্তির সহিত বেড়াইয়াছি। কাজটা ভাল করি নাই। ও বাটীতে আর ঢুকিতেছি না। এই স্থির করিয়া তিনি বেহারাদের জাগাইলেন। তাহারা অত রাত্রে ঐরূপ অবস্থায় বাবুকে দেখিয়া হতবুদ্ধি।

একজন বেহারাকে হুকুম দিলেন, "যা, চাকরদের সব উঠাইয়া আন্।" সে গিয়া সকলকে উঠাইয়া আনিল। তখন তিনি সেই রাত্রি প্রায় ৪ঘটিকার সময় লোকজন সমভিব্যাহারে ফিরিলেন। পরদিন বেলা ৮টার সময় বাসায় পঁহুছিলেন। কাঁথিতে আসিয়া ৪।৫দিন যায়, তিনিও ভাবেন, ব্যাপারখানা কি? একদিন সেই গ্রামের জমিদার-মহাশয়ের নিকট হইতে একজন গোমস্তা তাঁহার কাছে কি কার্য্যোপলক্ষে আসে। তাহাকে দাদাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ গো, তোমাদের মেজবাবুর বৌটি কেমন?"

গোম। আজ্ঞে সে বৌটি বড়ই সুন্দরী, ধীর, শান্তপ্রকৃতি ছিলেন।

দাদা। ছিলেন কি? তিনি এখন কোথায়?

গোমস্তা। মহাশয়, দুঃখের কথা আর কি বলিব? যে বাড়ীতে আপনি ছিলেন, সেই বাড়ীতে একবার মেজবাবু সস্ত্রীক দিনকয়েক বাস করিতে যান। একদিন জানি না কিরূপে মেজবৌটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া যান। তাহাতেই তিনি মারা পড়েন।

দাদা। ওঃ, তাই বটে! তা দেখ, তোমাদের বাবুকে বলো—সেই বৌটির গতি করিতে। বৌটি এখনও ঐ বাটীতে আছে।

এইরূপ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে গোমস্তা গৃহে ফিরিয়া গেল।

এই নিশীথপ্রেতিনীর কথা দাদাবাবু অনেকবার আমাদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন।

রণরঙ্গিণী

আদর্শ উপ-সংহার। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃদুবাহিনী কলনাদিনী ভাগীরথীর তীরে প্রশান্তপুর নামে গ্রাম। গ্রামের প্রান্তদেশে মহাস্বামী প্রেমানন্দের পবিত্র তপোবন।

নিমজ্জনোন্মুখ আরক্তিম দিনকরের নয়নবিমোহন মৃদুল রশ্মিরেখা তপোবনের তরুশিরে, কুসুমখচিত লতিকার যৌবনচলচল ঈষৎ বিকম্পিত "আলসলালস" সুকুমার দেহে নাচিতেছিল, তপোবনচ্ছায়াচুম্বিত ভাগীরথীর স্থির জলে ভাসিতেছিল, এবং কোন দুইটি মধুর-স্নিগ্ধ মুখের সন্ধানে ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীর অবকাশপথে উঁকি

* শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "ফুলজানি" উপন্যাসের উপ-সংহার।

মারিতেছিল—কিন্তু হায়, তাহার আশা কি মিটিতেছিল? জগতে কয়জনের আশা মিটিয়া থাকে? এই আমারই কথা ধর না কেন? যদি আমার নিজের অপূর্ব্ব মৌলিক রচনাবলীর মর্য্যাদা লোকে বুঝিত, যদি তাহারা আমার যশোলালসা অপিচ অর্থলালসা মিটাইত, যদি আমার উদ্দাম আশাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিত, তাহা হইলে আর আমায় এ প্রাচীন বয়সে অপর একজন লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ উপ-সংহার লিখিতে হইবে কেন? কিন্তু যাক্, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

রবিরশ্মিরেখা চিরবাঞ্ছিতের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে ম্লান হইতে ম্লানতর হইতেছিল, বিষাদের ঘনান্ধকার তাহার মুখের উপর ঘনাইয়া আসিতেছিল। হায়, হতাশের সুখ কোথায়? প্রাণ আর থাকে না, তৈলহীন দীপের ন্যায় জীবনী শক্তি বিলুপ্তপ্রায়, এমন সময়ে কাহাকে দেখিয়া ম্লান আলো আবার জ্বলিয়া উঠিল। কোন যুবক-যুবতী ভাগীরথীর মৃণ্ময় সোপান অবতরণ করিতেছিল—গৈরিক-বস্ত্রাবৃত দেহের মধ্য হইতেও তাহাদের অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রী যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। আলো ইহাদেরই দেখিয়া হাসিল কি? আলো হাসুক বা না হাসুক, পাঠক আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই হাসিতেছে। বহুকাল পরে প্রিয়সন্দর্শনজনিত উল্লাসে আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই ভরিয়া উঠিতেছে।

আপনি নিশ্চয়ই চিনিয়াছেন, এই যুবক-যুবতী কে? ইহারা আপনার সেই পূর্ব্বপরিচিত পুরন্দর ও ফুলজানি।

ফুলজানি ও পুরন্দর মরিয়া আবার বাঁচিল কিরূপে, ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছেন? ভগবানের লীলাভূমি এই বিপুল সংসারে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এখানে সকলি সম্ভব, সকলি স্বাভাবিক—শুধু জ্ঞানের অভাবেই আমরা সম্ভবকে অসম্ভব মনে করি।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেই দরবারের কথা স্মরণ

করুন—সেই সর্ব্বত্র সুরভিময়, সৌন্দর্য্যে-আলোকে উদ্ভাসিত, রূপসীবৃন্দ-পরিশোভিত রাজসভা মনে মনে কল্পনা করুন। কি দেখিতেছেন? শৃঙ্খলবদ্ধ পুরন্দর, কৃপাণহস্ত ঘাতক, পিঞ্জরবদ্ধা ফুলকুমারী। কিন্তু এই উজ্জ্বল আলোকতরঙ্গের অন্তরালে ফুলকুমারীর ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগে যে জটাজূটবিমণ্ডিত গৈরিকাম্বর-রঞ্জিত দীর্ঘাকৃতি মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই দেখেন নাই—নহিলে আমায় আর এতখানি গৌরচন্দ্রিকা লিখিয়া আমার উপন্যাসের রসভঙ্গ করিতে হইবে কেন?

জলদগম্ভীরস্বরে নবাব হাঁকিলেন, "জল্লাদ, কোতল কর।" ঘাতকের অসিফলক দীপালোকে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেই শাণিত প্রদীপ্ত তরবারি পুরন্দরের কণ্ঠদেশে পতিত হইবার পূর্ব্বেই ফুলকুমারী ছুটিয়া গিয়া আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে পুরন্দরের বীরমূর্ত্তি আবৃত করিয়া ফেলিল। সেই জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল অমরলাঞ্ছিত অপূর্ব্ব রূপলহরী ঘাতকের চক্ষে সহসা স্বপ্নবিভ্রম উপস্থিত করিল—পতনোন্মুখ অসিফলক অজ্ঞাতসারে তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। বিস্মিত নবাব সিংহাসন হইতে দ্রুতবেগে উত্থান করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবাব ফুলকুমারীর রূপসুধা মুহূর্ত্তকাল পান করিতে না করিতে কোথা হইতে এক দীর্ঘ তপস্বিমূর্ত্তি তথায় উপস্থিত হইয়া নিমেষমধ্যে অচেতন যুবক-যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া, শকুন্তলাবাহিনী উর্ব্বশীর ন্যায় চকিতে কোথায় মিলাইয়া গেল। এই তপস্বী দেশপ্রসিদ্ধ মুক্তাত্মা মহাস্বামী প্রেমানন্দ—এবং পুরন্দর ও ফুলকুমারী এক্ষণে ইঁহারই তপোবননিবাসী।

নবাব এই অপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনা দর্শনে কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বিস্ময়ের বেগ কিয়ৎপরিমাণে উপশমিত হইলে পারিষদবর্গকে বলিলেন, "এ কথা যেন কোথাও প্রকাশ না পায়!"

শ্রীশবাবু পলাশীর সন্নিকটে যে স্মৃতিস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন, তাহা এই অলৌকিক ঘটনা চাপা দিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার গাত্রে—

"ফুলে এত ভালবাসা আগে যদি জানিতাম
তা হ'লে কি তারে কভু বৃন্তচ্যুত করিতাম।"

এই কবিতাপংক্তি খোদিত থাকিলেও তাহার তলদেশে ফুলকুমারীর চিহ্নমাত্র ছিল না। ফুলকুমারীর চিহ্ন কোথায় ছিল, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠক আমার এই উপ-সংহার পাঠে অবগত হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"কিন্তু গুরুদেব, এ অপমানের প্রতিশোধ আমি লইবই, আমাদের সুখনিশার যে এইরূপে অবসান করিয়াছে, তাহাকে আমি কখনই সুখে মরিতে দিব না।"

"বৎস অধীর হইও না। ভগবানের কৃপায় তোমাদের বিশেষ কোন অপকার হয় নাই।"

"অপকার? অপকারের আর বাকী কি? মৃত্যুর কথা বলিতেছেন? মৃত্যুকে আমি অপকারের মধ্যেই গণ্য করি না। কিন্তু জীবন্মৃত্যু—লোকনিন্দা, সমাজের তীব্র উপহাস! আপনি কি মনে করেন, আমি আবার এই ফুলকুমারীকে লইয়া আমার শান্তির কুটীর রচনা করিতে পারিব? সমাজ তাহার বিশীর্ণ ঘৃণার অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিবে না,—'এই ফুলকুমারী নবাবের উপভুক্তা,' বলিবে না,—'এই অপদার্থ পুরন্দর ঘৃণিত কুলটার স্বামী?' তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! অপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? সংসারে আমাদের মরিতেই হইবে, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল আমাদের সর্ব্বনাশকারীকে দিয়া যাইবই।"

পুরন্দরের নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল—নাসারন্ধ্র ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। মহাস্বামী প্রেমানন্দ ধ্যানস্থ হইলেন। কিছুকাল পরে নয়ন উন্মীলন করিলেন, তাঁহার সেই প্রশান্ত বদনমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎস, অদৃষ্ট-লিপির খণ্ডন হয় না। তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

পুরন্দর কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে গুরুদেব, কবে?" স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর অধিকদিন বিলম্ব নাই, বঙ্গদেশে অতিশীঘ্র যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে, হতভাগ্য নবাব তাহাতেই ভস্মীভূত হইবে। তুমি এই দাবানলে ইন্ধন প্রদান করিবে। আগামিনী অমাবস্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাটীতে বিদ্রোহীদের এক গুপ্তসভা বসিবে, তুমি সেইখানে উপস্থিত থাকিয়া বিদ্রোহিদলের সঙ্গে যোগদান করিবে ও তাহাদের উৎসাহপ্রদানে প্রয়াস পাইবে তার পর লর্ড ক্লাইব যখন নবাবকে আক্রমণ করিতে আসিবেন, তখন তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইবে।"

পুরন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর, ফুল?" মহাস্বামী কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "হায় ভগবান্, তাহার অদৃষ্ট তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে দৃঢ়গ্রথিত।" স্বামীর নেত্রে যেন একবিন্দু অশ্রুসঞ্চার হইল। পুরন্দর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাটোয়ায় ভাগীরথীতীরে ব্রিটিশশিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রভাতের স্বর্ণকিরণে মণ্ডপের উচ্চচূড়া সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে। যোদ্ধৃবর্গের অসিফলকে—শিরস্ত্রাণে রবিরশ্মি আন্দোলিত হইতেছে। লর্ড ক্লাইব এক চেয়ারে বসিয়া সৈনিকবর্গের কুচ্‌কাওয়াজ্ দেখিতেছেন। পলাশীর সমরক্ষেত্র ভাবিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল

কখন তেজোদীপ্ত, কখন বিষাদমলিন হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল, "এক যুবক ও একটি যুবতী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" ক্লাইব বিস্মিতচিত্তে ভাবিলেন, "যুবতী!—এই সেনানিবাসে যুবতী! কিছু বিস্ময়ের কথা বটে।" প্রকাশ্যে দ্বাররক্ষককে বলিলেন, "আসিতে দাও।"

ক্ষণকাল পরে গৈরিকপরিহিত যুবক-যুবতী সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইল। উভয়েই দর্শনীয় বটে। একজনের বলিষ্ঠ দেহে, সুদৃঢ় কলেবরে বীরত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট অঙ্কিত, বিশালোজ্জ্বল তেজোদীপ্ত নয়নে বীরগর্ব্ব সম্যক্ পরিস্ফুট—অপরের স্নিগ্ধ-সুন্দর সুগঠিত অবয়বে লজ্জার মধ্য হইতেও যেন একটা তেজোদীপ্তি রঞ্জিত-স্ফটিকারত আলোকের ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ক্লাইব কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে এই অপূর্ব্বসুন্দর যুবক-যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি আবশ্যক?" পুরন্দর ধীরে ধীরে বলিলেন. "নবাব আমাদের সঙ্গে পরম শত্রুতা করিয়াছে, আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। অবগত হইলাম, আপনি নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন—আমরা আপনার সৈন্যদলভুক্ত হইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে চাহি।"

ক্লাইব ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কেমন করিয়া বুঝিব, আপনারা নবাবের গুপ্তচর নহেন?"

পুরন্দরের আয়ত চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। পুরন্দর আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "বীরহৃদয় প্রবঞ্চনা জানে না। আমার নিকট মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চিঠি আছে। ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন।" পুরন্দর ক্লাইবের হস্তে পত্র সমর্পণ করিলেন। ক্লাইব পত্রপাঠ করিয়া একবার ফুলকুমারীর দিকে তৃষিতনয়নে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, "এমন অনুপম সুন্দরী আর কখনো দেখিয়াছি কি? কই মনে ত হয় না।" কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন আপনাদের পাঠাইয়াছেন, তখন আর আমার সন্দেহ অনাবশ্যক। আপনারা এখন বিশ্রাম করুন।" প্রহরী পুরন্দর ও ফুলজানিকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আবাস দেখাইয়া দিল। সেনাপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর। যামিনী জ্যোৎস্নালোক-পুলকিত। অনেকক্ষণ শয্যায় শুইয়া শুইয়া পুরন্দর ঘুমাইলেন, কিন্তু ফুলকুমারীর ঘুম হইল না। এত পরিবর্ত্তনে রমণীহৃদয় স্থির থাকিতে পারে কি? কোথায় অন্তঃপুর, কোথায় রণক্ষেত্র!—কোথায় স্বল্পভাষিণী সলজ্জা বধূ, কোথায় প্রগল্‌ভা রণরঙ্গিণী! ভূতভবিষ্যতের চিন্তায় ফুলকুমারীর কোমল হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি দ্বার খুলিলেন।

সম্মুখেই অনন্তবিস্তৃতা বীচিবিক্ষোভিতা কলনাদিনী ভাগীরথী। জ্যোৎস্নালোকে মরি মরি কি সুন্দর! ফুলকুমারী এ প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ভাগীরথীর কূলে গিয়া উপবেশন করিলেন। মুহূর্ত্তে ভাগীরথী তাঁহার শীকরসম্পৃক্তবায়ুকরে তাঁহার সকল চিন্তা—সকল দুর্ভাবনা অজ্ঞাতসারে মুছিয়া লইলেন। ফুলকুমারী কোন্ স্বপ্নলোকে—কোন্ নন্দনকাননে অজ্ঞাতে ভাসিয়া গেলেন।

কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলেন মনে নাই, সহসা সম্মুখে ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একদৃষ্টিতে ক্লাইব তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। সন্ত্রস্তা ফুলকুমারী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ক্লাইবের চমক ভাঙিল। ক্লাইব মধুরস্বরে বলিলেন, "আপনার কোন আশঙ্কা নাই, প্রেমিকের নিকট প্রেমিকার আশঙ্কা কি?" ফুলকুমারীর আয়ত নেত্র জ্বলিয়া উঠিল, রুদ্ধ দন্তের মধ্য হইতে গর্জ্জনের মত বাহির হইল—"প্রেমিকা!" ক্লাইব শিহরিয়া এক পা

সরিয়া গেলেন, তার পর সহসা জানু পাতিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় দেখিয়া অবধি উন্মত্ত হইয়াছি। তোমার জন্য আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি, বাংলার সিংহাসন চূর্ণ হউক, ইংরাজের বাণিজ্য রসাতলে যাউক—তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। চল আমরা এই নিশীথরাত্রে ভাগীরথী বাহিয়া কোন নির্জ্জন দূরদেশে চলিয়া যাই।"

ফুলকুমারী কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "যুদ্ধের পূর্ব্বদিনে নিশীথরাত্রে চোরের মত পরস্ত্রীর নিকট প্রেমভিক্ষা করা, এ ইংরাজসেনাপতির উপযুক্ত বটে! হায় মীরজাফর, এই কাপুরুষ ইন্দ্রিয়াসক্ত ইংরাজের উপর নির্ভর করিয়া তুমি সুপ্তসিংহকে জাগাইতে যাইতেছ! তোমার দুর্গতি অনুমেয়, সন্দেহ নাই।" তীব্র বিদ্রূপধ্বনি দিকে দিকে নৈশপবনে প্রবাহিত হইল। ক্লাইব ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, তেজোময়ী রমণী কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধবেশী সৈনিকবৃন্দে পরিপূর্ণ পলাশী আজ ভীমকান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সৈনিকের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, বায়ুরাশি বিকম্পিত করিতেছে।

সহসা উভয় পক্ষের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র কোলাহল বৃহৎ শব্দসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। তার পর কামান-গর্জ্জন, ঘনঘন ধূমোদ্গার, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অশনিনিনাদ, কর্ণ বধিরপ্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল। যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

মুসলমান হুহুঙ্কার করিয়া ইংরাজসৈন্যের উপর তীরবেগে আসিয়া পড়িল। নিষ্কোষিত অসিফলক প্রভাতরৌদ্রে জ্বলিয়া উঠিল, অঙ্গের

বর্ম্ম ঝনঝনশব্দে নিনাদিত হইল। হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহসা ইংরাজের গোলায় সেনাপতি মীরমদনের প্রাণবায়ু মহাকাশে মিশাইয়া গেল। নবাবসৈন্য ক্ষণেকের জন্য ছত্রভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল, ক্ষণেকের জন্য রণপয়োধি আলোড়িত হইল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। মোহনলালের ক্ষত্রিয়বীরত্বে মুসলমান আবার জাগিয়া উঠিল, আবার প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল।

ইংরাজসেনাপতির জীবন সঙ্কটাপন্ন। মোহনলালের অসির আঘাতে ক্লাইবের তরবারি খসিয়া পড়িয়াছে, এইবার তাহার প্রচণ্ড আঘাত ইংরাজসেনানীকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। কিন্তু একি হইল? পতনোদ্যত অসিফলক কাহার অসির উপর পড়িয়া দ্বিধা ভগ্ন হইয়া গেল? মোহনলাল চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অপূর্ব্ব রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি, চক্ষে তাড়িতালোক, বদনে বীরত্বগৌরব, আলুলায়িত কুন্তলদাম, গৈরিকবসনাবৃত অলোকসামান্য রূপরাশি! মোহনলাল শিহরিয়া উঠিলেন,—চণ্ডী রণভূমে অবতীর্ণা মনে করিয়া সেই বীররমণীকে প্রণাম করিয়া দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে কাহার গুলি আসিয়া রমণীর বক্ষ ভেদ করিল। রমণী ভূতলে পড়িয়া গেলেন। পতনোদ্যতা সুন্দরীকে ধরিবার জন্য ক্লাইব বাহুপ্রসারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তীব্র ভ্রূকুটিভঙ্গিদর্শনে স্পর্শ করিতে সাহস করেন নাই। ভূতলে পড়িয়া ফুলকুমারী বলিলেন, "আমার স্বামীকে বলিও, আমার মনে বড় দুঃখ রহিল, ব্রত সম্পূর্ণ না করিয়াই আমায় মরিতে হইল, তিনি যেন ব্রত সম্পূর্ণ করেন।" ক্লাইব পুরন্দরকে সংবাদ দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, "রমণি, তুমি মরিয়া গেলে, কিন্তু আমায় চিরদিনের মত জীবন্মৃত করিয়া ফেলিয়া গেলে।" সকলেই জানেন, ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ ইহার উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন

নাই। কিন্তু পাঠক এখন বুঝিলেন, এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিই তাঁহার জীবননাশের কারণ। হায় রমণীর রূপ!

পুরন্দর যথাসময়ে এ সংবাদ পাইলেন। তিনি ইহাতে আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া যবনসৈন্য মথিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মীরজাফরের ঘোষণায় যুদ্ধ শীঘ্র থামিয়া গেল। তখন পুরন্দর ভাবিলেন, "তাহা হইলে পাপিষ্ঠ নবাবের শাস্তি হইল কৈ?" কি চিন্তা মনে উঠিল, জানি না; পুরন্দর দ্রুতবেগে সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

তিনদিন পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করিয়া যে ফকিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফকির পুরন্দর!* পুরন্দর পারসী ভাল জানিতেন, হাফেজ পড়িয়া "দেওয়ানা" হইতেন, সুতরাং আসল ফকিরের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার পক্ষে ফকির সাজা কঠিন হয় নাই। নবাবকে ধরাইয়া দিবার সময় মর্ম্মভেদী বিদ্রূপের স্বরে ফকির নবাবকে বলিয়াছিল, "ফুলে কত মধু, তাহা আজ বোধ হয় বুঝিয়াছ!" তার পর পুরন্দরের কি হইল? সে অনেক কথা। সম্পাদকমহাশয় বলিতেছেন, আর স্থান নাই। কিন্তু প্রিয় পাঠক, এ অধীনের প্রতি যদি আপনাদের করুণা থাকে, তাহা হইলে সম্পাদকমহাশয় আমায় কয়দিন ঠেকাইবেন? আমি শ্রীশবাবুকে শেষ করিয়া ক্রমে অন্যান্য জীবিত গ্রন্থকারেরও উপ-সংহার করিব!

শ্রীঅপ্রকট-চন্দ্র-ভাস্কর।

ভগবতী-প্রসঙ্গ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মা ও ছেলে।

বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ-গ্রামের বসতবাটী যখন অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সেই "বীরসিংহ গ্রামের মা" ভগবতী দেবী বলিলেন, "যে সকল গরিব লোকের ছেলে এখানে থাইয়া গ্রামের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে, তাহাদের উপায় কি হইবে?

একবার মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর তাঁহার জননী ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ৫।৭শত টাকা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে মাসে মাসে ঐ টাকায় সাহায্য করা ভাল।" ইহা শুনিয়া ভগবতী দেবী বলিলেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক দু'বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইলে পূজা উপলক্ষে অনর্থক খরচ করিবার আবশ্যক কি?" কথাগুলি আজকালকার শিক্ষিতা মহিলার মুখ হইতে বাহির হইলে তত বিস্ময়কর বোধ হইত না; কিন্তু যে সমাজে শাস্ত্র ও দেশাচারের বন্ধন তখনকার রমণীকুলের নিকট সুদৃঢ় ছিল, সেই হিন্দুসমাজের প্রাচীনা রমণীর মুখ হইতে এমন স্বাভাবিক উপদেশ যে বহির্গত হইতে পারে, এ কথা বড় বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। ভগবতী দেবী তাঁহার স্বাভাবিক সুনির্ম্মল বুদ্ধিবলে বুঝিয়া-

ছিলেন যে, প্রকৃত অভাব যাঁহার, তাঁহার সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। মাতার উপযুক্ত পুত্র বিদ্যাসাগর-মহাশয়ও এই সুনির্ম্মল স্বাভাবিক সংস্কারকে আজীবন হৃদয়ে পরিপোষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতামাতার প্রতি বিদ্যাসাগরের অকপট ভক্তি ছিল বলিয়া তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ হইয়া ঘোরতর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন এবং সেই ভক্তিবলেই পরিণামে দাতাও হইয়াছিলেন। তিনি যে আপনার হৃদয়ে জ্ঞান ও ন্যায়সঙ্কল্পের সরল পথ অবলম্বনে, প্রশস্ত বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবলে, স্বীয় দরিদ্রতা নষ্ট করিয়া পরিশেষে সহস্র সহস্র ব্যক্তির আশ্রয়দাতা হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার অলৌকিক পিতৃমাতৃভক্তি ও তাঁহাদের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ। জনকজননীর এই আশীর্ব্বাদের বলে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিজয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জনকজননীর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইলে, তাঁহাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিলে, তাঁহাদের মনে সৎকর্ম্মদ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে, যে পুণ্যসঞ্চয় হইবে ও পরকালের পথ যেরূপ সরল হইবে, দেশাচারসম্মত শাস্ত্রবিধি পালন করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিলে তাহার শতাংশের একাংশও হইবে কি না, সন্দেহ; কেন না, দেশাচারানুগত কর্ম্মাদির ফলাফল অনিশ্চিত,—দেশাচার পালন করিলে কেবল সমাজে সুখ্যাতি ও না করিলে কেবল সমাজেই অখ্যাতি হয়, পাপ ও পুণ্য কেবল সমাজেই থাকিয়া যায়; কিন্তু প্রত্যক্ষ দেবদেবী পিতামাতার সেবা করিলে নিশ্চয়ই পরলোকের মঙ্গল হইয়া থাকে।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়-প্রণীত "বিধবাবিবাহবিচার" গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বালিকা বিধবাগণের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া, কেবল পতিসংসর্গবিহীনা বালিকা বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া

বর্ত্তমান দেশাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অকাল-বৈধব্যজনিত ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি সামাজিক অনিষ্ট তাঁহার দয়া-ধর্ম্মকে প্রণোদিত করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যদি কেহ ভগবতী দেবীর মতামত জিজ্ঞাসা করিত, তাহাতে তিনি বলিতেন যে, ঈশ্বর অত-বড় পণ্ডিত হ'য়ে যখন বিধবাবিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রচার করিতেছে, তখন অবশ্যই উহা ভাল কাজ; আমি স্ত্রীলোক হ'য়ে উহার ভাল-মন্দ কি বিচার করিব।" *

বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবী সকলকেই সমান ভাবে দেখিতেন। তাঁহার আত্মপরজ্ঞান ছিল না। একসময় বিদ্যাসাগরবন্ধু সিভিলিয়ান্ হ্যারিসন্-সাহেব সরকারিকর্ম্ম উপলক্ষে মেদিনীপুর গমন করেন। এই কথা শুনিয়া ভগবতী দেবী পুত্রের ম্লেচ্ছ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বীরসিংহে লইয়া আইসেন। এমন কি, বৃদ্ধা ভগবতী দেবী হিন্দু হইয়া সাহেবের ভোজনস্থলে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুর অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছের প্রতি এইরূপ আত্মীয়তা ও সৌজন্যে সাহেব বড় আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহার স্নেহ ও বাৎসল্যের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, কুসংস্কারহীনা উদার ও উন্নতহৃদয়া প্রবীণা মিত্রজননী ভগবতী দেবীকে হিন্দুপ্রথামত মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। মহামতি হ্যারিসন্-সাহেব প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, আপনার কত টাকা আছে?" বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবী সম্মুখস্থ পুত্রদিগকে দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, "কেন, আমার এই কয় ঘড়া টাকা † আছে।" সাহেব বৃদ্ধার এই রহস্যালাপ বুঝিতে

* নারায়ণবাবুর মুখে এইরূপ শুনিয়াছি।

† আমার বৃদ্ধা পিতামহীকে কেহ ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনিও তাঁহার পুত্রদের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, "আমার ভাবনা কি, আমার যতগুলি পুত্র, তত-ঘড়া টাকা।"—লেখক।

পারিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! তুমি সামান্যা রমণী নও, এমন না হইলে কি (বিদ্যাসাগরকে দেখাইয়া) এমন ছেলে হয়!"

কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি উচ্চ, কি নীচ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকল শ্রেণীর সকল লোকের প্রতিই তাঁহার সমান দয়া, সমান দৃষ্টি ও সমান স্নেহ ছিল। একবার বিদ্যাসাগর-মহাশয় কলিকাতা হইতে কয়েকখানি লেপ প্রস্তুত করাইয়া বীরসিংহের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। দয়াময়ী ভগবতী দেবী সেগুলি লইয়া দরিদ্র প্রতিবেশিগণকে দান করিয়া তাহাদের শীতনিবারণের উপায় করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে তাহাদের জন্য আর কয়েকখানি লেপ পাঠাইয়া দিতে বলিয়া পাঠান। মাতার এই দয়ার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর অতীব আহ্লাদ সহকারে আরও কয়েকখানি লেপ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

মাসিক পত্র।

(আষাঢ়)

৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৩০৯।

কলিকাতা,
৯৮ হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভগবতী-প্রসঙ্গ ...	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	২১৯
কাব্যকথা	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এল ...	২২৬
চিত্র-চয়ন	শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	২৩১
কবিতা-গুচ্ছ		
অনাদৃতা	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২৩৫
আত্মসমর্পণ	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়	২৩৭
সুন্দরী	ঐ	২৩৮
বলপ্রার্থনা	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	২৩৯
সমালোচনার সমালোচন	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	২৪০
তৈমুরের সদাশয়তা ...	শ্রীইমদাদল হক, বি, এ, ...	২৪২
সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্ ...	শ্রীনবকুমার দত্ত	২৫৫

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা ১৲, উত্তরচরিত ১।০, রত্নাবলী ৸০, মালতী-মাধব ১।৵০, মুদ্রারাক্ষস ১।০, মৃচ্ছকটিক ১৷৷০, মালবিকাগ্নিমিত্র ৸০, বিক্রমোর্ব্বশী ৸০, মহাবীরচরিত ৸০, চণ্ডকৌশিক ৸০, বেণীসংহার ১।৵। উক্ত গ্রন্থকারের মনোহর প্রহসন হঠাৎ নবাব ।৵০।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন কাব্য—নৈবেদ্য ১৲, রবিবাবুর—নূতন ও পুরাতন ছোট ছোট গল্প একত্রে সংগ্রহ "গল্পগুচ্ছ" দুই খণ্ড উত্তম বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা ৪৷৷০, "কাব্যগ্রন্থাবলী" কুড়িখানি কবিতাপুস্তক ৬৲ স্থলে পাঁচ টাকা, গল্পগুচ্ছ ও কাব্যগ্রন্থাবলী একত্রে লইলে আট টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"ফুলজানি"—(২য় সংস্করণ) উপন্যাস। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য বাঁধা ১।০, কাগজে ১৲।

শ্রীশবাবুর অন্যান্য উপন্যাস—শক্তিকানন ১৲। বিশ্বনাথ ১৲, কৃতজ্ঞতা ৸০, রবীন্দ্র বাবুর—নূতন ধরণের কাব্য—কথা ১৲, কাহিনী ১৲, কল্পনা ১৲, ক্ষণিকা ১।০, কণিকা ৷৷০।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী (ঈশান বাবুর) দুইখানি বিভিন্ন বয়সের ছবি সমেত, মূল্য ৷৷০। কণ্ঠমালা—উপন্যাস সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন সংস্করণ মূল্য ১।০।

প্রাপ্তির স্থান—

মজুমদার লাইব্রেরি।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

মেধাকর রসায়ন।

মেধাকর রসায়ন, মেধা ও স্মৃতিবর্দ্ধক, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাসম্পাদকস, বল ও পুষ্টিকারক, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা-নিবারক, সকল প্রকার মানসিক দোষের (অপস্মার, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির) নিবারক এবং সুনিদ্রাপ্রদায়ক, আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষিত মহৌষধ। প্রনষ্ট ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি করিতে, ইহার মত প্রত্যক্ষফলদায়ক ঔষধ আর নাই; সুতরাং ইহা বিদ্যার্থীর প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। মেধাকর রসায়নের, মূল্য সাতদিনে দেড়, পনরদিনে আড়াই এবং এক মাসে সাড়ে চারি টাকা।

সুকল্যাণ তৈল।

সুকল্যাণ তৈল, ঊর্দ্ধজত্রুগত বাত ও পিত্তজাত শিরোরোগ নিবারক। ইহাতে উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি রোগের উপশম হয়, মনের অস্থিরতা দূর হয়, মাথাঘোরা বা কামড়ান নিবারিত হয়, এবং সত্বর সুনিদ্রার সঞ্চার হয়। ইহা অতিশয় স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট। মূল্য বড় শিশি দুই এবং ছোট শিশি দেড় টাকা।

অম্লশূলান্তক ১৫ দিনে ১৲। ক্ষুধাসাগর ১৫ দিনে ১৲।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত,—"আমার ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান্ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থের ঔষধ আমার বহুপরীক্ষিত। ইহার ঔষধে রোগীর প্রকৃত উপকার হইবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস। অম্লশূলান্তকে অম্ল ও শূলরোগের তীব্রবেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক; ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উষা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ।

১৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ বিডন্ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অমৃতবল্লী কষায়।—আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, উপদংশ দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও গাব-ভীয়, দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া, শরীর পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারক। ইহা সকল সময় সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ আনা।

কুটজারিষ্ট।—(রক্তাতিসার, আমরক্ত ও গ্রহণীর মহৌষধ।) ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তাতিসার, আমরক্ত, গ্রহণী, শোথ ও তৎসঙ্গে অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত জ্বর সত্বর উপশমিত হয়।

২ সপ্তাহের ব্যবহারোপযুক্ত ১ শিশি ঔষধ ও দুই প্রকার বটিকার মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ দশ আনা।

অগ্নিদীপক।—ইহা সেবনে প্রবল অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বার অজীর্ণ ও তজ্জন্য তরল মলনির্গম, দম্‌কা ভেদ, উদরাধ্মান, অম্লোদ্গার প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব আশু নিবারিত হইয়া, অগ্নির উদ্দীপ্তি, আহারে রুচি, সম্যক পরিপাক, কোষ্ঠশুদ্ধি, শরীর হাল্কাবোধ, মনের প্রফুল্লতা প্রভৃতি সুন্দররূপে উৎপন্ন হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০।

অশোকারিষ্ট।—ইহা সেবনে বাধক, রজঃ অনির্গম, অতিরিক্ত রজঃনির্গম, প্রদর, শ্বেতপ্রদর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, আর্ত্তবের বিবর্ণতা, উদরের বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া জরায়ু পরিশোধিত হইয়া থাকে, এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক শিশি অশোকারিষ্ট ও এক কৌটা (১৬টী) বটিকার মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ দশ আনা। ভিঃ পিতে লইলে ২৷০ সোয়া দুই টাকা মাত্র।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৯। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভগবতী-প্রসঙ্গ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও তীর্থযাত্রা।

বৃহৎ পরিবার এক দিকে যেমন সুখকর ও আনন্দদায়ক, অপর দিকে তেমনই ক্লেশকর ও যন্ত্রণাদায়ক। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস এক দিকে পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া যেমন আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনই নানাপ্রকার পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, সংসারে বাস করা তাঁহার পক্ষে ক্রমশ ভারাবহ বোধ হইতে লাগিল। এই কারণে শান্তিপ্রিয় ঠাকুরদাস শেষ জীবনে শান্তিসুখে নশ্বর জীবন

অতিবাহিত করিবার জন্য তীর্থবাস মনস্থ করিয়া পুত্র বিদ্যাসাগরের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

বিদ্যাসাগর-মহাশয় বৃদ্ধ পিতামাতাকে একদণ্ডও চক্ষের অন্তরালে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। পিতা ঠাকুরদাস কাশী যাইবার প্রস্তাব করিলে বিদ্যাসাগর কলিকাতা হইতে আকুলভাবে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, "এ বৃদ্ধবয়সে বিদেশে একাকী বাস করা আপনার কোনমতে উচিত নয়। যে ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদি এত পরিবার, তিনি যে শেষ বয়সে একাকী অনাথের ন্যায় অতি কষ্টে বিদেশে কালহরণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আপনার একাকী কাশীবাস আমি কোনমতে সহ্য করিতে পারিব না।" এইরূপে অনেক বুঝাইয়াও বিদ্যাসাগর পিতাকে কাশীযাত্রা হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত যুক্তি ও বিনয়পূর্ণ বাক্য পিতার নিকট একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

পিতৃদেবের কাশীযাত্রা নিবারণ করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর-মহাশয় এক কৌশল স্থির করিয়া পুত্র নারায়ণকে বলিলেন, "তোমায় ত বাবা বড় ভালবাসেন, একদণ্ড চক্ষের অন্তরালে রাখিতে চান না। দেখ, বাবা কাশী যাইতেছেন, অনেক বুঝাইয়াও তাঁহার কাশীযাত্রা নিবারণ করিতে পারিলাম না। অতএব তুমি বাবাকে বল যে, আমিও তোমার সহিত কাশী যাইব, তুমি যাইতে চাহিলে তিনি অবশ্যই কাশীযাত্রায় বিরত হইবেন।" পিতার কথায় নারায়ণ পিতামহের নিকট তাঁহাকে কাশীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। পৌত্র নারায়ণচন্দ্র তাঁহার সহিত কাশী যাইতে চাহে শুনিয়া, তিনি তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়গণকে বলিলেন, "দেখ, আমার বুঝি কাশীবাস ঘটিল না। একে ঈশ্বর অমত করিতেছে, তাহার

উপর আবার নারায়ণ কাশী যাইবে বলিয়া খেপিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, অশান্তিময় সংসারে না থাকিয়া তীর্থবাসে ইষ্টদেবপূজায় জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে কাটাইব, তাহা বুঝি আর হইল না।" পরে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর, আমার কাশী যাওয়া বুঝি হইবে না, নারায়ণ খেপিয়াছে, সে কাশী যাইবে।" বিদ্যাসাগর-মহাশয় মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তা' বলিয়া আমি আপনাকে আর এ বয়সে দেশে (বীরসিংহে) রাখিব না।" * কিন্তু কি জানি, পরে আত্মীয়বর্গের উত্তেজনায় আবার তিনি কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এবার আর কাহারও কোন আপত্তি শুনিলেন না। ঠাকুরদাস কাশীযাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে পত্নী "ভগবতী দেবী"ও কাশী যাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সতীবাক্য—বেদবাক্য।

"ভগবতী দেবী" পতিসেবার্থ কাশীধামে বাস করিতে যাইলেন বটে, কিন্তু পুত্রপৌত্রাদি আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করিয়া দূরদেশে বাস করা পুত্রবৎসলা ভগবতী দেবীর মনঃপূত হইল না। তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বীরসিংহে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার পূর্ব্বে কাশীতে পতি ঠাকুরদাসকে বাড়ী লইয়া আসিবার জন্য অনেক চেষ্টা পান, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই মত করেন নাই। পতিপরায়ণা ভগবতী দেবী পতিদেবতাকে বলিয়া আইসেন, "কর্ত্তা! এখনও তোমার যাবার অনেক বিলম্ব আছে; আমি যেখানেই থাকি, এই কাশীতে আসিয়া

* নারায়ণবাবুর মুখে এইরূপ শুনিয়াছি।

তোমার আগে মরিব, আমার পর তুমি যাইবে। তাই বলি কর্ত্তা! তোমার যাবার এখনও বিলম্ব আছে। বাড়ী চল, এত আগে পা বাড়াইয়া রহিলে কেন?" কিন্তু ঠাকুরদাস কিছুতেই সম্মত হন নাই। সুতরাং ভগবতী দেবী বীরসিংহে চলিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে কাশীধাম হইতে সংবাদ আসিল যে, ঠাকুরদাস পীড়িত ও শয্যাগত হইয়াছেন। এই অমঙ্গলসংবাদে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ১২৭৭ সালের ২রা ফাল্গুন তারিখে দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র নামক অনুজদ্বয় এবং জননী ভগবতী দেবীকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন ও পশ্চাৎ আপনিও গমন করিলেন।

গুণশীলা স্ত্রী ও পুত্রগণের সেবাশুশ্রূষায় কর্ত্তা ঠাকুরদাস সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পিতা আরোগ্য লাভ করিলেন দেখিয়া, কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর মাতা ভগবতী দেবী ও অনুজদ্বয়কে তথায় রাখিয়া আপনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। এদিকে সর্ব্বগুণান্বিতা পত্নী পতিপরিচর্য্যায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া পতিকে আরোগ্য করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু ঐ সালের শেষ দিনে (চৈত্রমাসের মহাবিষুব-সংক্রান্তির দিন) ভগবতী দেবী বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিলেন, পতিপ্রাণা সতী পতি-পুত্র রাখিয়া নশ্বর দেহ ছাড়িয়া গেলেন। সতীবাক্য বেদবাক্য হইল!

পুণ্যবতী ভগবতী দেবীর অভাবে বীরসিংহ আজ কাঁদিয়া আকুল!—বীরসিংহের প্রত্যেক নরনারী যে ভগবতী দেবীকে "বীরসিংহের মা অন্নপূর্ণা" বলিয়া ডাকিত। আজ যেন তাহারা আশ্রয়হীন ও মাতৃহীন হইয়া পথে পথে রোদন করিয়া বলিতেছে :—

"তুমি মা জগদ্ধাত্রী সংসারপালনকর্ত্রী
স্নেহময়ীবেশে,
পুণ্য অমৃতের ভূমি স্বরগের দেবী তুমি
মানবের দেশে॥

কেউ কোথা নাহি যার তুমিই সকলি তার
জুড়াও পরাণ,
তাই মা তোমার নাম আনন্দশান্তির ধাম
বুকে উঠে তান।" *

বৃদ্ধ ঠাকুরদাস শেষ জীবনে পত্নীশোকে মৃতপ্রায় হইয়া সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি পুণ্যবতী স্ত্রী, আপনার পুণ্যে আপনি আগে চলিলে, তোমারই জিত্ হইল।" আর মুদিতনয়না ভগবতী দেবী সেই নিষ্পন্দ দেহে যেন পতির মর্ম্মান্তিক কথার উত্তরে বলিতে লাগিলেন :—

"আজি * * * তোমার চরণে
এ দাসী বিদায় মাগে।
জনমের মত দুই এক কথা
কহিতে বাসনা জাগে॥
তোমার আশিষে চলিনু স্বরগে
মরলীলা করি সায়।
কৃতজ্ঞতারসে উথলিছে প্রাণ,
শেষ নমস্কার পায়॥" †

আবার হাসিতে হাসিতে অপরাধিনীর ন্যায় যেন বলিতেছেন :—

"তোমার প্রেয়সী, হ'য়ে ধরাতলে
ছিলাম অতুল সুখে,
বৈকুণ্ঠের দ্বার, খুলিল আবার
কাঁদিব কিসের দুখে?

* কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১২শ পৃষ্ঠা।

† কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৪৬তম পৃষ্ঠা।

মনে রেখ নাথ, রমণীহৃদয়
ভালবাসা-প্রস্রবণ,
প্রিয়তম পতি, জগতের গতি
প্রাণের সর্ব্বস্ব ধন।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
তুমিই আমার সার
এ জনম তরে চলিলাম তবে
করি শেষ নমস্কার।" *

এই ভগবতী দেবীর ন্যায় মহীয়সী রমণীর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া কবি বলিতেছেন :—

"তুমি ত মানবী নহ * * *
এই দয়া—এই স্নেহ মানবীর নহে।
নহে রূপ মানবীর, মানবীর প্রাণে হায়!
কোথা এইরূপ দয়া-মন্দাকিনী বহে?" †

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাতৃভক্তের কথা।

যথাসময়ে ভগবতী দেবীর মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইল। স্নেহময়ী জননীর নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মাতৃভক্ত পুত্র বিদ্যাসাগর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, জননীর শেষ দশায়

* কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৪৬তম পৃষ্ঠা।
† কুরুক্ষেত্র কাব্য, ৮ম সর্গ।

"মা" এই মধুর সম্ভাষণে ডাকিতে পারিলেন না, রোগশয্যায় জননীর সেবায় বঞ্চিত হইলেন, এই বলিয়া মাতৃ-সেবক বিদ্যাসাগর অহোরাত্র বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেন। হায়! যিনি মায়ের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র সংস্কৃত-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে ছুটি না পাইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে সুদূর বীরসিংহগ্রামে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছিলেন—পথে ভীষণ দামোদর-নদের খরস্রোতও যাঁহার মাতৃ-শ্রীচরণদর্শনলালসা রোধ করিতে পারে নাই—যিনি প্রাণের উৎকণ্ঠায় দুস্পার দামোদর অবাধে সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন এবং বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চিরপূজ্য জননীর শ্রীচরণদর্শনে সে উৎকণ্ঠা দূর করিয়াছিলেন, মাতৃভক্ত তেজীয়ান্ কর্ম্মবীর সেই বিদ্যাসাগর আজ মাতৃহীন! এমন মাতৃসেবকের নিকট জননীর এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ যে কি মর্ম্মান্তিক ও যাতনাদায়ক, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য!

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কলিকাতার নিকট কাশীপুরস্থ গঙ্গাতীরে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া একবৎসর কাল সর্ব্ববিধ বিলাসসুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন। নির্জ্জনে স্বহস্তে পাক করিয়া একসন্ধ্যা নিরামিষ আহারে দিন কাটাইতেন। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মমত একবৎসর বিনামা, ছত্র ও কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" দীন-হীন-কাঙালের ন্যায় অতিকষ্টে দিনযাপন করিয়াছিলেন।

ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠা বধূ—বিদ্যাসাগরের পত্নী "দিনময়ী"ও ঠিক হিন্দুগৃহের গৃহিণী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরূপ গুণবতী ছিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া গরীবদুঃখীদিগকে আহার করাইতেন। এমন গুণশীলা জননী ও এমন গুণবতী পত্নী, এই উভয় রত্ন বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাভাগ্যবান্ পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও

ভাগ্যে ঘটে না। ভগবতী দেবীর মৃত্যুর কয়েকবৎসর পরেই স্বামী ঠাকুরদাস বৃদ্ধবয়সে পত্নীশোকে দেহবিসর্জ্জন করেন।

জননীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বীয় জননীর প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র "ভগবতী"নামের স্মরণার্থ জন্মভূমি বীরসিংহ-গ্রামে "ভগবতী বিদ্যালয়" নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

কাব্যকথা।

প্রকৃতিপ্রত্যয়সাধিত শব্দবিশেষের নাম পদ। সঙ্কেত ও লক্ষণা দ্বারা পদের বৃত্তি বা অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অন্যথা মাত্র শব্দোচ্চারণে শব্দার্থবোধ হয় না। "বারি" এই শব্দে বৃদ্ধ-ব্যবহারাদিজনিত সঙ্কেতদ্বারা দ্রব দ্রব্যবিশেষে শক্তিগ্রহ না থাকিলে, "বারি আনয়ন কর" শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র জল আনয়নের অভিপ্রায় উপলব্ধ হইবে না। আবার স্থলবিশেষে মাত্র সঙ্কেত দ্বারা বক্তার অভিপ্রায় উপলব্ধ হয় না। সেখানে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। "গঙ্গায়াং ঘোষো বসতি"—এস্থলে গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ জল-প্রবাহের মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ অসম্ভব বলিয়া বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে গঙ্গাপদটিকে তীর-লক্ষক করিতে হইবে। তদ্রূপ "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাং" সন্নিকৃষ্ট কাক দর্শনে কর্ত্তা এই আদেশ করিলে, ভৃত্য কেবল কাকসম্বন্ধে সতর্ক হইবে, এমন নহে; পরন্তু লক্ষণাদ্বারা দধি-ভক্ষক কাককুক্কুরশৃগালাদি অপচয়কারিমাত্রসম্বন্ধেই সতর্ক হইবে।

পদসমষ্টি অর্থযুক্ত হইলে বাক্য হয়। পদসমষ্টি আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, এই ত্রিবিধগুণাশ্রিত না হইলে অর্থযুক্ত হয় না। আসত্তি অর্থে শব্দসমষ্টিমধ্যে সন্নিকট-উচ্চারণ-জনিত বোধের অবিচ্ছেদভাব। অদ্য উচ্চারিত বায়ুশব্দের সহিত দিনান্তরে উচ্চারিত 'বহিতেছে' শব্দের নিকট-উচ্চারণ-জনিত বোধের অবিচ্ছেদভাব নাই, সুতরাং তাহাতে অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং সেরূপে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি বাক্য নহে। আবার নিকট-উচ্চারিত পদসমূহের মধ্যে যদি পরস্পর আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকে, তবে উক্তরূপ পদসমষ্টিও বাক্য হয় না। যে শব্দ ব্যতীত যে শব্দের অন্বয়ের অনুপপত্তি ও শ্রোতার প্রতীতির অভাব, সে শব্দ অপর শব্দের সাকাঙ্ক্ষ। "বায়ু বহিতেছে" এখানে শব্দদ্বয় পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ। "অশ্ব, নদী" এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং এই শব্দসমষ্টি বাক্য নহে। তৃতীয়ত পদসমষ্টিমধ্যে যোগ্যতা অর্থাৎ অর্থপ্রকাশসম্বন্ধে পরস্পর স্বাভাবিক বাধাহীনতা বা অসঙ্গতিরাহিত্য থাকা আবশ্যক। 'অগ্নিদ্বারা সিঞ্চন', 'পদদ্বারা ভক্ষণ', ইত্যাদি পদসমষ্টির মধ্যে অর্থগ্রহসম্বন্ধে স্বাভাবিক বাধা বা অসঙ্গতি রহিয়াছে, সুতরাং অর্থপ্রকাশের উপযোগিতার অভাবে উক্ত পদসমষ্টি বাক্য হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, কাব্যসংজ্ঞাসম্বন্ধে প্রধান প্রধান আলঙ্কারিক-গণ কি বলেন। সাহিত্যদর্পণকার রসাত্মক বাক্যমাত্রকেই কাব্য-নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বামনসূত্র, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতির মতে রসাত্মক বাক্যমাত্রই কাব্য হয় না। কাব্যমাত্রই সৌন্দর্য্যাশ্রয়। বামনমতে গুণালঙ্কারযুক্ত শব্দার্থ কাব্য। মম্মটমতে ও প্রভাকরমতে আবার তাহা "অদোষ" হওয়া আবশ্যক। ভোজমতে অদোষ-গুণালঙ্কারযুক্ত রসবৎ বাক্য কাব্য। জগন্নাথমতে রমণীয়ার্থ শব্দ কাব্য। শেষোক্ত সংজ্ঞা অতি সরল, তদ্দ্বারা স্পষ্টত এবং (সাহিত্যদর্পণপ্রদত্ত সংজ্ঞা ব্যতীত) অপরাপর

সংজ্ঞাদ্বারা অভিপ্রায়ত কাব্যলক্ষণে সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে। * Dr Blair কাব্যের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, যথা :—

Poetry is the language of passion or enlivened imagination formed most commonly into regular numbers.

এই সকল সংজ্ঞার সারসঙ্কলনে আমরা দেখিতেছি, রমণীয়ার্থ বা সৌন্দর্য্যাশ্রিত রসবৎ বাক্য কাব্য এবং তাহা সাধারণত ছন্দোবদ্ধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, "অদোষ" "গুণবৎ" "রীতি" ইত্যাদি কাব্যের নিত্যলক্ষণ নহে এবং তাহা কাব্যসংজ্ঞার অঙ্গীভূত হইতে পারে না; কারণ দোষগুণ কাব্যের অপকর্ষ ও উৎকর্ষের সাধকমাত্র, স্বরূপ-নির্ণায়ক নহে। রীতিশব্দেরও কাব্যসংজ্ঞার মধ্যে বিশেষ সার্থকতা দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার যে রসাত্মক বাক্যমাত্রকেই কাব্য বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। কারণ উক্ত মত দেশে বিশেষরূপে পরিচিত এবং উক্ত মতের পোষকগণ বলিতে পারেন যে, সৌন্দর্য্য কাব্যের অলঙ্কার বা উৎকর্ষসাধক মাত্র, কাব্যের নিত্যলক্ষণ নহে, অথবা 'রসাত্মক" ঐ শব্দদ্বারাই সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে।

আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, স্থূলত নৈসর্গিক লীলামাত্রই সুন্দর এবং তদনুকৃতি কবিকল্পিত ভাব ও মূর্ত্তিও সুন্দর হয়, যদি যথারীতি সংস্থিত ও সুবিন্যস্ত হয় এবং তাহাতে আমাদের স্বাভাবিক

* ফলত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' এই নামেই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হইতেছে। এখানে অলঙ্কারশব্দ উপমা-যমকাদি প্রচলিত অর্থে পর্য্যবসিত নহে। অলঙ্কারশব্দের অর্থই সৌন্দর্য্য। বামনসন্দর্ভে লিখিত আছে—"কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ, সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ।" "অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এতৎসম্বন্ধে বলেন :—"অলঙ্ক্রিয়তে অনেনেতি করণব্যুৎপত্তিনিষ্পন্নো যমকোপমাদিবোধকো নায়মলঙ্কারশব্দঃ, কিন্তু অলঙ্কৃতিরলঙ্কার ইতি ভাবব্যুৎপন্নো দোষাপগমো গুণালঙ্কারসংবলনকৃতঃ সৌন্দর্য্যপরঃ। তৎপ্রতিপাদকত্বাদেব অন্যালঙ্কারনাম্না ব্যপদেশ ইতি।"

সামঞ্জস্যজ্ঞানের ব্যাঘাত না জন্মে। স্বাভাবিক সুবিন্যাস ও সামঞ্জস্য না থাকিলে কল্পিত ভাব বা মূর্ত্তি সুন্দর হয় না এবং তাহার অবতারণায় শ্রোতার চিত্তবিনোদনও সম্ভব নহে, সুতরাং কাব্যের যে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, তাহাই ভ্রষ্ট হয়। তার পর রসাত্মক বাক্য দ্বারা সৌন্দর্য্য অনেকসময় সূচিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদা নহে। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই রসের আবির্ভাব, এ কথা সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য রসের নিত্যসঙ্গী নহে। রসবৎ বাক্যে স্থলবিশেষে আমাদের মনে উৎকট দুঃখাদির উপচয় হয়; তাহা কিছুতেই সুন্দর ও সুখকর নহে; আমাদের মতে তাহা কাব্যের উপযোগীও নহে। তার্কিক এই অবসরে বিয়োগাত্মক কাব্যের উল্লেখ করিয়া বলিবেন, তাহা সুখকর ও চিত্তবিনোদক কিসে? অনেকেই জানেন, কাব্যপাঠে আমরা যে সময়ে সময়ে দুঃখানুভব করি, তাহা কোমল বিষাদমাত্র। আপাত দুঃখের নিম্নস্তরে সুখের স্তর আছে, সুতরাং বিষাদকাব্যও মূলত সুখকর ও চিত্তবিনোদক বটে। আর যদি রসাত্মক বাক্যমাত্রই কাব্য, তবে পুত্রশোকবিহ্বলা রোরুদ্যমানা জননীর বিলাপবাক্যও কাব্য, কারণ তাহাতে শ্রোতার মনে করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিলাপ কল্পনা ও সৌন্দর্য্য বিরহিত হওয়ায় তাহা কাব্য নহে। সত্য বটে, মানুষের ভাষা হৃদগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনিমাত্র, হৃদয় যখন যে ভাবে আলোড়িত হয়, অনুভব প্রখর হইলে ভাষাও তাহার অনুসরণ করে; কিন্তু তথাপি কাব্যে প্রকৃতি ও কল্পনাকে এরূপ কৌশলে মিশ্রিত করিতে হইবে যে, তাহাতে পাঠকের হৃদয় কবিহৃদয়ের অনুসরণ করিয়া প্রীতি ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবে। সৌন্দর্য্যলক্ষ্য রসবৎ-বাক্যাবলি সুকল্পনাবিরহিত হয় না, কিন্তু রসাত্মক বাক্যাবলিমাত্রেই এই কথা বলা যায় না।

কাব্য সাধারণত ছন্দোবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ছন্দ কাব্যের

নিত্যসঙ্গী নহে, সুতরাং ছন্দ কাব্যসংজ্ঞার অঙ্গীভূত হইতে পারে না। সহজ কথায় কাব্য, গদ্য ও পদ্য, দুইপ্রকার রচনাতেই হইতে পারে, কারণ রস এবং সৌন্দর্য্য গদ্যরচনাতেও থাকিতে পারে; সুতরাং যেমন মেঘনাদবধ কাব্য, তেমনি চন্দ্রশেখরও কাব্য। তবে এসম্বন্ধে একটি কথা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভাষা হৃদ্গত ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র, হৃদয় যখন যে ভাবে আলোড়িত হয়, অনুভব প্রখর হইলে ভাষাও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রখর-অনুভূতিপরায়ণ কবির হৃদয়াবেগ হইতে উত্থিত ভাবরাশির অনুসরণে তাহার ভাষাও তরঙ্গায়িত হইবে এবং তাহাতে সাধারণ ভাষাপ্রণালীর শব্দযোজনারও কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হইবে। শোকবিহ্বলা রোরুদ্যমানা বঙ্গীয় মহিলার আবেগময়ী বিলাপরচনাতে বোধ হয় অনেকেই এই বৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়াছেন। আর একটি কথা আছে, পূর্ব্বে রচনামাত্রই গীতোদ্দেশে রচিত হইত, সভ্যতার উন্নতির সহিত গায়ক ও কবিশ্রেণী প্রায়শ পৃথক্‌শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং কবিতা ও গীতের নিত্যসম্বন্ধ রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি কাব্যে একটা লয়ের ভাব ও তালবোধ বা পরিমাণবোধ অন্তঃকরণে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যেখানে ছন্দ না থাকে, সেখানেও এইরূপ একটা তাল বা পরিমাণ জ্ঞানের দ্বারা কাব্যের ভাষা নিয়মিত হয়। গদ্যকাব্যের উচ্ছ্বাসময়ী বাক্যাবলিও উদ্বেলিত হৃদয়ের অনুসরণে প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা ভিন্নরূপ ধারণ করিবে এবং তাহা তালবোধ বা পরিমাণজ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইবে।

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহার সংক্ষেপ:—প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের আধার। সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যের অনুভবে প্রীতিলাভ মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সৌন্দর্য্য কি, তাহা যদিও তর্কশাস্ত্রসম্মত সংজ্ঞাদ্বারা সম্যক্ নিরূপণ করা কঠিন, তথাপি সৌন্দর্য্য যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের

অধীন, তাহার আলোচনাদ্বারা সৌন্দর্য্যের সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ স্থির করা যাইতে পারে। উক্ত নিয়মসমূহের অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, কল্পনাশ্রিত উন্নত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি উপভোগ করা সভ্যতার উন্নতিকে অপেক্ষা করে। এজন্য সভ্যতার উন্নত অবস্থাতেই সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি। কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্প সৌন্দর্য্যাশ্রয়তায় সমধর্ম্মী; উভয়ই সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার অন্তর্গত। কাব্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সাধনে, কাব্যের সাধন ভাষা বা অর্থযুক্ত বাক্য। আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, এই তিন-গুণাশ্রিত হইলেই পদসমূহ অর্থযুক্ত হয়।

অনুভূতিপরায়ণ কবি স্বয়ং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহা অনুরূপ ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহার তন্ময়তা-জনিত বাক্যাবলি যাদুমন্ত্রের ন্যায় রসজ্ঞ শ্রোতারও তন্ময়তা জন্মাইয়া থাকে এবং তাঁহার মনে হর্ষাদি ভাব বা "রসের" সঞ্চার করে। উক্ত-রূপ আলোচনায় দেখা যায়, সৌন্দর্য্য, রস ও অর্থযুক্ত শব্দ, এই তিনটি কাব্যের উপকরণ। কাব্যের অভিপ্রায়াদি আলোচনায় এবং প্রধান প্রধান আলঙ্কারিকের মতসঙ্কলন দ্বারা আমরা কাব্যের এই সংজ্ঞা স্থির করিলাম, যথা:—

কাব্য সৌন্দর্য্যাশ্রয় রসবৎ বাক্য, উক্ত বাক্য ছন্দোবদ্ধ অথবা তাল, লয় বা পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে।

চিত্র-চয়ন।

১

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী, জলস্থল সর্ব্বত্রই চন্দ্রকরে প্রফুল্ল, সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য, অসীম সৌন্দর্য্যে চরাচর উদ্ভাসিত! লতাজটিল কুসুমিত বনকুঞ্জে কোকিল-কাকলি প্রকৃতির সুমধুর-

সঙ্গীত-রূপে উচ্ছ্বসিত! সমস্ত সৌন্দর্য্যে একটা স্বর্গের ছায়া—অসীমের ভাব ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এমনি জ্যোৎস্নারজনী তাহার শতসঙ্গীত—শতছন্দে হৃদয়কে মুখরিত করিয়া তুলে। চন্দ্রদর্শনে সাগরের দূরপ্রসারিত নীলাম্বুরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আর জ্যোৎস্নারজনীতে মানবচিত্তও আলোড়িত—বিক্ষুব্ধ হয়। মনুষ্যহৃদয়ও প্রসারে অসীম, গভীরতায় অতলস্পর্শ, বাসনা-তরঙ্গিত, চির-প্রহেলিকাময়! সমুদ্রে উল্লোচ্ছ্বাসের মত হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস না ঘটিবে কেন?

অথচ হাতে কোন কাজ নাই—এই অনন্ত আকাশতলে, এই স্নিগ্ধ-মধুর জ্যোৎস্নায়, যে একটা বিশাল সৌন্দর্য্য চিত্রিত হইতেছিল, তাহার সংস্পর্শে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম কোন্ দূরে সরিয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ভোগ-বিলাস, সম্ভোগ-তৃপ্তি আর নাই, সমস্তটার উপর একটা মোহ-আবরণ পড়িয়া, তাহাদের প্রত্যেককে একটা নিত্য-সত্য বিরাট্-বিপুল মনে হইতেছিল।

হাতের কাছে আর কোনও কাব্যগ্রন্থ ছিল না—কেবল বহুদিনের জীর্ণ শিথিলপত্র একখানি "কপালকুণ্ডলা" শিয়রে পড়িয়াছিল। একাগ্র-চিত্তে তাহাই পাঠ করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, একস্থানে সঙ্গিহীন নবকুমার বালুকাধূসর তটে উপবেশন করিলেন—সম্মুখে "ফেনিল-নীল অনন্তসমুদ্র"! আন্দোলিত তরঙ্গক্ষেপ, হেমকান্ত সৈকতে তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেন-লেখা; দূরে—অতিদূরে উদ্বেলিত নীলাম্বুরাশি দৃষ্টিরেখায় মিশিয়া গিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। নবকুমার এতক্ষণ স্থান-কাল ভুলিয়া প্রকৃতির গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন—সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি—সেই গম্ভীরনাদী বারিধির তীরে সৈকতভূমে

অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি—সুন্দরী, মনোমোহিনী, আভরণহীনা। কেশভার অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ-লম্বিত! বিশাললোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়! সমুদ্রের জনহীন তীরে কিছুকাল পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। ধ্বনি যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্রে যেন মর্ম্মরিত হইল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর। নবকুমারের হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় উঠিতে লাগিল।

"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" ইহা যেন কোন চিরপরিচিত বহুকালশ্রুত স্বর বলিয়া মনে হইল—"যেন কতরূপে কতবার, যুগে যুগে অনিবার" এই স্বর শুনিয়াছি! পুস্তকপাঠ বন্ধ করিলাম।

রাত্রি ক্রমে নিশীথ হইয়াছে—রজতবসনা রজনীর হৃদয়ে যেন প্রৌঢ় বিধবার গাম্ভীর্য্য বিস্তার করিয়াছে। দূরে নৈশবায়ু অস্ফুট সঙ্গীতের শেষাংশটুকু বহিয়া আনিতেছিল—নিস্তব্ধ প্রশান্ত রজনী—মুমূর্ষুর হাসির মত পাণ্ডু জ্যোৎস্না! কুঞ্জে কুঞ্জে তরুলতায় জ্যোৎস্নাস্নাত ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রহিয়া রহিয়া সেই স্বর কেবল কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?"

মনে হইল, যে দিন প্রথম প্রিয়া বৈকুণ্ঠের পথ হইতে প্রেমের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া প্রেমামৃতে মনুষ্যহৃদয় সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন; যেদিন স্নেহে-প্রেমে মনুষ্যহৃদয়কে অপূর্ব্বমোহে আচ্ছন্ন করিয়া তিনি দুঃখবেদনাক্ষত, রুধিরাক্ত মনুষ্যহৃদয়কে সযত্নে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিলেন; সেদিন তিনি বুঝি এমনি নিঃসহায় আশ্রয়ভিখারী পুরুষকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পথিক

তুমি পথ হারাইয়াছ ?" সেদিনও দিকে দিকে এমনি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তরুলতায় পত্রে পত্রে এমনি অমৃত ক্ষরিত হইয়াছিল।

সেদিনও সেই মানবের সম্মুখে তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত, চিরচঞ্চল, চিরপ্রহেলিকাময়, চিরসুন্দর, ঝাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ আলোড়িত-তরঙ্গিত মহান্ সংসার, পার্শ্বে অসামান্যা সুন্দরী কনকরুচির সরলা তরুণী—উর্দ্ধে নীলাকাশ নক্ষত্রখচিত, জ্যোৎস্নামণ্ডিত। কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলরাশি ফুটিয়া ফুটিয়া আবেশে লুটাইয়া পড়িতেছিল। সেই দিন হইতে এই সুমধুর স্বরলহরী যেন অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে। অসীম সাগরে উর্ম্মিবাহু তুলিয়া তুলিয়া ফেনাঙ্কিত তটভূমি চুম্বন করিয়া লহরীবালা যেন বলিতেছে—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?" কাননে ব্রততীকুল দুলিয়া দুলিয়া শ্যামল তরুদলের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া গাহিতেছে,—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?" আর নীলাকাশে নক্ষত্রদাম চন্দ্রপার্শ্বে সারি দিয়া গাহিতেছে—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?" মনে হইল, জলে-স্থলে সর্ব্বত্র এই একই গান, সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া কেবল এই একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি!

এমনি করিয়া চিরমধুর প্রেম বুঝি পথহারা মানব-পথিকের হৃদয় প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল। যে দিন মলয়সমীরে, কুসুমে কুসুমে, নিত্যই নব ভাবোচ্ছ্বাসে, নিত্যই নব সঙ্গীতে তাহার হৃদয়তলে এক অব্যক্ত বেদনা মুখরিত করিয়া দিল, সেই দিন বুঝি সমস্ত আত্মবিস্মৃতি ত্যাগ করিয়া পথহারা পথিক প্রেমমন্দিরে প্রিয়তমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

সেই দিন হইতে বুঝি চরাচরে তীব্রবিরহের পর এই সুমধুর মিলনগীতি, তীব্র তৃষার পর এই পূর্ণতৃপ্তি, শ্রান্তির পর এই মোহন বিরাম—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য্যে এই মোহন গীতি, এই সুমধুর

আশ্বাস, এই সস্নেহ সান্ত্বনা, এই অযাচিত আত্মসমর্পণ—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

কতদিন "কপালকুণ্ডলা" পড়িয়াছি কিন্তু ইহা বুঝি নাই—পূর্ব্বে এই সঙ্গীত কখনও মর্ম্মস্পর্শ করে নাই। আজিকার এই স্থান-কাল-শোভা-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে, পূর্ব্বে যাহা বুঝি নাই, তাহা বুঝিলাম। যে শোভা—যে সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে উপভোগ করি নাই, মুহূর্ত্তে আজ তাহা সুস্পষ্ট হইল—এই শোকদুঃখবেদনাতুর সংসারে নন্দনকাননের ছায়া, দেববালাগণের সঙ্গীত, দিকে দিকে মাধুর্য্য বিস্তার করিল। অমর কবিপ্রতিভা যে মহাসৌন্দর্য্য, যে মহাসঙ্গীতের সৃজন করিয়াছেন—আজি হৃদয়ে হৃদয়ে তাহা অনুভব করিলাম।

কবিতা-গুচ্ছ।

অনাদৃতা।

১

তুমি ত চাওনি স্নেহে,
দেখনি বিরূপ দেহে,
অনাদরে কেটে গেছে একটি জীবন।
তুমি খুঁজেছিলে যাহা,
রূপ-নিঃস্ব—আমি তাহা
দিতে পারি নাই ব'লে করেছ বর্জ্জন!

২

তোমার মনের মত
আপনারে গড়ি কত,
ঢাকিতে পারি না তবু ত্রুটি আপনার।

শত অপূর্ণতা ল'য়ে,
শত অনাদর স'য়ে
প'ড়ে আছি জগতের পাশে একধার!

৩

আমার পরাণপুটে
নিভৃতে যে কলি ফুটে,
ঢাকিতে পারি না তারে বিফল যতনে।
তৃণ—সে-ও ফুল ধরে,
মৃদুগন্ধে বায়ু ভরে,
আমার এ প্রেম কত রাখিব গোপনে?

৪

প্রেম কোথা বাধা মানে,
মরমের মাঝখানে,
নিজ মহিমায় সে যে নিজে ফুটে রয়!
সে যে গো আরাধ্যতরে,
অর্ঘ্য হ'য়ে স্বত ঝরে
হায় হায়! বুঝিলে না রমণী-হৃদয়!

৫

চাহিনি ত প্রতিদান,
চাহিনি চরণে স্থান,
কেবল বাসিতে ভাল দিবে অধিকার!
শুধু ওগো কায়মনে,
পূজিব হৃদয়াসনে,
আপনারে ঢেলে দিব চরণে তোমার!

৬

এক দিকে অবহেলা,
আর দিকে ধৈর্য্য-বেলা,
নিদারুণ উপেক্ষায় ভেঙে টুটে যায়।
যায় যাক্ ভেঙে-চুরে,—
যদি গো হৃদয়-পুরে,
থাক তুমি দেবতা গো,—নাহি ক্ষতি তায়!

আত্মসমর্পণ।

তোমার চরণমূলে কুণ্ডলিয়া রব
সুখ দুঃখ হর্ষ আশা দৈন্যে নোয়াইয়া,
ধীরে ধীরে গর্ব্ব ভাঙি' লুটাইব হিয়া—
তুমি দিও পাদস্পর্শ নিত্য-অভিনব।
নিত্য মোরে জাগাইও বিরল প্রত্যূষে
শিশিরের বিন্দুসম শষ্পে লম্বমান—
এক ফোঁটা অশ্রু যেন,—কোরো অবসান
নিত্য মোর, হৃদণ্ডেই, তব তাপে শুষে।
তবু মোর সুখ দুঃখ হর্ষ আশারাশি
তোমার চরণমূলে হারাইয়া গিয়া,
কখনো কি উঠিবে না সহসা ফুটিয়া
দলমল স্বর্ণগাদা সম?—মোর হাসি,
মোর অশ্রু—সব, যাহা দিনু তব পায়ে—
প্রেম কি গো তুলিবে না ভুবনে ফুটায়ে?

সুন্দরী।

১

হে সুন্দরি, তুমি কি গো গরবে নিঠুরা ?
তোমার সৌন্দর্য্যগর্ব্বে নিয়ত বিমূঢ়া ?
ছি ছি মুগ্ধে ! মনে করি দেখ একবার—
প্রেমের পূজায় কোন্ আত্মসমর্পণে
লভিলে অনিন্দ্য এই সৌন্দর্য্য তোমার ?
মনে পড়ে ?—কোন্ আত্মহারা আলিঙ্গনে
এ বাহুসৌষ্ঠব গোল উঠিল ভরিয়া ?
সোমজ্যোতি এ ললাট কোন্ প্রণতির ?
কোন্ পাদবিমোচনগৌরব স্মরিয়া
লম্বিত এ কেশদাম কালিন্দী-গভীর ?
—সে কোন্ বিস্ময়ময় আনন্দ-অর্চ্চন—
কি গভীর অশ্রুধারা গড়িল নয়ন
আকূল তরলোজ্জ্বল ?—সর্ব্বসমর্পণে
পরিপূর্ণ পদ্মসম ফুটেছ যৌবনে !

২

বৈষ্ণবসমান আমি পরম বিশ্বাসী
জানি জানি—পূর্ণ তব এ সৌন্দর্য্যরাশি,
চিত্রকান্তি নাগিনীর এ নহে বিলাস।
জানি ওই ললাটের সৌম্য গৌরাভাস
ঊষা-শশধর-সম ভক্তিনমস্কার
রাখিছে গোপন করি'। ওই কম্বুগ্রীবা
প্রণয়নির্ভরে ত্বরা বিলুণ্ঠিত-ভার

ছিন্ন মৃণালের মত হেলি পড়ে কিবা—
জানি তাহা। জানি জানি এ লাবণ্য লোল
বয়স লুকায় সুখে সন্ধ্যাপদ্মসম—
ওই তব বক্ষোময় যৌবন-হিল্লোল
ভাঙি' পড়ে প্রেমভারে তরঙ্গ-উপম
—জানি আমি—স্খলি' পড়ে ত্বরা গর্ব্বস্তূপ
অনিন্দ্য মধুর রাখি' তব মুগ্ধরূপ।

বলপ্রার্থনা।

আঁধার পলায় যথা আলোক নেহারি'
তেমনি হে প্রাণনাথ, আমি নাহি পারি
তোমার মাঝেতে নিত্য রহিতে জাগিয়া
দুর্ব্বহ পাপের বোঝা শিরেতে বহিয়া !
সদা তাই চাহিতেছি—প্রমত্ত সংসারী—
ভুলিবারে তব প্রেম। তাই অশ্রুবারি
সংরুদ্ধ করিয়া চিত্তে, জলন্ত অনলে,
অনুতপ্ত অন্তরেতে প্রতি পলে পলে
পশিতেছি। তুমি যে অসীম শান্তিময়,
তাহা মনে আসিলেই প্রাণে ভয় হয় ;—
মনে পড়ে, অতীতের সে মলিন স্মৃতি
জ্বালাময়ী, কলঙ্কপূরিতা ! তাই নিতি
দীনভাবে, করজোড়ে প্রাণে চাই বল
ভুলিবারে জীবনের সে চিন্তা-সকল।

---

(৯)

এ যুগে ভাই, অবান্তরের নাই আদর ;
ক্ষুদ্র প্রাণের নাই যে বেশি অবসর !
দেশ-বিদেশে এ ঢেউ লাগি ছোট কথাই উঠ্‌ছে জাগি
এ যুগে ভাই অল্প কথার যত আদর ;
ক্ষুদ্র প্রাণের নাই যে বেশি অবসর !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

তৈমুরের সদাশয়তা।*

১

মারিয়া কাটিয়া, জ্বালাইয়া পুড়াইয়া, অমরবাঞ্ছিত বহুধনজনাকীর্ণ দিল্লী-নগরী ছারখার করিতে করিতে দিগ্বিজয়ী তৈমুরের নৃশংস সৈন্যগণ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন লুণ্ঠন করিবার একটি সামগ্রীও আর অবশিষ্ট রহিল না। বিস্তীর্ণ রাজপথগুলি রাশিরাশি বিকৃত শবদেহে ও শোণিত-পঙ্কিল ভস্মস্তূপে পরিপূর্ণ হইয়া, সোণার দিল্লী মহাশ্মশানে পরিণত করিল। মৃত্যু ও বিভীষিকা লোমহর্ষণ তাণ্ডব-উল্লাসে নগরময় নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরিশেষে পর্ব্বতাকার গলিত মৃতদেহস্তূপের ভীষণ দুর্গন্ধে যখন তৈমুরের দিক্-ধ্বংসী যমদূতগুলি অস্থির হইয়া উঠিল, তখন তিনি অচিরে সেই মহাশ্মশান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

* তৈমুরের হৃদয়ে যে একবিন্দুও সততা ছিল, এ কথা ইতিহাসে লেখে না। সকলে তাঁহাকে নৃশংস, হৃদয়হীন, কঠোরপ্রাণ, বিশ্বধ্বংসকারী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। উপরি-বর্ণিত ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে জানা যায় যে, সময় ও অবস্থার মাহাত্ম্যে তৈমুরের হৃদয়ও গলিয়া যাইত।

দিল্লীপরিত্যাগের পূর্ব্বে তৈমুর উপাসনার্থ যমুনাতীরস্থ এক মস্‌জিদে প্রবেশ করিলেন। উপাসনান্তে তাহার চমৎকার কারুকার্য্যে ও বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই উপাসনামন্দিরটি সম্রাট্ ফিরোজ বহু অর্থব্যয়ে অসংখ্য মণিরত্নে সুসজ্জিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া তৈমুর কহিলেন,—"লোকে বলিবে, তৈমুর পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তেমন মহারাজোচিত একটি উপাসনালয় তাঁহার ছিল না। দিল্লীর স্থপতিগণ দ্বারা ঐরূপ একটি মস্‌জিদ সমরকন্দে নির্ম্মাণ করাইয়া এ কলঙ্ক মোচন করিব।"

সম্রাটের আদেশ পাইয়া অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ দিল্লীর যাবতীয় স্থপতি ও প্রস্তরব্যবসায়িগণকে বন্দী করিয়া আনিল। স্বদেশ ও স্বজনবর্গ ত্যাগ করিয়া হতভাগ্য বন্দিগণ দূর-প্রবাসে নির্ব্বাসিত হইতে বাধ্য হইল।

ভারতের ধনরত্ন যদৃচ্ছ লুণ্ঠন করিয়া লক্ষাধিক বন্দী সহ তৈমুর-বাহিনী স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

২

দিল্লীপরিত্যাগের নয় দিবস পরে ভারতের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া তৈমুর দুর্গম মুরী-গিরিশ্রেণীর পাদদেশে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের অবসর পাইয়া, অজস্র সুরাপান এবং পৈশাচিক আমোদ-আহ্লাদে লিপ্ত হইল। তাহারা সম্রাটের শুভকামনায় বন্দিগণের সহিত একত্র সুরাপান করিতে করিতে, উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল উত্থিত করিয়া, গিরি-প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিল। এইরূপে তৈমুরের নিষ্ঠুর বিজয়কীর্ত্তি ঘোষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু বন্দিগণের মধ্যে দুইটি বালক এই আনন্দ-কলোচ্ছ্বাস হইতে

সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত রহিল। ইহারা দুই ভ্রাতা বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছিল। জ্যেষ্ঠটির বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষের অধিক হইবে না। তাহার দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ এবং মুখশ্রী বীরোচিত। কনিষ্ঠটি নিতান্তই বালক; বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবর্ষও হইবে কি না, সন্দেহ। দেহ ক্ষীণ, মুখশ্রী সুন্দর, কোমল; আয়ত চক্ষু দুইটি সর্ব্বদাই যেন ভীতি-সঙ্কুচিত। ইহাদের উক্তরূপ গর্হিত আচরণে সকলেই বিস্মিত হইল।

একজন বৃদ্ধ সৈনিক অগ্রসর হইয়া কহিল,—

"তোমরা এ বিজয়ঘোষণায় যোগদান না করিয়া কিরূপ দণ্ডার্হ হইতেছ, তাহা জান?"

শুনিয়া অপর সৈনিকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "উহাদের গর্দ্দান লও", "উহাদিগকে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেল", "তরবারি দ্বারা উহাদিগকে আদব-কায়দা শিক্ষা দাও" ইত্যাদি ক্রুদ্ধ শ্লেষবাক্য বালক-দুইটির উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।

তাহাদের হঠকারিতায় হতভাগ্য বন্দিদ্বয়কে হয় ত তৎক্ষণাৎ নৃশংস প্রতিফল ভোগ করিতে হইত। কিন্তু পূর্ব্বকথিত সদাশয় বৃদ্ধ মধ্যস্থ হইয়া, রুষ্ট সৈনিকগণকে নিবৃত্ত করিয়া কহিল,—

"সাবধান, তোমাদের এরূপ সরাসরি দণ্ডবিধান সম্রাট্ কখনই অনুমোদন করিবেন না।"

সুশৃঙ্খলাপ্রিয় তৈমুরের কঠোর শাসনভীতি সৈন্যগণের উত্তেজিত অস্ত্র সংবৃত করিয়া দিল। কিন্তু বন্দিদ্বয়ের বিচারার্থ সম্রাট্-সমীপে দূত প্রেরিত হইল।

তৈমুর তখন স্বীয় শিবিরে মুন্সির সহিত নিভৃতে বসিয়া পত্রাদি লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে দূত আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিল।

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তাহারা?"

"জাঁহাপনা, দুইটি বন্দী বালক, প্রস্তরের কাজ করিবার জন্য ধৃত ও আনীত হইয়াছে।"

"উভয়েই বালক?"

"একটির বয়স নিতান্তই অল্প খোদাবন্দ্।"

"মস্‌জিদ-নির্ম্মাণে উহাদের আবশ্যক হইতে পারে। বালক-দুইটিকে প্রাণে মারিও না। কল্য প্রাতে সামান্য বেত্রাঘাত করিয়া, অন্যান্য বন্দিগণকে সাবধান করিয়া দিও।"

৩

বন্দিদ্বয়ের বেত্রাঘাত-লীলা দেখিবার জন্য, পরদিবস অতি প্রত্যূষ হইতে সৈন্যগণ দলে দলে সমবেত হইতে লাগিল।

অপরাধী বালক দুইটি দণ্ডভূমিতে আনীত হইলে, প্রথম বেত্রধারী বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকটির উত্তমাঙ্গের বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া ফেলিল।

পরে দ্বিতীয় বেত্রধারী কনিষ্ঠটির বস্ত্রাকর্ষণ করিল। সহসা বালকের গণ্ডদ্বয় ও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তে হতভাগ্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

তাহার করুণ-কোমল মুখশ্রী দেখিয়াই বেত্রধারী মুগ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে বালকের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল। মূর্চ্ছিত বালকের চৈতন্যোদয় হইলে সে সান্ত্বনাচ্ছলে কহিল,—

"আমার কি ইচ্ছা যে, তোমার দেহে বেত্রাঘাত করি? কিন্তু কি করিব, রাজার আদেশ! যাহা হউক, তোমার কোন ভয় নাই। আস্তে আস্তে দুই-এক ঘা মারিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

সুন্দর মুখের সর্ব্বত্রই জয়!

বেত্রধারী পুনরায় তাহার বস্ত্রাকর্ষণ করিল। লজ্জায় ও ভয়ে অপরাধীর মুখ-চোখ পুনরায় লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু একি!

পীনোন্নত বক্ষ, আগুল্‌ফ-লম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি! এ ত বালক নয়, এ যে স্ত্রীলোক!

বিদ্যুদ্‌গতিতে এ সংবাদ সম্রাটের নিকট নীত হইল। তিনি ত আকাশ হইতে পড়িলেন! "কি আশ্চর্য্য! ভারতবাসীরা নিতান্তই অদ্ভুত-প্রকৃতি। ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গুপ্তপ্রণয়ব্যাপার আছে।"

সম্রাট্‌সমীপে বন্দী ও বন্দিনীর তলব হইল। তৈমুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বালিকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—

"তুমি কে?"

"আমি অনাথা। আপনিই আমাকে পিতৃমাতৃহীনা করিয়াছেন।"

"কি করিয়া? তোমার পিতা কে ছিল?"

"আমার পিতা দিল্লীর একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগর ছিলেন। আমাদের অভাব কিছুই ছিল না। আমরা পরমসুখে কালযাপন করিতাম। কিন্তু আপনিই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। আপনার সৈন্যগণ আমার পিতাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। অপমানভয়ে মা আমার আত্মঘাতিনী হইয়াছেন!"

বালিকার গোলাপ-নিন্দী গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল!

"আর তুমি?"

"আমি পলাইয়া জনৈক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার সৈন্যগণ তাঁহাকেও ধরিয়া আনিল। অগত্যা আমিও এই ছদ্মবেশে তাঁহার সঙ্গে আসিলাম।"

"আমার সৈন্যদলের সহিত আসিতে তোমার ভয় হয় নাই? এই ত তুমি ধরা পড়িয়াছ, এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করিবে?"

বালিকা কোন উত্তর দিল না। শুধু বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া সম্রাট্‌কে দেখাইয়া দিল।

তৈমুর ছুরিকা কাড়িয়া লইতে আদেশ করিলেন। এক ব্যক্তি

তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু বালিকা দৃঢ়করে ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ের সুকোমল বৃন্ত-মুখে স্থাপিত করিয়া নিরুদ্বেগে দাঁড়াইয়া রহিল!

অগত্যা তৈমুর আদেশ রহিত করিতে বাধ্য হইলেন; এবং কহিলেন,—

"আত্মরক্ষার্থ তোমার আর, কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। আমি তোমার কোনই অনিষ্ট করিব না, অঙ্গীকার করিতেছি।"

অতঃপর তিনি সেই যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"তুমিই কি ইহার সেই বন্ধু?

"হাঁ আমিই।"

"তুমি উহার বিশ্বাসভাজন হইলে কিসে?"

"শৈশব হইতেই আমরা পরস্পর পরিচিত। বিশেষত ও আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী।"

"কাহার বাগ্‌দত্তা?"

"উহার পিতার।"

"তোমার পিতামাতা কোথায়? জীবিত আছে?"

বন্দীর মুখশ্রী শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল—

"তাহারা আপনারই সৈন্যদলের নৃশংসতানলে জীবনাহুতি দিয়াছেন।"

তৈমুরের পাষাণহৃদয় দ্রব হইয়া গেল! চিন্তাকুলচিত্তে তিনি ধীরে ধীরে শিবিরাভ্যন্তরে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় যুবকের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি স্থপতি?"

"হাঁ!"

"দিল্লীতে ফিরোজের মস্‌জিদ দেখিয়াছ ?"

"হাঁ, দেখিয়াছি।"

"স্বর্গীয় দূত গেব্রিয়েল কোরাণহস্তে আমাদের হজরতের নিকট অবতীর্ণ হইতেছেন—বহির্দ্বারের সেই চমৎকার চিত্রটির অনুকরণ করিতে পার ?"

ব্যবসায়ী যুবক ধীরে ধীরে কহিল,—"বোধ হয় পারি!"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর তৈমুর কহিলেন,—

"তোমরা উভয়েই আমার হস্তে অশেষ লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান্ হইব। ধন, সম্পত্তি, ক্ষমতা, যাহা চাহিবে, তাহাই দিয়া তোমাদিগকে সুখী করিব। কিন্তু সমরকন্দে তোমাদিগকে যাইতেই হইবে। আপাতত তোমাদের বন্ধনমোচন করিয়া দিতেছি; আমার সৈন্যগণের সহিত তোমরা যদৃচ্ছ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পার।"

যুবক আর কোন কথা কহিল না।

৪

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। জগৎ নিদ্রিত, নিস্তব্ধ; সুনির্ম্মল নীলাকাশ হইতে জ্যোৎস্নাধারা বর্ষিত হইয়া, প্রকৃতির স্থির-গম্ভীর নীরবতায় এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তা ঢালিয়া দিতেছে। রাজ-কার্য্যালোচনায় পরিশ্রান্ত হইয়া তৈমুর সুশীতল-নৈশবায়ু-সেবনার্থ শিবির হইতে একাকী নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

জ্যোৎস্নাস্নাত গভীরা রজনীর প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পর্ব্বত-শিখরে ভ্রমণ করিতে করিতে তৈমুর বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। এই প্রদেশে পূর্ব্বে একদল অতি দুর্দ্দান্ত দস্যু বাস করিত। তাহাদের অত্যাচারে মুরীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশগুলি কম্পিত হইত। ভারতবর্ষে আসিবার পথে তৈমুর ইহাদের গৃহাদি ভস্মীভূত, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন এবং

অধিকাংশ দস্যুকে নিহত করিয়া এই দুর্দ্দমনীয় জাতিকে দলিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দস্যুগণের আবাসভূমির নিকটবর্ত্তী হইয়া যে তিনি বিপন্ন হইতেছিলেন, মুগ্ধ তৈমুরের সে দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না।

অবশেষে তিনি এক ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে উপনীত হইলেন। দ্বারে যমদূতসদৃশ ভীষণাকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল। তাহার অসুরের ন্যায় বলসম্পন্ন দীর্ঘ দেহ ও রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয়ের ক্রূর-কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া তৈমুর তাহাকে দুর্বৃত্ত নরঘাতক দস্যু বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন সহসা তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বিপদ্ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলেন। কিন্তু দস্যু একলম্ফে তাঁহার কণ্ঠ-নালী সবলে ধরিয়া ফেলিল এবং এক দীর্ঘ শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া ভীষণ প্রতিশোধের আয়োজন করিল।

তৈমুরের ইতিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইত। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ ছিল। সেই প্রাণঘাতিনী ছুরিকা তৈমুরের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তৃতীয় এক ব্যক্তির অব্যর্থ তরবারি-সঞ্চা-লনে মরণাহত হইয়া ভীমকায় দস্যু ভূপতিত হইল। তৈমুর সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি—যে দিগ্বিজয়ী মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাট্ তৈমুরের প্রাণরক্ষা করিল ? তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে গিয়া তৈমুর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তাহার প্রাণদাতা—সেই বন্দী যুবক!

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গভীরা স্তব্ধরজনীর সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইয়া সেই যুবকও নৈশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল, দূর হইতে তৈমুরের বিপদ্ দেখিতে পাইয়া, আপন অদৃষ্ট-চিন্তা ভুলিয়া যুবক তাহার পিতৃমাতৃ-হন্তার প্রাণরক্ষার্থ ছুটিয়া আসিয়াছিল!

কৃতজ্ঞতাপ্লুত হৃদয়ে সস্নেহে তৈমুর কহিলেন,—

"তোমার যাহা ইচ্ছা, আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।"

যুবক সোৎসাহে কহিল—

"তবে আমাকে ও আমার বাগ্‌দত্তা পত্নীকে স্বাধীনতা প্রদান করুন!"

যুবকের ঈদৃশ প্রার্থনায় তৈমুর ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিলেন। স্বাধীনতার সহিত প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিয়া প্রণয়িদ্বয় স্বদেশে ফিরিয়া আসিল।*

ভারতে ইংরেজ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও দিনেমারগণ ভারতের বিপুল বিভবে অঙ্গ পুষ্ট করিতেছিলেন। গৃহকোণে বসিয়া এই নগণ্য শক্তিত্রয় ভারতের অস্থিমজ্জা শোষণ করিতেছে, ভারতের ধনরত্ন—হীরা, চুনী, পান্না, মতির অপূর্ব্ব আলোকে ক্ষুদ্র প্রতিবাসিগণের ধনভাণ্ডার আলোকিত হইতেছে, শক্তিসম্পন্ন ইংলণ্ডের তাহা সহ্য হইবে কেন? ইংলণ্ডের লোলুপ-দৃষ্টি সুদূর ভারতের বিস্তৃত ধনভাণ্ডারে নিপতিত হইল। ভারতবৈভবের ভোগস্পৃহা ইংলণ্ডের মজ্জাগত হইয়া পড়িল।

ভারত রত্নপ্রসূ বলিয়া ইংলণ্ডের নিকট অতি প্রাচীনকাল হইতে পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছিল। ইংলণ্ড যখন পূর্ণভাবে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, নিরক্ষর কৃষক রাজা-

* এই আখ্যায়িকাটি শশিবাবুর ইংরাজি গ্রন্থাবলী হইতে সঙ্কলিত।

দিগের হস্তে যখন বৃটনের রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত ছিল এবং ভারতের বিপুল বিভব স্বপ্নের অগোচর এক অচিন্তনীয় সামগ্রী বলিয়া তাহাদের মনে হইত, ইংলণ্ড তখনও ভারতের জন্য ব্যাকুল। অতীত ইতিহাস অস্ফুট ভাষায় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা আল্‌ফ্রেড্ ভারতীয়-রত্ন-সংগ্রহের জন্য সিগেলমাস-(Sighelmus)-নামক সেরবারণের বিশপ্‌কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন।* ঐ বিশপ্ ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর ধনরত্ন ও সুগন্ধি মসলাদি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

উপর্য্যুক্ত ঘটনা কিংবদন্তীমূলকই হউক, আর যাহাই হউক, ইংলণ্ডীয় বিশপ্ রত্নসংগ্রহার্থ ভারতেই আগমন করুন, আর ভূমধ্য-সাগরের উপকূল হইতেই ভারতীয় সম্পদ্ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান, ভারতবর্ষ যে তাঁহাদের নিকট তখনও রত্নগর্ভ বলিয়া সম্মানিত ছিল এবং ভারতের নামে প্রত্যেক বৈদেশিক জাতির রসনায় যে রসসঞ্চার হইত, ইহা সুনিশ্চিত।

যাহা হউক, ইহার পর বহুদিন চলিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট কতকটা অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে পুনরায় তাহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে পূর্ব্বস্মৃতি পুনরুদিত হইয়া উঠিল, রসনা আবার রসভারাক্রান্ত হইল।

এই সময়ে পর্ত্তুগীজ জলরাজ্যের অধীশ্বর; স্পেইন বাহুবলদৃপ্ত বিজয়ী নাবিক। এমন অবস্থায় ইংলণ্ডের পক্ষে জলপথে প্রতিযোগিতা

* যাহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

Historical and descriptive account of British India. Vol. I. Page 146.

The Decline and Fall of the Roman Empire. Page. 837.

সম্পূর্ণ নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া, ইংলণ্ডীয় বণিক্‌গণ ভারতাগমনের নূতন পথ আবিষ্কারে যত্নপর হইয়া পড়িলেন।

তাঁহারা আসিয়ার উত্তর উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্প রক্ষার জন্য ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানা সুদৃঢ় জাহাজ লইয়া সার হিউ উইল্‌বি ইংলণ্ড ছাড়িয়া গেলেন। তখন পথে জলদস্যুর ভয়ানক উপদ্রব। তিনি জলদস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া লেপলেণ্ডের উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তথায় শীতে ও অনাহারে নাবিকগণের সহিত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সঙ্গী রিচার্ড চেনসেলার একখানা জাহাজ লইয়া মস্কোনগরে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপ আরও দুইএকবার পরীক্ষার পর ঐ পথ তুষারাবৃত ও বিপৎসঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং সকলে নূতন পথ আবিষ্কারের উপায়চিন্তায় ব্রতী হন।

এই সময় কোন কোন ব্যক্তি রুষ ও পারস্য রাজ্যের উপর দিয়া স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করিবার উপায় অবধারণ করেন এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতেও অগ্রসর হন। একদল ইংরেজ স্থলপথে একেবারে কাস্পিয়ান্ অতিক্রম করিয়া বোগ্দাদনগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের সন্ধান করিতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপেও অনেকে অনেক অর্থনাশ এবং প্রচুর কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু ভারতবর্ষ তথাপি তাহাদের নিকট অদৃশ্য, অস্পৃশ্য এবং অপরিচিতই রহিয়া যায়।

ইহার পর পুনরায় জলপথে যাইবার প্রস্তাব উঠে। এবার আর্ক্‌টিক্-মহাসাগর পার হইয়া, আমেরিকার উপকূল ঘুরিয়া, ভারতবর্ষে আসিবার কথা স্থির হয়। কাবেট, ডেবিস, ফ্রবিসার ও হড্‌সন এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল,

কিন্তু কিছুতেই ঐ পথে ভারতে আসিবার উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

এদিকে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত নাবিক সার ফ্রেন্‌সিস ড্রেক দক্ষিণ-সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিতে অভিলাষী হন। তিনি, ইতিপূর্ব্বে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার উপকূল প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, ঐ অর্থে পাঁচখানা অর্ণবপোত বিবিধ সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া, ১৩ই ডিসেম্বর প্লাইমাউথ পরিত্যাগ করিলেন।

পরবৎসর আগষ্টমাসে তিনি মেগেলন-প্রণালীতে উপনীত হন। সে স্থান হইতে কালিফর্ণিয়া গমন করেন। * অতঃপর তিনি প্রশান্ত-মহাসাগর অতিক্রম করিয়া মলাক্কা হইয়া য়ুরোপ-অভিমুখে গমন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। মলাক্কাদ্বীপে তখন পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ সংস্থাপিত ছিল। সেই সময় কোন কোন বিষয়ে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দিগের সহিত তদ্দেশীয় রাজার মনান্তর উপস্থিত হওয়ায়, ড্রেক নিজ প্রতিপত্তিস্থাপনের একটু সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। মলাক্কারাজ ইংরেজ নাবিককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ড্রেক সে স্থানে কতকদিন অতিবাহিত করিয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমনে তৎপর হইলেন। ১৫৮০ অব্দের ২ শে সেপ্টেম্বর প্লাইমাউথে তাঁহার জাহাজসমূহ উপনীত হইল।

তাঁহার আগমনমাত্র, তাঁহার এই পৃথিবীপরিভ্রমণরূপ বিরাট্ ব্যাপারের কৃতকার্য্যতায় ইংলণ্ডে এক বিপুল আনন্দরোল উত্থিত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ড্রেকের জাহাজে আসিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রমসূচক 'নাইট্' উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

* ড্রেক কালিফর্ণিয়াকে তাঁহার আবিষ্কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালিফর্ণিয়া আবিষ্কৃত হইলে, তাঁহার নাম New Albion রাখা হয়।

ড্রেকের কৃতকার্য্যতায় ইংলণ্ডের ভগ্নোৎসাহ বণিগ্বর্গের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। অনেক ভদ্রসম্প্রদায়ও তাঁহার পদানুসরণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

তমাস্ কেবেন্‌ডিস্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দক্ষিণসমুদ্রে পরিভ্রমণমানসে বহির্গত হইলেন।

এদিকে ষ্টিভেন্স নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী গোয়া-নগরে আসিয়া ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া স্বদেশে তাহার এক বিস্তৃত বর্ণনা লিখিয়া পাঠাইলেন। ইংলণ্ডের লোক সেই বর্ণনা পাঠ করিয়া ভারতের জন্য মাতিয়া উঠিল। একদল ইংরেজ ভূমধ্যসাগরপথে—সিরিয়া, আলিপ্পে, বোগ্দাদ হইয়া পারস্য-উপসাগর দিয়া অরমজ-পথে মলয়-উপকূলে পঁহুছিবার সহজ পথ কল্পনা করিল। জন্ নিউবেরী ও রল্‌ফ্ ফিচ্ এই দলের অধিনায়ক হইলেন। অচিরে তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট তাঁহাদের উদ্দেশ্য জানাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলে, রাণী এলিজাবেথ্ উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন; অধিকন্তু দিল্লীশ্বর আকবর এবং চীনরাজের নিকট দুইখানি অনুরোধপত্রও সঙ্গে দিলেন।

নিউবেরী ও ফিচ্ সহচরগণের সহিত ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কতকদিন আলিপ্পে ও বোগ্দাদে কাটাইয়া বসোরাতে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে অরমজে যাইয়া কারবারে যোগদান করেন। প্রথম কয়েকদিন কেহই তাঁহাদের কারবারে বাধাপ্রদান করে নাই। ৬ষ্ঠ দিবসে মাইকেল ষ্ট্রপেন নামক এক ইটালিয়ান বণিক্ নিজ কারবারের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। তাহার ষড়্‌যন্ত্রে পর্ত্তুগীজেরা নিউবেরী ও ফিচ্‌কে ধরিয়া কারারুদ্ধ করে এবং অবিলম্বে গোয়ায় পাঠাইয়া দেয়।

এইরূপে ভারতের ভাবী উত্তরাধিকারীর পূর্ব্বপুরুষদ্বয় প্রথম ভারতবর্ষ দর্শন ও ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

সার্ ওয়াল্‌টার্ স্কট্।

বাল্য জীবন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-মাসে এডিনবরানগরস্থ জনৈক আইন-ব্যবসায়ীর গৃহে সার্ ওয়াল্‌টার্ স্কট্ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তদীয় পূর্ব্বপুরুষ সার্ উইলিয়ম্ স্কট্ কোন অভিযোগে এলিন-ব্যাঙ্কস্থ সার্ গিডিয়ন মারে কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তদীয় অতি কুৎসিত কন্যাদ্বয়ের অন্যতরটিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। উক্ত রমণীর মুখাকৃতি অতিশয় বৃহৎ থাকায় তাঁহার সন্তানসন্ততিগণের অধঃস্তন পুরুষবর্গেও ঐরূপ মুখাকৃতি লক্ষিত হইত। যাহা হউক, কুৎসিতা হইলেও গৃহিণীপনায় মেগ্ মারের বিশেষ দক্ষতা ছিল। সুতরাং সার্ উইলিয়ম্ তৎসহবাসে বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

প্রায় দেড়-বৎসর বয়ঃক্রমকালে সার্ ওয়াল্‌টার্ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার দক্ষিণপদের চলচ্ছক্তির ন্যূনতা জন্মে। চলচ্ছক্তির উৎকর্ষের নিমিত্ত তদীয় পিতা তাঁহাকে সহরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া স্যাণ্ডিনোনস্থ পল্লীগৃহে স্বীয় পিতার নিকট প্রেরণ করেন। স্যাণ্ডিনোনের সন্নিকটে সেমেইনহলম্ দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং কতিপয় ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী থাকায় স্থানটি বড়ই রমণীয় ছিল। স্কট্ বাল্যাবধি উক্ত শৈলশ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত

আছে, স্কট্ একদা জনৈক পরিচারিকা সহ উক্ত শৈলশ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে যান। পরিচারিকাটির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটায় সে স্কট্‌কে মারিয়া ফেলিয়া শৈলমধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। এই ঘটনার পর হইতে স্কট্‌কে মেষরক্ষকদিগের সহিত ভ্রমণার্থ প্রেরণ করা হইত।

স্কটের পিতা সার্ ওয়াল্টার্ অতিশয় তেজস্বী, উদার এবং পরোপকারী ছিলেন। নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ছিল। আত্মীয়স্বজনের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য রক্ষা করিতে এবং যথাশক্তি তাহাদের উপকারসাধন করিতে তিনি সততই তৎপর ছিলেন।

স্কটের জননী অ্যান্ রাদারফোর্ড তদানীন্তন স্কচ্ মহিলাগণের মধ্যে বিশেষরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। স্নেহ, দয়া, সরলতা, প্রফুল্লতা প্রভৃতি কোমল গুণাবলীতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্যের জন্য তিনি বিশেষরূপে পরিচিতা ছিলেন। পুরাতন ঘটনাবলী তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিতে পারিতেন যে, তাহা শুনিলে যার-পর-নাই বিস্মিত হইতে হইত।

সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্ স্বীয় অলৌকিক মনস্বিতার সহিত পিতৃমাতৃ-গুণাবলীর সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন।

স্কটের প্রপিতামহ ষ্টুয়ার্ট-রাজগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধকালে তাঁহাদের স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ষ্টুয়ার্ট-রাজবংশের নির্ব্বাসনের পর তিনি আর তাঁহার শ্মশ্রুমুণ্ডন করেন নাই। ইহা হইতেই স্কটের হৃদয়ে ষ্টুয়ার্ট-রাজবংশের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ সংক্রামিত হয়।

বাল্যকালে স্কট্ অতিশয় সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত। সপ্তমবর্ষ বয়সে গৃহীত

তাঁহার প্রতিকৃতি তাঁহার বাল্য সৌন্দর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ফলত যৌবনের উন্নত ও বক্র শীর্ষদেশ তাঁহার বাল্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে দৃষ্ট হইত না।

বাল্যাবধিই তিনি বিশেষ শ্রমশীল ছিলেন। খঞ্জতানিবন্ধন চলচ্ছক্তির কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইলেও অতি শৈশবকাল হইতেই তিনি অশ্বারোহণে বিশিষ্ট পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। স্যাণ্ডিনোনের নিকটস্থ বন্ধুর প্রদেশে তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত অশ্বচালনা করিতে পারিতেন যে, অতি অল্প লোকেই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারিত।

স্মরণশক্তির প্রাখর্য্যহেতু বাল্যকাল হইতেই স্কট্ কবিতা আবৃত্তিতে বিশেষ অনুরক্তি দেখাইতেন। হাডীনিউট-ঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় কবিতাবলী তিনি এরূপ উৎসাহের সহিত সজোরে আবৃত্তি করিতেন যে, নিকটস্থিত গির্জ্জার ধর্ম্মযাজককে সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে শুনা যাইত।

আত্মদমনে স্কটের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে, একদা জনৈক ভৃত্য অপর একজনের নিকট "ভূতের গল্প" বলিতেছে শুনিয়া, উক্ত গল্প শ্রবণ করিলে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে বুঝিতে পারিয়া, তিনি এরূপ ভাবে বিছানাদ্বারা স্বীয় মস্তক আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যেন কিছুতেই একটি বাক্যও শ্রুতিগোচর না হয়।

বিদ্যালয়ে স্কট্ অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত না হইলেও, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইত। স্কুলের বাহিরে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সততই নূতন নূতন গল্প রচনা করিয়া সহপাঠী এবং অন্যান্য ছাত্রবৃন্দকে শুনাইতেন। তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিত। গল্পরচনার ক্ষমতা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জন্মিয়াছিল।

লোকচরিত্রের গূঢ়তত্ত্বাবিষ্কারে তিনি বাল্যাবধিই বিশেষ পারদর্শী

ছিলেন। কথিত আছে, একদা শ্রেণীস্থ কোন বালককে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মে। তীক্ষ্ণদর্শী স্কট্ দেখিলেন যে, উক্ত বালককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই সে তাহার ওয়েষ্টকোটের বোতামের উপর হস্তস্থাপনা করিয়া উত্তরপ্রদানে মনোনিবেশ করে। স্কট্ স্থির করিলেন যে, যদি কোনক্রমে উক্ত বোতামটি স্থানচ্যুত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং তৎপরদিবস তিনি বোতামটি কর্ত্তন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেদিবস উক্ত বালককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে পূর্ব্ববৎ বোতামের উপর হস্তস্থাপনার্থ হস্তোত্তোলন করিল, কিন্তু বোতামটি না পাওয়ায় সে অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। এইরূপে স্কট্ যে স্থান পরিশ্রমদ্বারা অধিকার করিতে পারেন নাই তাহা এবংবিধ চাতুরী দ্বারা অধিকার করিলেন।

খঞ্জ হইলেও স্কট্ কলহবিগ্রহাদিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পথিমধ্যে বিবাদবিসংবাদ উপস্থিত হইলে তিনি পরম উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগদান করিতেন। অশ্বারোহণে তিনি যেরূপ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন, বৃক্ষ এবং গির্জ্জাদির চূড়ার উপর আরোহণ করিতেও তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতেন।

স্কট্ সমস্ত জীবনই অতীতের গুণদর্শী ছিলেন এবং রক্ষণশীল দলের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল।

গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

১৮১১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অমৃতবল্লী কষায়।—আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, উপদংশ, দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া, শরীর পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারক। ইহা সকল সময় সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹,, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ আনা।

কুটজারিষ্ট।—(রক্তাতিসার, আমরক্ত ও গ্রহণীর মহৌষধ।) ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তাতিসার, আমরক্ত, গ্রহণী, শোথ ও তৎসঙ্গে অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত জ্বর সত্বর উপশমিত হয়।

২ সপ্তাহের ব্যবহারোপযুক্ত ১ শিশি ঔষধ ও দুই প্রকার বটিকার মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ দশ আনা।

অগ্নিদীপক।—ইহা সেবনে প্রবল অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বার অজীর্ণ ও তজ্জন্য তরল মলনির্গম, দমকা ভেদ, উদরাধ্মান, অম্লোদ্গার প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব আশু নিবারিত হইয়া, অগ্নির উদ্দীপ্তি, আহারে রুচি, সম্যক পরিপাক, কোষ্ঠশুদ্ধি, শরীর হাল্কাবোধ, মনের প্রফুল্লতা প্রভৃতি সুন্দররূপে উৎপন্ন হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৶৹।

অশোকারিষ্ট।—ইহা সেবনে বাধক, রজঃ অনির্গম, অতিরিক্ত রজঃনির্গম, প্রদর, শ্বেতপ্রদর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, আর্ত্তবের বিবর্ণতা, উদরের বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া জরায়ু পরিশোধিত হইয়া থাকে, এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক শিশি অশোকারিষ্ট ও এক কৌটা (১৬টী) বটিকার মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ দশ আনা। ভিঃ পিতে লইলে ২।৹ সোয়া দুই টাকা মাত্র।

মেধাকর রসায়ন।

মেধাকর রসায়ন, মেধা ও স্মৃতিবর্দ্ধক, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাসম্পাদকস, বল ও পুষ্টিকারক, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা-নিবারক, সকল প্রকার মানসিক দোষের (অপস্মার, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির) নিবারক এবং সুনিদ্রাপ্রদায়ক, আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষিত মহৌষধ। প্রনষ্ট ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি করিতে, ইহার মত প্রত্যক্ষফলদায়ক ঔষধ আর নাই; সুতরাং ইহা বিদ্যার্থীর প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। মেধাকর রসায়নের, মূল্য সাতদিনে দেড়, পনরদিনে আড়াই এবং এক মাসে সাড়ে চারি টাকা।

সুকল্যাণ তৈল।

সুকল্যাণ তৈল, ঊর্দ্ধজত্রুগত বাত ও পিত্তজাত শিরোরোগ নিবারক। ইহাতে উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি রোগের উপশম হয়, মনের অস্থিরতা দূর হয়, মাথাঘোরা ও কামড়ান নিবারিত হয়, এবং সত্বর সুনিদ্রার সঞ্চার হয়। ইহা অতিশয় স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট। মূল্য বড় শিশি দুই এবং ছোট শিশি দেড় টাকা।

অম্লশূলান্তক ১৫ দিনে ১৲। ক্ষুধাসাগর ১৫ দিনে ১৲।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত,—"আমার ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান্ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থের ঔষধ আমার বহুপরীক্ষিত। ইহার ঔষধে রোগীর প্রকৃত উপকার হইবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস। অম্লশূলান্তকে অম্ল ও শূলরোগের তীব্রবেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক; ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উহা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ।

১৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ বিডন্ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা ১৲, উত্তরচরিত ১।০, রত্নাবলী ৸০, মালতীমাধব ১।৵০, মুদ্রারাক্ষস ১।০, মৃচ্ছকটিক ১৷৷০, মালবিকাগ্নিমিত্র ৸০, বিক্রমোর্ব্বশী ৸০, মহাবীরচরিত ৸০, চণ্ডকৌশিক ৸০, বেণীসংহার ১।৵। উক্ত গ্রন্থকারের মনোহর প্রহসন হঠাৎ নবাব ।৵০।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন কাব্য—নৈবেদ্য ১৲, রবিবাবুর—নূতন ও পুরাতন ছোট ছোট গল্প একত্রে সংগ্রহ "গল্পগুচ্ছ" দুই খণ্ড উত্তম বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা ৪৷৷০, "কাব্যগ্রন্থাবলী" কুড়িখানি কবিতাপুস্তক ৬৲ স্থলে পাঁচ টাকা, গল্পগুচ্ছ ও কাব্যগ্রন্থাবলী একত্রে লইলে আট টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"ফুলজানি"—(২য় সংস্করণ) উপন্যাস। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য বাঁধা ১।০, কাগজে ১৲।

শ্রীশবাবুর অন্যান্য উপন্যাস—শক্তিকানন ১৲। বিশ্বনাথ ১৲, কৃতজ্ঞতা ৸০, রবীন্দ্র বাবুর—নূতন ধরণের কাব্য—কথা ১৲, কাহিনী ১৲, কল্পনা ১৲, ক্ষণিকা ১।০, কণিকা ৷৷০।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী (ঈশান বাবুর) দুইখানি বিভিন্ন বয়সের ছবি সমেত, মূল্য ৷৷০। কণ্ঠমালা—উপন্যাস সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন সংস্করণ মূল্য ১।০।

প্রাপ্তির স্থান—

মজুমদার লাইব্রেরি।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

সমালোচনী।

মাসিক পত্র।

(শ্রাবণ)

৭ম সংখ্যা।

১৩০৯।

কলিকাতা,

৯৮ হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে

শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুগ্মচিত্র	শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	২৫৯
ভাষার প্রাদেশিকতা ...	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু ...	২৬৯
বঙ্কিম-কথা	শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৫
কবিতা-গুচ্ছ		
বিরহিণী	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৮০
ব্যথিতা	শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়	২৮১
কবির গান	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	২৮২
প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত	২৮৩
বর্ষা ও শরৎ	... ...	২৮৮
পুস্তক সমালোচনা ...	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়	২৯২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। } ১৩০৯। { ৭ম সংখ্যা।

যুগ্মচিত্র।

Victor Hugoর "লা মিজারেবেল" ও বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহে দুইটি চিত্র বিবিধ দৃশ্য এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে হিমারণ্যপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে দিল্লীর অসীম সুখৈশ্বর্য্য, মোগল-অন্তঃপুরের বীভৎস বিলাসতরঙ্গ, কুচক্রী আওরংজেবের কূটনীতি ও অবিশ্রান্ত রণরঙ্গ—কার্য্যের স্রোতে মোগলসাম্রাজ্য ভাসমান। অন্যদিকে প্যারিসের গর্ব্বিত বিলাসী ধনিসম্প্রদায়ের যথেচ্ছ ব্যবহার, দরিদ্রের অযথা নির্য্যাতন, সামাজিক ও রাজনৈতিক সহস্র বৈষম্য—ক্রিয়াচক্রের বিচিত্র সংঘর্ষণে ফরাসীসমাজ আলোড়িত, উচ্ছৃঙ্খল। সুখৈশ্বর্য্য—বিলাসলালসার বহুদূরে সংসারের একপার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র বালিকা, অসংখ্য ঘটনান্তরালে ছায়ার মত আমাদের অনুসরণ করে। ইপনাইন্ ও দরিয়া—এই দুইটি চিত্র; ইহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

ইপনাইন্‌কে প্রথমে আমরা প্যারিসের এক জঘন্য পল্লীর অন্তর্গত অতি হীন গৃহে মেরিয়সের কক্ষে দেখিতে পাই—জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ আকৃতি,

রুক্ষ কেশ; যৌবনে বার্দ্ধক্যের ছায়া [illegible] ভাবে পিতৃ-আদেশে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এত কষ্টেও সে প্রফুল্ল,—এত দুঃখদৈন্যেও তাহার জীর্ণ আকৃতি, শীর্ণ কঙ্কাল সে আনন্দের শুভ্র আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

দরিয়াও দরিদ্রা, কিন্তু ভিক্ষা করে না। এক দূর আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া সুর্ম্মা বিক্রয় করিয়া কোনরূপে জীবনযাপন করে।

ইপনাইন্ অত দারিদ্র্যের মাঝে থাকিয়াও মেরিয়সের কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া ভুলিল। অলক্ষিতে প্রেম তাহার হৃদয়ে আপনার প্রভাব বিস্তার করিল, মরুভূমির অগ্নিকণবর্ষী বালুকারাশির মধ্যেও জীর্ণ কণ্টকবৃক্ষে কুসুম ফুটিয়া উঠিল!

আর দরিয়া ত নামমাত্র বিবাহিতা, স্বামীর সন্দর্শনমাত্রও সে ভাল করিয়া পায় নাই। তাঁহাকে ক্বচিৎ দেখিয়া, তাঁর একটিমাত্র কথা শুনিয়াই তার সুখ, সেই আশাতেই সে বাঁচিয়া আছে।

দরিয়া ও ইপনাইন্, দুইজনেই ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে চাঞ্চল্য নাই, আবেগ নাই,—তাহা ধীর, স্থির, সংযত। শুক্তি যেমন কঠিন আবরণের ভিতর তাহার মুক্তা সযত্নে লুকাইয়া রাখে, তাহারাও তেমনি হৃদয়ের অন্তরালে অতি যত্নে তাহাদের প্রেম পোষণ করিতেছিল। সে ভালবাসার কথা কখনও মুখ ফুটিয়া বাহির হয় না, সে নৈরাশ্যের জ্বালা—বিরহের শ্বাস ধীরে ধীরে নীরবে মিলাইয়া যায়। কখনও হয় ত একটি কথায়, কখনও বা একটি ভাবে তাহা ব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের মাঝে যে ভীষণ ঝটিকা—যে গভীর কল্লোল, তাহা কয়জন বুঝে?

ভক্ত যেমন ভূমানন্দে তাঁহার ইষ্টদেবের প্রেমে তন্ময় হন, কবি যেমন চরাচরে উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যপ্রতিমায় আত্মহারা হন, তাহারাও

তাহাদের ঈপ্সিতকে দেখিয়া তেমনি তন্ময় হয়, প্রিয়তমের অপরূপ সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে তেমনি মুগ্ধ করে।

অথচ প্রেমের প্রতিদান কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। মেরিয়স্ কসেটের চিন্তায় নিমগ্ন;—বিরহে সংসার শ্মশান মনে হইতেছে, বাসনানলে হৃদয় পুড়িয়া ক্ষার হইতেছে, মেরিয়সের তবু কসেটের চিন্তাতেই সুখ, তাহার ধ্যানেই শান্তি, স্মরণে আনন্দ; অভাগিনী ভিখারিণী ইপনাইনের কথা কে ভাবিবে?

অন্যদিকে মবারক জেবোন্নিসার বিলাসলালসায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সেই সুসজ্জিত কক্ষ, সেই অতুল প্রভাব, সেই অমিত ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বোপরি সেই মনোমোহন রূপরাশি—মবারকের হৃদয় আলোড়িত করিল। সে শাহজাদীর প্রেমলাভে আকুল; অভাগা জলভ্রমে মরীচিকা লক্ষ্য করিয়া ছুটিল, একবার শুষ্ক দরিয়ার পানে চাহিল না।

দরিয়া ও ইপনাইন্ উভয়েই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী;—উভয়েই তাহাদের প্রিয়তমের প্রেমলালসায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু অবস্থার ভেদে উভয়ের চরিত্রে যে স্বাতন্ত্র্য অবশ্যম্ভাবী, তাহা বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। দরিয়া বিবাহিতা পত্নী—প্রত্যাখ্যাতা, সুতরাং অভিমানিনী,—তাহার সমস্ত রুদ্ধ অশ্রু ও সংযত উচ্ছ্বাস তাহার অভিমানকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। ইপনাইন্ ব্যর্থমনোরথ প্রণয়যাচিকামাত্র, সুতরাং অভিমানে তাহার অধিকার নাই,—কিন্তু তাহার একটি কথা, একটি ভাব পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসে।

ইপনাইন্ এই দুঃখনৈরাশ্যের মাঝে যেখানে ম্লান-বিবর্ণ-মুখে দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র ত্যাগ করিয়া নীরবে অবস্থিতি করে, সেখানে দরিয়ার একটিমাত্র কথা সমস্ত হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া অব্যক্ত বেদনা মুখরিত করিয়া দেয়। ইপনাইনের নীরব ম্লান মূর্ত্তিতে যেখানে পাঠকের হৃদয়ে

দুঃখের ছায়া ঘনাইয়া আসে, দরিয়ার একটি উচ্ছ্বাসে সেখানে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হয়।

ক্ষুদ্র তটিনী যেমন দূর বনান্তরাল দিয়া নীরবে বহিয়া যায়, ইপনাইন্ তেমনি সমস্ত কোলাহল হইতে অতি দূরে থাকিয়া নায়কের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা ধরিবার-ছুঁইবার জো নাই। যেন কোন তিরস্করিণী মায়া তাহার ছায়াময়ী মূর্ত্তিকে গভীর রহস্যে ঘিরিয়া আছে। মেরিয়স্ কসেট্‌কে দেখিয়া-শুনিয়াই সুখী। ইপনাইনের চিন্তার স্থান কোথায়? মেরিয়স্ প্রণয়িনীর প্রেমচিন্তায় দিশাহারা। অথচ ইপ্‌নাইন্ একবারও মুখ ফুটিয়া তাহার ভালবাসার কথা প্রকাশ করে নাই। মেরিয়স্ শুধু দেখিত, ম্লান ধূলিধূসরিতা চীরপরিহিতা বালিকা মাঝে মাঝে তাহাকে দেখা দেয়, প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সর্ব্বদাই যেন ছায়ার মত অনুসরণ করে—তাহাকে দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়—অথচ সাহায্য করিতে চাহিলেও সাহায্য গ্রহণ করে না। তাহার এই আচরণ মেরিয়সের নিকট একটা গভীর রহস্য বলিয়া মনে হইত বটে, কিন্তু ইপনাইন্ যে তাহারই প্রেমের জন্য লালায়িত, তাহারই প্রণয়ের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট, স্বপ্নেও এ কথা সে ভাবিতে পারিত না। কিন্তু দরিয়াসম্বন্ধে সে কথা খাটে না। মবারক জানিত, দরিয়া তাহার পরিণীতা স্ত্রী, তথাপি সে নিরপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিল—প্রেমের অপমান করিল—শাহজাদি জেবোন্নিসার রূপানলে ঝাঁপ দিল—প্রেমলালসায় আত্মহারা হইল। মবারকের এই গোপনপ্রেম—পাপের এই পূর্ণপ্রবাহ—পতিব্রতা দরিয়ার হৃদয়ে সহ্য হইল না—লালসার উদ্দাম চাঞ্চল্য পবিত্র প্রেম সহিতে পারিল না। তাই যে-দিন গভীররাত্রে জেবোন্নিসার কাছে শাহজাদির হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ব্যর্থমনোরথ মবারক খাসমহল হইতে ফিরিতেছিল, সে-দিন দরিয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া বিদ্রূপকঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজপুত্রীর সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল কি না।"

জ্যোতিষীর কথা, অদৃষ্টগণনার কথা—সমস্ত কথাই বলিল—কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য সেই এক—রাজপুত্রীর সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল কি না। মূঢ় মবারক তাহার কোন কথাই বুঝিল না, কোন্ অপরাধে দরিয়া তাহার উপর এমন অত্যাচার করিতেছে, ইহার চিন্তাতেই সে ব্যস্ত। অভিমানিনী আর থাকিতে পারিল না—ফণিনী যেমন প্রহৃত হইলে গর্জ্জিয়া উঠে, দরিয়াও তেমনি পূর্ণোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল—"কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?" ইপনাইনের এমন বিদ্রূপকঠোর বাক্য নাই, সুতীব্র পরিহাস নাই, জলন্ত উচ্ছ্বাস নাই—সে তাহার অধিকারিণীও নহে। মেরিয়সের তিরস্কারে সে নিরুত্তর হইয়া থাকে—তাহার সমস্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেলেও মুখে কোন কথা আসে না—সে নিঃশব্দে এক দিকে চলিয়া যায়। তাহার মুখে পাণ্ডুবর্ণ ঘনাইয়া আসে, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কিছু বলিতে পারে না, শেষে মৌন সন্ধ্যায় ধীরে একদিকে চলিয়া যায় মাত্র।

বিচিত্র চরিত্রসমষ্টির পার্শ্বে উভয়েই যেন ছায়ার মত ঘুরিতেছে—কতকটা অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া দরিয়ার চিত্র অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল মাত্র, এই ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বত্রই ইপনাইন্ হইতে তাহাকে পৃথক্ রাখিয়াছে। প্রণয়ীর জন্য আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা কাহারও হৃদয়ে কম নহে। মবারক যুদ্ধ করিতে করিতে যখন রণক্ষেত্রস্থ কূপে পড়িয়া ঘোর বিপদে পড়িল, ঊর্দ্ধে অমৃতময় নারীকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাঁচিয়া আছ?" এ কণ্ঠ দরিয়ার—এমন সময় অন্য কে তাহাকে বাঁচাইতে আসিবে? কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই পরিহাসকুটিল প্রশ্ন—"শাহজাদী কেমন ভালবাসে?"

অভাগিনী ইপনাইন্‌ও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া চলিল—তাহার সুখের যে একমাত্র অন্তরায় কসেট্—মেরিয়সের সুখের জন্য তাহার ঠিকানা

বলিয়া দিতেও সে ইতস্তত করিল না। পদে পদে সে কঠোরতা সহ্য করিয়াছে—মেরিয়সের কাছে কৃতজ্ঞতা কিংবা সহানুভূতিটুকু পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। সে পিতৃদলস্থ দস্যুদের অসহ্য অত্যাচার হইতে নীরবে মেরিয়স্ ও কসেট্‌কে প্রাণপণে রক্ষা করিয়াছে—তাহার সমস্ত শোকদুঃখ সযত্নে নিজ হৃদয় দিয়া মুছিয়া লইয়াছে। মেরিয়সকে একটিবার দেখিবার জন্য তার কত আগ্রহ—তার মুখে হাসিটি ফুটিয়া উঠিলে তার কত আহ্লাদ! অথচ সহস্র সুযোগের মাঝে সে একদিনও মুখ ফুটিয়া তাহার ভালবাসার কথা একটিবারও বলে নাই।

কসেট্ সহসা স্থানত্যাগ করায় মেরিয়স্ সেই শূন্য গৃহের শূন্য বেদীতলে বসিয়া ভাবিতেছিল—সেই বেদীতল, যেখানে মেরিয়স্ ও কসেট্ কত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত,—নীলাকাশে সমুজ্জ্বল চন্দ্র তাহার প্রিয়তমার শিরে রজতমুকুট পরাইয়া দিত—অনিন্দ্যসুন্দর মুখে, সেই প্রেমদীপ্ত লজ্জারুণ গোলাপী গণ্ডে কি মোহমাধুর্য্য ঢালিয়া দিত; তরুলতা ভাবে স্পন্দহীন, নক্ষত্রমালা অনিমেষনয়নে তাহাদের সুখে বিভোর হইয়া আছে; তাহাদের নীরব সুখে নিশীথিনী বুঝি শিহরিত, তুহিনকণায় প্রকৃতির পুলকাশ্রু ঝরিত। যে কথার অবধি নাই, যে উচ্ছ্বাস শেষ হয় না, যে ভাবপ্রকাশের ভাষা নাই—যে সৌন্দর্য্যের কণামাত্র ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় ছাপাইয়া উঠে, এমনি কত কথা—কত সৌন্দর্য্য ভাবিতে ভাবিতে মেরিয়স্ যখন আত্মহারা হইতেছিল—তখন সচকিতে মেরিয়স্ শুনিল, বিদ্রোহিদলে যোগ দিবার জন্য কে তাহাকে সাগ্রহ আহ্বান করিতেছে। কে শুনাইল?—ইপনাইন্। ইপনাইন্ তাহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি চিন্তায় এইরূপ ছায়ার মত সর্ব্বদাই ঘুরিত।

এতদূর যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝান কঠিন হইবে না যে, দরিয়া ও ইপনাইন্ একই চরিত্রের বিভিন্ন পার্শ্বমাত্র। একই প্রকৃতি

দুই ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ভিন্নরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে—দরিয়া ইপনাইনের অবস্থায় পড়িলে হয় ত ইপনাইন্ হইত, ইপনাইন্ দরিয়ার অবস্থায় পড়িলে হয় ত দরিয়া হইত। মানবচরিত্র সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে একই-রূপ, দেশভেদে কালভেদে তাহার বহিরাবরণ বিভিন্ন হইয়া যায় মাত্র।

মবারক যখন বুঝিল, শাহজাদীরা ভালবাসে না—দরিয়া যখন বুঝাইল, যাহারা গরীব তাহারা ভালবাসে, তখন মবারক আর জেবোন্নিসার কাছে গেল না; দরিয়াকে লইয়া সুখে কাল কাটাইবার বাসনা করিল। কিন্তু দরিয়া ও মবারকের অত প্রেম জেবোন্নিসার সহিল না। তিনি সব শুনিলেন, শেষে শাহজাদী ও নায়িকার মান ঘুচাইয়া মবারককে ডাকিতে পাঠাইলেন, তবু মবারক আসিল না। ইহাতে শাহজাদীর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি মবারককে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কোনরূপে মবারক বাঁচিয়া উঠিল। দরিয়া মবারকের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া পাগল হইয়া গেল, সুকুমার নারীহৃদয়ে তত কষ্ট—তত যন্ত্রণা সহিল না। উন্মাদিনী দরিয়া খাসমহলে জেবোন্নিসাকে হত্যা করিতে আসিয়া শাহজাদীর চক্ষে জল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া হত্যা করিল না। একবার উচ্চহাস্যে আনন্দপ্রকাশ করিল, তার পর বিবসনা উন্মাদিনী দরিয়া, লক্ষ্যহারা দিশাহারা ধূমকেতুর মত দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

এদিকে জেবোন্নিসার অনুতাপদগ্ধ হৃদয় বাদশাহজাদীত্বকে পদদলিত করিয়া মবারককে স্বামিরূপে বরণ করিল; বিনীতা দর্পশূন্যা স্নেহশালিনী অশ্রুময়ী জেবোন্নিসাকে দেখিয়া মবারক আবার সব ভুলিয়া গেল। তাহার পূর্ব্বানুরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। কিন্তু এই সুখের আবর্ত্তে পড়িয়াও মবারক

সুখী হইতে পারিল না। সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিম্বসমন্বিত উদয়-সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবনতুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেবোন্নিসাকে বুঝাইতেছে যে, তাহার এই সুখ দশ দিনের জন্যও সে ভোগ করিতে পারিল না,—কাল তাহাকে মরিতে হইবে। ঠিক সেই সময়ে সর্ব্বদেহে বস্ত্রমণ্ডিতা উন্মাদিনী নারীমূর্ত্তি তাহাদিগকে দেখা দিল—এই মূর্ত্তি দরিয়া। সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া শূন্যনয়নে একটিমাত্র কথা বলিল, "তোমরা কে?" এই একটিমাত্র কথায় অভাগিনী দরিয়ার নিষ্ফল প্রেম, প্রেমের অযথা অপমান, শোক-দুঃখ-নৈরাশ্য-সন্দেহের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতে উন্মাদিনীর চূর্ণবিচূর্ণ হৃদয়, ঘনীভূত অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে মবারক কাহার বন্দুকের গুলিতে ভূপতিত হইল,—মাণিকলাল সবিস্ময়ে দেখিল যে, বন্দুকহস্তে ধীর-স্থির নারীমূর্ত্তি দরিয়া—ঘোর উন্মাদিনী—তার পর আর কেহ তাহাকে দেখে নাই।

অনেকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ইহা দরিয়ার প্রতিশোধগ্রহণ মাত্র। জেবোন্নিসা যখন গোপনপ্রেমে তাহাকে প্রেমের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছিলেন, তাহা বরং তাহার সহিয়াছিল, কিন্তু যখন মবারক জেবোন্নিসাকে বিবাহ করিল, তখন তাহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল, তাই সে মবারককে হত্যা করিয়া জেবোন্নিসার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইহা দরিয়ার প্রতিহিংসাগ্রহণ নহে। হতভাগিনী যখন শোকে-দুঃখে উন্মাদিনী হইয়া গেল, তখন মবারক যে তাহার প্রিয়তম, ইহা হয় ত তাহার মনে ছিল, কিন্তু অজস্র অত্যাচার সহিয়াও গর্ব্বিতা শাহজাদীর সহিত প্রণয়ালাপরত সেই যে মবারক—সেই যে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব—তাহা বিচার করিবার মত জ্ঞান সে হারাইয়াছিল। উন্মাদিনী স্থান, কাল, পাত্র, সব দিক্ বিবেচনা করিতে

পারিল না। তাহার কার্য্যের ফলাফলও সে ভাবিল না, হয় ত জেবোন্নিসার সম্পর্কীয় সমস্তই তাহার বিষবোধ হইতেছিল—সে অজ্ঞাতে মবারককে গুলি করিয়া মারিল। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, উন্মাদেরা উন্মত্ততার অবস্থায় তাহাদের প্রিয়তমের জীবন লইয়াছে, অথচ সেখানে প্রতিহিংসাগ্রহণের লেশমাত্র কারণ নাই এবং তাহারা আরোগ্যলাভ করিয়া গতকর্ম্মের জন্য যে গভীর অনুশোচনা করিয়াছে, তাহাতে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।

দরিয়া উন্মাদিনী হইল, ইপনাইন্ প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। সে জানিত, মেরিয়স্ বিদ্রোহিদলে যোগদান করিয়াছে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। যদি মেরিয়স্ মরে, ইপনাইন্ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু মরিতে হয় ত তাহার কাছেই মরিতে হইবে—আশা, মরিবার সময় তবু একবার মেরিয়স্‌কে দেখিতে পাইবে। তাই যখন বন্দুকের গুলি মেরিয়সের দিকে ছুটিয়া আসিল, ইপনাইন্ তাহা নিজদেহে গ্রহণ করিয়া মেরিয়স্‌কে বাঁচাইল, কিন্তু নিজে সাংঘাতিক আহত হইয়া ভূপতিত হইল এবং মেরিয়স্‌কে ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, "আমি এইখানে আছি, at your feet." মেরিয়সের তাহাকে সৈনিকের ছদ্মবেশে চিনিতে বিলম্ব হইল, সে বলিল—"You do not know me? Eponine." মেরিয়স্ সব শুনিয়া তাহার অবিমৃষ্যকারিতা ও আহত হওয়ার জন্য কত দুঃখ করিলেন। সে কিছু বলিল না, শুধু মেরিয়স্‌কে তাহার পার্শ্বে একবার বসিতে অনুরোধ করিল এবং মেরিয়সের কোলে মাথা রাখিয়া সে যেন কৃতার্থ হইল, সকল জ্বালা ভুলিল। কত স্মৃতি তার মনে পড়িতে লাগিল, কত দিন, কত দৃশ্য, কত সুখ, কত ব্যথা, সে আপন মনে বলিতে লাগিল। সে যেন কোন নূতন রাজ্যে যাইতেছে—এতদিন মৃত্যুর পর সে নবজীবন লাভ করিতে চলিয়াছে—আজ তাহার আর শান্তির সীমা নাই। সে অল্পক্ষণ পরেই অসীমের পারে যাইতেছে—

সেখানে মেরিয়স্‌কে পাইবে নিশ্চিত, এ সময় কি আর বঞ্চনা ভাল দেখায়?—সে কসেটের চিঠি মেরিয়স্‌কে দিল—পূর্ব্বে দেয় নাই। সে মরিবার সময় মেরিয়সের নিকট একমাত্র প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল—"Promise to kiss me on the forehead when I am dead, I shall feel it." ধীরে ধীরে হতভাগিনীর জীবন শূন্যে মিলাইয়া গেল।

আমরা দেখিলাম, দরিয়া ও ইপনাইন্, দুজনেই দরিদ্রকন্যা, নিঃসহায়—প্রেমমাত্র আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে—দারিদ্র্যদৈন্যের মাঝেও প্রফুল্ল, স্নেহময়ী—ভাবময়ী, নিরাশ প্রণয়ের তাপে দুজনেই ভস্মীভূত।

অথচ দরিয়া ও ইপনাইনের মধ্যে পার্থক্যও বেশ সুস্পষ্ট। দরিয়া তেজস্বিনী, সতীত্বগর্ব্বিতা, অভিমানিনী; ইপনাইন্ সঙ্কুচিতা, দীনহীনা, আশ্রয়ভিখারিণী। দরিয়া প্রেমে চঞ্চল এবং মুখর; ইপনাইন্ প্রেমে ধীর এবং মৌন। দরিয়া প্রেমে আবেগ-উচ্ছ্বাসময়ী; ইপনাইন্ প্রেমে শান্ত ও সংযত। দরিয়া সামাজিক শৃঙ্খলার অন্তর্ভূত; ইপনাইন্ সমাজবন্ধনের বহির্ভূত। দরিয়া পরিণীতা স্ত্রী; ইপনাইন্ প্রেমযাচিকামাত্র। দরিয়া হিমানীধৌত শ্বেত শেফালিকা; ইপনাইন্ কীটদষ্ট ম্লান কুন্দ-কুসুম। দু-ই ছায়াময়ী, একটি উষার—যৌবনের তরুণারুণ আলোকে উজ্জ্বলা, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয়; অপরটি প্রদোষের—যৌবনালোকে ডুবুডুবু, আশা-নিরাশায় ভরা ছায়া ঘনাইয়া আনে। একজন দুঃখ-দারিদ্র্যের চিরসহচরী, অপরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অতল তলে নিমজ্জিতা। একজন অত্যাচার ও নির্য্যাতনে তিলে তিলে জীবন বিসর্জ্জন করিল, অপরা তাহার প্রবল ভাবপ্রবণ হৃদয় লইয়া শোকে-দুঃখে আশা-নিরাশায় উন্মাদিনী হইল। একজন মরিয়া জ্বালা জুড়াইল—অপরা মরণাধিক যন্ত্রণা পাইল—উন্মাদিনী হইয়া সকল জ্বালা ভুলিল।

সুকুমারী করুণাময়ী দুইটি রমণীমূর্ত্তি! গভীর দারিদ্র্যে তাহারা আপনার কথা ভুলিয়াছে।এবং সর্ব্ব সুখে-দুঃখে প্রণয়ীর জন্য আপনাদের হৃদয় অযাচিত উৎসর্গ করিয়াছে। প্রতিদানমাত্র না পাইয়া তাহারা অজস্র ভালবাসা ঢালিয়া দেয় এবং কঠোর বন্ধুর জীবনপথে নিজেদের ক্ষুদ্র হৃদয় বিস্তৃত করিয়া তাহা সহজগম্য করিয়া তুলে।

সমস্ত ঘটনা ইহাদের দীর্ঘশ্বাসে উষ্ণ, অথচ ইহাদের দীর্ঘশ্বাস বুঝা যায় না; সমস্ত দৃশ্য ইহাদের অশ্রুসিক্ত, অথচ প্রফুল্লতার বিরাম নাই; দীনহীনা অথচ অভিমানিনী—গর্ব্বিতা, প্রেমময়ী করুণাময়ী অথচ পরিহাসকঠোরা, ভয়চকিতা ভীরুস্বভাবা অথচ তেজস্বিনী; অমর প্রতিভার অতুল তুলিকাস্পর্শে উভয়কেই বিচিত্র প্রভায় ভূষিত করিয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ভাষার প্রাদেশিকতা।

(Provincialism)

পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে আচার ও ভাষাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একধর্ম্মাবলম্বী ও একভাষাভাষী লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাসহেতু (প্রাদেশিক আচার ও ভাষার স্বাতন্ত্র্যবশত) পরস্পর পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হন, ইহাকেই প্রাদেশিকতা বলে। আচারগত প্রাদেশিকতার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ভাষাগত প্রাদেশিকতাই ইহার লক্ষ্য। ভাষাগত প্রাদেশিকতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—একটি উচ্চারণগত, অপরটি পদগত। এই দুই বিষয়ের একটু বিশদভাবে আলোচনায় "ভাষার প্রাদেশিকতা" বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান বাংলাদেশ প্রধানত এই কয়টি জেলা লইয়া গঠিত, যথা :—চব্বিশপরগণা (কলিকাতা), হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, বগুড়া, পাবনা, মালদহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও নদীয়া। আবার এই সকল জেলার গণ্ডির বাহিরে মেদিনীপুরের সীমান্তে উৎকলে উড়িয়া ভাষা, মানভূমের পশ্চিমোত্তরে সাঁওতালপরগণায় সাঁওতালি ভাষা, দিনাজপুরের পশ্চিমে পূর্ণিয়ায় হিন্দী ভাষা, জলপাইগুড়ির উত্তরে দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে পাহাড়ী ভাষা, কুচবিহারের নিকটস্থ ভূটানরাজ্যে ভূটানী ভাষা, চট্টগ্রামের পূর্ব্বে রেঙ্গুন প্রভৃতি প্রদেশে মগ ভাষা এবং ময়মনসিংহের উত্তরপূর্ব্বে খসিয়া-পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে খসিয়া প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত। বাংলার উপরি-উক্ত সাতাইশটি জেলার ভাষা পার্শ্ববর্ত্তী দেশের ভাষার সহিত কতকপরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। ভাষাসমূহের পরস্পর মিশ্রণ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে; বস্তুত প্রাকৃতিক-নিয়ম-বলেই ভাষার এইরূপ আদানপ্রদান সংগঠিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সহিত অন্যান্য প্রদেশের ভাষার এইরূপ আদানপ্রদান চলিলেও নিজ বাংলার ভাষা সর্ব্বত্র প্রায় একই-প্রকার। পার্থক্য কেবল চলিত কথোপকথনের ভাষা লইয়া। কথোপকথনের ভাষাতেও আবার ইতর ও ভদ্র শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, এই বিপুল-বিস্তৃত বাংলাদেশের ভাষার পরিধির মধ্যে পূর্ব্ববাংলার, রাঢ়দেশের, বরেন্দ্রভূমির ও বঙ্গসীমান্তভাগের কথিত ভাষার সমধিক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বাংলার প্রত্যেক জেলার ভাষায় কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গের অথবা মধ্যবঙ্গের উচ্চারণ হইতে

অনেক বিভিন্ন; এই কারণে এতদঞ্চলের লোক পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণের কথিত ভাষাকে "বাঙালে ভাষা" বলে; কিন্তু উহাদের লিখিত ভাষার সহিত পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের ভাষার বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু খাস্ কলিকাতাবাসীর ভাষার সহিত গঙ্গার পরপারস্থিত কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতির লোকের এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দেশের লোকের কথিত ভাষার কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা আছে;—অবশ্য এরূপ বিভিন্নতা অতিকষ্টে পৃথক্ করিতে পারা যায়।

নিম্নে উচ্চারণ ও পদ গত প্রাদেশিকতার সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের 'গেছ্লাম', 'গেলাম', 'করিলাম', 'কল্লাম' প্রভৃতি খাস্ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গেলুম, গেনু, খেলুম, খেনু, করলুম, করনু প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয়। পদগত-প্রাদেশিকতা-সম্বন্ধে দু'চারিটা নমুনা দেওয়া গেল :—

শ্রীহট্ট জেলা।	কলিকাতা।
গরই মাছ	শোয়াল (শোল)।
পিতলী	বিঠা (বাছে)।
রেণ্ডী	স্ত্রী।
মর্দ্দানা	স্ত্রীলোক। মেয়েলোক (রাণীগঞ্জ)।
কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থান।	কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল।
চিংড়ীমাছ	মাছ চিংড়ী।
ধামা, ধামি,	এদে, বাগি।
বিচালি, খড়	খড়।
খড়	উলু।

"এঁটো"শব্দ বাংলার কোন কোন স্থানে "শকড়ী" নামে অভিহিত। "উনুন"শব্দ কোথাও "আকা," কোথাও "উনান্", আবার

কোথাও বা "তিগড়ী", "চুলা" প্রভৃতি নামে কথিত। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে "তিগড়ী" ও "চুলা" শব্দে শ্মশানের শবদাহ-স্থানকেও কহে। হুঁকো বা হুঁকা (হুক্কা) পূর্ব্বাঞ্চলে "ডাবা" নামে অভিহিত। "ন্যাদস্"মাছকে কোথাও "আব্‌রো" মাছ বলিয়া থাকে। "মাদার" ফল কোথাও বা "ড্যাফল" ফল নামে অভিহিত। এইরূপ আরও কত দেখান যাইতে পারে, এখানে অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" যখন অভিধানসঙ্কলনের উদ্দেশে এইরূপ শব্দসংগ্রহ মনস্থ করিয়াছেন, তখন ঐ পত্রিকায় এই শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

"পরিষদের" এই চেষ্টা দেখিয়া কোন কোন সাহিত্যসেবক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, "গ্রাম্যতা ও প্রাদেশিকতা বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিলে ভাষার বিশুদ্ধতার হানি হইবে।" ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্য মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী অথবা অন্য কোন প্রবন্ধপুস্তকে ইহার পরিবর্জ্জন একান্ত আবশ্যক বটে; কিন্তু কোন কোন সাহিত্যে ইহাদের ব্যবহারে ভাষার বিশুদ্ধির কোন ব্যতিক্রম হয় না; অথচ ভাষায় সরসতার বৃদ্ধি পায়। বিশেষ এক প্রদেশের কথা অন্য প্রদেশে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত;—এইগুলির সংগ্রহ ও তাহার অর্থনির্ণয়ে যে সাহিত্যের কোন উপকার নাই, এ কথা সাহিত্যসেবী, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক প্রভৃতি কেহই স্বীকার করিবেন না। কেন না, নাটক ও উপন্যাসাদিতে বাংলার কোন প্রদেশের লোকের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, ঐ প্রদেশের কথিত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ লিখিত ভাষায় তাহার কথোপকথন প্রকটিত করিলে তাহাকে উক্তপ্রদেশবাসী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে কেন? *

* এ বিষয় প্রথম সংখ্যার "সমালোচনীতে" "নাটকের ভাষা" নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে।

ভাষার প্রাদেশিকতা অবগত না হইলে, এক প্রদেশবাসী অপর প্রদেশে অথবা অপর প্রদেশের লোকের নিকট সময়-সময় কিরূপ অপ্রতিভ ও লাঞ্ছিত হন, তাহা নিম্নের দুইটি ঘটনায় বিবৃত হইতেছে।

রাণীগঞ্জ-মহকুমা বর্দ্ধমান-বিভাগের অন্তর্গত, কিন্তু বর্দ্ধমানের কথিত ভাষার সহিত রাণীগঞ্জের কথিত ভাষার যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে বর্দ্ধমানবাসী রাণীগঞ্জের প্রাদেশিকতা অবগত না থাকিলে সময়-সময় বিশেষ অপমানিত হন। কোনসময় আমার বর্দ্ধমাননিবাসী জনৈক বন্ধু (ব্যবসায়ী) কার্য্যসূত্রে দিনকয়েকের জন্য রাণীগঞ্জে বাস করেন। একদিন তথাকার জনৈক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক একঝাঁকা ফুটি বিক্রয়ার্থ তাঁহার বাসস্থানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। বন্ধুবর ফুটি ক্রয় করিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে ও মেয়েটা, কত ক'রে ফুটি বেচিতেছিস্?" তাঁহার কথা শুনিয়া সে ক্রোধে নানা অকথ্য গালি দিতে লাগিল। বন্ধুবর তাহার ক্রোধের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় তাহাকে মিষ্টকথায় বুঝাইয়া বলিলেন, "ওরে ও মেয়েটা, রাগিস্ কেন বাছা! আমি তো তোরে কোন অন্যায় কথা বলি নাই, কেবল ফুটির দরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি—ইহাতে রাগ করিয়া গালি দিবার দরকার কি?" সে নীচজাতীয় স্ত্রীলোক, বন্ধুর কথায় আরও ক্রোধপ্রকাশ করিয়া বলিল, "তুই আমায় মন্দ কথা বল্‌বি, আর আমি তোরে আশীর্ব্বাদ কোর্‌বো?" এই বলিয়া সে মনের সাধে অজস্র গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল। বন্ধুবর ইহার ক্রোধের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ জনৈক পরিচিত বন্ধুকে (ইনি বহুদিন হইতে রাণীগঞ্জে বাস করিতেছেন) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উভয়ের এইরূপ বচসার সময় মুখে কাপড় দিয়া এতক্ষণ মৃদুমৃদু হাসিতেছিলেন। এক্ষণে বন্ধুবরের প্রশ্নে বলিলেন,

"তোমার কথায় 'মেয়েটা' ও 'ফুটি' শব্দ শুনিয়াই ও মাগী রাগ প্রকাশ করিয়া গালি দিয়াছিল। এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোক স্ত্রীকে 'মেয়ে' বলে, আর ভদ্রসন্তুতগণ স্ত্রীকে 'মেয়েলোক' এবং কন্যাকে 'বেটী' বলে। উহাকে 'মেয়েটা' বলিয়া সম্বোধন করায় তোমার পরিণীতা স্ত্রী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আর 'ফুটি' শব্দ এখানে অশ্লীল অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা যাহাকে 'ফুটি' বলি, উহারা (খাস্ রাণীগঞ্জ-বাসী) উহাকে 'ফুট্' বলে।" বন্ধু শুনিয়া অবাক্!

আর একদিন ঐ স্থানের কোন লোক (ইনি বন্ধুবরের পরম মিত্র) উক্ত প্রদেশের কোন স্ত্রীলোক (বাড়ীর ঝি) দ্বারা বন্ধুকে কিছু মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বন্ধু উক্ত স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁরে! তোর বাবুর ছেলেপিলে হ'ল না, আবার বিবাহ করিবে নাকি? বাবুর স্ত্রী কি বড় রোগা?" এই কথায় সেই স্ত্রীলোকও পূর্ব্বোক্ত ফুটিওয়ালীর ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "বাবু! তুমি তো বড় ভদ্দরলোক? এমন লোককে আবার কেউ আদর ক'রে খাবার পাঠায়?" আমি বলিলাম, "কেন, আমি কি করিলাম—যাহাতে তুমি আমায় মন্দ লোক ঠাওরাইলে?" সে বলিল, "তুমি মন্দ লোক নও তো কি? মন্দ লোক না হ'লে তুমি বাবুর স্ত্রীকে 'রোগা' বল?" তাহার কথায় বন্ধুবর উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "রোগা বলায় দোষ কি হইল?" সে পুনরায় ক্রোধে বলিল, "আবার ঐ কথা! বাবুর পরিবার কি 'কুটে' যে, তাঁরে তুমি 'রোগা' বলিতেছ?" তখন বুঝিলাম, আমরা প্রধানত 'শীর্ণকায়' অর্থে রোগা বলি, এ দেশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে 'রোগা' বলে।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

বঙ্কিম-কথা।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের নৈহাটী-ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে কাঁঠালপাড়া নামে যে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি। এক্ষণে গ্রামখানি যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন, পূর্ব্বে উহা এপ্রকার ছিল না। তখন উহা বড়ই প্রীতিকর, নয়নস্নিগ্ধকর, মনোরম স্থান ছিল।

একদিন এক সন্ন্যাসী মস্ত এক ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া চেলার সহিত এই গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন—কোথায় যাইতেছিলেন, কে জানে। ঝুলির ভিতরে কাপড়-গামছা, চাল-ডাল, আর কৃষ্ণ প্রস্তরের এক মস্ত রাধাবল্লভ। গ্রীষ্মকাল, প্রখর রৌদ্র। সন্ন্যাসি-ঠাকুর রৌদ্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া এক দীর্ঘিকার তীরে বট-বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামাশায় উপবেশন করিলেন। দীর্ঘিকার নাম "অর্জ্জুনা"। সেখানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া সন্ন্যাসিঠাকুর পুনরায় যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন। উঠিয়া ঝুলি তুলিতে গেলেন, তুলিতে পারিলেন না; অনেক চেষ্টা করিলেন—কিছুই হইল না। শেষে তিনি চেলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রঘুদেব! বুঝতে পাচ্চ ব্যাপারখানা কি? আমি ত অনেক দেশ—অনেক তীর্থ এই ঠাকুর লইয়া বেড়াইলাম, কোথাও ত এরূপ ঘটে নাই। বোধ হয়, ঠাকুরের আর আমার কাছে থাকিবার সাধ নাই। আচ্ছা ঠাকুর! তোমার যখন থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন থাক।" এই বলিয়া সেই চেলাকে ঠাকুরের পাহারায় নিযুক্ত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এই রঘুদেব ঘোষালই কাঁঠাল-পাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ! রঘুদেব মহাশয় সন্ন্যাসীর

কৃপায় ও রাধাবল্লভের আশীর্ব্বাদে ঠাকুরকে সেইখানে স্থাপনা করিলেন—ঠাকুরের এক অতি রমণীয় মন্দির প্রস্তুত করাইলেন ও জায়গা-সম্পত্তিও করিলেন।

রঘুদেব ঘোষাল মহাশয়ের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যার সন্তানাদি হয় নাই, তিনি অকালে মারা যান। অপর দুই কন্যাকে তিনি কুলীনে করেন। হুগলীর অন্তঃপাতী দেশমুখো-শেয়াখালা-বন্দিপুরের নিকটে এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীন ছিলেন। তাঁহারা অবসথী সদানন্দের সন্তান। তাঁহাদিগের বংশের রামহরি ও রামজীবন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ঘোষালমহাশয়ের দুই কন্যার বিবাহ হয়। রঘুদেব মহাশয় উইল করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রোহিণী দেবীকেই সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিয়া যান। রোহিণী দেবীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তিনি মাতামহের পিতামহ,—স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় যাদবচন্দ্রের পিতা। যাদবচন্দ্র পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার আর তিন সহোদর ছিল। তাঁহার মধ্যম সহোদর সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। যাদবচন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য নিরুপায় অবস্থায় বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং একটি ৫৲ টাকা মাহিনার মুন্সীগিরিতে ভর্ত্তি হন। ক্রমে ইনি নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ৫০০৲ টাকা বেতনের ডেপুটি কালেক্টার হইয়াছিলেন। ইনিই পুনরায় সমস্ত বিষয়-আশয় ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করেন। ইঁহার চারি পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। এক শ্যামাচরণ বাদে সকলেই সাহিত্যানুরাগী। বাংলা ১২৪৫ অব্দে আষাঢ়-মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে এক অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে গ্রামের অনেকেই পুত্র হইয়াছে মনে করিয়া দেখিতে যান। কিন্তু যাইয়া দেখেন, তখনও পুত্র কি কন্যা, কিছুই হয় নাই। আর শঙ্খধ্বনিও যে কোথা হইতে হইয়াছিল বা কে করিয়াছিল, কেহই বুঝিতে পারেন

নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মেধাশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল,—একদিনেই তিনি বাংলা বর্ণমালা সমস্ত শিখিয়া ফেলেন। কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ঠাকুর তাঁহার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিপত্নীক অবস্থা ও পুনরায় দারপরিগ্রহ।

বাল্যাবস্থাতেই মাতামহদেবের বিবাহ হয়। নারাণপুরনিবাসী এক জন মধ্যবিত্ত লোকের এক সুন্দরী কন্যার তিনি পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের এক অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল—কারণ কন্যা ও বর এক বাটীতেই শিক্ষিত হইতেন,—তাহাতে অতি শৈশব হইতেই দুই জনের সৌহার্দ্দ জন্মে। বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম হইলেন। এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া নগোয়ানে (Nagoan) বদলি হইলেন। গৃহে যুবতী সুন্দরী স্ত্রী রাখিয়া কর্ম্মস্থলে যাইলেন। এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাতামহদেব বলিতেন, বিবাহের পর যতদিন তিনি গৃহে ছিলেন (অর্থাৎ হাকিম হন নাই), স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকিলে তিনি একটু গভীর রাত্রে শুধু দোছুট লইয়াই শ্বশুরালয়ে যাইতেন। নগোয়ানে থাকিতেই তিনি বিপত্নীক হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২২বৎসর। যথাসময়ে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। তিনি কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিলেন। প্রথমা স্ত্রীর মাথার সোণার কাঁটা ও চুল ও ফিতে নিজের বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। বাটীতে পিতৃদেব, অগ্রজদ্বয়, মাতা এবং গ্রামের বহুলোকই

---

* একবার চন্দ্রশেখরের "উপক্রমণিকা" দেখুন—"বুঝি বাল্যপ্রণয়ে কিছু অভিসম্পাত আছে।" এটা যে কবির বুকের ভিতরের কথা, কেহ কি কখনও লক্ষ্য করিয়াছেন? কবি কি হৃদয়-যন্ত্রণায় ঐ কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর ভিন্ন কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন।

যদি কেহ তাঁহার প্রথমা পত্নীর সৌন্দর্য্য জানিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক "দুর্গেশনন্দিনীর" তিলোত্তমার রূপবর্ণনা পাঠ করুন।

তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তখন সুরসিক কবি দীনবন্ধুও আসিয়া পড়িয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র এবং আরো ২।১জন বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া নৌকাযোগে পাত্রীর অন্বেষণে চলিলেন। এক জায়গায় তাঁহারা পাত্রী দেখিতে উঠিলেন। পাত্রীর পিতা অত্যন্ত ধনবান্। পাত্রীটিও সুন্দরী। বাটীটি প্রকাণ্ড। "বিষবৃক্ষের" নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা সকলেই পড়িয়াছেন—পৃথিবীতে এমন কোন লোক যদি থাকেন, যিনি পড়েন নাই, তাঁহাকে আমি পড়িতে বলি,—আমার বোধ হয়, দাদাবাবু ঐ বাটী সমস্ত দেখিয়া—নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। যথাসময়ে পাত্রী আসিল। সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

পাত্রী। আমার নাম মনোরমা।

স। তোমার মামার বাড়ী কোথায়—কখনও কি সেখানে গিয়াছ?"

পা। (ভ্রূভঙ্গীসহ উচ্চৈঃস্বরে) মামার বাড়ী আবার কোথায়!"

ঐ কথা শুনিয়া কাহারও মুখে আর অন্য কোন কথা নাই—কেবল উচ্চ হাস্য। বরটি পর্য্যন্ত হাসিতেছেন। তাঁহারা আর কোন কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া সকলেই উঠিলেন। দীনবন্ধুবাবু "বাঁশবেড়ে"য় নামিলেন, সুতরাং সকলেই সেইখানে নামিলেন। সেখানে আবার তারাপ্রসন্নবাবু—বঙ্কিমবাবুর অতি নিকট আত্মীয়—আসিয়া জুটিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তিনি জানিলেন, তাঁহারা পাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার সন্ধানে এক ভাল পাত্রী আছে। যেমন সুশ্রী, তেমনি নম্র, তেমনি লজ্জাশীলা। ইত্যাদি। সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসিলেন, "পাত্রীটি কোথায় এবং অন্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না?"

তারা। পাত্রী আমাদের হালিসহরেরই—বিখ্যাত চৌধুরীমহাশয়দের বাটীর কন্যা। পাত্রীর মাতামহ কন্যাকে কুলীনে করিয়াছেন, সেই-জন্য পাত্রীর মাতা বৎসরের অধিকাংশ দিনই পিত্রালয়ে থাকেন। অদ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সংবাদ দিই গে। আপনারা পশ্চাতে আসুন।

আর তাঁহাদের বিশ্রাম করা হইল না—সকলেই পাত্রী দেখিতে ছুটিলেন। পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইল, দিন ধার্য্যও হইল। বিবাহের আর ১০।১১দিন বাকী রহিল। কন্যাপক্ষ হইতে একটু আপত্তি উঠিল যে, "এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সব গুছাইতে পারিব না।"

সঞ্জীব। আপনাদের কিছুই গুছাইবার প্রয়োজন নাই—শুধু হরীতকী দক্ষিণা দিয়াই কন্যার বিবাহ দিবেন। আমরা অনেক কন্যা দেখিয়াছি—কিন্তু এরূপ সুলক্ষণা, সর্ব্বগুণসম্পন্না, সুন্দরী কন্যা কোথাও পাই নাই; সেইজন্যই এত ব্যস্ত। আরো এক কথা—ভ্রাতার ছুটি আর বেশীদিন নাই, সেইজন্যও তাড়া।

যথাসময়ে,—সুদিনে, সুক্ষণে, সুলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই তিনি পত্নী (দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা) সমভিব্যাহারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাক্স হইতে প্রথমা পত্নীর ফুল, কাঁটা ও ফিতা, (যাহা তিনি এতদিন অতিযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন) বাহির করিয়া নবপরিণীতা পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। পত্নী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী—যথার্থই "রাজলক্ষ্মী"। নারায়ণ লক্ষ্মীকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

ইহার পর তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীর কিছু কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল। তাঁহার জীবনের আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা—"ভীমমূর্ত্তি-কাপালিক-দর্শন"। তাহাও পাঠকগণ শুনিতে পাইবেন।

শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতা-গুচ্ছ।

বিরহিণী।

আমি অভাগিনী 'শাঙণ'-যামিনী
কেমনে করিব ভোর ?
যূথিকার মালা ঘরে কি শুকাবে
যতনের গাঁথা মোর ?

গুরুগুরুগুরু ডাকে মেঘমালা,
গৃহশিখি-দুটি সোঁহাগে উতলা,
কেমনে নিবারি হৃদয়ের জ্বালা
মুছিব নয়ন-লোর ?
আমি অভাগিনী শাঙণ-যামিনী
কেমনে করিব ভোর ?

(২)

জলদের কোলে ঘুমায় চপলা
সদা তার অনুরাগী,
স্বপনের ঘোরে না দেখিয়া নাথে
চমকি উঠিছে জাগি।

কপোত-কপোতী জাগিছে কুলায়,
সুখী, এ যামিনী নিমেষে পোহায়,
আমি কি গো আজি কুমুদিনীপ্রায়
হইব দুখের ভাগী ?
আমি অভাগিনী শাঙণ-যামিনী
কেমনে কাটাব জাগি ?

(৩)

নীরব কুটীরে আছি একাকিনী
দূরদেশে গেছে সখা,
সে-ও গো ব্যাকুল, আমার মতন,
হৃদিমাঝে দেয় দেখা।

আমি আছি হেথা সে রয়েছে দূরে,
বিরহ-বাহিনী বহিছে মাঝারে,
চকা-চকী সম এ যামিনী ধ'রে
হবে নাকি আর দেখা ?
আমি অভাগিনী শাঙণ-যামিনী
কেমনে কাটাব একা ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ব্যথিতা।

তব পদে হৃদি দিয়া
সুখে ত ছিল গো হিয়া
কাঁদাতে ভাঙালে কেন ধ্যান ?
আমি ত চাহিনি কোন দান।

নগপদ চুমি ধীরে,
গাহিয়া তটিনী ফিরে,
সে ত গো চাহে না প্রতিদান।
প্রেম তার,—হৃদি-বলিদান।

যদি গর্ব্বভরে তার
ঘৃণা-মাখা শিলাভার
খসি পড়ে হৃদয়মাঝারে।
হাসিয়া তটিনী তায়,
হৃদয়ে ধরিতে চায়,
ক্ষীত বক্ষে চুমিয়া তাহারে।

মোর প্রেম অনুরূপ
ঘৃণা দিয়ে যদি সুখ
হয় তব হে হৃদয়স্বামি,
তাই ভাল, সেই দানে
বাড়িবে আমার প্রাণে
তব ধ্যান, যদি পড়ে নামি।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়।

কবির গান।

(টেনিসন্ হইতে)

বাদলধারা ধরিয়া গেল ;—উঠিলা কবি ধীরে
নগর ছাড়ি সুদূর মাঠে চলে ;
পূরব হ'তে গগন-স্রোতে বহিল মৃদু বায়
বিছায়ে ছায়া শ্যামল তৃণদলে।
বিজনে একা বসিয়া কবি কণ্ঠ দিলা ছাড়ি
মধুর ধ্বনি ছাড়িয়া ধরা চলে ;—
মেঘের পথে হাঁসের শ্রেণী চকিতে গেল থেমে
পাপিয়া লুটি, পড়িল পদতলে।

অলির পিছে ফিরিছে ফিঙে—থামিল গান শুনি,
লুকাল ফণী কেতকীতরুমূলে ;
শিকার হানি' নখরতলে চঞ্চু গুঁজি' বুকে,
ক্ষুধিত বাজ আহার গেল ভুলে !
কোকিল ভাবে গেয়েছি আমি কত না শত গান
এমন মধু কেমন করে' হবে ?—
এ যেন গাহে নূতন গীতি নূতন জীবনের
মোদের ধরা ফুরায়ে যাবে যবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সৌন্দর্য্যকে সহজেই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) শারীরিক সৌন্দর্য্য, (২) মানসিক সৌন্দর্য্য, (৩) আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য।

মনুষ্যচিত্ত ক্রমশ যতই পরিণত ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার প্রথম প্রকারের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রার্থনীয় মনে হইতে থাকে। মানুষের অসভ্য অবস্থায় সে মানসিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না—সমুজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণবিভাস, চাক্‌চিক্যশালী পরিচ্ছদ, বৃহদাকার ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কাররাজি—অর্থাৎ যাহা কিছু দৃষ্টিকে মুগ্ধ বা প্রতারিত করে, তাহাই তাহার পরম সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ক্রমশ সভ্যতা-লাভের সঙ্গে তাহার মানসিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মে, শুদ্ধ বাহ্যিক বা শারীরিক সৌন্দর্য্য তাহাকে ভুলাইতে পারে

না। আধুনিক সভ্যজাতির মধ্যে অনেকেই, শারীরিক ও মানসিক, এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যেরই উপাসক। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা এখনও বোধ হয় সকলের সম্যক্ বিকশিত হয় নাই। তাই আজকালকার সভ্য ইউরোপীয়ানের চক্ষে Miranda'র মত শুদ্ধ সরলা সুন্দরী তত মনোরম নহে—শারীরিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানসিক সৌন্দর্য্য চাই—রূপের সঙ্গে আদব-কায়দা চাই। আজ-কালকার সমাজে যে সুন্দরী accomplished নয়, তাহার সমাদরের আশা অধিক নহে। কিন্তু এই দুইটি হইলেই তাহাদের যথেষ্ট, ইহা ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য্যলাভের তাহারা প্রত্যাশী নহে। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য চিত্তবৃত্তির অধিকতর বিকাশের প্রয়োজন।

এই হিসাবে যদি মানসিক বিকাশ বা পরিণতির পরিমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে মানসিক বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কারণ প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ উক্ত ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। যাঁহারা কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা কেবল মানসিক বা কেবল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যথেষ্ট সমুন্নত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু যাঁহারা এই ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য-জনিত পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত, তাঁহাদের মানসিক উন্নতি কতদূর পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে নকুল ও সহদেব শারীরিক শোভায় এক-রকম অদ্বিতীয়, কিন্তু আর্য্যকবি যে তাঁহাদের শোভা অপেক্ষা অর্জ্জুনের উক্ত ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্যজনিত শোভায় অধিকতর বিমোহিত, তাহা তিনি দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট প্রেমেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য কথাটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে

হইবে। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ নহে—তাহাদের সামঞ্জস্যে গঠিত পূর্ণ সৌন্দর্য্য। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য যে কোন অনুপাতে মিলিয়া থাকিলেই হইল না, সকলগুলির অনুপাত এমন হইবে, যাহাতে সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত না ঘটে। কারণ সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। পূর্ণ সামঞ্জস্যেই পূর্ণ সৌন্দর্য্য। এই সাগর-তরঙ্গিত অরণ্যানীবিক্ষোভিত অসংখ্যনক্ষত্রদামপরিশোভিত-আকাশ-পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল কেন এত সুন্দর?—ইহার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় একটা সামঞ্জস্যের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বলিয়া। তাই বলিতেছিলাম, ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের—সমবায় নহে—সামঞ্জস্যই প্রাচীন হিন্দুর সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে এ কথা আরও পরি-স্ফুট হইবে। যুধিষ্ঠিরের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক কোনপ্রকার সৌন্দর্য্যেরই অভাব নাই; তবু যুধিষ্ঠির মহাকবির চক্ষে অর্জ্জুন অপেক্ষা সুন্দর নহেন। ইহার মর্ম্ম কি? ইহার গূঢ় রহস্য কোথায়? যুধিষ্ঠিরের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এত অধিক বিকশিত যে, তাহার অতি-রিক্ততা সামঞ্জস্যের ব্যাঘাতক। ভীমের শারীরিক সৌন্দর্য্য সামঞ্জস্যের হানিকর। এস্থলে কৃষ্ণবলরামেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যে শারীরিক সৌন্দর্য্যে অধিকতর সৌন্দর্য্য-শালী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি তাঁহাকে হলের দ্বারাই যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল, এক দিনও সে স্বেচ্ছায় তাঁহার বাঁশীর গানে উজান বহে নাই। এখানে বলরামের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের অভাব সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল।

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যসম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যেখানে উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গে সমর্থ হয় নাই—যেখানে "রতি-

দ্বিতীয় মদন" বসন্তের সাহায্য লইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছে—স্বয়ং সৌন্দর্য্যাভিমানিনী উমাও যেখানে পরাস্ত হইয়াছেন—সেই খানেই তপস্যাবিদূরিতাভিমানা অতএব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের বিকাশে সামঞ্জস্যপ্রাপ্তা পার্ব্বতী যখন আবার দেখা দিলেন, তখন সহজেই মহাদেবের গভীর ধ্যান নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে ভাঙিয়া গেল। উমার যতক্ষণ সৌন্দর্য্যের অভিমান ছিল, ততক্ষণ সামঞ্জস্যহানি ঘটিতেছিল—যেই অভিমান চলিয়া গেল, অমনি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের অভাব ঘুচিয়া গেল—সামঞ্জস্য ফিরিয়া আসিল—সৌন্দর্য্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল, মহাযোগী বিমুগ্ধ হইলেন। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস এ রহস্য বড় সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন।

সৌন্দর্য্যের এই আদর্শ ছিল বলিয়াই 'কৃষ্ণা' দ্রৌপদীর জন্য সমস্ত রাজন্যসমাজ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্যামা দময়ন্তীর জন্য—স্বর্গের দেবতাও লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ঠিক এই কারণেই অর্জ্জুনকে দেখিয়া উর্ব্বশী মুগ্ধ হইল, কিন্তু উর্ব্বশীকে দেখিয়া অর্জ্জুন মুগ্ধ হইলেন না। কারণ অর্জ্জুনের সৌন্দর্য্য ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্যে গঠিত—উর্ব্বশীতে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অভাব।

রাজা দুষ্মন্ত যখন কণ্বের তপোবনে সখিসংযুতা শকুন্তলাকে দেখিলেন, তখন তাঁহারও মনে নিশ্চয়ই এই আদর্শ জাগিতেছিল। রাজা অসংখ্য সুন্দরী দেখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই তপোবনে আসিয়া যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তাহা আর কোথাও দেখেন নাই। কারণ রাজধানীতে আধ্যাত্মিক-সৌন্দর্য্য-বিকাশের তেমন সুবিধা ছিল না—তাই রাজা উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "পরাজিতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।"

কেহ কেহ বলিয়াছেন, শেক্সপীয়র মিরাণ্ডাকে যেমন পূর্ণ অশিক্ষিতা রাখিয়াছেন, কালিদাস শকুন্তলাকে ঠিক তেমন রাখেন নাই; শকুন্তলায় কিছু-কিছু শিক্ষার আভাস পাওয়া যায়—এটা মহাকবির উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতেন যে, শকুন্তলাচিত্রে সৌন্দর্য্যের কবি আপন মানস সৌন্দর্য্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কারণ মানসিক সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অভাবে শকুন্তলাচিত্র সামঞ্জস্যহীন হইত।

সৌন্দর্য্যের এই অপূর্ব্ব আদর্শ প্রাচীন হিন্দুর হাড়ে হাড়ে এমনি মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা শুদ্ধ মানবসৌন্দর্য্য নহে—জড়-সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত এই আদর্শের আলোকে দেখিতে চাহিতেন।

জড়প্রকৃতির নিজের কোন মানসিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য থাকা অসম্ভব। কিন্তু মানুষ কল্পনাবলে প্রকৃতির উপর উক্ত সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু আরোপ করিতে গেলে একটা অবলম্বন চাই। ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas) ইহার প্রধান অবলম্বন। সুতরাং যে স্থানে প্রকৃতির শোভা দেখিলে সহজেই প্রকৃতির বাহ্যশোভার সঙ্গে সঙ্গে মনে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শোভার ছায়া অঙ্কিত হইয়া যায়, সেই স্থানের শোভাকেই তাঁহারা উচ্চতর আসন দান করিতেন। তাই সংস্কৃতসাহিত্যে তপোবনবর্ণনার এত ঘনঘটা—তাই পুণ্যক্ষেত্র তীর্থরাজির শোভার নিকট রাজধানীর কৃত্রিম শোভা পরিম্লান।

সৌন্দর্য্যের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমরা ক্রমশ এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

এইরূপ পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ফল পূর্ণ মনুষ্যত্ব। যে এরূপ সৌন্দর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে মনুষ্যত্বে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে হইবেই। হইয়াছিলও তাই। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, রামচন্দ্র যেমন সৌন্দর্য্যে,

তেমনি মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ। সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী যেমন সৌন্দর্য্যে, তেমনি চরিত্রগুণে অতুলনীয়। সৌন্দর্য্যের এই মহিমোজ্জ্বল পূর্ণ আদর্শ এই পতিত ভারতে আবার কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে চাক্‌চিক্যশালী বেশভূষা ও রূজ-পাউডারের কৃত্রিম শোভা এই ঋষিনিষেবিত ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইবে?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

বর্ষা ও শরৎ।

নববর্ষাসমাগমে শ্যামলবসনা বসুধার যৌবন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, অশনিমৃদঙ্গধ্বনিত। সদ্যঃস্নাত স্নিগ্ধশ্যাম কিশলয়-কুলে তরুলতাকুঞ্জ আকুলিত। দূর গিরিশৃঙ্গে স্তরবিন্যস্ত ধূম্রাভ মেঘ-রাশি; মেঘান্ধ গিরিপার্শ্ব; কেকাধ্বনিত সানুদেশ; পূর্ণতোয়া স্রোতস্বতী!

প্রকৃতির এই পূর্ণযৌবনে জল-স্থল-আকাশ যখন নব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, প্রথম প্রেমের চঞ্চল আবর্ত্ত, প্রিয়ার উচ্ছ্বসিত যৌবন, যৌবনের অতৃপ্ত উদ্দাম হৃদয়, প্রেমিকের মনে তখন স্বতই উদিত হইয়া বহুদিন পরে আবার সেই ভাবে হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে। সে সময় সুতরাং মিলনবাসনাও যেমনি প্রগাঢ় হয়, বিরহও তেমনি অসহ্য হইয়া উঠে।

বসন্তের মলয়ানিলহিল্লোলিত বৃক্ষে, চন্দ্রকরসিক্ত লতাবিতানে, বিহগকূজিত বনকুঞ্জে, বীচিক্ষুব্ধ স্রোতস্বিনীতোয়ে প্রকৃতির যে নবীন প্রেম অঙ্কুরিত হইতেছিল, ঘনবরষায় তাহার তীব্র তৃষা ও উদ্দাম আবেগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বসন্ত এতদিন শত শোভা ও সঙ্গীতে হৃদয়কে দূর স্বপ্নরাজ্যে প্রেরণ করিয়া, সলজ্জা কিশোরীর ন্যায় অসীম

সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে প্রেম বিক্ষিপ্ত রাখিয়া অতি সঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছিল, বর্ষায় তাহা একত্র ও পুঞ্জীভূত, উদ্দাম ও প্রখর হইয়া দুই কূল ভাসাইতে চলিয়াছে।

আলোক যেমন অন্ধকারকে উজ্জ্বল করে—অন্ধ হৃদয়কে আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে; অন্ধকারও তেমনি অন্তরে-বাহিরে ছায়াবিস্তার করে। আলোক জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া বিপুল জগতের মাঝে আমাদিগকে প্রেরণ করে, অন্ধকার সমস্ত জগৎসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে আমাদিগের অতি নিভৃত অন্তরতম প্রদেশে লইয়া যায়; আলোক জগতের সৌন্দর্য্য চক্ষে ধরিয়া তাহাতেই আমাদিগকে তন্ময় করিয়া তুলে,—আমরা আপনাকে হারাইয়া বিশ্বে মিশিয়া যাই; অন্ধকার বিশ্বের সৌন্দর্য্য আবৃত করিয়া আমাদিগকে নিজ হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে,—আমরা সমস্ত ছাড়িয়া আপনাকে লইয়া থাকি।

এমন দিনে সমস্ত বিরহব্যথা ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে বিরহীর অন্তরে জাগিয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তাই কোকিলকুহরিত, কুসুমসুরভিত বিচিত্রালোকপূর্ণ বসন্তে বিরহ ও মিলন আমাদিগকে যত-না আকুল করিয়া তুলে, বর্ষার "তপনহীন ঘন তমসায়" ও গম্ভীর মেঘচ্ছায়ায় বহু ব্যথা অন্তরে সৃজন করিয়া, আপনার সুখদুঃখের সমস্তটুকু আপনাকেই ভোগ করিতে দিয়া হৃদয়কে আরও আকুল করিয়া তুলে। তাই এমন দিনে—

প্রত্যেক শ্যামালতায় প্রিয়তমার দেহশ্রী, প্রত্যেক চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে স্নেহকরুণ দৃষ্টিপাত, ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গে প্রিয়ার ভ্রূবিলাস এবং বিস্তৃত শিখিপুচ্ছে আলুলিত কুন্তলজাল দেখিবার আশায় হৃদয় ছুটিয়া যায়। তাই বিরহী তখন—

চেতন-অচেতনের জ্ঞান হারাইয়া আকাশের মেঘকে ডাকিয়া প্রিয়ার উদ্দেশে পাঠাইবার জন্য অধীর হয়। তাই—

"দুপসায়রে ধনী ভাসে।"

তাই—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।"

বর্ষার মধ্যে একটা অসীমের ভাব আছে,—একটা ছায়ার আবরণ আছে, বসন্তে তাহা নাই। বসন্তের সৌন্দর্য্য সংখ্যায় অসীম হইলেও, তাহার প্রত্যেকটিই সুস্পষ্ট, সুতরাং সীমাবদ্ধ; প্রত্যেকটিই উজ্জ্বল, সুতরাং আতৃপ্তিভোগ্য। বসন্তে স্ফুটচন্দ্রিকা রজনী, কোকিলকাকলীমুখরিত বনানী, নবকিসলয়রঞ্জিত বিচিত্রপুষ্পখচিত লতাকুঞ্জ প্রেমকে যেমন জাগ্রৎ করিয়া তুলে, ভোগেরও তেমনি উপাদান আনিয়া দেয়। বর্ষার মেঘান্ধ আকাশ,—তাহার তল নাই; কূলপ্লাবিনী নদী,—তাহার কিনারা নাই; দর্দ্দুরঝিল্লীধ্বনিত বনভূমি,—তাহাতে সুস্পষ্ট কোকিল-গীতি নাই। সমস্ত সুন্দর,—কিন্তু বিরাট্, ছায়ান্ধ, অস্পষ্ট, অসীম। তাই প্রেম জাগিয়া উঠে, ভোগে তৃপ্তি হয় না; মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, মিলিয়া আশ মিটে না। অনন্ত অস্ফুট বরষা,—সঞ্চিত অতৃপ্ত প্রেম; উজ্জ্বল বসন্ত,—পরিতৃপ্ত সম্ভোগ।

বর্ষার পরিণতি শরতে—ভরা-ভাদরে। কাশাংশুকপরিহিতা পঙ্কজ-লক্ষণা শরৎ যখন অপূর্ব্ব প্রভায় ধীরমন্থরগমনে আগমন করে, তখন আকাশে আর ঘনঘটা নাই, মেঘে বৃষ্টি নাই; তখন স্থলে স্থলপদ্ম-শেফালিকা, জলে কুমুদ-কহ্লার-কোকনদ, আকাশে সুবিমল জ্যোৎস্না। তখন শর্দিবা রবিকিরণোদ্ভাসিত, রজনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী! নির্ম্মল নদী-সরোবরে চন্দ্রসনাথ নক্ষত্রমণ্ডল ভাসিতেছে, তীরে শেফালিকা শরতের শুভাগমনে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিতেছে, প্রান্তরে অনন্ত-তরঙ্গায়িত হরিৎ সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে।

শরতেরও সেই কূলে কূলে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সে

উদ্দাম চাঞ্চল্য আর নাই—সেই খরস্রোত, সেই আবিলতা আর নাই; সমস্তই স্থির, গম্ভীর, নির্ম্মল, প্রশান্ত, পরিস্ফুট;—কোথাও ছায়া কিংবা অস্পষ্টতা নাই। শরতের প্রেমও যেন অনেক বুঝিয়া-সুঝিয়া গৃহিণী হইয়াছে—অনেকটা পরিপাক পাইয়া প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। যুবতীর চাঞ্চল্য ও লীলাভঙ্গিমায় প্রৌঢ়ার স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। শরতের সৌন্দর্য্যের মত সেই প্রেম পরিস্ফুট, শারদীয়া কৌমুদীর মত তাহা স্নিগ্ধ!

এখন আর বাসনার কলুষতা নাই, ভোগের তীব্র আবেগ নাই; এখন আর বসন্তের বিলাসলালসা নাই, গ্রীষ্মের অবসাদ নাই, বর্ষার চাঞ্চল্য নাই, শীতের তৃপ্তি নাই;—প্রেম এখন পূর্ণ, সংযত, স্থির, প্রশান্ত!

প্রেমের পূর্ণপরিণতি শরতে—তাই বুঝি শরতে ব্রহ্মময়ীর উৎসব! গৃহে গৃহে আনন্দ, স্নেহে-প্রেমে আনন্দহিল্লোলে মনুষ্যহৃদয় তরঙ্গিত! আশা ও আশ্বাসে চরাচর পূর্ণ! জলস্থল সৌরকরে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ছায়ালোকের অপূর্ব্ব বর্ণমাধুরী!

তাই এই সময় বাঙালীর পরিপূর্ণ মিলনসঙ্গীত। তাই বৈষ্ণবের বড় সুন্দর, বড় সাধের রাসমঞ্চে যেমনি সৌন্দর্য্যের উপকরণ, তেমনি মিলনের স্ফূর্ত্তি! তাই এখন অতৃপ্তি ও দীর্ঘশ্বাস মেঘের মত হৃদয় হইতে সরিয়া গিয়াছে—তাহা প্রেম ও মিলনের কনককিরণে উদ্ভাসিত—হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দধারা!—লতায়-পাতায় হিমানীসম্পাত;—প্রকৃতির আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে! তাই এখন—

"মধুর বরজবিপিনকুঞ্জ,
মধুর পিরীতি-আরতিপুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক আশ
মুগ্ধ দিবস-রাতিয়া।"

পুস্তক-সমালোচনা।

রেণু। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে রেণু কাব্যকণাটি রাখিয়া দিলাম। 'রেণু' কতগুলি সনেটের সমষ্টি, অবশ্য অন্য ছন্দের কবিতাও দু-চারিটি আছে। মনে হয়, যেন একটি বাঁশী একটিমাত্র মর্ম্মভেদী গান জানে—তাহাই সে নানাসুরে বাজাইতেছে।

যাহা হৃদয়ের নিতান্ত কাছে ছিল, যাহা একমাত্র সম্বল ছিল, তাহা এক হিসাবে হারাইয়া গিয়াছে— এমন জিনিষটির আকর্ষণ কি প্রবল! তাহারি জন্যে বিরহিণীর আর সোয়াস্তি নাই—তাহাকে চিরকাল জাগিয়া থাকিতে হইতেছে। যেন দেবমন্দিরের দেবতা নাই, তাই প্রদীপটিকে আরো ধৈর্য্যে, আরো প্রাণপণে আপনাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হইতেছে। সেই প্রেমদীপখানির দিকে চাহিয়া তপস্বিনী জাগিতেছেন, আর মানুষের যাহা সাধ্য অর্থাৎ 'we look before and after', সেইরূপে কখন আগে, কখন পাছে চাহিয়া দিন কাটাইতেছেন। যখনি দৃষ্টি অস্থির হয়, শূন্য হইয়া বহির্জগতের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, তখনি বুক ফাটিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হয়—'আসন্নবসন্তে' বাণের ফুলগুলি সব ফুটিয়া উঠিলে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে—"বসন্ত, আসিয়াছ—কিন্তু তোমার সখা আজি কোথায়?" কিন্তু যখনি আবার দৃষ্টি নিশ্চল হয়, প্রেমদীপ উজ্জ্বল শিখা ধরিয়া দাঁড়ায়, তখনি—

"ঝরিছে কিরণ.....
শতলক্ষধারে আমি করিতেছি স্নান
নগ্ন অনাবৃত চিত্তে উন্মুখ অধরে।
.....

তাই আজি তনুখানি
লাবণ্যে নবীন, কণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধ বাণী।
.....জাগি ওঠে মনে
সীমাহীন নভস্তল, চন্দ্রসূর্য্য সনে
অযুত নক্ষত্রলোক, বসন্ত-শরতে
জীবনের মহাযাত্রা অন্তহীন পথে।"

—ইহা শুধু একটা "নিশ্চয় পাইব" বলিয়া বিশ্বাসের ঘোষণা নহে, ইহাতে আবেগের পরিপূর্ণ গৌরব রহিয়াছে—তাই 'রেণু'কে এত আদর করিতেছি। কিন্তু এ সুর বহুক্ষণ মানুষের কণ্ঠে থাকে না, একএকবার জাগিয়াই মানুষকে কৃতার্থ করিয়া দেয়। তাই 'রেণু'র মাঝে মাঝে নিশ্বাসে হৃদয় ভারী করিয়া অবশেষে 'বিদায়ের পরে' ব্যথিত গানে সাশ্রুনয়নে বইখানি বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু রেণুর আর একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথম যে সুরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা শেষের সুরটিই 'রেণু'কাব্যে প্রবল। অনন্তের ধন প্রিয়তমকে নানারূপে সম্ভোগই অনেকগুলি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্ভোগে চাঞ্চল্য নাই—ইহা পবিত্র, গম্ভীর—কারণ দেবতা স্বর্গে এবং অসীমে, অতদূর হইতে আকর্ষণ করিতে হইলে মানুষকে খানিকটা ব্যগ্র, শুদ্ধ হইয়া ভক্তির গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ প্রেমের আশ্রয় লইতে হয়—সহজচঞ্চল খেলাধূলা-হাস্যপ্রমোদের মধ্যে তখন আর প্রেম কৃতার্থ হইতে পারে না। মৃত্যু প্রেমকে গম্ভীর করে। 'স্বপ্নে ও জাগরণে' শীর্ষক চমৎকার কবিতাটি পড়িয়া দেখুন। বাস্তবিক—

"তুমি মৃদঙ্গের রব গম্ভীর বিশাল
আমি তার মাঝখানে মন্দিরার তাল।"

—এটি অসীমের সম্মুখে ধ্যানে বসিয়া উপলব্ধি করা যত সহজ, জীবনের হর্ষ-খেলা-চঞ্চলতার মধ্যে তত সহজ নহে। মৃত্যুই এই ধ্যানপরায়ণ গাম্ভীর্য্য আনিয়া দেয়।

আমরা রেণুর ঠিক মোটামুটি ভাবটি বলিলাম। দুঃখিত আছি যে,

যথেষ্ট-রকম উদ্ধৃত করিয়া হাতে হাতে আমাদের প্রতি কথার প্রমাণ দিতে পারিলাম না। সে পরিশ্রমটুকু পাঠকপাঠিকার ভাগে রহিল।

কিন্তু আমাদের এইরূপ মোটামুটি বিশ্লেষণের মধ্যে এটুকুও কি নিহিত নাই যে, বইখানি আদ্যোপান্ত সুসংযত এবং অখণ্ডগ্রথিত ?—যে, ইহার আন্তরিকতা ও আবেগে 'রেণু' শক্তিশালী ?—এবং পরিশেষে—যে, কাব্যটি নূতন উপমা-অলঙ্কারে, আপনার একটি স্বতন্ত্র ভাবরাজ্যে এবং নির্দ্দোষ ছন্দের সম্পদে নিতান্তই গৌরবান্বিত ?—তাহা না হইলে আমাদের মনে একটা কিছুই ছাপ পড়িত না—বিশ্লেষণও করিতাম না।

'রেণু' ব্যাপক প্রতিভার চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপ্ত অসংখ্য ভাবফুলের আকাশ-ভরা গন্ধরেণু নহে—একটিমাত্র ভাবের বাগানে একজাতীয়-মাত্র ফুলের রেণু;—আপনার মধ্যে আপনি এত সম্পূর্ণ যে, প্রথমটা ভাবিয়া পাই না,—এ কবির আর কোন দিকে বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি না। কিন্তু আর একটু অনুধাবন করিলে একটি রন্ধ্র পাওয়া যায়। বাস্তবিক দুঃখে অভিভূত করিয়া ভাঙিয়া দেয়, আনন্দে অভিভূত করিয়া সবল করে। রেণুর কবি বিশ্বাসের বলে যেন শেষোক্তরূপেই অভিভূত। তাই তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া রেণুতে যে প্রকৃতির ছবিগুলি দেখিলাম, কিংবা অন্য দু-একটি ভাবের আলোচনা দেখিলাম—তাহাতে প্রিয়তমের বিচ্ছেদ-মিলনের ছায়ালোকপাত থাকিলেও, সেগুলির মধ্যে যেন কবির একটু স্বতন্ত্র আনন্দ আছে—সেগুলি যেন ঐ সর্ব্ব-গ্রাসী ভাবটির ছায়া ছাড়াইয়া একটু এদিকে ওদিকে কাঁপিতেছে। এই পথে রেণুর কবির একটু বিকাশের সম্ভাবনা যেন আছে বলিয়া বোধ হয়। কবি যত মুক্ত হন, ততই তাঁহার মঙ্গল। একটা ভাল এবং প্রিয় ভাবের দ্বারাও চির-অধিকৃত থাকাটা মানুষের পক্ষে গৌরবের নহে।

রেণুর ভাষা রবীন্দ্রবাবুর শব্দে অনেকটা পুষ্ট। সনেট্‌গুলির যতিও অনেকটা রবীন্দ্রনাথের যতির মতই। শব্দ ও ছন্দ যাহাই হৌক—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রেণুর একটি স্বতন্ত্র ভাবরাজ্য আছে, যাহা আধুনিক অনেক কাব্যেই দুর্লভ।

আভাস। কুমারী শান্তিময়ী দেবী প্রণীত।

কবিতার সমালোচনা করা শক্ত কাজ। প্রথম সমস্যাটি এই যে, শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষক, কোন্ ভাবে কবির কাছে যাইব। কিন্তু এ সমস্যা সহজেই মিটান যায়। ভাবুকভাবে অগ্রসর হইলেই সব গোল মিটিতে পারে। কিন্তু এই ভাবুকতাটাকে আবার এত-দূর প্রসারিত করা যায় যে, নিতান্ত অল্পপরিসর ভাবও সেই ভাবুকতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে পারে—কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর একটু কঠিন বিচার প্রার্থনীয় কি না? এই সব সমস্যা কবিতাসমালোচনাকালে পদে পদে আমাদের গতিরোধ করে। কিন্তু উপরোক্ত বহিখানির সমালোচনা করিতে আরও বিপদ্ আছে। এই বহিখানির নাম 'আভাস'—অর্থাৎ' বিকাশ' নহে, তাই আভা-সের মাপেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। এ স্থলে—কেন সকল স্থলেই—কবিতাসমালোচনায় আমরা দুইভাবে দুইটি পথে চলিব। প্রথমত উদার ভাবুকের ভাবে; দ্বিতীয়ত কঠিন সাহিত্যি-কের ভাবে। প্রথম ভাবে সমালোচনা করিয়া বলিতে পারি—কবিতাপুস্তকখানি বেশ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে কুমারী লেখিকার শুভ্র প্রাণের জ্যোৎস্নালোক আসিয়া পাঠকের সমস্ত প্রাণটি ছাইয়া দেয়। কুমারীর করুণা, সরল সৌন্দর্য্য, বিমল ভক্তি এবং একটা বেশ স্বচ্ছন্দ উৎসাহ স্বচ্ছজলের মত দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পরিষ্কার গানের মত বহিখানি শেষ হইয়া গেলে মোটামুটি একটি সুস্থ, প্রসন্ন ভাব চিত্তে রহিয়া যায়। বঙ্গীয় রমণীকবিগণের ন্যায়

'আভাসের' ভাষাটিও বেশ মিষ্ট ও পরিষ্কার এবং আধুনিকাদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, শব্দ ও ভাবে বহুলরূপে পরিপুষ্ট।

এ পর্য্যন্ত বেশ বলিলাম— লেখিকাও সন্তুষ্ট হইলেন, আমরা আরো সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু কঠোর আদর্শ আমাদের রাশ টানিয়া মুখটা বাঁকাইয়া দেয়।

এই যে নির্ম্মল প্রাণের আভাস, এই যে সরল সৌন্দর্য্য—ইহা পৃথিবীর পক্ষে অমূল্য, পিতামাতাবন্ধুবান্ধবের পক্ষে পরম উপাদেয় হইলেও, সাহিত্যের পক্ষে আরো একটু জিনিষের অপেক্ষা রাখে। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে হয়—কবির বিশেষত্ব। তাহা কিন্তু আভাসে নাই। আভাসে যাহা নাই, বিকাশে তাহা ফুটিবে কি?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

Do you get the best work in Electric-fitting
at the cheapest rate?
Most likely, you think you do, but a comparison of our estimates will make you alter your mind.

SEN, GUPTA & CO.,

ELECTRICAL ENGINEERS.
LIGHT & FAN FITTERS, CONTRACTORS.
ALL SORTS OE ELECTRICAL WORKS UNDERTAKEN.
ESTIMATES FURNISHED ON APPLICATION.
21-2, Sukeas Street, Calcutta.

মজুমদার লাইব্রেরী।

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন প্রকাশিত পুস্তক।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত—Lake of Palm মূল্য ৩৲।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত—সিরাজদ্দৌলা ২য় সংস্করণ, মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত—১। চিত্রবিচিত্র, মূল্য ১৷০।
২। (ইন্দু শীঘ্রই বাহির হইবে)।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত—১। ঋতুবিহার ১৲। ২। স্বর্গীয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী ॥০।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত—চন্দ্রশেখর রায়ের জীবনী ৸০।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত—গাথা (কাব্য) ।৵০।

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত—রঞ্জিনী, ১৲।

বঙ্গবাসীর প্রকাশিত—রাজলক্ষ্মী বাঁধাই, ১॥০।

রামদাস গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, ২৲।

শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত—কালিদাসের জীবনী ৸০।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত—পদ্মা ১॥০; গীতিকা ১॥০; দীপালী ১॥০; গান ১।০।

মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন সঙ্কলিত—হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা ১ম হইতে ১২খণ্ড মূল্য ৩॥০।

শ্রীখেলারাম নন্দী প্রণীত—তত্ত্বনির্ণয় ॥০।

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত—১। অমৃতে গরল ॥৵০; ২। চারুচন্দ্র ১৲। লক্ষ্মী মা ।৵০, লক্ষ্মী বৌ ।৵০, লক্ষ্মী মেয়ে ।৵০।

সব্‌রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত রাজগোপাল রায় প্রণীত—দলীল ৷০। এই পুস্তক গৃহস্থমাত্রেরই বিশেষ আবশ্যক।

ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত—২য় সংস্করণ হিন্দুধর্ম্মনীতি ১৲, নারীনীতি ৸০।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥০।

ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু, রমেশবাবু, দামোদরবাবু, নবীনবাবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থকারের যাবতীয় গ্রন্থ ও অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ উচ্চ কমিশনে বিক্রয় হইয়া থাকে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৯। | ৮ম সংখ্যা।

গ্রন্থকার।

(সাকরেদি)

সে অনেক দিনের কথা—আমার প্রাইভেট্ টিউটার মহাশয় দুইবার বি, এল, ফেল করিয়াছিলেন, তিন বারের বারও পাশ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অনুৎসাহের বা কোন কষ্টের চিহ্ন দেখা গেল না। বরং সেবার ফেলের পর হইতেই তিনি অধিকাংশ সময়েই নিয়মিতরূপে আমায় আঁক কসিতে নিযুক্ত করিয়া, কিংবা কোন এক্‌সারসাইজ দিয়া, একমনে নিজের একখানি বাঁধা খাতায় কত কি লিখিতেন; একবার লিখিয়া পাঁচবার কাটিতেন, আবার তাহাই নকল করিতেন। প্রত্যহ এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমার কৌতূহল বড়ই বাড়িয়া উঠিল, একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম, মাষ্টার মহাশয় খাতাখানি কি আইনের নোট? মাষ্টার মহাশয় গাম্ভীর্য্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—'না'। কিন্তু শুধু 'না' শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। আগ্রহভরে শুধাই-

লাম—তবে খাতাখানি কিসের সার! সার অর্থাৎ Sir, আপনারা এ কথাটি যেন অন্য ভাবে লইবেন না!—এবার মাষ্টার মহাশয়ের মুখ হইতে সহসা যেন গাম্ভীর্য্যের ছায়া সরিয়া গেল, একমুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন—শুনিবে? আমি খুব উৎসাহের সহিত আমার আন্তরিক সম্মতি জানাইলাম। তখন মাষ্টার মহাশয় তাঁহার চেয়ারটিকে আমার ডেস্‌কের অতি নিকটে টানিয়া, ঠিক আমার সাম্‌নে রাখিয়া খাতাখানি কোলের উপর রাখিয়া সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন! সে কবিতাটি ঠিক আমার স্মরণ নাই, কিন্তু মনে আছে সেই একটিমাত্র কবিতা শুনিয়াই আমার হৃদয়যমুনা মাষ্টার মহাশয়ের দিকে আকৃষ্ট হইল! একটি দুইটি তিনটি ক্রমে অনেকগুলি কবিতাই মাষ্টার মহাশয় পড়িয়া ফেলিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের কথায় বুঝিলাম, তাঁহার কবিতায় মাইকেলের শব্দবৈভব বর্ত্তমান, কিন্তু তাহা অমিত্রাক্ষর নহে, হেমচন্দ্রের গাম্ভীর্য্য আছে অথচ ভাষা প্রাণস্পর্শী, তাহা নবীনবাবুর সরলতাপূর্ণ, কিন্তু গ্রাম্যদোষশূন্য, তাহাতে রবীন্দ্রবাবুর মাধুর্য্য ও কবিত্ব আছে অথচ অস্পষ্টতাদোষ নাই! ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, বায়রণ প্রভৃতির সহিত তুলনায় মাষ্টার মহাশয়ের প্রাধান্য বুঝিয়াছিলাম! হায় হায় এতদিন আমার বৃথায় গিয়াছে।

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে ফিরে অন্নের তরে

এ হেন মাষ্টার-রত্ন আমার গৃহে থাকিতে আমি কি না লুকাইয়া লুকাইয়া বটতলার পুস্তকের সাহায্যে সাহিত্যচর্চ্চা করি! তা আমারই বা দোষ কি? মাষ্টার মহাশয়ের ভিতরে যে এত কাব্যরস-শুক্তির ভিতর মুক্তা, তাই বা কেমন করিয়া জানিব বল? তা সেই দিন হইতেই মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আমার সাহিত্য-চর্চ্চা অবাধে চলিতে লাগিল! সম্মুখে টেষ্ট পরীক্ষা, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইল না, টেষ্টে পাশ হই আর

না হই, allow ত কোন প্রকারে হইলাম! এবার মাষ্টার মহাশয় আমার পড়াশুনার দিকে একটু দৃষ্টি দিলেন, বলিলেন, পরীক্ষার পর আবার সাহিত্য চর্চ্চা করা যাবে, এখন পরীক্ষার পড়া পড়, এ পথ হইতে ফের,—কিন্তু আমার হৃদয় তখন সাহিত্য-রসপানে মাতোয়ারা, সে কথা কে শুনে বল! আমি তখন মনোরমা হইয়া মাষ্টার হেমচন্দ্রকে বলিলাম "গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও, গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, তুমি পর্ব্বতে ফিরে যাও।" মাষ্টার মহাশয়ের নাড়ীজ্ঞান খুব টন্‌টনে, তিনি এই একটিমাত্র কথাতেই আমার রোগ ধরিয়া ফেলিলেন। পাঠ্য পড়িতে আমায় আর পীড়াপীড়ি করিতেন না। পুনরায় সমভাবেই আমাদের সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হইল! মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি আমার ভক্তিও ক্রমে অচলা হইয়া উঠিল, আমার চক্ষে মাষ্টার মহাশয় মহাজনরূপে প্রতিভাত হইলেন! শাস্ত্রে বলে, মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথেই চল। কাজেই আমি মাষ্টার মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবিতা লিখিতে মন দিলাম। ক্রমে আমার রচনা মাষ্টার মহাশয়ের নয়নপথে পড়িল। তিনি মহা-উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, যথার্থই ইহাতে প্রতিভার অঙ্কুর আছে। সময়ে এ প্রতিভা যে বঙ্গ সাহিত্য-সরোবরের তীরে সুরম্য কদলী-কানন সৃষ্টি করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন আমার এই পরিণাম "ফল" দেখিয়া জানিয়াছি, মাষ্টার মহাশয় যে কেবল কাব্যকলায় ব্যুৎপন্ন, তাহা নহে, জ্যোতিষ-বিদ্যাতেও তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত! কিন্তু আমার দুঃখ এই, এ "ফল" আমি মাষ্টারকে দেখাইতে পারিলাম না। তা সে যাক্, আমি এই কাব্যরসে ভরপুর হইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলাম, প্রশ্নোত্তর লিখিতে লিখিতেও আমার কাব্যরস উথলিয়া উঠিল, যেন আমার অজ্ঞাতেই লেখা বাহির হইয়া গেল—

"অয়ি বিশ্ববিদ্যালয় নমি তব পায়,
ফিসের টাকা, আগাম বেতন সবই বুঝি যায়।"

পরীক্ষান্তে গৃহে গেলাম। মাষ্টার মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন না, তথাপি আমার সাহিত্যচর্চ্চার উৎসাহ কিছুমাত্র কমিল না। নিত্য নূতন কবিতা লিখিয়া লঘু-গুরু-অভেদে সকলকে শুনাইতে লাগিলাম। আমাদের গ্রামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল "বিদ্যা-কচ্‌কচি"। সেই কচ্‌কচি মহাশয় হইলেন আমার মল্লিনাথ। তোমরা অবিশ্বাস করিও না—কচ্‌কচি মহাশয় বলিতেন, আমার কবিতার মত কবিতা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও তিনি দেখেন নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া এবং আমার ম্যাকাসারসুগন্ধি দীর্ঘ-কুঞ্চিত অলকসমষ্টি, চশমা-পরিহিত নয়নেন্দীবরের উদাস দৃষ্টি, নিত্য নব নব সুশোভন বেশের সৃষ্টি দেখিয়া, একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন সকলেই বিস্মিত হইলেন, বুঝি ভীতও হইলেন। বিবাহের সম্বন্ধে এতদিন তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই, সম্প্রতি বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইলেন, বিবাহের দিন দেখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সেই বিদ্যা কচ্‌কচি মহাশয় 'বৈশাখে নরবানরঃ' প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া বৈশাখের প্রথমেই দিন স্থির করিয়া দিলেন, শুভ দিনে শুভ লগ্নে আমার বিবাহ হইল। কবিতার নূতন পথ খুলিল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, আমার নাম না দেখিয়া আত্মীয়-বন্ধু সকলেই দুঃখিত হইলেন। এমন ছেলে কি ফেল্ হয়? বোটি তবে নিশ্চয়ই "অপয়া"।

স্কুল খুলিলে আবার কলিকাতায় ফিরিলাম, কিন্তু এবার আর মাষ্টার মহাশয়ের সাক্ষাৎ মিলিল না,—মাষ্টার মহাশয়ের নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "নিকুঞ্জ বন"কে সংবাদপত্রে বড়ই আক্রমণ করিয়াছে কেহ কেহ নাকি গ্রন্থকারকে উন্মাদও বলিয়াছেন! মাষ্টার মহাশয়ের বন্ধুবান্ধবেরা

সমালোচনার সেই সব কঠোর অংশ লইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি নাকি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোন এক মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টারি লইয়া সুদূর মফস্বলে লুকাইয়াছেন! কিন্তু হায়, গুরুর সেই কবিতার ঝুলি যে এখন শিষ্যের স্কন্ধেই চাপিল! বানপ্রস্থাবলম্বী গুরুর শূন্য সিংহাসন তখন ওয়ারিশ সূত্রে আমাকেই যে পূর্ণ করিতে হইল! "বিশ্বতোমিণী" "জ্ঞানরঞ্জিনী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আমার দুই চারিটা কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরেই গ্রন্থকার হইবার সাধ বড় বেশী বেশী হইল! বিশেষত আমি একজন বিশিষ্ট কবি,—আমার কবিতা প্রকাশ করিতে কত সম্পাদক লালায়িত, আমার কবিতা কি না অমুক অমুক কাগজের সম্পাদক প্রকাশযোগ্য বলিয়া মনে করেন না! আমার সে সব কবিতা প্রকাশযোগ্য কি না, তাহা দেখাইবার জন্যও সত্বরে গ্রন্থ-প্রকাশ প্রয়োজন হইয়া পড়িল! আমার পুস্তক প্রকাশ হইতে না হইতে কোন কোন কাগজে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সমালোচিত হইল! নিন্দা,—তাও কেহ কেহ যে না করিল, এমন নহে,—কিন্তু নিন্দুকের কাজই ওই! সে নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া আমি খানতিনেক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করিলাম! যাঁহারা আমার কবিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আমার কবিতাগ্রন্থগুলি "অমূল্য"; বোধ হয়, সেজন্যই এ গ্রন্থ কেহ মূল্য দিয়া গ্রহণ করিল না। প্রেসের ও কাগজের দোকানের বিল জমিয়া উঠিল।

বলিতে ভুলিয়াছি, ইতিমধ্যে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে এবং আমি স্কুলও ত্যাগ করিয়াছি। এতদিন পিতৃদেবের আয়ে সংসার চলিত, আমার ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইত, এখন সে পথ বন্ধ! তাই এখন উপায়ের পথ দেখিতে হইল! কবিতাগ্রন্থ ছাপাইয়া যে লাভ, তাহা ত দেখিলাম! উপন্যাসে নাকি খুব লাভ, সুতরাং এখন উপন্যাসেই

হাত দিলাম,—আমার চলন্ত কলম, জলন্ত প্রতিভা, সত্বরেই খানদুই উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলাম—বোঝার উপর শাকের আঁটি ভাবিয়া ধারের উপর ধার করিয়া নূতন প্রেসে পুস্তক দুইখানি ছাপিলাম! প্রথম-প্রথম দুইচারিখানি পুস্তকও কাটিল, কারণ সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমবাবু আমার গ্রন্থ পাঠে বলিয়াছিলেন, "এমন পুস্তক বাংলায় আর প্রকাশিত হয় নাই, বর্ণনায় গ্রন্থকার কালিদাসকেও হার মানাইয়াছেন!" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—গ্রন্থকার বঙ্কিমের পার্শ্বে আসন পাইবেন—স্থানে স্থানে ইনি বঙ্কিমকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন! এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপনও দিলাম। পুস্তকও কাটিতে লাগিল, কিন্তু দুষ্ট সমালোচকগণের উৎপাতে আমার বাড়া ভাতে ছাই পড়িল, দরিদ্রের শাকে বালি মিশিল! আমার প্রশংসাকারী বঙ্কিমচন্দ্র যে আমার ভাগিনেয় বঙ্কিমচন্দ্র ভাদুড়ী ও রবীন্দ্রনাথ যে আমার প্রতিবাসী রবীন্দ্রনাথ দত্ত, এ কথাও কেহ কেহ প্রকাশ করিলেন! আমার পুস্তক যে আর কাটে না; ক্রমে বুঝিলাম, বাংলার পাঠকগণের অপেক্ষা কীটের সহৃদয়তা অনেক বেশী! ইহারই নাম "বিধি চেয়ে বাঁধ ভাল।"

কবিতা ছাপাইয়া দেখিলাম—উপন্যাসও বাদ গেল না, এখন বাকী রহিল নাটক ও প্রহসন। তাহাতেও আমার হাত খুলিল! এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া কয়জন গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?—শাস্ত্রে বলে, আপনার প্রশংসা করিলে আত্মহত্যা করা হয়, সে দুষ্কৃতি করিবার ইচ্ছা আমার নাই, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম, নতুবা দেখিতে—ঐরে আবার কবিতা! কবিতার হাত কি না—তা—

কথা হইতেছিল, আমার নাটক আর প্রহসনের! আমার নাটক ও প্রহসন প্রকাশিত হইলে তাহা শীঘ্রই থিয়েটারে অভিনীত হইবে, এ-প্রকার আশাও পাইলাম। এইবার! পাঠক তুমি কোথায় যাও!

এবার ত আমার পুস্তক কিনিতেই হইবে! মনে মনে কত সুখের ঘর বাঁধিতেছি, কিন্তু মানুষ গড়ে, আর বিধাতায় ভাঙে,—

"পয়সা লাগিয়া নাটক লিখিনু
বাঁধিনু সুখের বাসা,
ভাই, কি আর বলিব পুলিশ কমিশনর
নাশিল সকল আশা!
কুরুচি অশ্লীল, আমার কেতাব!
দণ্ড তাহে যে হ'ল।
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু
বরজ পড়িয়া গেল।

এদিকে প্রেস ও কাগজের দেনার জন্য ৩,৪ নম্বর নালিশ দায়ের হইল! দপ্তরী ও মুদি (উঠানদার), তারাও বড় ব্যতিব্যস্ত করিল,—তখন কোন উপায়ই দেখিলাম না—শুধু অন্ধকার দেখিলাম! শেষ শাস্ত্রের "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই বাক্যের অনুসরণ করিব, স্থির করিলাম,—কিন্তু কোথায় যাই, বাড়ী? সেখানে এ দশায় কেমন করিয়া যাই বল?

"কৈ ছলে যাওব যমুনাক তীর,
কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটীর।"

শেষ মনে মনে একটা উপায় স্থির করিলাম। উত্তরে একটি আত্মীয় পাটের দালালী করিতেন, আমি রাতারাতি তাঁর নিকট রওনা হইলাম। তিনি আমার অবস্থা শুনিয়া আমাকেও দালালী কাজে প্রবেশ করিতে বলিলেন। আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল, আমি আর কোন ইতস্তত না করিয়া দালালীতে মন দিলাম। এখন বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে আছি, সাহিত্যের সমস্ত ঋণ শোধ করিয়াছি, হাতেও কিছু জমিয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি আমার পরমাত্মীয় বুদ্ধিমান, তাই কর্ত্তব্যবোধে আমার কাহিনী আপনাকে শুনাইলাম, আপনিও সেই পথের পথিক হইয়াছেন—সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে, এখন হইতে সাবধান হউন; নতুবা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ চরাইলে, ওরফে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চা করিলে, পরিণামে যে কত সুখ, তাহা শীঘ্রই বুঝিবেন। তাই বলি, এখনও সময় আছে, এ সব ছাড়িয়া পাটের দালালী করিবেন ত আসুন।

শ্রীসাহিত্যায় পাটাশ্রমী।

সম্পাদকের প্রতি।

ওগো—
প্রবীণ সম্পাদক
না প্রকাশি' মম মোহন কবিতা
কেন ফেলে রাখ মাসকতক ? গ্র।
ধিক্ তোমা শত ধিক্
আমার প্রাণের কতই আবেগ
সেটা বুঝিলে না ঠিক্,
বুঝিলে না তাতে কতই চিত্র,
কি ভাবভঙ্গী অতি বিচিত্র,
অপ্সরস্বর, করুণ কণ্ঠ
চেয়ে আছে অনিমিখ
ধিক্ তোমা শত ধিক্!

বুঝিলে না খাঁটি অর্থ
আকুলি-ব্যাকুলি মরম-তিয়াস
কবি-হৃদি-ভরা স্বার্থ।

কতই মলয় কত হা-হুতাশ,
কতই জ্যোৎস্না, প্রেমের আভাস
সুন্দর কত মধুর রাগিণী
জিনিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত
বুঝিলে না হায় অর্থ!

দেখিয়া মোহন ছন্দ
ভাবের আবেগ ঠিকরিয়া উঠে
বুঝিয়া করিলে সন্দ,—
মম ভাবী যশ হোমানলশিখা
অতি প্রচণ্ড ভীমললাটিকা
করে তব যশে অশনিপ্রহার
তাই কি,—শিথিল হৃদয়-বন্ধ!
মনে কি হইল সন্দ?

আমি কি রেখেছি বাকী?
বাংলার যত কবিতা হইতে
শব্দ বাছিয়া রাখি—
তাহে গাঁথিনু একটি মালা
তাহে স্বর্গসুরভি ঢালা,
নীচে ফুটনোট্ আর কোটেশন্-জালে
বিস্তৃত সব আঁখি
কিছু ত' রাখিনি বাকী!

হায়! কবিতা মানসপ্রিয়া!
তোর হাতে দিনু উপাধির রাখি
অনুরোধে হিয়া রাঙিয়া,

তবু কেহ ত না চাহে ফিরে
তোর রক্তিম মুখানিরে
মূঢ় সম্পাদক ক্রিটিক্ আনাড়ি
দেশটা ফেলিল নাশিয়া!

শেষে,

শুন সম্পাদক মশাই
আমারই কবিতা আমারই নামেতে
প্রকাশিত হওয়া চাই।
নতুবা দেখিবে রিভিউ লিখিয়া
কাগজে কাগজে ফেলিব ছাইয়া
ত্রাহি ত্রাহি রবে উঠিবে কাঁপিয়া
বলিবে তাই-ত-তাই!
আমি, বলিয়া খালাস ভাই।

শ্রীঅপ্রকটচন্দ্রভাস্কর।

অমরাবতী।

ভুল।

"আমার কথার উত্তর দিবে না?"

"না, আগে তুমি বল আজ কোথায় গিয়াছিলে, তার পর আমি এর উত্তর দিব।"

"তা হবে না, তোমাকে এ কথার উত্তর দিতেই হ'বে।" স্বামী চারুচন্দ্র একটু কঠোর কণ্ঠে কুসুমকে এই আদেশ করিলেন।

কুসুম মেয়ে কিছু জেদি, সে কথা শুনিল না, বরং একটু জোরে বলিল, "এ ত ভারি মজা দেখতে পাই, আমি আগে হ'তে ওঁকে যে

কথা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দেবেন না, উল্টা আমার উপর তম্বি। তা সেটি হবে না, আগে তুমি বল, তার পর আমার পালা।"

চা। ও সব রেখে দাও, আগে তোমাকে উত্তর দিতেই হবে।

কু। কখ্খনই না—

চা। আমার কথা শুনবে না?

কু। কেন তুমিই আগে বল না?

চা। আবার ঐ কথা, যদি ভাল চাও ত আগে উত্তর দাও।

চারুচন্দ্রের এ কথায় কুসুমের একটু রাগ হইল। বলিল, "কেন এর আর ভালমন্দ কি?"

চা। দেখ্‌বে।

কু। "এতে আর দেখাবে কি?" কোথা হইতে অভিমান আসিল —কুসুম স্বামীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইল। চারুচন্দ্রের মেজাজটা আজ ভাল ছিল না, রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিলেন, "বটে, বড় যে অহঙ্কার, এতটা চিরকাল থাক্‌বে না।" কুসুমের গায়ে কথাটা সহিল না —সে বলিল, "না থাকে না থাক্‌বে।" ইস্পাতে ও পাথরে ঠোকা-ঠুকিতে আগুন বাহির হইল। হাসিতে হাসিতে কপালে ব্যথা দাঁড়াইল। শান্ত বারিবক্ষে কোথা হইতে ঊর্ম্মি দেখা দিল। সহসা তাহাদের যুক্ত প্রাণে কেমন-একটা চির পড়িয়া গেল। স্বামীর কথায় অভিমানিনী কুসুম ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে শয্যাত্যাগ করিয়া মেঝেয় আসিয়া শুইল, বোধ হয় মনে মনে আশা ছিল, চারুচন্দ্র তাহাকে সোহাগ করিয়া আবার ডাকিবে। কেন না, এমনতর কত-শত কলহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল মেঘের মত নিত্য তাহাদের হৃদয়াকাশ ঢাকিয়া ফেলিত; আবার মুহূর্ত্তে মেঘমুক্ত রৌদ্রকরে তাহাদের দাম্পত্যপ্রেম হাসিয়া জাগিত। কিন্তু এবার আর স্বামী ডাকিলেন না। অনেকক্ষণ দেখিয়া, কে জানে কি ভাবিয়া, কুসুম একবার পালঙ্কের ধারে যাইল,

আবার ফিরিয়া আসিল। বুঝিল, স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; একবার তাকে ডাকিতে ইচ্ছা হইল, আবার অভিমান আসিল। ঘড়ি টংটং করিয়া দুইটা বাজিল। ম্যাটিংএর উপর শুইয়া কুসুম আবার কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া আবার কি ভাবিয়া পালঙ্কে উঠিল, ধীরে অতি ধীরে স্বামীর পায়ে কোমল হাতখানি দিল, অমনি কোথা হইতে লজ্জা আসিল, ফুটি ফুটি করিয়া মুখ আর ফুটিল না, ক্ষণিক এপাশ ওপাশ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে কুসুম ঘুমাইয়া পড়িল। চারু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

চিন্তাক্লিষ্ট মনে বড় গভীর নিদ্রা হয় না। চারু জাগিয়া দেখিলেন, চিম্‌নী তখনও নিভে নাই; পাংশুবর্ণ ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া তখনও জ্বলিতেছে। জানালা সবই খোলা। চারু বিছানা ছাড়িয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন; বাক্স খুলিয়া অন্যমনে তাহাতে চাবি দিলেন। অর্থ কয়টি সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন, কুসুম নিদ্রিতা। একবার ভাবিলেন উঠাইয়া দেখি, কি বলে। আবার কি মনে হইল, সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিলেন, আবার ঘরে ফিরিলেন; ভাবিলেন, মিছামিছি একটা কথা লইয়া এতদূর করাটা ঠিক নয়। কুসুম ঘুমের ঘোরে ফিরিয়া শুইল। মুক্ত বাতায়নে মধুর মলয় আসিয়া বালিকার কুঞ্চিত কেশদাম ছড়াইয়া দিল। জ্যোৎস্না-কিরণে মুখ-কমল বড় সুন্দর বোধ হইল। চারুচন্দ্র সুপ্তা রূপসী পত্নী ছাড়িয়া যাইতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। শেষে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "না, এখন বালিকা ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। একবার দেখি না, কি হয়।"

বাটীর বাহিরে আসিলে মস্‌মস্ পদশব্দে দ্বারবান্ তন্দ্রা ছাড়িয়া একবার হাঁকিল, "কোন্ হ্যায়?" চারুচন্দ্র উত্তর না দিয়া বাহিরে আসিলেন। পদশব্দ শুনিতে না পাইয়া দোবেজী আর তাকাইল না, সে-বাটীতে আবার ভূতের ভয় ছিল, গুমটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

২

প্রাতে কুসুমের ভারিভারি মুখ দেখিয়া ঠাকুরাণীদিদি ধরিয়া বসিলেন—"কিলো কাল হয়েছে কি?" তার দিদি বলিল, "হ্যাঁলা, মুখ এমন কেন?" কুসুম বিরক্তিস্বরে, "কি আবার হবে"—বলিয়া চলিয়া গেল।

স্নানের সময় বেহারা জামাইবাবুর খোঁজ পাইল না। জলযোগের সময় গৃহিণীরা দেখিলেন, জামাতা বাটী নাই। আহারের সময় কর্ত্তা মহাশয় জামাতাকে দেখিতে পাইলেন না। কেহ কিছু জানে না, কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

কুসুমের মাতা নিভৃতে কুসুমকে ডাকিয়া শুধাইলেন, "কি হয়েছে বল্?" সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে চোখের জল ফেলিল। কুসুম কেবল তার দিদিকে সব বলিল, বড় কিছু লুকাইল না। কামিনী বলিল, "তা নয় ভাই, তুই নিশ্চয় কিছু বলেছিস্।"

কু। তোর দিব্যি দিদি, আমি আর কিছুই বলিনি।

কা। তবে সে রাগ করে গেল কেন? চারু ত ভাই তেমন নয়। কাল সে তার বোনের বাড়ী গিয়েছিল, সে আমায় নিজে বলেছে। এ কথায় কেন সে রাগ করবে।

কেহই কুসুমের কথা বিশ্বাস করিল না। কুসুমের মাতা কুসুমের উদ্দেশে বলিলেন; "চারু বড় এখানে আস্‌তে চায় না; এসেও এখানে ওঠেনি। উনি (স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) নিজে গিয়ে তবে এ বাসায় আনেন। আলাই বলছিলেন, চারুর ব্যবহারে সকলেই তার সুখ্যাৎ করে, ছুঁড়ীর যেমন কপাল, নইলে আর অমন স্বামীও চটায়"।

কর্ত্তামহাশয় অনেক স্থানেই খোঁজ করিলেন। চারুর সংবাদ কেহই দিতে পারিল না। সকলেরই রাগ কুসুমের উপর।

রাত্রে কুসুম কত দেবতাকে ডাকিল, কতবার কাঁদিল, কত ক্ষমা চাহিল, কেহ শুনিল না। পত্র লিখিতে বসিল; কোথায় লিখিবে?—

পাঠান হইল না। শেষে শ্বশুরবাটীতে তার ঠাকুরঝিকে সব খুলিয়া লিখিল। লিখিল, আমি দোষী, তোমরা আমায় ক্ষমা কর, আমায় লইয়া যাও। আমি তোমাদের কাছে যাইব।

৩

পিতার মৃত্যুর পর জননীই চারুর একমাত্র অভিভাবিকা, চারুর মাতা প্রবীণা, দাম্পত্যপ্রেমের মধুবিষ তিনি যে আস্বাদন না করিয়াছেন, এমত নহে। কন্যার মুখে সব শুনিলেন; পত্র নিজে পড়িলেন। বলিলেন, "চারু আমার তেমন নয়। সে কোথাও যাইবে না, যেখানেই যাক্, আমি সংবাদ পাইব। তবে বউ আনা চাই।"

চারুর সংবাদ তার শ্বশুরালয়ে আর কেহ পাইল না। সকলে ভাবিল, রাগ করিলেও সে কুসুমকে পত্র দিবে। কামিনী ভাবিল, কুসুম পত্র না পায়, সে পাইবে। কিন্তু চারুর পত্র কেহ পাইল না।

একদিন প্রাতে উঠিয়া রমাকান্ত রায় দেখিলেন, কুসুমকে লইতে লোক আসিয়াছে। ঝিকে ভিতর-বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

চারুর মাতা দূরসম্পর্কীয় তাঁর এক ভ্রাতাকে বধূ আনিতে পাঠাইয়াছেন। রমাকান্ত রায় জানিলেন, চারু ভাগলপুরে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, "বেয়াই মহাশয়, চারুকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখিলে হয় না?" বেয়াই বলিলেন, "ভগ্নীর বিশেষ জেদ, বধূমাতাকে পাঠাইতে হইবে।" রমাকান্তবাবু অপর কথা পাড়িলেন।

বাটীর গৃহিণীদের কন্যা পাঠাইবার বড় মত নাই। মত কেবল কুসুমের মাতার। কর্ত্তা মহাশয়ও ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কুসুম রাত্রে দিদিকে বলিল, "আমায় পাঠাইয়া দে দিদি। আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না।" কামিনী বুঝিল, বলিল, "আচ্ছা।"

কুসুমের মাতা বলিলেন, "বোঝ না, মেয়ে পাঠাইয়া দাও। চারু ছেলে ভাল, যে কারণে হোক্, এখন মিটিয়া যাইবে। না পাঠাইলে শেষে

মেয়ের দশায় কি হইবে? আমার ত মেয়ে পাঠানরই মত।" কাজেই দ্বিরুক্তি না করিয়া বৃদ্ধ কন্যা পাঠাইয়া দিলেন।

যাইবার সময় কুসুম বড় কাঁদিল। মাতা অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কুসুম থামিল না; কাঁদিয়া গাড়িতে উঠিল।

কুসুম শ্বশুরবাড়ী আসিল। পাড়ার মেয়েদের কাছে এ ঘটনা বড় অবিদিত ছিল না। বৃদ্ধারা বধূ দেখিতে আসিয়া বলিলেন; "হ্যাঁমা, বড় লোকের বেটীই না হয় বট, তা' বলে কি সোয়ামীকে আর গেরাজ্জী ক'রতে নেই।" যুবতীরা বলিল, "আহা বৌয়ের আর তেমন হাসি-হাসি মুখ নাই, ছেলেমানুষ, না হয় বুঝতে পারে নি, তা বলে চারুর রাগ-করা ভাল হয় নি। তুমি (চারুর মাকে লক্ষ্য করিয়া) বাছা, তোমার ছেলেকে একবার আস্তে বল, তা হলেই সব চুকে যাবে।" চারুর মাতা বলিলেন, "কিছুই হয় নি মা, এমন সব বাড়ীতেই হয়। বউ-মানুষদের বেশীদিন বাপের বাড়ীতে রাখা ঠিক নয়, তাই এমন হয়েছে।"

কুসুম দেখিল, সকলেই তাহাকে দুই-এক কথা বেশ শুনাইয়া দিল, কেহ বড় ছাড়িল না। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিলেও অন্তরের ভাব তার প্রতি আর তেমন নাই। তাহার ননদিনীর মায়া থাকিলেও মাঝে মাঝে তাহাকে দু-এক কথা বলে, এইরূপে ক্রমে কুসুমের শ্বশুরালয় পিতৃগৃহাপেক্ষা অধিক বিষাদময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

লিখি লিখি করিয়া বালিকার পত্র লিখিতে আর ভরসা হয় না। কি ভাবিবেন, কি বলিবেন, উত্তর পাইব কি না, নানা চিন্তায় বসন্ত-ব্রততী শুকাইতে লাগিল। পত্র লিখিতে বসিলেই পোড়া অভিমান আসিয়া চক্ষের জলে সব মুছাইয়া দেয়। কত যত্নে নিভৃতে দুইখানা পত্র ছিঁড়িয়া কুসুম পত্র লিখিল। ছত্র বাঁকিয়া গেল, অক্ষর-গুলা অস্পষ্ট

বোধ হইতে লাগিল। অভিমানে সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার হৃদয়ের বেদনা বাড়িতে লাগিল। মার কাছে, ভগ্নীর নিকট চারুর পত্র যেমন আসিত, আসিতে লাগিল। কৈ কুসুমের নামে ত পত্র নাই। রাত্রে কুসুম শুইয়া শুইয়া কাঁদে, দিবসে সে হৃদয়ের ব্যথা বক্ষে চাপিয়া চোখের জল অঞ্চলে মুছিয়া সব কাজ করে। আগে কুসুম সন্ধ্যারাত্রে ঘুমাইয়া পড়িত, আজ সে ঘুম কাকে বলে জানে না। একাদশীর রাত্রে শাশুড়ীর নিষেধসত্ত্বেও তাহার পদসেবা করিয়া রাত্রি জাগে। শাশুড়ীর পায়ে তেল মাখাইয়া দেয়, বাতাস করে। শাশুড়ীর বহু উপরোধে সে ঘুমাইতে যায়। শাশুড়ী রাঁধিলে সে বলে, "আমি রাঁধিতে জানি, আমি আজ রাঁধিব।"

দেখিতে দেখিতে কুসুমের সব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল। আগে তাহার মুখে হাসি ধরিত না, হাসিয়া কথা কহিত; আজ সে মুখে আর হাসি নাই। সদাই অবনত, বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায়, পদদলিত পত্রের ন্যায়, সে মুখকমল ক্রমে মলিন হইতে মলিনতর হইয়া আসিল, কুসুম-কলিকা দেখিতে দেখিতে কোরকেই ঝরিতে লাগিল। শরতের কুসুম যেন হেমন্তের শীত বাতে শীর্ণ হইয়া আসিল। স্বামীর তাচ্ছীল্যে বালিকার জীবনী শক্তি পূর্ণিমাপগমে শশিকলার মত দিনে দিনে হ্রাস হইতে লাগিল।

৫

চারুচন্দ্র কলিকাতা ছাড়িয়া দূরে ভাগলপুরে আসিলেন। মৃণাল ভাঙ্গিল, কিন্তু তন্তু ছিঁড়িল না। কুসুমের ব্যবহারে তাহাকে ত্যাগ করিয়া ব্যথিত চারুচন্দ্র দূরে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু কুসুমকে ভুলিতে পারিলেন কৈ?

দেবীপুরে আসিলে হয় ত কুসুমের বালিকা-সুলভ চপলতার হ্রাস হইবে ভাবিয়া, বাটীতে বন্ধু রামচন্দ্রকে পত্রে পূর্ব্বাপর সমস্ত খুলিয়া

লিখিলেন। কুসুমকে অবিলম্বে যাহাতে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসা হয়, ইঙ্গিতে তাঁহার মাতাকে সে কথা জানাইতেও লিখিয়া দিলেন।

দিনে দিনে চারুচন্দ্রের ক্রোধও মন্দীভূত হইয়া আসিল। ভাবিলেন, কুসুমের পত্র পাইলেই বাটী যাইবেন। কিন্তু কুসুমের পত্র আর আসে না। প্রবাসে থাকিলে সপ্তাহে দুইবার পত্র না পাইলে যাহার প্রেমলিপিতে তাঁহার পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটিত, আজ মাসান্তর হইতে চলিল, তথাপি সে কুসুম ত আর পত্র লেখে না। চারুচন্দ্র বুঝিলেন, কুসুমের আর সে ভালবাসা নাই; ভাবিলেন, তাহার এ নিস্তব্ধতা অভিমানবোধক নহে, তাচ্ছীল্যব্যঞ্জক মাত্র। চারুচন্দ্রের কুসুমের উপর বড় রাগ হইল, ভাবিলেন, দেখি মান ভাঙে কি না।

সহসা কোন বন্ধুর সাহায্যে চারুচন্দ্র একটি চাকুরী পাইলেন। তাঁহার মনঃসংযোগ কার্য্যে নিবিষ্ট হইল। চারুচন্দ্রের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল। মাতাকে লিখিলেন, নূতন কার্য্য পাইয়াছেন, এখন বাটী যাইবার উপায় নাই।

ক্লান্ত চারুচন্দ্র অফিস্ হইতে আসিয়া একদিন দেখিলেন, তাহার শিরোনামাঙ্কিত একখানি পত্র রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্ত্তের ন্যায় তাহাতে ক্ষুধা মিটিল না; মুষ্টি-অন্নে লালসা বাড়িল মাত্র। চারুচন্দ্রের আশা ছিল, কুসুমের পত্রে পূর্ব্বকৃত অপরাধের অনুশোচনা থাকিবে, করুণ-ললিত ভাষে তাঁহার ক্ষমা চাহিবে, না আসিলে তোমার কুসুম মরিবে, বিষ খাইবে, কে জানে আরও কত কি থাকিবে। চারুচন্দ্রের সে আশা পূরিল না। গভীর বারিধির মত কুসুমের পত্র প্রেমতরঙ্গে বিক্ষিপ্ত ছিল না, তবু তাহা তাহার অকপট প্রেমেই পূর্ণ; কিন্তু চারুচন্দ্র তাহা বুঝিল না। অবোধ নৌকারোহীর ন্যায় লোষ্ট্রবিক্ষেপণে বারির গভীরতা নিরূপণ করিতে গিয়া কোন ঊর্ম্মি দেখিতে পাইলেন না, কেবল ঘূর্ণীই সৃষ্ট হইল।

কুসুম পত্র লিখিয়া কেন উত্তর পাইল না। এখন সে রাত্রে শুইয়া কেবল অতীতের সুখ-ছবি আঁকিতে চায়, কিন্তু ব্যথিতচিত্তে তার সকলি স্বপ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। কুসুম এখন প্রত্যহ বক্ষে আশা লইয়া উঠে, রাত্রে কাঁদিয়া ঘুমায়। দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল, তাহার ত পত্রোত্তর আসিল না। কুসুমের মলিন বদন দেখিয়া তার শাশুড়ী নিভৃতে একদিন বলিলেন, "মা তুমিই না হয় একখানা পত্র লেখ না। তোমারি বা বাছা কি এমন জেদ। আমি ত চারুকে আস্‌তে লিখেছি"। কুসুমের বদন লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। কেবল চক্ষু ফাটিয়া জল দেখা দিল।

কুসুম অনেক ভাবিয়া দ্বিতীয় পত্র লিখিল। লিখিল, "তোমায় পত্র দিয়া উত্তর পাই নাই। জানি না, অনুতপ্তের ক্ষমা আছে কি না। তুমিই আমায় শিখাইয়াছিলে, দাম্পত্যপ্রেমে অভিমান চিরশত্রু।

মা তোমাকে আসিতে লিখিয়াছেন। উত্তর না পাইয়া তিনি ভাবিতা আছেন। তুমি কেমন আছ? ইতি। তোমার সেবিকা কুসুম।"

বৃদ্ধবয়সের কন্যা বলিয়া কুসুম তার পিতার বড় স্নেহের ধন। তিনি কুসুমকে নিজে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বিবাহের পর চারুচন্দ্রের চেষ্টায় সেটা কিঞ্চিৎ মার্জ্জিতও হইয়াছিল। পিত্রালয়ে কুসুম অনেক সঙ্গিনীর পত্র মুসাবিদা করিয়া দিত; কিন্তু আজ তাহার দুঃখের দিনে বহু চেষ্টা করিয়াও সে বেশী কিছু লিখিতে পারিল না।

যথাসময়ে কুসুমের পত্র পৌঁছিল। বন্ধুর নিমন্ত্রণে স্থানান্তরে থাকায় তিনি পত্র পাইলেন না। আসিয়া দেখিলেন, কুসুমের পত্র আসিয়াছে। মাতাও যাইতে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। চারুচন্দ্র বাটী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কুসুমের উপর তাঁহার রাগও কমিয়া আসিয়াছিল। ভাবিলেন, যখন বাটীই যাইতেছেন, তখন উত্তর দেওয়ার কি প্রয়োজন?

মানসিক অবস্থা যখন এরূপ, তখন একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সংবাদ পাইলেন, কুসুম পীড়িতা। তিনি অবসর লইয়া রওনা হইলেন।

৬

মানসিক উদ্বেগে চারুচন্দ্র ষ্টেসনে নামিয়া পদব্রজে বাটী চলিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দেন নাই; যানের কোন সুবিধা হইল না। সঙ্গীর খোঁজ করিলেন, এত রাত্রে কে তাঁহার সঙ্গী হইবে? কাজেই একাকী যাইতে মনস্থ করিলেন।

স্তব্ধ রজনীতে আর কোন শব্দ শোনা যায় না। মাঝে মাঝে চৌকিদারের চীৎকারে কেবলমাত্র প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পল্লীতে বড় আর কেহ জাগিয়া নাই।

দেখিতে দেখিতে চারুচন্দ্র গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চিরপরিচিত প্রান্তর দেখা দিল। বৃক্ষশাখায় বিহগকাকলী শুনিয়া চারুচন্দ্র বুঝিলেন, রাত্রি আর অধিক নাই; ক্ষিপ্রপদসঞ্চারে চারুচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন। বাটী আসিয়া চারুচন্দ্র দেখিলেন, দীপ জ্বলিতেছে মাত্র, আলোক বড় ক্ষীণ। অপরাধীর মত চারুচন্দ্র কুসুমের কাছে বসিলেন; মুখে কথা সরিল না। মুহূর্ত্তের ভিতর তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; তাহার তীক্ষ্ণ দংশনে তাঁহার অনুতপ্ত হৃদয় অবসাদে ম্লান হইয়া পড়িল। ওষ্ঠ চাপিয়া আসিল। চারুচন্দ্র কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কুসুম চেষ্টা করিল; দুর্ব্বলতায় ভাষা জড়াইয়া আসিল। যাহা বলিল, কেহ বড় বুঝিতেও পারিল না।

অনুতপ্ত হৃদয় তাহার সাধনায় নিবিষ্ট হইল। ব্যাধির মত চারুচন্দ্রও রোগিণীর পার্শ্ব ছাড়িলেন না। বলীর দ্বন্দে হীনবলই পরাস্ত

হইয়া আসে। চারুচন্দ্রের অবিশ্রান্ত শুশ্রূষায় ব্যাধি কুসুমকলেবর ত্যাগ করিল—সে সারিয়া উঠিল।

চারুচন্দ্র ভাবিলেন, তড়িতের মত এ বিচ্ছেদ, চলিত মেঘের ন্যায়, তাহাদের দুইটি হৃদয় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিবে। আবার তাহাদের শান্তি উছলিয়া পড়িবে; এ কঠোর জগৎ বুঝি আবার তাহাদের চক্ষে মনোরম হইয়া উঠিবে। কিন্তু আশা কবে পূরিয়াছে? যে যাহা চায়, কবে সে তাহা পাইয়াছে? দুঃখের উৎস একবারে কবে শুখাইয়াছে?

কুসুম সারিল। চারু হাসিল। কৈ কুসুমের হৃদয় ত সারিল না। এ ঘটনার পর কুসুম যেন ক্রমে বোবা হইয়া পড়িল। মনে যাহা আসে, অসঙ্কোচে আর তাহা স্বামীর কাছে বলিতে পারে না। সকল কথাই যেন তাহাকে মাপিয়া-বাছিয়া বলিতে হয়। কুসুম আর স্বামীর সহিত তেমন কথা কহিতে পারে না, সদাই ভয়, পাছে কি বলিতে কি বলে, কিসে কি হয়। সে অনেকসময় অনেক কথা বলিবে ভাবিয়া রাখে, কিন্তু কেন যেন সব কথা ফুটিয়া উঠে না। কিসে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরে।

আলোকের পর আঁধারে আসিলে চক্ষু ক্ষণেকের তরে তাহার দীপ্তি হারাইয়া ফেলে। চপলা কুসুম কিরূপে এমন বোবা হইল? চারু ত ভাবিয়া কোন কারণই পাইলেন না। তীব্রস্বরে তিনি একদিন তাহার ব্যবহারের কারণ শুধাইলেন। বালিকা নিরুত্তর। অনেক ভাবিয়া চারুচন্দ্র বেশী কিছু বলিলেন না, বুঝিলেন, কুসুমের শিক্ষা তখনও হয় নাই, তাই নানা অছিলায় শীঘ্র বাটীপরিত্যাগের সংকল্প আঁটিলেন।

চারু যাইবার দিন স্থির করিল। কিন্তু অকস্মাৎ গ্রামে বিসূচিকা দেখা দিল। চারু তাহার কবল এড়াইতে পারিল না। শরতের মেঘের মত কোথা হইতে আঁধারে তাহাদের গৃহকোণ ছাইয়া ফেলিল, বাটীতে যেন এক বিভীষিকার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। একমাত্র পুত্রবতী

জননীর আহার-নিদ্রা লোপ পাইল। তাঁহার নিয়মিত পূজাও বন্ধ হইয়া আসিল। চারুর শুশ্রূষাই তাহার আহ্নিক ও পূজার স্থান পাইল। আর কুসুম? লজ্জাবনতা শীত ঋতুর হিম-ক্লিষ্ট তরুলতার মত সে শুকাইয়া আসিল। দিবসে সে বড় রোগীর গৃহে যাইতে পায় না। বাঙালীর রোগশয্যা যে দেবালয়ের মত দর্শকেই ভরিয়া আছে। সেখানে বধূ যাইবে কি করিয়া? যতক্ষণ সে তথায় থাকে, বস্ত্রাবৃত হইয়া বসিয়া কাঁদে; চাহিয়া দেখিবার সাহসও তার কুলায় না। লোকে যে নিন্দা করিবে, কেমন করিয়া সে এত লোকের মাঝে স্বামীর সেবা করিবে? সে রাত্রেই কেবল সেখানে প্রবেশ করিতে পায়। সমস্ত রাত্রটুকুই সে সেবা করিয়া কাটায়; জাগিয়া বসিয়া থাকে। ঔষধের কৃপায় চারু রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে, আর, যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, তাহাতে তাহার সংজ্ঞাও বড় থাকে না।

আজ চারু একটু ভাল আছে। রাত্রে জাগিয়া দেখিল, কুসুম বসিয়া ঢুলিতেছে, তাহার হাতের পাখা খসিয়া পড়িতেছে। তখনই আবার চক্ষু কচালিয়া পাখা করিতেছে, পীড়ার সময় চারু কুসুমকে এই প্রথম দেখিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে তাহার কারণ শুধাইলেন; কুসুম বলিল, "কেন আমি ত এইখানেই থাকি।" চারু তাহাকে শুইতে বলিলেন। "এই ভোর হইলেই যাইব" বলিয়া সে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার চক্ষের জল অতর্কিতে চারুর গাত্রে ২।১ ফোঁটা পড়িল। কুসুম তা বুঝিতে পারিল না।

ক্ষণিকের সঙ্ঘাতে হৃদয়ের অনেক দ্বারই রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার ক্ষণিকের ঘাতেই কখন তাহা আপনা হইতেই খুলিয়া আসে; কেহ জানিতে পারে না। আজ রুগ্‌ণশয্যায় চারুচন্দ্র নীরব প্রেমের অভিব্যক্তি বুঝিলেন। দেখিলেন, অর্দ্ধরাহুগ্রস্ত চাঁদের মত কুসুমের সে দেহ ম্লান হইয়া আসিয়াছে। শ্বেত প্রস্তর বাত্যাঘাতে যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চারুচন্দ্র সকলই বুঝিলেন—বুঝিলেন, তাঁহারই ব্যবহারে এ 'চারুপ্রতিমায় ঘুণ ধরিয়াছে।' অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ হইয়া

উঠিল। তখন চারুচন্দ্র কুসুমকে কাছে আসিয়া বসিতে বলিলেন। কুসুম উঠিয়া আসিল। তাহার বক্ষে মুখ রাখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে চারুচন্দ্র বলিলেন, "কুসুম আমাকে ক্ষমা করিবে?" কুসুম, "কি কর" বলিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। চারু থামিলেন না, বলিলেন, "কুসুম তোমার এ দশা কে করিল—আমিই ত। আমার ভুল ঘুচিয়াছে। যদি বাঁচি, এ ভুল শোধ্‌রাইব। পূজার ফুল—এ কুসুমের আদর করিব।"

কুসুমের চক্ষু জলে ভরিয়াছিল, সে চক্ষু মুছিয়া স্বামীর মাথা কোলে লইল; বলিল, "ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন আর কোন চিন্তা নাই, এখন তুমি ঘুমাও, এখনও রাত আছে।" কিন্তু চারুর আর নিদ্রা আসিল না।

* * * *

* * * *

চারু এখন বেশ সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু চাকুরীতে আর তার যাওয়া হইল না। তাহাদের মিলন এখন যেন মেঘান্তে জোৎস্না, শীতান্তে বসন্ত,—বড় মধুর। শুনিয়াছি, সে চারুকুসুমে এমন কীট আর স্পর্শে নাই।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়।

বর্ষায় প্রেম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বরষার সেই সমগ্র বিরাট্ সৌন্দর্য্য মেঘান্ধ আকাশের মত আমাদের হৃদয়ে ঘনাইয়া আসে এবং প্রাণকে একেবারে অসীমের কূলে উদাস করিয়া দেয়।

এই অসীমের ভাবই প্রেমকে জাগ্রত করিয়া তুলে।

প্রেমের মধ্যেও এই অসীমের ভাব আছে। সমস্ত সংসারের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে প্রেম আপনার যে সত্তা অনুভব করে, তাহা নিত্য-

নূতন—তাহা চিরসঞ্জীবিত! সমস্ত সৌন্দর্য্য,—সমস্ত ভাবে-প্রেমে তাহার প্রিয়জনের মূর্ত্তি অঙ্কিত করে এবং চরাচরের মধ্যে আপনার ছায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে অতি মোহন, অতি সুন্দর করিয়া তুলে। বর্ষায়ও ঠিক সেই ভাব আছে—তাই বর্ষার সঙ্গে প্রেমের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! তাই বুঝি—বরষায় প্রিয়জনকে ছাড়িয়া থাকিতে প্রাণ এত কাঁদে।

বিরহীর স্বতই মনে হয়—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

ধরণীর তৃষিত বিরহদগ্ধ হৃদয় যখন বর্ষা-সমাগমে মিলনের অতৃপ্ত আনন্দে নবীন ও সরস হইয়া উঠিয়াছে এবং এই মিলনোৎসবের ভিতর যখন বর্ষালক্ষ্মী লীলাকমলহস্তে, লোধ্র-পরাগ-পাণ্ডুরমুখে আলুলিত কৃষ্ণালকরাশিতে নবজাত কুন্দকুসুম দুলাইয়া চূড়াপাশে কুরুবক এবং কর্ণে সুচারু শিরীষ এবং সীমন্তদেশে কদম্ব-ফুলসাজ পরিয়া প্রিয়সম্মিলনের আনন্দ-উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার প্রভাব ধীরে ধীরে মানব-মনকে যে মিলনোৎসুক করিয়া তুলিবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে, এবং মনের উপর বাহিরের এই প্রভাবও সুপরিচিত।

মন যখন আপনার অভিমুখে এইরূপে আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার আবরণ খসিয়া পড়ে, অন্তঃপ্রকৃতি চরাচরের সঙ্গে সুরসামঞ্জস্যে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায়। অতৃপ্ত হৃদয়, আর্দ্র উদাস বায়ু, দূরাকাশে লক্ষ্যহারা মেঘরাশি, মেঘাণুপ্রকৃতি চঞ্চল মন মিলিয়া-মিশিয়া এক হইবারই কথা। আর এই সুরে সুরে মিলে বলিয়াই লক্ষ্যহারা হৃদয় বিদ্যুৎচকিত নির্জ্জন রাজপথে ভীতিবিহ্বলা ও আবেশচঞ্চলা অভিসারিকার মত প্রবাসী প্রিয়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রগাঢ় মিলনের মাঝেও বিরহ জাগাইয়া তুলে।

তখনই মিলনের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে এবং যে অলকা হইতে আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি, তথাকার অধিষ্ঠাত্রী শিশির-মথিতা পদ্মিনীর মত ক্ষীণা প্রেমময়ী সুন্দরী প্রিয়ার জন্য এক মর্ম্মান্তিক বিরহসঙ্গীত অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

সেইজন্যই যে প্রেম এতদিন হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে অতি গোপনে সুষুপ্ত ছিল, তাহা বর্ষার নববারিসিঞ্চনে যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। হৃদয়ের আবেগে লজ্জাসঙ্কোচ অনেকটা কমিয়া আইসে, আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান খসিয়া পড়ে। সেদিন আর গোপন করিবার কিছু নাই, এই পৃথিবীর নবচিত্রিত নাট্যশালায় আপনাদের কোনও নায়কনায়িকা বলিয়া ভ্রম হয় এবং মনে হয়, আমরা যেন আর সেই অতি পুরাতন নরনারী নহি,—সেই চিরপরিচিত সুখদুঃখ-সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ডুবিয়া নাই, তাহার স্থলে অজস্র নবীন ভাব ও নূতন চিন্তা আর্দ্র সিক্ত উদাস সমীরণের মত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং আমরা নবভাবে ও নবোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠি—"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমনি ঘনঘোর বরিষায়।" এতদিন যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, এই ঘনবরষার দিনে তাহাও বুঝিবার অবসর পাই। তখন অন্তরের মাঝে কোনও আবরণ থাকে না, হৃদয় তখন ব্যবধানমাত্র-শূন্য এবং সম্পূর্ণ নগ্ন। তখনই—প্রকৃতপক্ষে প্রিয়জনের জন্য 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' এই বাক্যের সার্থকতা অনুভূত হয়।

আর সেইজন্যই প্রেম বর্ষায় হৃদয়ের উপর এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, অন্য কোনও ভাব স্থায়ী হইবার অবসরমাত্র নাই, এবং সমস্তদিন ঘনঘটাচ্ছন্ন বিদ্যুৎ-চকিত ও বারিসিক্ত বর্ষায় মনুষ্য-হৃদয় যখন বিশ্বপ্রিয়ার বিরহে আকুলহৃদয়ে চরাচরের মধ্যে প্রিয়জনকে অনুসন্ধান করে, আর হৃদয়ের এই ভাবের সহিত মিলিত হইতে দেখিলেই যখন বলিয়া উঠে ;—

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে যায় পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

এবং তরি ভিড়াইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেও যখন সমস্ত সংসার ধ্বনিত হইতে থাকে——

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী,
আমারি সোণার ধানে গিয়াছে ভরি।"

তখন বিরহের গান ও দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া আর কি হইতে পারে?

তাই আমাদের দেশে এই ঘনবর্ষার দিনেই সমস্ত বিরহ সংহত হইয়া মহাকবির অমর মেঘদূতের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই "গগনে মেহ দারুণ" এবং "ঝন্ ঝন কুলিশপাতনশব্দের" সঙ্গে "দামিনী ঝলকিত" দেখিয়া রাধিকার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং "দশদিশ সবহুঁ আঁধিয়ারা" হইতে দেখিয়া রাধিকার "জরজর অথির পরাণ।" কোথাও "বাদর নিশি" দেখিয়া "প্রেমে ভাসল বৃন্দাবনবাসী", আবার কোথাও "ঝরত তুয়া বিনু রাই!" কোথাও তীব্র মিলনাশায় গোপাঙ্গনা-গণ সেই সূচিভেদ্য ঘনান্ধকারে চকিতচরণে অভিসারে চলিয়াছে, আবার কোথায় "তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী চিরবিজুরীপাতিয়া; মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।" এবং এই বর্ষার দিনে "দুঁহু দোঁহা বাঁধা ভুজপাশ।" ইহাতে মিলনও যেমনি নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, "আজু শমনদিন হোয় নবজলধর চৌদিকে বেঢ়ল ঘেরি জীউ নিকশয়ে মোর" রাধিকার এই উক্তিতে বিরহের ভাবও তেমনি সুস্পষ্ট।

তাই পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, আষাঢ়বর্ষার যে ভাব হৃদয়ে ছায়া বিস্তার করে, তাহার পূর্ণ পরিণতি ভরা ভাদরে।

আজিও যখন বর্ষে বর্ষে "আষাঢ়স্য প্রথমদিবস" হইতে মেঘরাশি আমাদের মানসকাননের শত জীর্ণশাখার উপর অজস্র জলরাশি বর্ষণ করে, তখন তাহাও বর্ষার কবিতা ও গানগুলি সেথায় কুসুমে কুসুমে

ভরিয়া উঠে। আজিও বর্ষায় রাজসাহী অঞ্চলের "জাগের গানে" এবং বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে "হিন্দোলা" হইতে কামিনীর কলকণ্ঠ-নিনাদিত "কাজলী গানে" প্রেমমিলনবিরহবাথা অন্তরের বিচিত্র রাগিণীতে উচ্ছ্‌সিত হইয়া উঠিতেছে। এই বর্ষাকে বাদ দিলে আমাদের কাব্যকলা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, এবং প্রেম অনেকটা নির্জ্জীব হইয়া পড়ে—আমাদের মনের সঙ্গে ইহার এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

প্রেমের একএকটা ভাব এইরূপে এক এক সময়ে বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে—তাহা মনের সঙ্গে রঙে ও ভাবে ঠিক মিশ খায়।

আমাদের কবিরা প্রকৃতির মধ্যে এই প্রাণের সন্ধানটুকু পাইয়াছিলেন, তাই এক এক সময়ে তাঁহারা প্রেমের এক একটা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন।

তাই আমাদের দেশে বর্ষা ও শরতের কবিতায় অনেক পার্থক্য এবং মাস, ঋতু ও প্রহর ভেদে বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি!

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

চিত্রকরের খেদ।

বৈশাখী প্রাতে চম্পক হাসে
উজলিয়া দশদিশি,
বকুলবালিকা খেলে কত খেলা
ধূলি-পাতা সনে মিশি।
আবছায়ে বসি যূথীজাতিগুলি
কত উপকথা বলে,
সুন্দরী উষা পরাইয়া দেয়
নীহারমালিকা গলে।

তোমারও সহাস কচি মুখখানি
সরল নয়ন ছুটি
নন্দনবনে পারিজাতসম
অজ্ঞাতে উঠে ফুটি'।
বনগো[illegible]ানি তব রূপরাশি
রাখিতে পারে না ঢাকি,
আমি চিত্রে সে রূপ ফুটাতে পারিনে
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি,
শুধু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি।

(২)

ওগো বর্ষায় যবে ঝমঝম রবে
মেদুর জলদজালে
ম্লান শোভা ঢাকা ধরণীর বুকে
পীযূষের ধারা ঢালে,
ভাঙা-ঘুমঘোরে চমকিয়া উঠে
বিহ্বলা বিজলীবালা,
বহে শনশনে ক্ষুব্ধ পবন
মালতী সুরভি-ঢালা,
পাণ্ডু কপোল কুমুদিনী একা
দীর্ঘ রজনী ধরি
নয়নের জল ফেলে বিষাদিনী
পরাণসখারে স্মরি,
বেতসকুঞ্জে থাক বসি তুমি
লয়ে ছলছল আঁখি

আমি চিত্রে সে রূপ ফুটাতে পারিনে
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি,
শুধু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি।

(৩)

ওগো শরতনিশায় নীলিম আকাশে
শুভ্র শীতল শশী
প্রেমপ্রস্ফুট কুমুদিনীপানে
চেয়ে থাকে একা বসি ;
দু'একটি তারা মিটিমিটি চায়
সেফালিগুচ্ছ হাসে,
কহ্লার-ভরা সরসীতে হায়!
লুকায় নলিনী ত্রাসে ;
শৈশবমায়া কাটায়ে তখন
ডুব নব অনুরাগে,
বিষাদমধুর কি এক অভাব
উদ্বেল হৃদে জাগে ;
চঞ্চল আঁখি চকিত সলাজ,
উঠ বস থাকি থাকি,
আমি চিত্রে সে রূপ ফুটাতে পারিনে
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি,
শুধু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি।

(৪)

ওগো হেমন্তে যবে সুধাসিঞ্চিত
ক্ষুদ্র ধরণীখানি
শ্যামল বসন লয় গো সরমে
বক্ষমাঝারে টানি,

পশে গো প্রথম শ্রবণে তোমার
মদালস প্রেমগান,
রাখিতে পার না আপনার বশে
অধীর অবশ প্রাণ,
নয়নে নয়ন মিলিলে অমনি
সরমে মরিয়া যাও ;
চলে যেতে চাও চলে না চরণ,
ফিরিয়া ফিরিয়া চাও,
নিরখি তোমার মাধুরী অপার
মুগ্ধ হইয়া থাকি ;
আমি চিত্রে সে রূপ ফুটাতে পারিনে
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি,
শুধু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি।

(৫)

ওগো শীতের প্রথমে কুন্দকুসুম
রূপসী গোলাপবালা
আধভাঙা লাজে করে গো যখন
অলিসনে হাসিখেলা ;
চুরী করে-চাওয়া চুপি-চুপি-কথা
অধরলগ্ন হাসি
যৌবন সাথে ধীরে ধীরে আসে
সময়ের স্রোতে ভাসি।
নিশাসমাগমে দুরুদুরু হিয়া
চলে না চরণ তব,

লজ্জা-বাঁধন পদে পদে বাঁধে
সে শোভা কেমনে কব,
কত ভাব উঠে হৃদয়ে তোমার,
কত কথা বলে আঁখি ;
আমি চিত্রে সে রূপ ফুটাতে পারিনে
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি,
শুধু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি।

(৬)

যবে মাধবী প্রভাতে তপন উদয়ে
সূর্য্যমণিটি রাগি,
চুম্বন লভি, লোহিত গণ্ড
সরমে ওঠে গো জাগি,
যৌবনলেখা উথলিয়া উঠে
তোমার নয়নকোণে
অলক গুচ্ছ টুটে যায় যদি
বাঁধিতে থাকে না মনে,
বসে থাক তুমি পুষ্পবাসরে
সোণার প্রতিমাখানি,
শ্যামল নিচোল ক্ষণে সরে যায়
ক্ষণে লহ বুকে টানি,
মুগ্ধা আপনি আপনার রূপ
রাখিতে পার না ঢাকি,
আমি চিত্রে সে রূপ ফুটাতে পারিনে
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি
শুধু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জাগ্রত স্বপন।

শারদ যামিনী মাতিছে পুলকে
বসে আছি আমি একা
হৃদয়মাঝারে সেই মুখখানি
নীরবে দিতেছে দেখা।
পরিমলবাহী মৃদু সমীরণ—
গাহিছে উদাস গান,
উঠিছে পরাণে স্বপনের মত
বিষাদমধুর তান।
তটিনীর তীরে ডাকিছে চকোর
বিরহে পাগলপারা,
রোদনের ধ্বনি মরমে পশিছে
করিছে আপনা-হারা।
হাসিতেছে বিধু আপনার মনে
ধূসর বিটপি-শিরে,
আমি হৃদিমাঝে চাহি একবার
চাঁদপানে চাহি ফিরে।
হেনকালে দূরে ডাকিল বিহগ
কি এক ললিত তানে
ভুলিয়া গেলাম ক্ষণতরে সব,
চাহিনু তাহার পানে।
ফিরিয়া দেখিনু বিটপী আঁধার
কোথায় গিয়াছে শশী!
হৃদয়ের চাঁদ খুঁজিয়া দেখিনু
তাহাও গিয়াছে খসি।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন।

অলঙ্ঘ্য।

আমি যদি হইতাম নিম্ন-নিম্নতম
শ্যাম ওই উপত্যকাপ্রায়
তুমি হতে স্বর্গসম উচ্চ প্রিয়তম
উচ্ছলিত বিশ্ব, মহিমায়,
তবু—তবু প্রেম মম বিমুক্ত স্বাধীন
চরণ রেণুতে তব রহিত বিলীন।
আমি যদি হইতাম মেদুর, মধুর,
স্নিগ্ধ, কান্ত, সমীরণ সম,
তুমি হ'তে তৃণ-সম মৃদুল, ভঙ্গুর,
অসহায়, দীন, হীনতম,—
তবু—তবু প্রেম মম ওগো স্নেহাধার!
আত্মহারা, ও উরসে করিত সঞ্চার।
আমি যদি হইতাম গগন উদার,
তুমি হতে শ্যামা বসুমতী,
কোটি পূর্ণচন্দ্রে সাজি, নয়নে তোমার
বহাতাম শোভা-স্রোতস্বতী।
যেথা রবে, যাহা রবে, হে প্রেম-পাথারি!
তোমাতে মিশায়ে রবে সর্ব্বস্ব আমার।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

আকারমাত্রিক স্বরলিপির চিহ্নাবলী।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন=সপ্তক।

২। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন—সুরের নীচে হসন্ত এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন সুরের মাথায় রেফ্।

৩। কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ; কড়ি ম=ক্ষ; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ।

৪। তালি-বিভাগের চিহ্ন পাশে এক-একটি দাঁড়ি।

৫। ১, ২, ৩, ০ ইত্যাদি তালি ও ফাঁকের অঙ্ক; যে অঙ্কের মাথায় রেফ্, তাহাই সম।

৬। তালের এক ফের হইয়া গেলে, দাঁড়ির স্থলে I এইরূপ চিহ্ন থাকে।

৭। একমাত্রার চিহ্ন=।; অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন=:; সা=একমাত্রা; সা-া=দুইমাত্রা; সা-া-া=তিনমাত্রা। দুইটি সুর যদি একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ লিখিত হয়, যথা সরা; তিনটি সুর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে এইরূপ লিখিত হয়, যথা সরগা; চারিটি সুর, যথা সরগমা ইত্যাদি।

৮। যদি কোন আসল সুরকে কোন নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক সুর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেটি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়।

৯। স্বরবর্ণ অবলম্বন করিয়া সুরের যে টান চলে, তাহাকে "আশ" বলে। আশের চিহ্ন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে "হাইফেন্"-চিহ্ন।

১০। প্রতি কলির আগে ও শেষে যুগল I I স্তম্ভচিহ্ন বসে। কলির শেষ হইলেই আস্থায়ীর যুগল I I স্তম্ভচিহ্ন হইতে ফের আরম্ভ করিতে হয়।

১০। আস্থায়ীর যেখানে থামিয়া অন্য কলি ধরিতে হয়, তাহার মাথার উপর যুগল দাঁড়ি বসে।

১১। পৌনরুক্তির চিহ্ন = { }।

১২। পৌনরুক্তিকালে কতকগুলি সুর ডিঙাইয়া যাইবার চিহ্ন ( ); দৃষ্টান্ত যথা ;—

{ সা রা গা (মা পা) } মা ধা ; অর্থাৎ প্রথমবারে সা হইতে পা পর্য্যন্ত গাইতে হইবে, এবং দ্বিতীয়বারে সা হইতে গা পর্য্যন্ত গাহিয়া (মা পা) এই দুই সুর ডিঙাইয়া মা ধা ধরিতে হইবে।

১৩। মীড়ের চিহ্ন =

মায়ার-খেলা।

গীতিনাট্য।

প্রথম দৃশ্য।

মায়া-কুমারীগণ।

মিশ্র-পিলু—একতালা।

সকলে।—(মোরা) জলে-স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা।—(মোরা) স্বপনরচনা করি অলসনয়ন ভরি।

দ্বিতীয়া।—গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া।—(মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে!

প্রথমা।—দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে আধ তানে ভাঙা গানে

ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।

সকলে।—মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া।—নর-নারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়া-পাশে।

তৃতীয়া।—কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।

প্রথমা।—মায়া ক'রে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,

আনি মান-অভিমান!

দ্বিতীয়া।—বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী!

সকলে।—মোরা মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা।—চল সখি চল!

কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল!

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া।—নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল

প্রমোদে কাটাব নব-বসন্তের রাতি।

সকলে।—মোরা মায়াজাল গাঁথি।

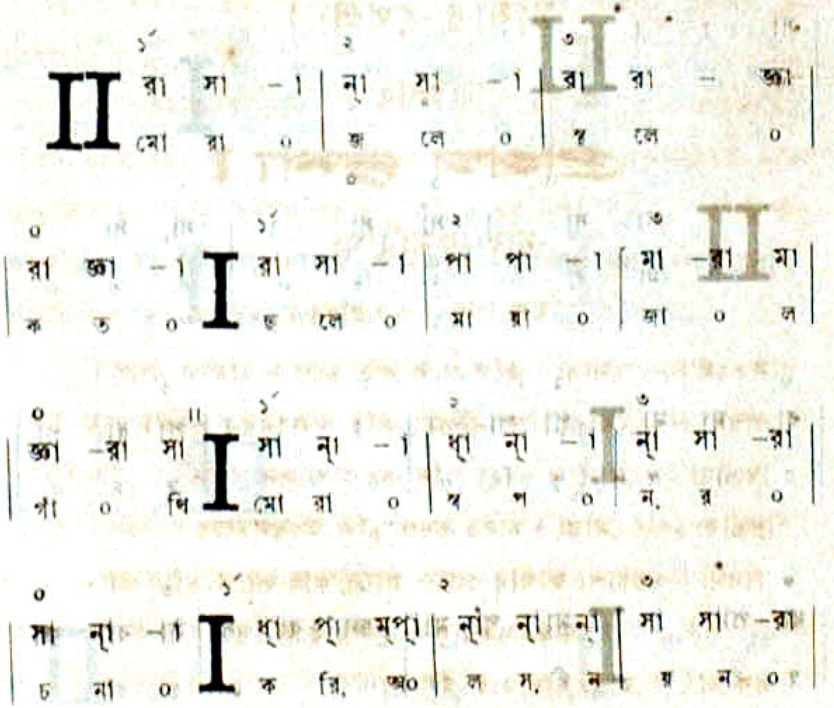

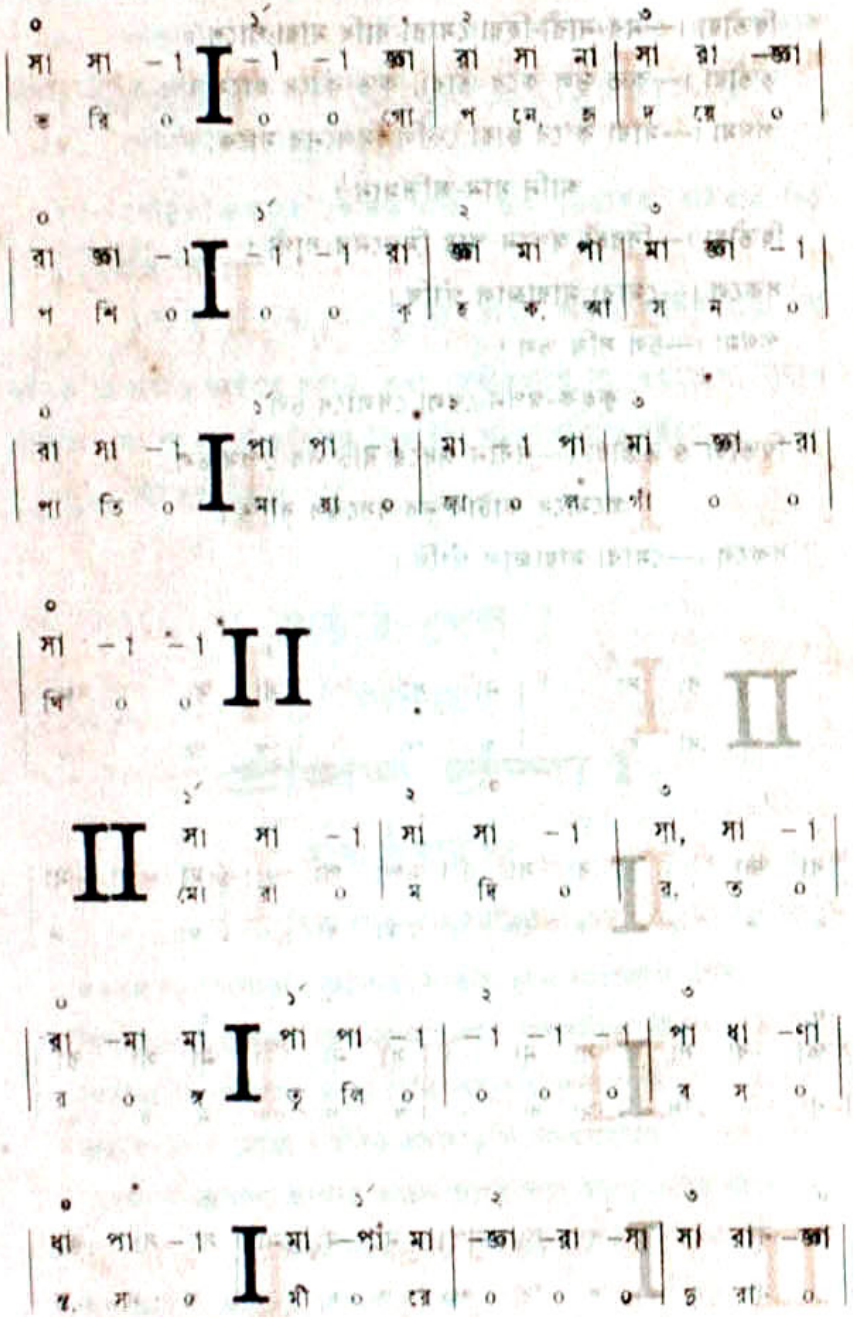
০ ১´ ২ ৩
সা সা –। I –। –। জ্ঞা | রা সা না | সা রা –জ্ঞা |
ত রি ০ I ০ ০ গো | প নে, ভ | দ রে ০ |
০ ১´ ২ ৩
রা জ্ঞা –। I –। –। রা | জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা –। |
প শি ০ I ০ ০ কু | ষ্ণ কা | স ন ০ |
০ ১´ ২ ৩
রা সা –। I পা পা –। | মা –। পা | মা –জ্ঞা –রা |
পা তি ০ I মা রা ০ | জা ০ ল | পা ০ ০ |
০
সা –। –। II
খি ০ ০
II ১´ ২ ৩
সা সা –। | সা সা –। | সা, সা –। |
মো রা ০ | ম দি ০ | র, ত ০ |
০ ১´ ২ ৩
রা –মা মা I পা পা –। | –। –। –। | পা ধা –ণা |
র ০ ঙ I তু লি ০ | ০ ০ ০ | ব স ০ |
০ ১´ ২ ৩
ধা পা –। I মা –পা মা | –জ্ঞা –রা –সা | সা রা –জ্ঞা |
শু, ন ০ I মী ০ রে | ০ ০ ০ | ভ রা ০ |

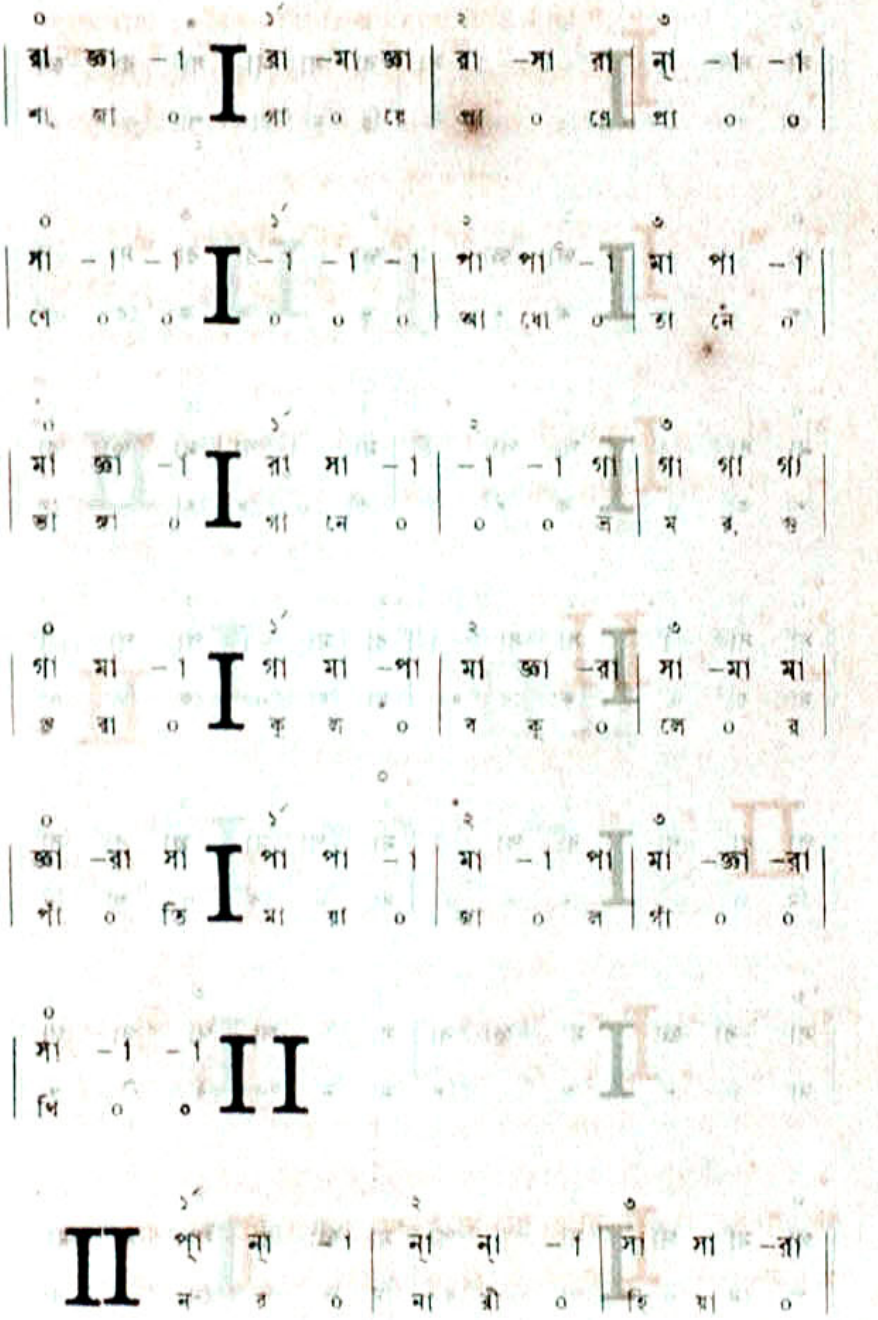
০ ১´ ২ ৩
রা জ্ঞা –। I রা –মা জ্ঞা | রা –সা রা | না –। –। |
শা, ন্তা ০ I গা ০ দে | প্রা ০ গে | প্রা ০ ০ |
০ ১´ ২ ৩
সা –। –। I –। –। –। | পা পা –। | মা পা –। |
গে ০ ০ I ০ ০ ০ | আ ধো ০ | তা নে ০ |
০ ১´ ২ ৩
মা জ্ঞা –। I রা সা –। | –। –। গা | গা গা গা |
ভা ঙ্গা ০ I গা নে ০ | ০ ০ ল | ম র, গু |
০ ১´ ২ ৩
গা মা –। I গা মা –পা | মা জ্ঞা –রা | সা –মা মা |
ঙ রা ০ I কৃ ল ০ | ব কৃ ০ | লে ০ র |
০ ১´ ২ ৩
জ্ঞা –রা সা I পা পা –। | মা –। পা | মা –জ্ঞা –রা |
পাঁ ০ তি I মা রা ০ | জা ০ ল | পা ০ ০ |
০
সা –। –। II
খি ০ ০
II ১´ ২ ৩
পা না –। | না না –। | সা সা –রা |
ন র ০ | মা রী ০ | শি য়া ০ |

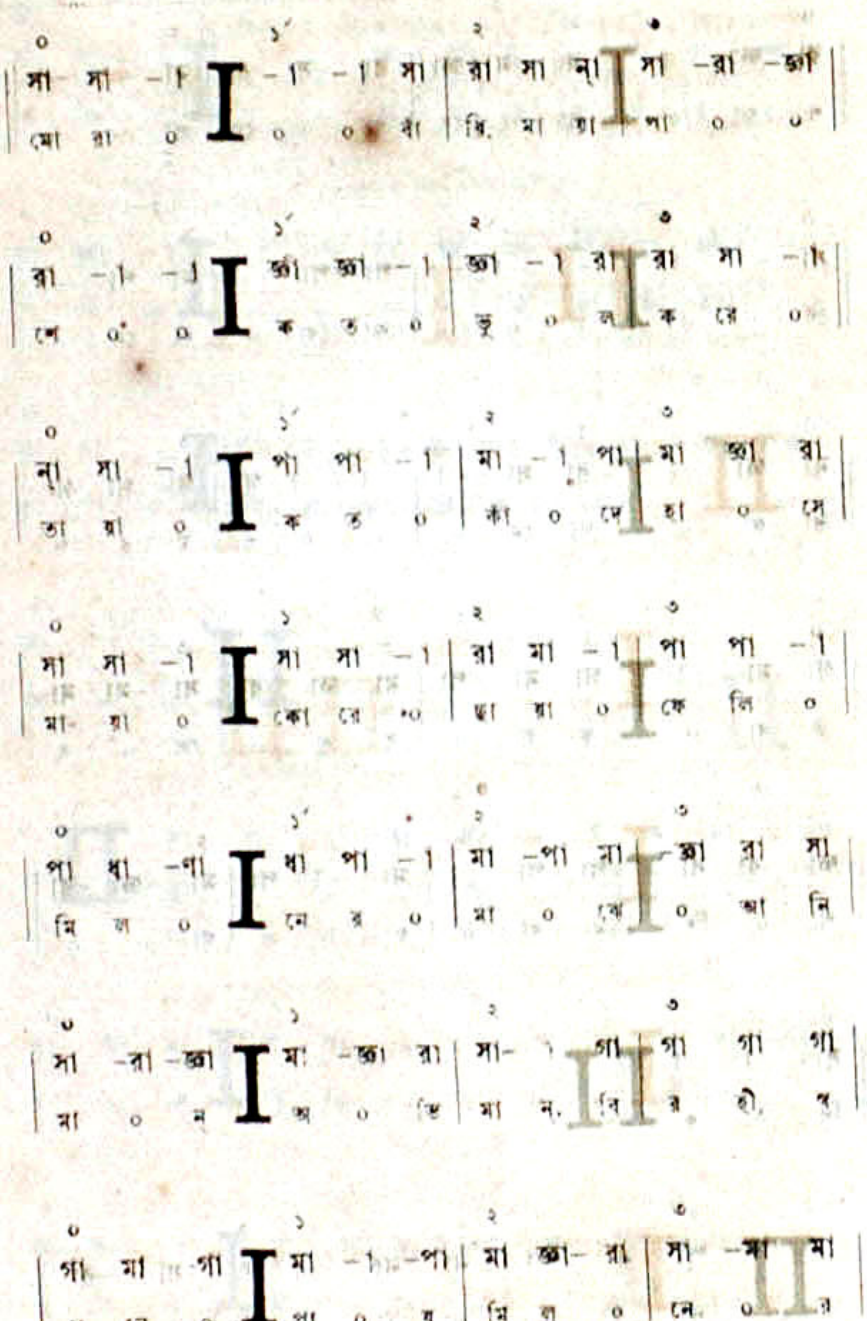
০ ১ ২ ৩
সা সা –। – । – । সা | রা সা ন্। সা –রা –জ্ঞা
মো রা ০ ০ ০ রা | ধি মা হা – পা ০ ০
০ ১ ২ ৩
রা –। –। জ্ঞা জ্ঞা –। | জ্ঞা –। রা | রা সা –।
শে ০ ০ ক ত ০ | ভু ০ ল | ক রে ০
০ ১ ২ ৩
ন্। সা –। পা পা –। | মা –। পা | মা জ্ঞা রা
তা রা ০ ক ত ০ | কা ০ দে | হা ০ সে
০ ১ ২ ৩
সা সা –। সা সা –। | রা মা –। | পা পা –।
মা রা ০ কো রে ০ | ছা রা ০ | কে লি ০
০ ১ ২ ৩
পা ধা –ণা ধা পা –। | মা –পা মা | –জ্ঞা রা সা
মি ল ০ নে র ০ | মা ০ খে | ০ আ নি
০ ১ ২ ৩
সা –রা –জ্ঞা মা –জ্ঞা রা | সা– । গা | গা গা গা
মা ০ ন অ ০ ভি | মা ন. | বি র হী ন
০ ১ ২ ৩
গা মা গা মা –। –পা | মা জ্ঞা– রা | সা –মা মা
প নে ০ পা ০ র | মি ল ০ | নে. ০ র

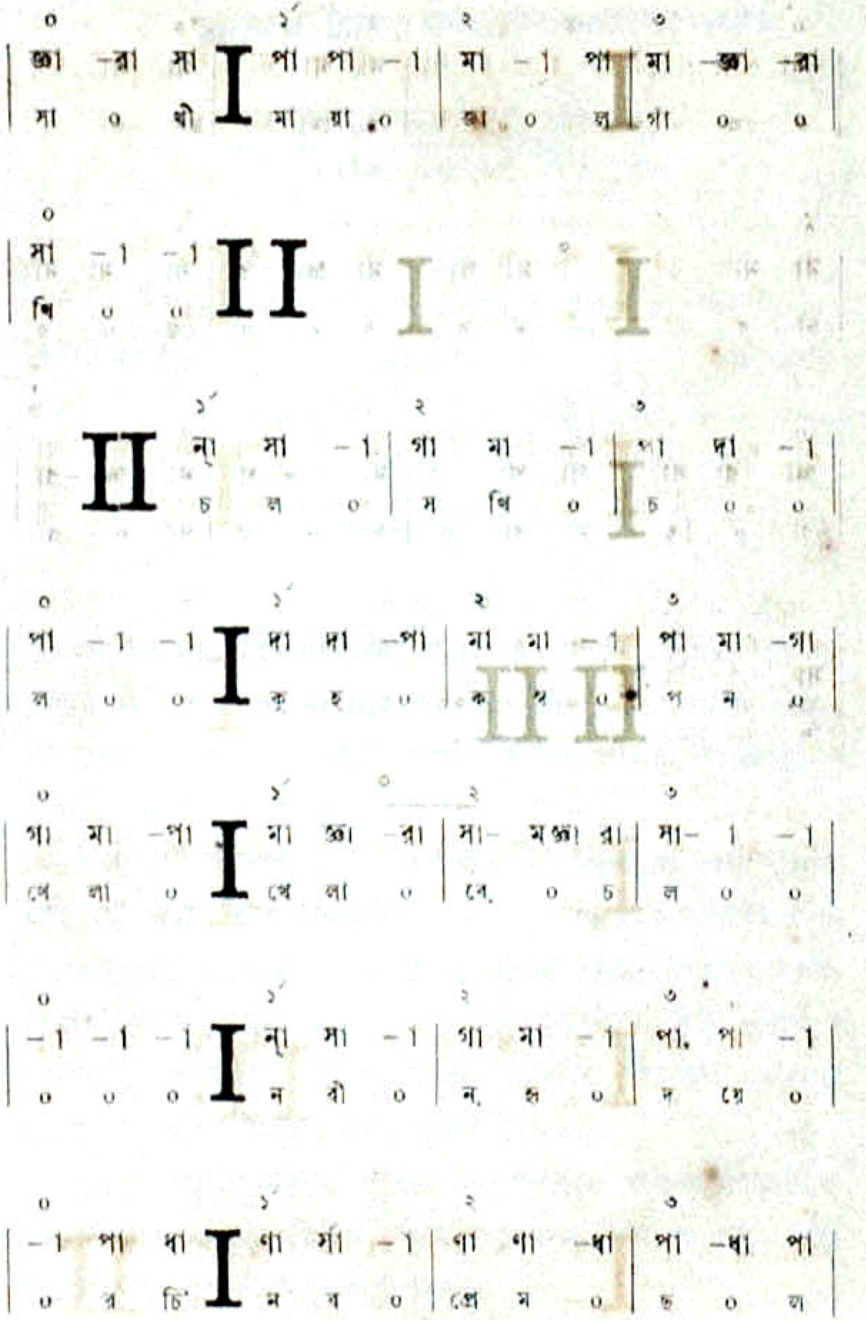
০ ১ ২ ৩
জ্ঞা –রা সা পা পা –। | মা –। পা | মা –জ্ঞা –রা
সা ০ খী মা রা ০ | জ্ঞা ০ লু | গা ০ ০
০
সা –। –।
খি ০ ০
১ ২ ৩
ন্। সা –। | গা মা –। | পা দা –।
চ ল ০ | স খি ০ | চ ০ ০
০ ১ ২ ৩
পা –। –। দা দা –পা | মা মা –। | পা মা –গা
ল ০ ০ কু হ ০ | ক ষ ০ | প ন ০
০ ১ ২ ৩
গা মা –পা মা জ্ঞা –রা | সা– মজ্ঞা রা | সা– । –।
খে লা ০ খে লা ০ | বে. ০ চ | ল ০ ০
০ ১ ২ ৩
–। –। –। ন্। সা –। | গা মা –। | পা. পা –।
০ ০ ০ ন বী ০ | ন. ধ্র ০ | দ য়ে ০
০ ১ ২ ৩
–। পা ধা ণা র্মা –। | ণা ণা –ধা | পা –ধা পা
০ র চি ন ব ০ | প্রে ম ০ | ছ ০ ল

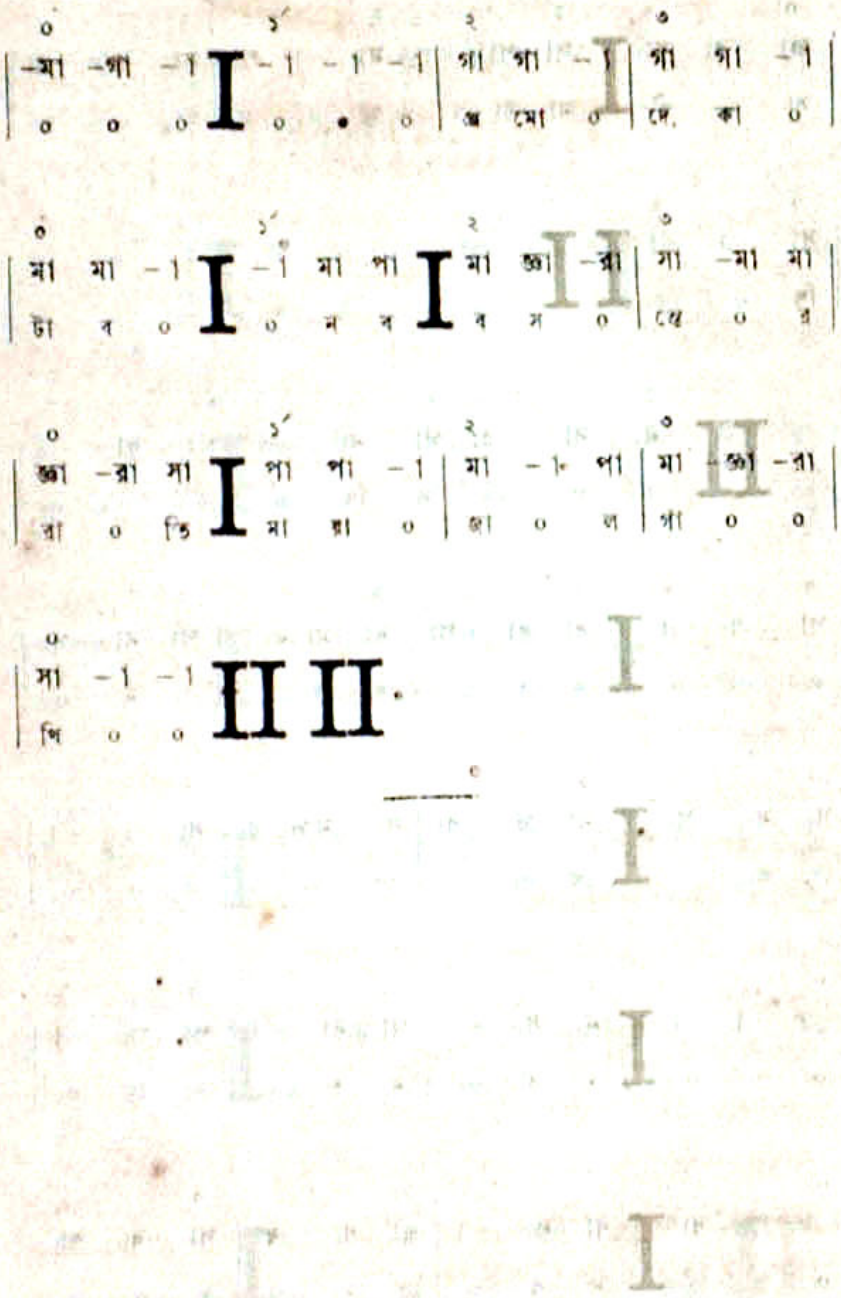

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ | ১৩০৯। | ৯ম সংখ্যা

গার্ড ভূত।

১

শনিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় আপিষ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ধূলিধূসরিত আলপাকার চাপকান ও ঘর্ম্মশিক্ত কামিজটি খুলিয়া রাখিতেছি, এমনসময় প্রভাসকুমার আসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, আজ একজায়গায় যাবেন ?"

বলিয়া রাখি, আমার বয়স পয়তাল্লিশ মাত্র। বাস্তবিক আমি ঠাকুর-দাদা হই নাই, তবে কলিকাতার একটা ষ্টুডেণ্ট-মেসে বা ছাত্রাবাসে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়াছিলাম বলিয়া মেসের সমস্ত যুবকেরা আমাকে আদর করিয়া "ঠাকুরদাদা" বলিয়া ডাকিত। আর এপ্রকার একটা হাস্তকৌতুকের মিষ্টসম্বন্ধ না পাতাইলে বয়োবৃদ্ধ লোকের ছাত্রদের মেসে থাকিবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

বর্ণিস্-চামড়ার তালিযুক্ত পুরাতন প্যানেলার পাদুকাজোড়াটিকে পদচ্যুত করিয়া আমি বলিলাম, "যদি আহারের নিমন্ত্রণে হয়, তাহা হইলে এখনি প্রস্তুত, অন্যথা পরে বিবেচ্য।"

এই বলিয়া আমার কেওড়া-কাঠের তক্তপোষের নীচে হইতে সুমার্জ্জিত গাড়ু ও ঈষৎসিক্ত গাত্রমার্জ্জনী বাহির করিয়া গৃহের বাহিরে গিয়া পায়ে হাতে জল দিলাম। ইত্যবসরে প্রভাসকুমার আমার জন্য তামাকু সাজিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া এক হাতে পাখা ও অপর হাতে হুঁকা লইয়া শ্রম অপনয়ন ও কলিকার আগুণ উদ্দীপ্ত করিতেছি, এমন সময়ে বাসার ঝি একটা বাটির ভিতরে শালপাতার ঠোঙাসুদ্ধ চারিপয়সার খাবার ও একগ্লাস জল আনিয়া তোরঙ্গের উপর রক্ষা করিল।

আমি জলযোগ করিয়া আমার চাপকানের পকেট হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে আফিমের ভুক্তাবশেষ একটি অর্দ্ধশুষ্ক তাম্বুল গ্রহণ করিয়া প্রভাসকে বলিলাম, "কোথায় যেতে হবে?"

"এসে বল্‌ছি"

এই বলিয়া প্রভাস আমার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি আপন মনে ধূমপান করিতে করিতে ভাবিলাম, ছেলেগুলা আজ থিয়েটারে যাবে বুঝি, তাই আমার এত খাতির। আমাকে খাতির করিবার একটু কারণও ছিল, আমি তাহাদের ঠাকুরদাদা হইলেও তাহাদের অভিভাবক ছিলাম। তাহারা আমার সাক্ষাতে পরস্পরে ইয়ারকি দিত, কিন্তু আমি তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বা পাঠে অমনোযোগী হইতে দিতাম না। আমি মেসের ম্যানেজার ছিলাম, সেইজন্য থিয়েটার বা সার্কাসে যাইতে হইলে আমাকে আগে জানাইত, নচেৎ সকালে সকালে খাইতে পাইত না।

৩।৪ মিনিট পরে প্রভাস, সনৎ, চারু, বীরেন ইত্যাদি একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র লইয়া আবার আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। আসিয়াই কাগজে নীলপেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটা অংশ আমাকে পাঠ করিতে দিল। কাগজখানি উল্টাইয়া দেখিলাম, ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্! সেদিন ১৩ই সেপ্টেম্বর, সুতরাং কাগজখানি ৩ দিনের পুরাতন। চিহ্নিত অংশের উপর লেখা আছে—"The Chandernagore ghost story." যাহা পড়িলাম, তাহার অর্থ এই যে, চন্দননগর ষ্টেশনের উত্তরদিকে ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের নিকট একটা ভূত রাত্রে আলোক দেখায় অনেকে এই আলো দেখিয়াছে। লেখকমহাশয়ও স্বচক্ষে এই আলোক দেখিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ যে, প্রথম রেল খুলিবার সময় একজন গার্ডসাহেব এই ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের নিকট হত হয়। সে-ই ভূত হইয়া রাত্রে আলোক দেখায়। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলে আলোক বা আলোকধারী, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসায় ছেলেরা খেপিয়াছে—আজ তাহারা ভূত দেখিতে যাইবে। আমার অনুমতি এবং সাহচর্য্য তাহারা প্রার্থনা করে। আমার নিজের বিষয় একটু বলিয়া রাখি। আমি শ্রীহীরালাল মিত্র স্বয়ং ভূত মানি, কিন্তু ভূতকে ভয় করি না। কথাটা আত্মশ্লাঘা নহে, কিন্তু কেন জানি না, ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকিলেও ভূতের ভয় আমার বিন্দুমাত্র নাই। আমাদের মেসে ৩।৪জন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিল, তাহারা মড়া কাটে, মড়ার হাড় লইয়া নাড়াচাড়া করে এবং অসংখ্যভূত সমাকুল কলেজ হাঁসপাতালে রাত্রিজাগিয়া নাইট্-ডিউটি করে, সেইজন্য তাহারা ভূত মানিত না। তাহারা আমার নিকট ভূতের গল্প শুনিয়া হাসিয়া উঠিত এবং সে সকল আমার কল্পনাপ্রসূত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিত। জ্যামিতির "বিন্দু" কল্পনা করিয়া তাহার উপর এতবড় একটা অঙ্কশাস্ত্র গঠন করিতে পারে, কিন্তু ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জগতের কত দুর্ব্বোধ্য রহস্য মীমাংসা করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। সেখানে তাহারা নানারূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। "স্নায়বিক বিকার" এবং "দৃষ্টিবিভ্রম"

এই দুইটায় জগতের সাড়ে-পনেরো-আনা ভূত তাড়াইয়াছে। আমি মনে করিতাম, একবার একটা সুবিধা পাইলে ইহাদিগকে দেখাই, ভূত আছে কি না?

আমি প্রতি শনিবার বাড়ী যাইতাম না। বেতন পাইলে মাসে একবার করিয়া বাড়া যাইতাম সেইজন্য মনে করিলাম, আজ একবার ভৌতিক ব্যাপারটা দেখিয়া আসি। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আজ থাক্, শনিবারের রাত্রি, বারটা ভাল নয়।"

আমার আপত্তি শুনিয়া সকলে একেবারে হোহো রবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ঠাকুরদাদা এতদিন মরা ভূতের গল্প করিতেন, আজ জীয়ন্ত ভূতের কথায় ভয় পেয়েছেন। তা হবে না, আজ ঠাকুরদাদাকে নিয়ে যেতেই হবে। আমরা ভূতের ভাষা বুঝি না, আজ আপনাকে আমাদের ইণ্টারপ্রিটার হতে হবে।"

আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেবল তাহাদিগকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিলাম অবশেষে আমাদের যাওয়াই স্থির হইল। পাচককে ডাকিয়া সকালে সকালে আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। ছেলেরা ভূত ধরিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। বর্ষাকাল, সকলেই ছাতি লইল। কাহারও লাঠি ছিল না, দুই একজনের সূক্ষ্ম ষ্টীক্ ছিল, কিন্তু তাহা ভূত ধরিবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নহে। ডাক্তারীনবীশেরা গোপনে ছুরি সঙ্গে লইল। বোধ হয় তাহারা মনে করিয়াছিল, ভূত তাহাদের নিকট হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া থাকিবে, আর তাহারা অবাধে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ছুরি চালাইয়া তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিবে। একজন একটা অপেরাগ্লাস সঙ্গে লইল। আমাকে বলিল—"ঠাকুরদাদা, ভূত ধরিবার জন্য কিছু যন্ত্র লইবেন না?"

আমি বলিলাম—"যন্ত্র আমার সঙ্গে আছে।"

সনৎকুমার বলিল, "কি যন্ত্র?"

আমি বলিলাম, "বিশ্বাস, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তি।"

আমার কথা শুনিয়া তাহারা-আবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদার বুজরুকিটুকু খুব আছে।"

২

সাড়ে সাতটার ট্রেণে যাইব বলিয়া সকলে বাহির হইয়াছিলাম। হাবড়া-ষ্টেশনে প্রবেশ করিবামাত্র সাড়ে সাতটার গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমরা অগত্যা আবার একঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। এই একঘণ্টা কেবল ভূতের গল্প লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়িল। মধ্যশ্রেণীতে আমরা আশ্রয় লইলাম। আমরা দলে সাতজন ছিলাম। আরও ৬।৭ জন আফিসের বাবু মধ্য-শ্রেণীতে ছিলেন। বালি হইতে একটি একটি করিয়া কমিয়া অবশেষে শ্রীরামপুরে একজনমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। যিনি রহিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয় কোথায় যাইবেন?"

"চন্দননগর।"

একটু সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্টেশনে এই ভৌতিক ব্যাপারের কথা কিছু জানেন?"

"নিজে বিশেষ কিছুই জানি না। গুজব ত নানাপ্রকার শুনিতে পাই। কাল বুঝি না পরশু একখানা মালগাড়ি দাঁড় করাইয়াছিল।"

তিনি আর কিছু জানেন না। আমরাও এই নিদ্রালু প্রৌঢ় কেরাণী-বাবুটিকে অধিক বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না। সাড়ে নয়টার পর আমরা চন্দননগরে উপস্থিত হইলাম। সেই বাবুটি এবং তৃতীয়-শ্রেণী হইতে আরও ১০।১২ জন আফিসের বাবু গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। গাড়িটা প্রায় খালি হইয়া গেল। গাড়িটা হুগলি পর্য্যন্ত যাইবে, সুতরাং হুগলির ১০।১৫জনমাত্র আরোহী গাড়িতে রহিয়া গেল। আমরা যখন গাড়ি হইতে নামিলাম, তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমাদের সহযাত্রী

কেরাণীবাবুটির বাড়ী হইতে একজন খোট্টা ভৃত্য লণ্ঠন লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। মনিবকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে কোরিয়ার-ব্যাগ এবং একটা পুঁটুলি গ্রহণ করিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া নামিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে আমরা টিকিটবাবুকে টিকিট দিয়া প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া রহিলাম। টিকিটবাবু বোধ হয় মনে করিলেন, আমরা বৃষ্টির ভয়ে দাঁড়াইলাম। গাড়িখানা ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আমরাও টিকিটবাবুর লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেল্ লাইন পার হইয়া পূর্ব্বদিকের প্ল্যাট্‌ফরমে উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, একবার ষ্টেশন্‌মাষ্টারের সহিত দেখা করিয়া কিছু সন্ধান লওয়া যাক্।

ষ্টেশন্‌মাষ্টারের আফিষে মাষ্টারবাবু বসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে, তিনি আমাকে দলের চাঁই দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"বসুন, কিছু আবশ্যক আছে?"

তাঁহার ভদ্রতায় আমি আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—"বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই, আমরা কলিকাতা হইতে ভূত ধরিতে আসিয়াছি।"

তিনি সহাস্যে বলিলেন—"আপনাদের ঝোঁক মন্দ নহে, এই দারুণ বর্ষায় কলিকাতা হইতে ভূত দেখিতে আসিয়াছেন? হয় ত আজ দেখিতে পাইবেন না। কাল ২জন সাহেব এবং ১০।১২জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, কাল ভূত দেখা দেয় নাই।"

প্রভাস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপারটা কি সত্য?"

"কোন্ ব্যাপারটা? আলোটা না ভূতটা?"

"ভূতটাই?"

"আলোটা সত্য আমি দেখিয়াছি এবং ষ্টেশন-ষ্টাফের সকলেই দেখিয়াছে; কিন্তু সেটা ভূত কি না, তাহা আপনারাও যেমন জানেন, আমিও তেমনি জানি। তবে গল্পগুজব নানাপ্রকার শুনিতে পাই, সে সকল বাজে কথা।"

আমরা মাষ্টারবাবুর সহিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়াই উত্তরদিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া দেখাইলেন—"ওই ভূত দেখুন।"

আমরা সকলে মহাকৌতূহলী হইয়া উত্তরদিকে ডিষ্ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, লাইনের ধারে একটা বেশ উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। উপরের সিগ্‌ন্যালের মাথায় নক্ষত্রের মত দুইটা আলো জ্বলিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ আলোটা, নীচের না উপরের?"

"উপরে ত সিগ্‌ন্যালের আলো। নীচের আলো আমরা জ্বালি নাই, প্রত্যহ থাকে না এবং সমস্তরাত্রিও থাকে না, হয় ত এখনি অদৃশ্য হইতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে ও আলো কতদূর?"

"অনেকটা, প্রায় আধমাইল হইবে। কেন? আপনি যাইবেন নাকি?"

"ইচ্ছা করিতেছি!"

"আপনি পাগল হইয়াছেন? এই মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, তা ছাড়া লাইনে ভয়ানক সর্পভয়। বর্ষাকালে প্রায় প্রত্যহ গাড়ির চাকায় সাপ কাটা যায়। ভূতের হাতে পড়িবার পূর্ব্বেই সাপের মুখে পড়া সম্ভব; আপনি হয় ত ভিজিতে ভিজিতে অর্দ্ধেক পথ যাইবেন, আর হয় ত আলোক অদৃশ্য হইবে।"

এমনসময় আমরা দেখিতে পাইলাম, সেই নীচের আলোটা লাইনের ধার ছাড়িয়া লাইনের ঠিক মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমার ঔৎসুক্য বড়ই বাড়িয়া উঠিল। দেখিলাম, ষ্টেশন্‌মাষ্টার মহাশয় ভদ্রতার খাতিরে আমাদিগকে এই বিপৎসঙ্কুল স্থানে যাইতে দিবেন না, অথচ আমরা যাইব বলিয়াই কলিকাতা হইতে আসি-

য়াছি। বড় মুস্কিলে পড়িলাম, তিনি অনুমতি না দিলে আমরা লাইনের ধার দিয়া যাইতে পারি না। সেটা বে-আইনি কাজ।

আমার মনে পড়িল, যেখানে আলোটা দেখা যায়, সেখানে একটা সাঁকো আছে। যদি ষ্টেশনের বাহির দিয়া ফরাসডাঙার গড়ের ধারে ধারে সেই সাঁকোর কাছে যাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্পাঘাতের ভয় থাকে না এবং একেবারে ওই সিগ্‌ন্যালের নিকট যাওয়া যায়, কিন্তু সকলে দল বাঁধিয়া যাওয়া হইবে না। এ সকল রহস্য একাকী দেখিতে যাওয়া ভাল। বিপৎসঙ্কুল স্থানে কেন এই ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে লইয়া যাইব? মনে মনে একাকী যাইবার সঙ্কল্পটাই বাহাল রাখিলাম।

সহযাত্রিগণকে বলিলাম, "মাষ্টার বাবু বল্‌ছেন মন্দ কথা নয়। কাজ নাই আর ওখানে সাপের মুখে গিয়া, এইখান হইতেই ভূত দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া যাক্।"

আমার প্রস্তাবে সকলেই একে একে সম্মত হইল। ডাক্তারী-নবীশেরা আগে সন্তুষ্ট হইল, ভূতের ভয় অপেক্ষা জলে ভিজিয়া সর্দ্দীতে ভুগিবার ভয় তাহাদের বেশি। ডাক্তারী-নবীশদের পরামর্শে সকলেই তাহাদের কথায় সায় দিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল যে, জল ছাড়িলে, জ্যোৎস্না উঠিলে, একজন খালাসি এবং ২টা লণ্ঠন ও লাঠি-সোঁটা সঙ্গে লইয়া সকলে ভূত ধরিতে যাইব।

প্রথমেই বলিয়াছি, আমার ইচ্ছা ছিল না যে, এই যুবকেরা সর্প-সঙ্কুল স্থানে ভিজিতে ভিজিতে যায়। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে আমাকেই দোষী হইতে হইবে। কেন না, আমিই দলপতি--সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বাসা হইতে বাহির হইবার সময় সর্পভয়ের কথাটা মাথায় আসে নাই। কলিকাতায় বাস করিয়া অন্ধকার রাত্রি ও সর্পভয়ের কথাটা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ষ্টেশন্‌মাষ্টারের অনুগ্রহে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বসিবার গৃহে স্থান পাইলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ফরাসীদের থানায় ঢং ঢং করিয়া ১০টা বাজিল।

৩

সকলে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন, আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্ল্যাট্‌ফরমে আসিলাম। দেখিলাম বৃষ্টী অনেক কমিয়াছে। বীরেন বলিল—"ঠাকুরদাদা, কোথায় যান?"

আমি বলিলাম, "স্বভাবের ডাকে সাড়া দিতে।"

তাহারা আবার গল্পে মত্ত হইল।

আমি ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া গড়ের ধারে পড়িলাম। গড়ের পথ ধরিয়া অন্ধকারে, শুক্লপক্ষের মেঘাবৃত রজনীর সামান্য আলোকে, পথ দেখিয়া সেই সাঁকোর উদ্দেশে চলিলাম। যে স্থানে সেই সাঁকোটা আছে, সেই স্থানকে গোখাটা বলে। গড়ের পথ ছাড়িয়া আবার রেলের দিকে পশ্চিমমুখে ফিরিলাম। স্থানটা জনশূন্য, নিকটে একটা সান-বাঁধান-ঘাটওয়ালা পুকুর—একখানা ভাঙা তৃণকুটীর। আমি সাঁকোর পাশ দিয়া রেল লাইনের উপর উঠিলাম। উঠিয়াই সম্মুখে উত্তরদিকে প্রায় ১০০হাত দূরে সেই আলোক দেখিলাম। তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি স্থির, ঠিক যেন রেলওয়ে লণ্ঠনের আলোক। একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, ষ্টেশন্ প্ল্যাট্‌ফরমে সারি সারি আলো জ্বলিতেছে।

আমি আমার সেই সম্মুখের আলোকের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনে একটু ভয় হইল। ভূতের ভয় নহে, ভয় হইল, যদি কোনও কলের গাড়ির গার্ড আমাকে এখন এইখানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। মনে করিতে পারে, হয়ত আমি ভূত সাজিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। অথবা আমার আগে যদি কোনও অস্ত্রধারী লোক ভূতমারিতে আসিয়া নিকটে

লুকাইয়া থাকে, আমাকে দেখিয়া যদি ভূত মনে করিয়া গুলি করে, তাহা হইলেও মহাবিপদ্।

যখন আলোটার নিকট হইতে ২০হাত অন্তরে, তখন আলোটা বামে ও দক্ষিণে নড়িতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল, যদি ভূত না হইয়া আলেয়া হয়, তাহা হইলে বিষাক্ত বায়ুতে আমার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। মনে করিলাম, ফিরিয়া যাই; আবার ভাবিলাম, এতটা আসিয়া ব্যাপারখানা কি না দেখিয়া ফিরিয়া যাইব? সেটাও যুক্তিসঙ্গত নহে। সত্য বলিতে কি, তখন পর্য্যন্ত আমার মনে কিছুমাত্র ভূতের ভয় হয় নাই। আমি আলোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বোধ হয়, ১০।১২ পা অগ্রসর হইলেই আলোক স্পর্শ করিতে পারি, এমন সময়ে আলোক অদৃশ্য হইল। যে মুহূর্ত্তে আলোক অদৃশ্য হইল, সেই মুহূর্ত্তে, কেন জানি না, আমার সর্ব্বাঙ্গ অকস্মাৎ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় স্পষ্ট শুনিলাম, সাহেবসুলভ গম্ভীরকণ্ঠে কে বলিল—Good evning Babu. আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরহইয়া দাঁড়াইলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া কথা কহিতে গেলাম, কণ্ঠ হইতে কোনও শব্দ নির্গত হইল না, অথবা একটা অব্যক্ত ধ্বনিমাত্র বাহির হইল। আলোক বা আলোকধারী কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। এমন সময় আমার বোধ হইল, কেহ যেন আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, অল্প অল্প ভাঙা ভাঙা আলোকে কেমন যেন ঘোর-ঘোর হইয়া আছে। স্কন্ধে স্পৃষ্ট হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, এক মনুষ্যমূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি কি প্রকার, কেমন করিয়া বলিব? মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকে যতটুকু দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বোধ হইল, সাহেবের ন্যায় পোষাক পরা, হাতে কোনও লণ্ঠন ত দেখিলাম না। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই সেই মূর্ত্তি আমাকে ইঙ্গিতে তাহার

অনুসরণ করিতে বলিল। যাইব কি না, ভাবিবার সময় বা শক্তি পাইলাম না। এমন সময় আবার মনে হইল, যেন কেহ বলিল, "Follow me."

কথাটা বাহির হইতে আসিয়া আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, কি আমার কল্পনাপ্রসূ মস্তিষ্কের মধ্যে অনুভব করিলাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনিলাম—"Follow me."

তাহার অনুসরণ করা ভিন্ন আমার আর কোনও উপায় ছিল না। আমার নিজের ইচ্ছা শক্তি কোথায় চলিয়া গেল। আমি যন্ত্রচালিত-পুত্তলিকাবৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, সে আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। দেখিলাম, তাহার শরীর গমনজনিত আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে না। বাইসিকেলে ধাবমান ব্যক্তির শরীর যেমন সমান চলিয়া যায়—অধ-উর্দ্ধ অন্দোলিত হয় না, সে সেই প্রকার যেন সমান ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার চরণ যেন পৃথিবী স্পর্শ করিতেছে না। দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

গোঘাটার সাঁকোর উপর আসিয়া সে রেল্‌লাইন ছাড়িয়া নীচে নামিল, আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রেলের তারের বেড়া তাহাকে বাধা দিতে পারিল না, সে বেড়া গলিয়া অথবা উল্লঙ্ঘন করিয়া গেল না, যেমন সমান যাইতেছিল, তেমনি সমান যাইতে লাগিল। আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যাইতেছিলম, তারে বাধা পাইয়া পতনোন্মুখ হইয়া সাম্‌লাইয়া গেলাম। তারের বেড়া উল্লঙ্ঘন করিয়া আমিও পথে নামিলাম।

অন্ধকার-কক্ষমধ্যে ধুনার ধোঁয়া যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, আমিও এই মূর্ত্তিকে ঠিক সেই প্রকার দেখিতে পাইলাম। একটু দৃষ্টি স্থির

করিয়া তাহার প্রতি চাহিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার স্বচ্ছ শরীরের ভিতরদিয়া পরপারের বৃক্ষাদি দেখিতেপাইতেছি, আবার সেই বৃক্ষাদি দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার শরীর চক্ষুর সম্মুখে অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, তাহার দেহটা স্বচ্ছ কি অস্বচ্ছ। ধুনুচির অগ্নিতে ধুনার ধোঁয়া যেমন কতকটা জ্যোতির্ম্ময় দেখায়—তাহার শরীরও যেন কতকটা সেইপ্রকার জ্যোতির্ম্ময়। মনে হইল, খুব গাঢ়তম অন্ধকার হইলেও হয় ত ইহাকে ঠিক এমনি দেখিতে পাওয়া যাইত।

তাহার অনুসরণে পথে একটু অগ্রসর হইয়াছি, এমনসময় এক বিকট চিৎকারে আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই শব্দের কারণ বুঝিতে পারিলাম। একখানা এঞ্জিন্ আসিতেছে, তাহারই বংশীধ্বনি। গাড়ি আসিতে দেখিয়া মূর্ত্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, এঞ্জিনের আলোকে চকিতের ন্যায় তাহার মুখখানা দেখিয়া লইলাম। সে মুখ যেন শাদা খড়িতে গঠিত। মানুষের মুখ এত শাদা হইতে পারে কি? গাড়ি চলিয়া গেল, আমি তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

৪

আমি তাহার অনুসরণ করিতে করিতে সেই বাঁধাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মূর্ত্তি আমার দিকে ফিরিয়া বেশ সুস্পষ্টস্বরে বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় বলিল—"বোস হীরালাল।"

আমি ত অবাক্! অবাক্ পূর্ব্বেই হইয়াছিলাম, এক্ষণে বিস্ময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। আমার নাম জানিল কি প্রকারে? ঘাটের একটা বসিবার স্থান দেখাইয়া দিয়া সে আবার আমাকে বলিল—"এইখানে উপবেশন কর।"

এই বলিয়া সে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বসাইয়া দিল। সে আবার বলিল—"তুমি খুব সাহসী আজ তাহার পুরস্কার পাইবে।"

আমি মনে করিলাম, অন্ধকার-রাত্রে পুকুরপাড়ে নির্জ্জন স্থানে পুরস্কার দিবার কাল ও স্থানটা ঠিক হইয়াছে, আর পাত্রও মন্দ কি? একজন জীবন্ত বাঙালী কেরাণী, আর একজন মৃত সাহেব—ভূত!

আমার চিন্তায় বাধা দিয়া মূর্ত্তি বলিল, "আজ তুমি পুরস্কার পাইবে, —যাহা জানিতে আসিয়াছ, তাহা জানিবে। আমার পরিচয় দিব—"

তখন আমার মনে হইল, এ একজন বাঙালী, ভূত-সাহেব সাজিয়া সকলকে ভয় দেখায়, নচেৎ সাহেব এমন বাংলা কথা কহিতে পারে কি?

মনে মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র সে বলিল—"সাহেবের মুখে বাংলা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছ? আমাদের সময়ে অনেক সাহেব বেশ বাংলা জানিত। আমার এক জ্ঞাতিভাই ছিল, সে বাংলায় কবির দল করিয়াছিল, তাহার নাম শুন নাই?"

আমি স্থিরভাবে বলিলাম—"আণ্টুনি-ফিরিঙ্গির কবির দল ছিল শুনিয়াছি, সেই কি?"

"হাঁ সেই আণ্টনি আমার ভাই হইত, আমার নাম গষ্টেভ (Gustave). যখন এই রেললাইন প্রথম খোলা হয়—তখন আমি গার্ড ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সেইরূপ একটা জনরব শুনিয়াছি বটে।"

"জনরব নহে, সত্য কথা। আণ্টনি-কবিওয়ালার বাড়ী কোথায়ছিল জান?"

"না।"

"এই চন্দননগরের দক্ষিণ গরুটিতে। সে স্থানটাও ফরাসীদের। আমার বাড়ীও এই গরুটিতে ছিল। আমাদের বাড়ীর কাছে একজন বাঙালীবাবু, কোথাকার জমীদার আসিয়া বাস করেন। কোথা হইতে আসিয়া বাস করেন, তাহা জানি না। কিন্তু আমার ভাই সেই কবিওয়ালার সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ ছিল। তিনি আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন, আমিও তাঁদের বাড়ীতে

বেড়াইতে যাইতাম। আমরা তখন বাঙালীর মত কাপড় পরিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। এখন কিন্তু দেখিতে পাই, বাঙালীরাই বাঙালীর পোষাক পরিতে লজ্জিত হয়। গ্রীষ্মকালে আমরা বাড়ীতে আমাদের সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া তোমাদের মত বাঙালী কাপড় পরিতাম, কিন্তু কোথাও যাইতে হইলে সাহেবী পোষাক পরিতাম।

"বাঙালীবাবু যে বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন, সে বাড়ীটা গঙ্গার উপরে; এমন কি, বর্ষাকালে তাহার নীচেকার ঘরে জল ঢুকিত। বাড়ীটা যখন খালী পড়িয়াছিল,—এই বাবুরা ভাড়া লন নাই, তখন আমি কতবার এই বাড়ীর মধ্যে একাকী বেড়াইতে যাইতাম। বাবুরা আসিবার পর আর আমি সে বাড়ীর অন্তঃপুরে ঢুকি নাই। ঢুকি নাই কেন, একবার গিয়াছিলাম; কিন্তু এখন মনে হয়, না যাইলেই ভাল হইত।

"একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের সন্ধ্যার সময় আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি এমনসময় দেখিলাম, একখানি নৌকা সেই বাবুদের বাটীর দিকে আসিতেছে। জ্যৈষ্ঠমাসের দক্ষিণে বাতাসে শ্বেত পাল ফুলাইয়া রাজহংসীর মত নাচিতে নাচিতে সেই নৌকাখানা আসিতেছে। যখন ঘাট হইতে আন্দাজ ৫০হাত দূরে, তখন, একটা দমকা বাতাসের জোরেই হউক, অথবা মাস্তলটা জীর্ণছিল বলিয়াই হউক, হঠাৎ মাস্তলটা ভাঙিয়া পড়িল, আর সেই নৌকাখানিও উল্টাইয়া গেল।

"বাবুদের উপরের জানালা হইতে কে "সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ হয়, নৌকায় যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল তাঁহাদিগকে বাবুদের বাটীর স্ত্রিলোকেরা দূর হইতে দেখিতেছিলেন। আমি তখন বাঙালী পোষাকে ছিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে গায়ের কুর্ত্তিটা খুলিয়া ফেলিলাম, তোমাদের মত মালকোঁচা মারিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম।

"নৌকাটা যেখানে ডুবিয়াছিল, বায়ুর বেগে সেখান হইতে অনেকটা

নিকটে আসিয়া পড়িল। নৌকাটা উপুড় হইয়া বৃহৎ তিমিমৎসের পৃষ্ঠের মত ভাসিতেছিল। আমি ডুব দিয়া নৌকার নীচে গেলাম এবং হাত বাড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম; এমন সময়ে আমার মাথায় সবলে একটা মুষ্টির আঘাত লাগিল। বুঝিতে পারিলাম আরোহীরা প্রাণের জন্য ভিতরে ছটফট করিতেছে। তৎক্ষণাৎ সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলাম এবং নৌকার পাশ দিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। আনিবার সময় তাহার শরীর কিসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সবলে টানিয়া সেই বাধা অতিক্রম করিয়া আনিয়াছিলাম। উঠিয়া দেখি একজন মাঝি নৌকার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, আরও তিনচারজন ইতস্ততঃ সাঁতার দিতেছে। আশ্রয়প্রাপ্ত দাঁড়ীকে "পাকড়ো" বলিয়া সেই অজ্ঞান লোকটীকে নৌকার উপর তুলিতে বলিয়া আবার আমি ডুব দিলাম এবং আবার সেই প্রকারে নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাত বাড়াইবামাত্র সিক্ত সুকোমল রেশমের ন্যায় একগোছা কেশ আমার হাতে ঠেকিল, আমি অমনি সেই কেশগুচ্ছ ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলাম।

"আমি তখন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মগ্ন আরোহীর মুষ্টির আঘাতে, আমার মাথায় বিষম ব্যথা অনুভব করিলাম। ভাসিয়া উঠিবামাত্র একজন মাঝি আমার সাহায্যার্থ আমার নিকট আসিল। আমি তাহার সাহায্যে সেই কেশগুচ্ছধারিণী রমণীকে লইয়া নৌকার পৃষ্ঠে উঠিলাম! মাঝি বলিল, ভিতরে আর কেহ ছিল না।

"নৌকা উল্টাইয়া পড়া হইতে এই রমণীকে উদ্ধার করা পর্য্যন্ত বোধ হয় ৩।৪ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। কেন না যখন মগ্ন পুরুষটিকে উদ্ধার করি, তখন সে হাত-পা ছুঁড়িতেছিল, পরে নৌকার উপর উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, কিন্তু রমণীকে আমি অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে তুলিয়াছিলাম। নৌকাখানা ভাসিতে ভাসিতে কূলের দিকে যাইতে লাগিল।

ইত্যবসরে তীরে অনেক লোকজন জমিয়া গেল, একখানা নৌকা আমাদের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিল। আমি তীরে উঠিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।"

৫

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, একটি অর্দ্ধসজ্জিত কক্ষে সুন্দর কোমল বিছানার উপর আমি শায়িত। আমার মাথায় ভয়ানক ব্যথা। বক্ষেও এত বেদনা যে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে। কক্ষের এক-পার্শ্বে একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে; আমি কোথায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার নিকট একজন দীর্ঘশ্মশ্রুধারী সাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিলাম না।

"আমাকে চাহিতে দেখিয়াই সাহেব আমার মাথার নিকট উপবিষ্ট কোনও লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'Thank God. Look the patient revives, he is out of danger.'

"তাঁহার উচ্চারণ শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি ফারাসী, ইংরাজ নহেন। অকস্মাৎ আমার মনে পড়িল, ইনি চন্দননগরের ডাক্তার মারগ্যা *।

"আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম, 'Good evening doctor.'

"ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন, 'Good morning rather. But please keep quite. You are too weak to talk.'

"আমি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'Where am I ?'

"কিনি আবার বলিলেন—'Amongst your friends. But keep you quite please.'

* মহাত্মা ডাক্তার মারগ্যার চেষ্টায় এবং অর্থে চন্দননগরে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দননগরের বর্ত্তমান সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া "মারগ্যা হাঁসপাতাল" নামে অভিহিত হইতেছে। লেখক।

"এই বলিয়া একচামচ ঔষধ আমার মুখে দিলেন, বোধ হয় তীব্র সুরা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, ক্রমে বেশ বলসঞ্চার হইতে লাগিল। কক্ষান্তরে একটা ঘড়িতে ঢংঢং করিয়া চারিটা বাজিল। একে একে আমার সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল—নৌকা মগ্ন, আরোহী-দিগকে উদ্ধার ইত্যাদি আমার স্মরণপথে পড়িতে লাগিল। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'Prey tell me, doctor, are they safe. ?'

"তিনি সম্মতিসূচক মস্তকসঞ্চালন করিলেন।

"আমি আরোগ্য হইলাম। মগ্ন ব্যক্তির মুষ্ট্যাঘাতে আমার মাথায় বেদনা হইয়াছিল, নচেৎ আর কোন ক্লেশ ছিল না। বলা বাহুল্য যে, আমার চিকিৎসার ব্যয় আমি দিতে চাহিলেও বাবুরা তাহা দিতে দিলেন না। তাঁহারাই সমস্ত ব্যয় বহন করিলেন। আমি ভাল হইলাম, কিন্তু ডাক্তারসাহেব প্রত্যহই বাবুদের বাটী আসিতে লাগিলেন। শুনিলাম, যে ব্যক্তিকে আমি প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাঁহার ঘাড়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে।

"নৌকা মগ্ন হইবার পর হইতে আমি বাবুদের বাড়ী প্রায়ই যাইতাম এবং পীড়িত ব্যক্তির সংবাদ লইতাম। যাঁহারা জলমগ্ন হইয়াছিলেন, শুনিলাম, তাঁহারা বাবুর জামাতা ও কন্যা। বাবুর কন্যা ২।৩দিনে বেশ সারিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জামাতার অবস্থা আশাপ্রদ নহে। ডাক্তার-সাহেব বলিয়াছিলেন যে, সেই ঘাড়ের আঘাতের জন্যই ভাবনা। সম্ভবত জলমগ্নের পর ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নৌকার কোনও সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর গিয়া পড়িয়াছিলেন, পরে আমি যখন টানিয়া বাহির করি, তখন ঘাড় মুচ্‌ড়াইয়া গিয়া থাকিবে। শুনিয়া আমার মনে ভয়ানক কষ্ট হইল, আমি প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া একটা প্রাণ নষ্ট করিতে বসিয়াছি! যদি তত তাড়াতাড়ি ঝাঁপাইয়া না পড়িতাম, তাহা হইলে হয় ত ২।১মিনিট পরে

অপরের সাহায্যে মগ্ন নৌকা হইতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে বাহির করিতে পারিতাম। ২।১মিনিট জলমধ্যে থাকিলে তাঁহার প্রাণ যাইত না। যদিও আমি শুভ উদ্দেশ্যেই তাঁহার স্কন্ধে আঘাত করিয়াছিলাম, তথাপি এক্ষণে তাহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমার অতিশয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি কিছুতেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না।

"জলমগ্নের ১৫দিন পরে প্রাতঃকালে বাবুদের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোলে গগন বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাদের বাড়ীতে ছুটিলাম। শীলতা, ভদ্রতা, সামাজিকতা, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আমি একেবারে তাঁহাদের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। আমার মনে হইল, আমিই ঘাড় মুচ্ড়াইয়া বাবুদের জামাতাকে হত্যা করিয়াছি। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি মাত্র, এমনসময়—'ও জগদীশ্বর! কেন গিয়াছিলাম?'

মূর্ত্তিকে নীরব হইতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'এমনসময় কি?'

মূর্ত্তি বলিল—"এমনসময় এক অনিন্দ্যসুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'কেন সাহেব আমাকে বাঁচালে?' বলিয়াই আমার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া লুটাইয়া পড়িল। তখন সেখানে কেহ ছিল না, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে পরিচারিকারা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। সেই একদিন প্রাতঃকালে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—সেই একদিনের এক মুহূর্ত্ত এক অনন্ত যুগ! সেই অশ্রুশূন্য নয়নের উন্মাদ-দৃষ্টি, বেশ আলুথালু, মুক্ত কেশরাশি,—তত সৌন্দর্য্য বুঝি হাস্যময়ীতেও থাকে না! আমি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তাহাদের বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

"সেই দিন গরুটি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। সেই ঘটনার ৮।১০বৎসর পরে এই রেল খুলিল। আমার একজন পিতৃবন্ধু

হাবড়া-ষ্টেশনে আমার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করিয়া দিলেন। আমি চাকরি করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই উন্মাদ দৃষ্টি, সেই অচঞ্চল নীল-নয়ন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলাম না।

"সেই সময় তোমাদের একজন হিন্দু সেণ্ট হিন্দুবিধবার বিবাহের জন্য খুব আন্দোলন করিতেছিলেন!"

আমি আবার বাধা দিয়া বলিলাম—"আমরা তাঁহাকে সেণ্ট বলি না, আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত ও মহাত্মা বলি।"

"এখন বল না, কিছুকাল পরে বলিবে। পরের চোখের জল দেখিলে যাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা যায়, তিনিই সেণ্ট। তোমাদের আর একজন সেণ্ট এইপ্রকার হিন্দু বিধবাদিগকে অগ্নির মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে কথা থাক্, আমি যখন শুনিলাম যে, হিন্দু বিধবার বিবাহ হইতে পারে, এ কথা হিন্দুসমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে, তখন আর একবার আনন্দে অধীর হইলাম। সেই বাবুকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য আর একবার গরুটির দিকে ছুটিলাম। ইচ্ছা, তাঁহাকে গিয়া বলিব, তোমার কন্যার বিবাহ দাও, তোমাদের সমাজ—তোমাদের ধর্ম্মপুস্তক অনুমতি দিয়াছে। মনে হইল, আমি যাহাকে বিধবা করিয়াছি, যদি তাহাকে আবার সধবা হইবার কোনও উপায় দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার আত্মগ্লানির সহস্রাংশের একাংশও কমিতে পারে। কিন্তু হায়, গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুক ভাঙিয়া গেল, জগৎ শূন্য দেখিলাম——"

আমি বলিলাম—"গিয়া কি শুনিলে?"

"গিয়া কি শুনিলাম? শুনিলাম, স্বামীর মৃত্যুর ৩মাস পরে হত-ভাগিনী হিন্দুবিধবা স্বামীর নিকট যাইবার জন্য মধ্যরাত্রে ছাদের উপর হইতে ভাদ্রের ভরা গাঙে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তার পর আর কি বলিব? আমি চিরদিনের জন্য গরুটি ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু সে ত আমাকে ত্যাগ করিল না। সেইদিন সন্ধ্যার পর বৈদ্যবাটী-ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি, নিকটে কেহ নাই, এমনসময় অদূরবর্ত্তী জঙ্গল হইতে সে ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—'সাহেব কেন আমাকে বাঁচালে ?'"

৬

"আমি উন্মত্তের মত হইলাম। দিনের বেলা বেশ কাজকর্ম্ম করি, কোন-রকম গোলযোগ হয় না। কিন্তু রাত্রে যখন-তখন সেই বিধবা আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিত—'কেন সাহেব, আমাকে বাঁচালে ?'

"অন্যমনস্ক হইবার জন্য আমার কর্ম্মে খুব মনোনিবেশ করিলাম। তাহার ফলে চাকরিতে উন্নতি হইল, কিন্তু মনে ত শান্তি পাইলাম না। আমি গার্ড হইলাম। বিবাহ করি নাই, করিতে প্রবৃত্তিও হইল না। যখন কোনও স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করিতাম, তখনই আলুথালু ধূলি-ধূসরিত কৃষ্ণচিক্কণকেশবেষ্টিত একখানি সুগৌর মুখ অশ্রুশূন্যনয়নে অতি দীনভাবে আমার পানে চাহিয়া থাকিত, আর আমার প্রাণ হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। আমি যাহা বেতন পাইতাম, তাহার অতি অল্প-মাত্র নিজের সেবায় ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ কলিকাতায় সেই হিন্দু সেণ্টের নিকট পাঠাইতাম। শুনিয়াছিলাম, তিনি বিধবাবিবাহের জন্য নিজে অনেক অর্থব্যয় করিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতাম, কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিতেন না—কে পাঠাইল।

"এত করিয়াও কিন্তু সেই হতভাগিনী আমাকে ছাড়িল না। রাত্রে তাহার কথা মনে পড়িলেই দেখিতে পাইতাম, কে যেন আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেছে—'সাহেব, কেন আমাকে বাঁচালে ?'

"একদিন সন্ধ্যার সময় আমি আমার ডিউটিতে ছিলাম অর্থাৎ একখানা গাড়ির গার্ড হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছিলাম, চন্দননগর হইতে গাড়ি ছাড়িল—আমি আমার কামরায় পাদানের উপর দাঁড়াইয়া হাতের

লণ্ঠন দোলাইয়া এঞ্জিনের জমাদারকে ইঙ্গিত করিতেছিলাম। এইভাবে আলো নাড়িতে নাড়িতে কেমন-যেন আত্মবিস্মৃত—বিভোর হইয়া পড়িলাম। নিবিড় অন্ধকার-রাত্রি, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, আকাশের কোলে বৃক্ষাদি যেন মিশাইয়া গিয়াছে! হঠাৎ আমার মনে হইল, ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে এমনি ভাদ্রমাসের বর্ষারজনীতে সেই হতভাগিনী বিধবা ছাদ হইতে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনাটা স্মরণ হইবামাত্র আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম—তখন গাড়িখানা এই ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছাকাছি আসিয়াছে—অকস্মাৎ দেখিলাম, সে এই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া-আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সেই নীল অচঞ্চল অশ্রুশূন্য নয়ন আমার দিকে ফিরাইল। স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, সে বলিয়া উঠিল,—'কেন সাহেব, আমাকে বাঁচালে ?'

"আমি ত্রস্তপদে যেমন পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইব, অমনি আমার পা পাদান হইতে সরিয়া গেল, আমি লণ্ঠন দোলাইতে দোলাইতে রেলে পড়িয়া গেলাম। সেই অবধি আমি এইখানে দাঁড়াইয়া আলো দেখাইতেছি—আমার কর্ত্তব্য আমি ভুলি নাই। কিন্তু সে ঘটনা কখন্ হইয়াছে, তাহা জানি না,—হয় ত লক্ষ বৎসর, লক্ষ যুগ, আবার হয় ত এই মুহূর্ত্ত। এখন আমি সময়ের পরিমাণ বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে যাহাকে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিতাম, এখন আর তাহা নাই, এখন কেবল বর্ত্তমান,—কেবল সেই দৃষ্টি, কেবল সেই শব্দ,—সেই উন্মাদকারী, সেই হৃদয়বিদারী শব্দ, 'সাহেব কেন আমাকে বাঁচালে ?'"—

বলিতে বলিতে সাহেবের ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া গেল। আমি কিছু বলিব মনে করিতেছি, এমনসময় শুনিলাম—"Good night Baboo."

আমি অভিভূত হইয়া রহিলাম। একটু পরে আবার যেন অনেক দূর হইতে অতি মৃদুস্বরে কে বলিল—"Good night."

আমার চলৎশক্তি নাই, স্পন্দনশক্তি নাই, আমি যেন কেমন অবশ, অসাড়, আত্মহারা, বিহ্বল হইয়া রহিলাম।

* * * *

কতক্ষণ পরে জানি না, কাহার শীতলস্পর্শে আমার চেতনা হইল। আমি সচকিতে বলিয়া উঠিলাম—"Good night Mr. Gustave."

এই বলিয়া চক্ষু চাহিবামাত্র দেখিলাম, একটা শৃগাল ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বোধ হয়, আমাকে মৃত মনে করিয়া উদরপূর্ত্তির চেষ্টায় আসিয়াছিল। তাহারই শীতল-নাসাগ্র-স্পর্শে আমি জাগিয়া উঠিয়াছিলাম।

উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে। দেখিয়া পুষ্করিণীর জলে মুখ ধুইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনে যাইলাম। সুখের মধ্যে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, নচেৎ হয় ত বৃষ্টিতে সেই অনাবৃত ঘাটে বসিয়া ভিজিতাম।

ষ্টেশনে গিয়া দেখি যে, মেসের বাবুরা কেহ নাই। টিকিটবাবু বলিলেন যে, প্রথমে তাহারা আমাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিয়াছিল, আমি ভূত ধরিতে গিয়াছি; কিন্তু যখন দেখিল যে, ভূত আলোক নিবাইয়াছে, তখন তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, সম্ভবত আমি রাত্রে চন্দননগরে কোন আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গিয়াছি। সুতরাং অন্ধকার-রাত্রে অজ্ঞাতস্থানে আমার অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে নাই, বিশেষত বিদেশীর পক্ষে চন্দননগরের "তুড়ুম" বড় ভয়ানক। সেইজন্য তাহারা আর কোথাও না গিয়া ওয়েটিং রুমে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছে।

তাহাদের ঘুম ভাঙাইয়া আমি প্রাতের ট্রেণে বাসায় ফিরিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অস্ফুট।

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়!
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা!
কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে
পূরিবে সকল কামনা!
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না!

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুলশ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে!
কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা!
দখিন পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা!
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না!

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে
ভাবিছে উদাসপারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা!
কহিছে সে—হায় হায়,
কেন আমি বাঁচি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়!
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা!
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি!
জনম ব্যর্থ যাবে না!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্ষণিকা।

আজ অনেকদিন হইল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'ক্ষণিকা' আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন বোধ হয় এই কাব্যসম্বন্ধে দুটি-চারিটি কথা বেশ জোর করিয়া, স্থির করিয়া বলিতে পারি। প্রথম উদয়ের চক্ষু-ঝল্‌সানো এখন আর নাই, তাই আশা করি এতদিনে দ্বিধা না করিয়া 'ক্ষণিকা'সম্বন্ধে মন্তব্য বলিতে পারি।

ক্ষণিকার কথাপ্রসঙ্গে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি একদিন আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মুখে একটু মৃদুহাস্যের নুড়ী নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হাঁ সুন্দর বটে, কিন্তু সমস্ত কবিতাকে কবি গভীর অর্থযুক্ত করিতে পারেন নাই!" অনেকেরই হয় ত এইরূপ মত। আমাদেরও এ বিশ্বাস নয় যে, ক্ষণিকার যে কোন-একটি কবিতা তুলিয়া লইয়া পড়িলেই যথেষ্ট গভীর কবিত্ব আস্বাদন করা যায়। যে কোন-একটি তুলিলে ত হইবে না-ই—যে-কোন-একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতাও পৃথক্ করিয়া লইয়া পড়িলে তাহার সমস্তটা সৌন্দর্য্য জানা যাইবে কি না সন্দেহ। কদম্ব-ফুলের কেশরগুলি যেমন একটা শরীরে বাণবিদ্ধ থাকাতে, সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ কদম্বফুল—একটিমাত্র কেশরে অসম্পূর্ণ, ক্ষণিকাও তেমনি সবগুলি কবিতা লইয়া একটি ভাবসুরভি কবিত্ব-মণ্ডল;—একত্র দেখিলেই ইহার সৌন্দর্য্য,—প্রকৃতি যেমন চিরকালের সহচর, কখনো যায় না, ইহাও তেমনি যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা এই একত্বসূত্রটির ঠাহর না পাইবেন, তাঁহারাই গভীর অর্থের অভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাঁহারাও অবশ্য—যদি বাহ্যজগতের

কোনো সৌন্দর্য্যপ্রেরণা ধরিবার শক্তি তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে—তাহা হইলে তাঁহারাও ক্ষণিকার ভাষা পড়িয়াই কাঁপিয়া উঠিবেন! একি চমৎকার! এ যে ষ্টাইল্!—ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছন্দ বাঁধিয়া অক্লেশ উপমায়, অনায়াস সাজসজ্জায় ছুটিয়া বাহির হইতেছে!

আমরা যতদিন সংস্কৃত দিয়া লিখিব, ততদিন আমাদের ষ্টাইল্ হইবে না। আমরা লিখিবার সময়ে সংস্কৃতের স্থূল ঢাকনীতে আমাদের মনের গতিভঙ্গী আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই আমাদের ষ্টাইল্ এত অল্প।

কবিতা মনের কথা, বিশেষত লিরিক্ কবিতা। তাই তাহার ভাষা নিতান্ত সোজা হওয়া দরকার। 'ক্ষণিকা' লিরিকের চরম—উহার ভাষাও তাই একেবারে নির্খুৎ সোজা। এই সোজার কত গুণ, তাহা দেখা যাইবে।

যে সময়ে আর শিল্পীর কুঁদানো চক্ষে পড়ে না, গঠনটি ঠিক প্রকৃতির ছবির মত প্রাণ ছুঁইয়া দেয়, 'ক্ষণিকা' সেই সময়ের। ভাবে এবং ভাষায় অভেদ। ভাষা কাণে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরর্থ তৌর্য্যত্রিকে একমিনিটও দেরী করে না। ঠিক প্রাণে ভাব ও চিত্র নাচাইয়া দেয়—যতটুকু তৌর্য্যত্রিক ভাষাতে রহিয়াছে, ততটুকু ভাব-উদ্বোধনের জন্যই আবশ্যক। ইহা হইতে ভাবও যেমন সম্যক্ উদ্বোধিত হয়, তেমনি প্রতি ভাবের সঙ্গে যে একটিমাত্র সুর আছে (যাহা কবিরাই আয়ত্ত করিতে পারেন), সেটিও ধরা পড়িয়া যায়।

"সূর্য্য গেল অস্তপারে
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণতরী—
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া

শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হাহা করি—"

এই লাইন্‌কটি পড়িবামাত্র বুক ছাঁৎ করিয়া উঠে। শব্দ বুঝিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করিতে হয় না, ঠিক সেই উদার মাঠের উদাস হাওয়াটা আসিয়া, বুকের উপর হাহা করিয়া উঠিয়া, দূরে ঘুরিয়া চলিয়া যায়।

তার পরে সাজসজ্জা। প্রকৃতি রূপে এবং বর্ণে ভরা। তাহার সুরের সঙ্গে সঙ্গে রূপ অনন্ত। কবিরও যখন সম্পূর্ণতালাভ হয়, তখন তাহার সুরগুলি জমাইয়া রূপের বৈচিত্র্য এবং বর্ণের হিল্লোল চারিদিকে ঘিরিয়া আসে। প্রকৃতিবর্ণনা করিতে গিয়া কবিগণ যে রূপ ও বর্ণ ফুটান, এখানে তাহার কথা হইতেছে না। এখানে রূপ ধরিয়া ভাবপ্রকাশের কথাই বলিতেছি। ইহাই কাব্যের অলঙ্কার। যেমন :—

"জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রংটি থাক্‌বে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎসন্ধ্যামেঘে"—

এই পংক্তিকটিতে দূরস্মৃতির ভাবটি শরৎসন্ধ্যামেঘে একটি নিবিড়-করুণ রূপ পাইয়াছে বলিতে পারি। এইরূপ অলঙ্কার ক্ষণিকার প্রতি পৃষ্ঠায়। এইরূপ অলঙ্কারগুলি যেমন ভাষাটিকে ঝুম্‌কাফুলের ন্যায় বিচিত্র রঙে সাজাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ ভাষাটিও কিন্তু আপনাকে নিতান্ত সোজা করিয়া ফেলিয়া অলঙ্কারগুলিকে সহজেই জীবন্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছে। ছন্দসম্বন্ধেও সেই কথা। ভাষা অত সহজ, একএকটি পদ অত অল্পাক্ষর বলিয়াই ছন্দগুলি এত বিচিত্রভঙ্গীপূর্ণ, এমন সহজে ভাবানুসারিণী। অমরকোষ হইতে স্থূলস্থবির শব্দ বাছিয়া অত নানাভঙ্গীর ছন্দ কে রচিতে পারিত, আমি জানি না।

ছন্দ চাই, সহজ ভাষা চাই, অলঙ্কার চাই—এ সমস্তই লিরিকের বাহ্যিক উপাদান। কিন্তু এই যে কামিনীফুলদলের মত অলঙ্কারগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, ইহার নিগূঢ় কারণ একটি মুক্ত প্রাণের হাওয়া বই আর কিছুই নহে। ক্ষণিকার আদ্যোপান্ত সেই প্রাণটির সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব।

কাব্যটির নাম 'ক্ষণিকা'। কিন্তু নাম দিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। মুখবন্ধস্বরূপ একটি কবিতায় আবার নামটির ব্যাখ্যা দিয়া দিয়াছেন।

"ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ"
—"ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন।"

এই ঝলমল প্রাণটিই যে ক্ষণিকার আগাগোড়া চলিয়া গিয়াছে—কিরূপে গুরুভারবর্জ্জিত হইয়া প্রথমে যাত্রা করিয়াছে, কিরূপে ক্রমে মুক্তপ্রাণ নানা সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া গিয়া মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে সুখে বিচরণ করিয়াছে এবং অবশেষে কি একটি গম্ভীর পরম পরিণতি পাইয়াছে, তাহারই অনুধাবন করিয়া কৃতার্থ হইব।

ক্ষণিকা লিরিক্। তাই যত কিছু ছবি, সমস্তের মধ্যেই কবির প্রাণটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। কালিদাসের কালে লোধ্র-কুরুবক, অশোক-দোহদ, শৌরসেনী জল্পনা আপনা-আপনি আমাদের কতকটা মোহিত করে বটে, কিন্তু কবির চিত্ত যে সহজেই সেই দূরকালের মধ্যে ঢুকিয়া, সেকালের সমস্ত সৌন্দর্য্য মালার মত গাঁথিয়া তুলিতেছে, এই চলৎকল্পনার লঘুগমনই আরও অধিক চিত্তহারী। ক্ষণিকার গ্রাম্যচিত্রগুলির যে স্বতন্ত্র আনন্দ, তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া সেগুলি যে এক-রকমে চিত্তভাবের বাস্তবায়িত ছায়া বই আর কিছুই নহে—ইহাই আমাদের প্রধানত দেখিবার বিষয়। ক্ষণিকার সেই মূলধারা অর্থাৎ এই কাব্যের আদ্যন্তমধ্যে প্রবাহিত যে কবিজীবনটি, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

বলিতে পারি, ক্ষণিকায় কবিজীবনের একটি সন্ধি ও পরিণতি দেখা যায়। একটি প্রাণ ভোগক্ষুব্ধ যৌবন ছাড়াইয়া ব্যাপ্ত শান্তির স্থিরজলে নামিয়া আসিতেছে। ক্ষণিকার যে মোটামুটি দুটি ভাগ আছে, তাহার প্রথম ভাগে প্রাণ কেবল জল্পনা করিতেছে—'আর এ সব বড় কাজ, বড় কথা, সংসারের শূন্য গাম্ভীর্য্য ভাল লাগে না,—সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠিব,—কাজ আর নহে, কেবল আনন্দ—দুর্দ্দিন পড়িলে ঘরে খিল লাগাইয়া ছন্দগাঁথা, কিন্তু আনন্দ পাইলে অগ্নিমুখে পতঙ্গের মত তাহাতে গিয়া ছুটিয়া পড়া। সুখদুঃখ—যত বুকভাঙা বোঝা সব ঠেলিয়া ফেলিব। মোটামুটি, প্রথমভাগে মনের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ার ভাব—আর শেষভাগে প্রকৃতই সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠা—সেই অনলস আনন্দের জীবন যাপন। সাপের খোলসের মত যেন প্রথম ভাগে, শেষভাগের আনন্দচঞ্চল চিত্তের নির্ম্মোক দুলিতেছে। প্রথমভাগে সঙ্কল্প হইতেছে—

'তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি'
আর শেষভাগে 'চতুর রাঙা ঠোঁটে মধুর হাসি' দেখিয়া
'কথাই নাহি জোটে
কণ্ঠ নাহি ফোটে।'

প্রথমভাগে সঙ্কল্প হইতেছে—কথার ওজন রাখিব না, আর শেষভাগে—

"প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে।'

প্রথম হইতে 'কবির বয়স' পর্য্যন্ত প্রথমভাগ, 'বিদায়' হইতে দ্বিতীয়ভাগ। কবি বিদায় লইতেছেন। অনেকক্ষণ জল্পনা করিয়া মনটাকে বুঝাইয়াছেন। 'আঁধার-আলোয় শাদা-কালোয় দিনটা ভালই গেছে কাটি'—কবি বিশ্রামে যাইতেছেন, যুবাদলের আমোদপ্রমোদে আজ তাঁহার যৌবনান্তকালের বিমনস্কতা উপস্থিত। প্রাণটি আজ আর ভোগে

বন্ধ নাই, আজ তাহার কোন তীব্র লোভ নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কণা-মাত্র আভাসেই বিকল হইয়া উঠিতেছে—'পড়ল খসে খসে'। প্রাণ বিশ্বে ছড়াইয়া গিয়াছে—সে আজ উদাসীন। একদিন যৌবনের মত্ততায় অকূলে যাত্রা হইত, রশারশি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যাইতে হইত, কিন্তু এখন আর সে তীব্র আবেগ নাই; সে তীব্র যৌবন,—'জীবনের সেই পরম অধ্যায়' চম্পকবকুলচামেলীভারে নিজেকে মণ্ডিত করিয়া মুহুর্মুহু উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাকে মাধবীর গূঢ়সত্তার সঙ্গে অনন্ত-আবর্ত্তন-মুখে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছে—

"অমর বেদনা মোর হে বসন্ত রহি গেল তব
মর্ম্মর নিশ্বাসে
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্ত রৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে" (কল্পনা)

এবার আর যৌবনের সেই তীব্র বেদনা সহিবে না—

'এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রাহ'
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি'।
'যাস্‌রে খেয়া বেয়ে
আন্‌বে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলেমেয়ে'।

কবি আসিয়া যেন নিতান্ত সরল সৌন্দর্য্যের মধ্যে গ্রামের প্রান্তে ঘর পাতিয়াছেন।

"আজ শান্ত তীরে তীরে
তোমায় বাইব ধীরে ধীরে।"

খঞ্জনা নদীর তীরে অঞ্জনা গ্রামখানি। সে গ্রামে শরৎ ও বর্ষা ঋতুতে কবির বাস। কবি সেখানে অকাজে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, লক্ষ্য কিছু নাই বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার সৌন্দর্য্যসম্পদ্ কবির প্রাণে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে—

দীঘির জলে ঝলক ঝলে
মাণিক্ হীরা
সর্ষে-ক্ষেতে উঠ্‌ছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে
আমি শুধু হেথায় এলাম
অকারণে।

কখনো মাঠে, কখনো ঘাটে—রাস্তা যেখানে গিয়াছে, কবি সেখানেই যাইতেছেন। কখনো মনটিকে একটু ঘুরাইয়া সেই দূর বৃন্দাবনের দিকে ফেলিয়া, হৃদয়ের জালে সেকালের সখাদের সমস্ত মধুর লীলা তুলিয়া আনিতেছেন, প্রতি শব্দে পাঠককে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান কোন সৌন্দর্য্যকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হৃদয় এত লঘুভার যে, সে 'রিমিঝিমি বাদল বরিষণে' রাতে স্বপ্নের সঙ্গেও সত্যের মত করিয়া সম্ভাষণ করিতে চায়। কবির কাছে সত্য এত গুরুত্ববর্জ্জিত হইয়াছে যে, স্বপ্ন হইতে যেন তাহার কিছু তফাৎ নাই।

এমনি তরল প্রাণ বলিয়া তাহার প্রসারও অনেক—অনেক দূর—একটু-খানি উত্তেজনা হইলেই সে বাণিজ্যে ছুটিয়া যায়—

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগরবিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে।"

এইরূপ ভারশূন্য প্রাণে কবি আসিয়া গ্রামে বাসা করিয়াছেন। যেখানে-সেখানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সন্ধ্যায় বধূর দ্বারে অতিথি হইয়া রিণিঠিনি শিকলটি নাড়িয়া দিতেছেন,—মাঠের মেঘত্রস্তা হরিণ-চোখ মেয়েটিকে কৃষ্ণকলি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—জলার্থিনী দুটি বোনের গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনিতেছেন,—'ভাঙনধরা কূলে' আপনারি অন্তরের সৌন্দর্য্যতৃষ্ণিকে মূর্ত্তিমতী দেখিতেছেন,—

"আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই?
সে কহিল ভাই
নাই নাই নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।"

কখনো 'সজলনীলজলদবরণবসনাবৃতা'র জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইতেছে। মোট কথা 'শরৎকালের বালুচরে নির্জ্জন ঘর' হইতে, কখনো স্থলপথে, কখনো জলপথে, বাহির হইয়া কবি বাংলাগ্রামের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সম্মুখেই আপনাকে আনিয়া ফেলিতেছেন—এ কেবল স্বচ্ছ হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের ছাপ ধরা। হৃদয়ে আলোড়ন থাকিলে এই কোমল সৌন্দর্য্যগুলি এমন যথাযথ বেশে উঠিয়া আসিতেই না।

সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কেবলমাত্র দেখা এবং স্পর্শ বিনাই তাহার পরিপূর্ণ আভাটি হৃদয়ে লওয়া। তাই যাত্রীকে কেবলমাত্র পার করিয়াই সুখ—কোন পীড়াপীড়ি, কোন নাছোড় জিজ্ঞাসাবাদ নাই—

বল্‌তে যদি না চাও, তবে,
শুনে আমার কি ফল হবে?

কোন ব্যস্ততা নাই। দুজনে একটি গাঁয়ে থাকিয়াই সুখ। প্রাণ সৌন্দর্য্যের উপরে আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া প্রতি ক্ষুদ্র কণায় বৃহৎ সুখকে, দূরের সুখকে অধিকার করিতেছে—

"তাঁদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা
মোদের বনে কুসুম ফুটে ওঠে।"

একটি যে দূরবিস্তারী "গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে"—প্রকৃতির কবি আজ প্রাণে প্রকৃতির সেই মিলনাধার ঔদার্য্যটি লাভ করিয়াছেন। যেখানে 'বিরহ', সেখানেও আবেগ ব্যাপ্ততায় শান্ত হইয়া গিয়াছে। দুপুরে ঝাউর অবিরাম শব্দে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত আকাশ বিরহবাঁশীর সুরে কাতর—আবেগ আর হৃদয়ের সংকীর্ণ কোটরে জলিয়া মানুষটিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না, শুভ্র অলস মেঘ-জড়ানো আকাশ, নিস্তরঙ্গ নদী—সমস্ত প্রকৃতিকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে।

মিলনে আহ্বান—সেও কি অতীব্র সুরে!—

এস তোমার চরণদুটি
তৃণের পরে ফেলে!'

আর মিলন তো নিতান্তই 'সোজাসুজি'। সোজাসুজি বলিয়াই ছোট নহে, পরন্তু অতি বৃহৎ, মনোরম উচ্ছ্বাস—

দুটি চক্ষে বাজ্‌বে তোমার
নব রাগের বাঁশী

কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠ্‌বে হাসিরাশি।

অতর্কিতে কোনদিন দুর্দ্দিনে সুন্দরী ফুল নিতে আসিয়া পড়িলেও কোন শশব্যস্ততা নাই। মনে পড়ে বটে একদিন ছিল,

'বন, আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি,—'

কিন্তু অচিরেই সে খেদ পরিহার করিয়া 'ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন ধুয়ে ধুয়ে' দেওয়া হয়। এক একদিন 'মনের কথা জাগানে' বাতাস বহিলে আগের কথা মনে পড়িয়া প্রাণের তল হইতে বেদনা মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু—'আজকে কিছুই গাব না'—কবি সহজেই আপনাকে সংবরণ করিয়া ফেলেন।

তাই দেখিতেছি শান্তি, ব্যাপ্তি—দেখিতেছি অসীমে প্রসার। প্রথমভাগে কবি তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া আসিয়াছেন,—ক্রমে দেখিতে পাই, মিলন, বিরহ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রাণটিকে আদৌ ধরিতে পারিতেছে না, তাহাদের মধ্য হইতে 'সূত্রং মৃণালাদিব' সৌন্দর্য্যটুকু লইয়া, আনন্দরসটুকু লইয়া প্রাণ কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে। সুখদুঃখ ত পাতার ভেলার খেলার মত, স্নানযাত্রার মেলায় বালকবালিকার হাসিকান্নার মত, প্রেমও নিতান্ত সহজ—এ সব ছাড়াইয়াও কবি কোথায় যাইতেছেন? তাহার উদার প্রাণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া দিতে পারে? উত্তর—প্রকৃতিকে। পূর্ব্বে যে সুর শুনিয়াছিলাম 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি', এখন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। মাধুর্য্যে কবি আজ ধনী, তিনি আজ কৃতার্থ, তিনি আজ দাতা, সকলকেই তাঁহার কিছু দিবার আছে—

আছে আছে কিছু রয়েছে বাকী।

প্রকৃতির বুকেই যেন তাহার স্থির শান্তির ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে।

কবিও তাহা ছবিতে এবং সিধা কথায়ও বলিয়া দিতে বাকী রাখেন নাই। "ভর্ৎসনা" কবিতায় কবি বলিতেছেন—"আমাকে তিরস্কার করিও না। আমি বিনা স্পর্শে তোমার সৌন্দর্য্য লইয়াছি, আমি কাহারো জন্যে অপেক্ষা করিয়া নাই—আমার গৃহ আছে—সেখানে

"জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মত"।

আবার সিধা কথাতেই বলিতেছেন—

"দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি"
"তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি পিছুতে"।

স্থির শান্তির ঘর রচিত হইয়া গিয়াছে। তাই যতই শেষের দিকে যাই, ততই প্রাণ মেঘমুক্ত, ততই প্রাণ আপনার ঔদার্য্যপরিমাণ বিহারভূমিতে আসিয়া পড়িতেছে,—শেষের দিকে যতই যাই, ততই সেই 'বিপুল বিরতি', সেই 'অকূল শান্তির' সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছি। প্রভাতে কবির প্রাণটি বর্ষাধৌত প্রকৃতির উপর পড়িয়া ঝিকিঝিকি করিয়া কাঁপিতেছে, সংসারের আচারকে অবহেলা করিয়া বর্ষার ঝর্ঝরের সঙ্গে মাতিয়া উঠিতেছে—নব বর্ষায় নানা রঙের অনুকারে নানা রঙীন্ ভাবের জাল প্রাণের চারিদিকে ময়ূরের পাখার মত খুলিয়া যাইতেছে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য বুকের মধ্যে আসিতেছে, আবার প্রাণের ভাব বিশ্বে বাষ্পবায়িত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। যেমন :—

"নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।" * *

প্রকৃতিও নদীকূলে, কেতকীতটে, মেঘপ্রাসাদে, বকুলশাখার অন্ধকারে, অনতিস্ফুট বিভাসে নিজের মূর্ত্তিখানি দেখাইয়া পালাইতেছে।

একজন চিত্রকর যদি এই ছায়াভাসগুলিকে অস্বরব্যঞ্জনের বর্ণে ফুটাইতে পারিতেন। এত তন্ময়তা, এত সৌন্দর্য্য, এত বিস্তার, এত সুসঙ্গত সঙ্গীত যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট লিরিক্ সৃষ্টি না করিতে পারে, তবে জগতে আর পূর্ণ লিরিক্ নাই।

এইরূপে সৌন্দর্য্যের মাতালের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যের ব্যাপ্তক্ষেত্রে আসিয়া আমরা বহির্ভুবনের উপর গলিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু অবশেষে আরও একটি নিবিড়তর স্পর্শে আমরা অতলের অতলে ডুবিয়া গিয়াছি। প্রকৃতির মধ্যে এতকালের আরাধ্যা আবির্ভূতা হইলেন, প্রাণ আনন্দে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসিয়া গেল, কোন দিকে আর তীরের সন্ধান পাইল না।

"আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়
আজি জলভরা বরষায়।"
"যেথা চলিয়াছে সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে"।

কবির বীণা নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষণিকায় সৌন্দর্য্যের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষণিকা একখানি সাধনার ইতিহাস, সৌন্দর্য্যসাধনা ও মাধুর্য্যসাধনার ইতিহাস অর্থাৎ পরম কবিতা. কবিদের আপনাদের জিনিষ। কবি সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সাধনা সফল হইয়াছে। তাই কবি সংসারের জন্য একটি আলয় নির্ম্মাণ করিতেছেন —তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আদর্শস্বরূপা এই কল্যাণী।—কবির "সর্ব্বশেষের গানটি" সিদ্ধকাম কবিকে আবার সংসারের সহিত মিলাইয়া দিতেছে।

ক্ষণিকায় আরও দুটি কবিতা আছে। সুগম্ভীর দুটি কবিতা।

সেই দুটি পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারিব, তুমুল ছন্দে কাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইখানেই আমরা অতলের অতলে ডুবিয়া যাই। চঞ্চল হইতে গভীর সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া বাংলার প্রকৃতির বনপথ দিয়া একটি কবির প্রাণ আসিয়া অবশেষে এক "স্তব্ধ উদার আলয়ে নীরব নিভৃত ভবনে" উপস্থিত হইয়াছে। এখনো

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্তনয়নে
অশ্রুজলের রেখা ?"

বাংলাও ধন্য, আমরাও ধন্য। যতই সংসারের ভার বাড়িবে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে আমাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে, ততই এই পরিপূর্ণ কোমল মাধুর্য্যের বিবরণ সর্ব্বদাই আমাদিগকে অসীম এবং সুন্দরের সহিত অন্তত কণাতেও সংশ্লিষ্ট রাখিবে। যাহারা এইরূপ সুন্দর হইতে জানে এবং মানুষের জীবনের নিগূঢ় মধুররস নিজের প্রাণে পাইয়াছে, তাহারাই যেন আপনার কথা গান করে, তাহারাই যেন লিরিক্ কবিতা লেখে। কারণ ঐ একটি হৃদয়ের জ্যোতিঃসম্পদে সমস্ত মনুষ্যজাতির গৌরব।

ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম। আসল কাব্য পাঠের যে আনন্দ, তাহার শতাংশের একাংশও বলা হইল না। যাঁহারা ক্ষণিকা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা বুঝিবেন। ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম সত্য, কিন্তু প্রসঙ্গত একটু এদিক্-ওদিক্, একটু আগে-পাছে দৃষ্টি দেওয়া অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ধারাবাহিক। স্তরে স্তরে তাঁহার কাব্যের বিকাশ—কোনোখানে একটা উড়িয়া-আসা উদ্ভট কবিতা পাওয়া দুষ্কর। তাই একখানি কাব্যের সূত্রেই স্বভাবত আমরা তাঁহার অন্যান্য কাব্যে গিয়া উপস্থিত হই। ক্ষণিকা হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—কি আলোড়ন, কি বেদনা, কি একটা অশান্ত অন্বেষণ। সেই 'তলতল ছলছল' ইত্যাদি আহ্বানের গভীর

আবেগ ;—সেই 'ভীষণরঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা রাত্রিবেলা' ইত্যাদি অতি মাধুর্য্যের অবসাদান্তে উন্মত্ত মিলন ;—সেই ধরণীগগনের সৌন্দর্য্যকে ব্যথিত হৃদয়ের বেষ্টনে মানসী প্রেয়সীর রূপে আহরণ করিয়া লইবার চেষ্টা,—যেমন 'মানসসুন্দরীতে' ; আবার সেই রমণীকে সমস্ত সম্বন্ধকর্ত্তব্যবন্ধন হইতে ছাড়াইয়া বিশ্বভুবনের অঙ্গে তাহাকে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া—যেমন উর্ব্বশীতে ; সেই 'যেতে নাহি দিব' স্বরে বুক চিরিয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রন্দন ; সেই চিত্রাঙ্গদায় পার্ব্বতীয় অরণ্যছায়ে দীর্ঘায়িত প্রেমলীলা—আরও সেই কত ঢেউয়ের টলমলানি, কত স্রোতের টান যে দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কি একটা কৃচ্ছ্র আলোড়নই দেখিতে পাই! তাহার পরে ক্ষণিকায় আজ সৌন্দর্য্য সহজ হইয়া আসিয়াছে 'নাগাল পেয়েছি নীচুতে'! যদি চৈতালী ও কল্পনার কথা মনে করা যায়, তবু ধারাটি বেশ স্পষ্ট। চৈতালীতে যে একটা শান্তি আছে, সেটা গভীর শান্তি নহে, সে বিকাল-বেলার শান্তির মত—তখনো সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রাণ একেবারে নিবিড় মাথামাখিভাবে মিশিয়া যায় নাই ; তাই কল্পনায় আবার ক্রন্দনস্বর :—

"হে কিশোর তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
করহ আহ্বান"

প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন হয় নাই—তবু কাছাকাছি আসিয়াছে, যেমন——

"বিদ্যুতের চম্‌কানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম
মিশে যেত আকাশে-পাতালে
বিদ্যুতের চম্‌কানি-কালে"—

কিন্তু ক্ষণিকায় একেবারে মিলন "অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি"।—ক্ষণিকার যে শান্তি, তাহা নিতান্ত নিবিড়রহস্যময় মধ্য-রজনীর শান্তি।

ক্ষণিকা হইতে এখন আবার আমরা কোথায় যাইব? রবীন্দ্রনাথ যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার জন্য তো আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু আরো কি সম্মুখে চাহিতে পারি না? ওয়াল্‌ট্ হুইট্‌ম্যান্ Passage to India বা 'ভারতযাত্রা' নামক কবিতায় আত্মার সঙ্গে সমুদ্রে বাহির হইয়া ভারতের তীরে উপস্থিত হইয়া যেমন বলিতেছেন—

"Passage to more than India O soul.
আরো দূর, ওরে প্রাণ, ভারত ছাড়িয়া—

তেমনি ক্ষণিকায় দাঁড়াইয়া আমরা কি "আরো দূরের" সঙ্গীতের, আরো বৃহৎ গভীর গুহার প্রত্যাশা করিব না?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

বিশ্বরূপ।

প্রিয়তম, বিশ্বরূপে মোরে বিশ্বময়
আজিকে দিয়েছ দেখা মোহিয়া হৃদয়!
তোমারে নয়ন ভরি দেখিতাম যবে
মুখ চেয়ে ভাব তার মহান্ গৌরবে
সবলে হৃদয় মোর লইত কাড়িয়া,—
ভাল বেসেছিনু তারে অধিক করিয়া!

রূপের অতীত ভাব আজি বিশ্বরূপে
উদয় হতেছে যাহা অতি চুপে চুপে
অন্তরের অন্তস্তলে,—সেই ভাবে আজ
বিমুগ্ধ করিছে মোরে হে হৃদয়রাজ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সন্ধান।

কোন্ রূপে—কোন্ খানে তুমি প্রিয়তম
বিরাজিত—স্থূল সূক্ষ্ম নহে বোধগম!
প্রভাতের প্রথম কাকলি আনে কাণে
যে সঙ্গীত, সে সঙ্গীতে তুমি পশ প্রাণে!
তরু যে মাথায় ধরে পুষ্প অর্ঘ্য ভার—
সে শুধু দেখায় মোরে চরণ তোমার!
নিখিল ভরিয়া বহে মৃদুল পবন—
সে আমারে দিয়ে যায় তব পরশন!
লক্ষ তারা ফুটে রয় নিঃশব্দ আকাশে,
তোমার রহস্যকথা মোর প্রাণে ভাষে!
হেথা শশী অস্ত যায়,—হোথা উঠে রবি,
আমি দেখি তোমার—সে বিভূতির ছবি!
তোমার অসীম ব্যাপ্তি ধ'রেছে আকাশ,
আমারে দিয়েছ ধরা—ওহে অপ্রকাশ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৯। | ১০ম সংখ্যা।

বৈষ্ণব সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

নাস্তিকের নিরীশ্বর তত্ত্বকে বৈষ্ণব দার্শনিক কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের কশাঘাতে অস্থির করিয়া স্থানভ্রষ্ট করত অনাদি অনন্ত পরমকারুণিক ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে জগৎসাক্ষাৎ আরোপ করিতে পারিয়াছেন। সে সৌন্দর্য্যটি একটি ভয়ানক সত্য এবং সে সৌন্দর্য্য অন্য সব দর্শনকে খাটো করিয়া দিয়া বৈষ্ণবপ্রভাব এমন একটি অভিনবভাবে দাঁড় করাইয়াছে যে, বৈষ্ণব মহাজনগণ শাকসবজিপরিপুষ্ট নিরহঙ্কার নিষ্কাম মস্তিষ্ক হইতে কেবলই সুধানির্য্যাস জগৎমধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

চিত্র, কাব্য ও অভিনয়, এ তিনটি উপায়ে যখন আমরা সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে যাই, তখন দেখিতে পাই,—

চিত্রকর রেফ্যাইল তাঁহার মেডোনা যিশুমাতার চিত্রে যে মাতৃ-সৌন্দর্য্য ও জননীর অমিয়মাখা মুখের ছায়া প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহা সেই শিশুমাতার হুবহু ছবি না হইলেও অদ্য সেই ছাপাই জগতে

মেডোনাকে ভক্তহৃদয়ে যথার্থ মেডোনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যিশুর চিত্রসম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যথার্থ মেরী বা যিশুকে কেহ দেখে নাই, অথবা চিত্রকর যাহাকে আদর্শ করিয়া এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার নামও কেহ জ্ঞাত নহে, কিন্তু মেডোনা ও যিশুর চিত্র ভক্ত-হৃদয়ে অদ্য পর্য্যন্ত ভক্তি আকর্ষণের চরম উপায়।

বঙ্কিম প্রভৃতির কাব্য পাঠে আমরা অপর আর এক প্রকারের সৌন্দর্য্য অনুভব করি। মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই, তাঁহার নায়কনায়িকাগণ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইতেছে, অন্তর্হিত হইতেছে। গিরিজায়ার রূপ তুলিকায় প্রতিফলিত না হইয়া ভাষার মধুর স্রোতে পাঠককে যে সুখ অনুভব করাইয়া বিমোহিত করিতেছে, সে ভাব অন্য প্রকারের মাধুরীমিশ্রিত সুধা। আয়েসার, কুন্দের, শৈবলিনীর চিত্র না দেখিয়াও আমরা তাহাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্যের এখানে আর এক আদর্শ ও অন্যতম উপায়।

যাত্রা কিংবা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আমরা নরনারীদিগকে সীতারাম, রাধাকৃষ্ণের সাজে দেখিয়া তাঁহাদেরই অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়া যখন সুখানুভবে আত্মহারা হই, তখন সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্যই আমাদের মন ভুলাইয়া ফেলে। নরনারী, দেবদেবীর সাজে তাহাদের অস্তিত্ব তৎকালের জন্য লোপ করিয়া দেয়।

দেখা যাইতেছে, সৌন্দর্য্যপ্রভাব জগতে কুহকি-মায়াতে মন ভুলাইয়া দিবার কি অনির্ব্বচনীয় ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা ধরে। খৃষ্টান দর্শন, হিন্দু দর্শন, বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞানী বৈষ্ণব দর্শনের প্রভেদ এই যে, বৈষ্ণব দর্শনে আমরা সেই রেফ্যাইলের চিত্রাঙ্কনমাহাত্ম্য দেখিতেছি। বৈষ্ণব দার্শনিক বলেন, অজ্ঞেয় পরমেশ্বরকে জ্ঞানসহযোগে জানিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। তাঁহাকে বাদ দিয়াও আমরা সৃষ্টির সৌন্দর্য্যসহযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, অনুভব করিতে

পারিতেছি, সদা সঙ্গসুখে সুখী হইতে পারিতেছি। কারণ বৈষ্ণব তাঁহার মনোবৃন্দাবনের কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে সৃষ্টির যাবতীয় সৌন্দর্য্যের ও জগৎপাতার সৃষ্ট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি প্রতিকৃতি আঁটিয়া সেই ছবিটিতে শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি অনন্ত প্রেমের একটি আদর্শ নিয়া নিত্য সুখ অনুভব করিতেছেন। বৈষ্ণব বলেন, ভগবান্ আছেন থাকুন; তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমার অর্চ্চামূর্ত্তিতে তাঁহাকে দক্ষিণ দিকে স্থান দিয়াছি, কিন্তু নাম নিবার সময় আমি মাধুরীযুক্ত নামটি আগে নিব, তাঁর নাম মাধুরীর পশ্চাৎ যোগ করিয়া দিয়া তাঁহাকে পূর্ণ করিয়া মধুর "জয়রাধে কৃষ্ণ" নামে ডাকিব। তাঁহাকে বাদ দিয়াও দেখি—

"বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।"

তাঁহাকে বাদ দিয়া বলি—

"জয় রাধে শ্রীরাধে।"

তাঁহার সহিত যাঁহার সম্বন্ধ অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত গোপী মহারাসে নিমগ্না—তুমি আমি সেখানে কে?

হিন্দুদর্শন মায়াবাদসহায়তায় জড় জগৎকে মায়ার চক্ষে দেখিতেছেন, আর প্রচার করিতেছেন—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।

আর যেন ভবযন্ত্রণা পাইতে না হয়। সেই সুরে শাক্ত প্রেমিক গান ধরিলেন—

"জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা,
যে জন্মিছে সে জানে মা;
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা,
জন্মিলি না মরিলি না।"

বৈষ্ণব বলিতেছেন—

চিনি হইতে চাই না রে,
চিনি খেতে চাই।

জন্মান্তরে যেন এই জন্মই হয়, এইরূপ শ্রীপদসেবাতেই জন্মজন্ম কাটাই। অনন্ত জগৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোটি গোপবালার একই কর্ত্তব্য, একই চিন্তা, একই আনন্দ; সেই মহারাসের একটি কণিকা-মাত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়া সার্থক বোধ করেন। হিন্দু দর্শন জগতের কেবলই অসারতা অনিত্যতা প্রচার করিতেছেন, বৈষ্ণব সেই মায়াটাকে অনন্ত শক্তির সৌন্দর্য্যজ্ঞানে আত্মহারা হইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতেছে। উত্তাল সমুদ্র দেখিয়া ভীত নহে, কিন্তু সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া রত্ন কুড়াইতেছে। ভীতচিত্তে সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল নহে, ভবভীতি হইতেও সন্ন্যাস প্রভৃতি ভয়াবহ উপায় তল্লাস করে না, সংসারকে লীলাময়ের বিচিত্রলীলার একটি রাসমণ্ডপ জ্ঞানে তাহারই একটি প্রান্তে স্থান পাইয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করে। সংসার যদি পরিত্যাগের জিনিষ, তবে কোন্ স্থানে সংযোগের জিনিষ পাইব?

বৈষ্ণব কবি শুকশারীর মুখে বলাইতেছেন—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন।

বটেই ত "মদনমোহন" হইতে মোহিনী প্রকৃতি সতীকে তফাৎ করিলে "মদন" যে একা আড়ষ্ট পাষাণবিগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈষ্ণব এই সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে বিলিপ্ত করিয়া কেবল সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্য অনুভব করিয়াই শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিতে চান।

বৈষ্ণব দার্শনিক বলেন, মায়াময় সংসার বটে, কিন্তু এ মায়া মিথ্যা নহে। সংসার অনিত্য বটে, কিন্তু ইহা প্রেমবৈচিত্র্যমাত্র। ইহাতে

পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর, বিরহ, মিলন লইয়া একটি অতিবিচিত্র এবং মধুর লীলার সমাবেশ। জীব এখানে কর্ম্মভোগের জন্য জন্মায় না, লীলা-ভোগের জন্য অবতীর্ণ। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, তুমি যেন একখানা সুন্দর চিত্র দেখিতেছ। চিত্রকরের বাহাদুরী আছে, তোমার নয়নসমক্ষে চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা বিস্তার করিয়া তাজমহলের প্রতিকৃতি হুবহু দেখাই-তেছে। অবশ্য যথার্থ তাজ হইতে চিত্রিত তাজ অন্য জিনিষ। কিন্তু তোমার যদি চিত্রদর্শনের উপযোগী ক্ষমতা থাকে, এই প্রতিভাশালী চিত্রকরের চিত্রে তুমি তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পার। যদি ইহা মিথ্যা-পট বলিয়া উড়াইতে চাও, তোমার তাজ দেখার বা অন্তত তাজমহলের সৌন্দর্য্যদর্শনই ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু তুমি যদি তাজের ছবিতে তাজ অনুভব করিতে চাও, তবে এ চিত্রে তাহা প্রচুরপরিমাণে আছে। নতুবা যথার্থ তাজ ও চিত্রিত তাজ মায়াবাদীর নিকট একই বস্তু। দার্শনিকেরা বিচারে অনেকসময় নিজের অস্তিত্বকে ভ্রম মনে করেন, এরূপ তর্ক দার্শনিক-মহলে বিরল নহে।

বৈষ্ণব দার্শনিক বলেন—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—মহাপ্রভু নিমাইচাঁদ দার্শনিকমত্তহস্তী প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে দর্শন-প্রধান রাজধানী বারাণসী নগরীতে তাঁহারই উচ্চ সিংহাসন হইতে এই ব্যাখ্যাবলে ভূমিলুণ্ঠিত করিয়া আপনার পাদপদ্মে পাতিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—ঐ দৃষ্টান্ত ও ঐ ব্যাখ্যায় বেদান্তী দার্শনিকগণের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল। ইহার একমাত্র কারণ মায়াবাদখণ্ডন। এই মায়াবাদই বৈষ্ণব দার্শনিক একমাত্র সৌন্দর্য্যরসের কশাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন।

আর একটা দৃষ্টান্ত—মনে কর, তুমি তোমার প্রতিবিম্বটিকে সন্দেশ খাইতে দেখিতে ইচ্ছা কর। তুমি যদি দর্পণের মধ্যস্থ ছায়ার মুখে বারং-বার সন্দেশ তুলিয়া দাও, তবে তোমার সে সাধ কি পূর্ণ হইবে? অযথা

বালকের প্রয়াসের মত ব্যর্থ হইবে না? কিন্তু যদি তুমি নিজের মুখে সন্দেশ দিয়া ছায়ার দিকে দর্শন কর, তবে দেখিবে ছায়াতে সন্দেশ-ভক্ষণের ভাব হুবহু প্রতিফলিত হইয়া তোমার সে ইচ্ছা সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ এই মায়াবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি আপনার অসীম সৌন্দর্য্যে অনন্ত লীলার মহিমার, অপার করুণার বিন্দুর সুখটাও অনুভব করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইলে। মায়ামোহ বলিয়া সংসারটাকে পরিত্যাজ্য ও কঠোর ভাবে দেখিবে না। দেখিবে, জীবমাত্রই কর্ম্মভোগের জন্য নহে; ভগবানের অনন্ত লীলার সাথীর মত এই অনন্ত রাসমণ্ডপে তুমিও একজন অভিনেতা, তুমি একজন রসিক, তুমি একজন গোপী, তুমি একজন মানবজন্মধারী রাসকারী। তখন বুঝিবে:—

সুখদুঃখ মনের অবস্থান্তরমাত্র—পাপপুণ্য নিজকৃত আরাম বা ব্যাধি, অন্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। তখন দেখিবে, সুখ এবং দুঃখ দুটি ভাই সংসারক্ষেত্রে যমজ ভ্রাতা। অতএব সুখ এবং দুঃখ নিয়া মায়াবাদের ডালা মাথায় করিয়া ভবসমুদ্রপারের জন্য ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রে সুখ এবং দুঃখ আলো ও ছায়া। এই বিচিত্রতা না থাকিলে চিত্র কি সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি সঞ্চার করিতে পারিত? Light and shade বাদে কি চিত্র সম্ভব? ইক্ষুতে ফল ফলাইবার জন্য প্রয়াস, যেমন বিকৃত অভিলাষের ঐকান্তিকতা, চন্দনের ফুল ফুটাইবার জন্য চেষ্টা যেমন বৃথা বাতুলের ক্রন্দন, সংসার হইতে সুখমাত্রপ্রয়াসও সেইরূপ অরসিকের প্রলাপমাত্র। বৈষ্ণব বলেন, অনন্ত লীলায় জীব যখন মগ্ন থাকে, তখন তাহার পক্ষে সব সমান। শ্রীমতী যখন পূর্ব্বরাগ হইতে মাথুর অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি সব দুঃখ, অপমান, কষ্ট, বিড়ম্বনাদি, সুখের উপাদান জ্ঞান করিয়াছিলেন। সুখের মিলনের জন্য তিনি যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, সবই তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল। চিত্রদর্শনের পর নব অনুরাগ নয়নজল—পাকশালার ধূমের দরুণ অশ্রু

পাত—হইতে রক্ষা করিয়াছিল, ননদীর বাক্যবাণের মধ্যে নাগরের নামোল্লেখ নামশ্রবণের সুখানুভব করিতে দিত, অভিসারপথের কণ্টকক্ষত হইতে রক্তপাত তাঁহার পায় আলতা পরাইত, পেছন হইতে সখীদের রাইএর এ অবস্থার দরুণ কাতরতা—

ললিতে ধীরে যা ধীরে যা,
এত উতলা কেন?
বিরহে জর্জ্জরা প্যারী
কুশাঙ্কুর ফুটে পায়?

কিন্তু যাঁহার পায় কুশাঙ্কুর ফুটিতেছে, তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি দেখিতেছেন, পাদপদ্মে আলতার বাহার। বনপথে বিষধর সর্প চরণে বেড়িল, শ্রীমতী দেখেন, মণিময় মঞ্জীর—

কিন্তু বিরহের সময় অর্থাৎ যখন জীব ঈশ্বর হইতে দুরে পড়িয়া যায়, তখন প্যারী অন্ধকারঘরে সর্পই দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে সর্পভীতি, গঞ্জনার কঠোরতা, লোকলজ্জার ধিক্কার, সবই যেন সশরীরে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দেখা দিল। অস্থির শ্রীমতী তখন বিরহে কাতরা, অপ্রবোধী, জীবন্মৃতা, সঙ্গিনীগণ কৃষ্ণনাম কাণে শুনাইতেছেন, কিন্তু মরমে বিষের জ্বালা—যন্ত্রণায় অস্থিরা শ্রীমতী রাইকমল ধূলায় লুটাইতেছেন, সখীরা উপদেশ দিলেন—

"তুমি কৃষ্ণনাম শুনিতে পাও না, এমনই বধির হইয়াছ, আচ্ছা ও রূপ ধ্যান কর।"

শ্রীমতী বলিলেন—"আমি তাকে কখনও নয়ন ভরিয়া দেখি নাই, নয়নকোণে মাত্র দেখিয়াছিলাম, তোমরা ত তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ, তোমরা তাঁহার রূপধ্যানের অধিকারী—যে সমুদ্রে ডোবে, সে কি সমুদ্র-শোভা দেখিতে পায়?

তার পর মানের পালা। এ দুর্জ্জয় মানের মধ্যে পড়িয়া কত ভক্ত কত ভাষায় কত ভাবে ভগবান্‌কে মানভিক্ষা সাধাইলেন,

বৈষ্ণব ভক্ত—

"আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।"

কালীভক্ত—

"মা তোমার এম্‌নি বিচার বটে।"

ব্রহ্মভক্ত রামমোহন—

"কোথায় আনিলে
পথ ভোলালে।"

তার পর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু যাহা করিয়া ভক্তের মানরক্ষা করিলেন, সে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কোথায় না ভগবানের হাত আছে? ভক্তের চরণ কি তাঁহার হাতছাড়া? তখন ভগবান্ বলিতেছেন,—

"রাই তুমি সে আমার প্রাণ
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থান।"

বটেই ত, এই অনন্ত লীলাও আমারই জন্য, আমার জন্যই ত এই সব বিচিত্র সংসারসৌন্দর্য্য, আমি কোন্ প্রাণে 'মায়া মায়া' করিয়া সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া আড়ষ্ট, কঠিন, শুষ্কত্যাগী সাজি? কেন, কি দুঃখে, কার জন্য? ভগবান্‌কে পাইতে? দূর পাগল, কেবলই মাটি খুঁড়িলি, কৈ কহিনুর ত পেলি না, তাই পাগল হইলি?

বৈষ্ণব দার্শনিক বলেন—

কোটী কোটী জীবলীলার এ বিশ্বের মেলা,
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা?

তত্ত্বজ্ঞানহীনকে কবি বলিতেছেন—

"যার খুসি রুদ্ধচক্ষে কর বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ' সেই জ্ঞান;
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে,
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।"

এক্ষণে পাঠকের নিকট নিবেদন, সেই যে মেরী মাতা ও যিশুর ছবির কথা গোড়ায় বলা হইয়াছে, তাহার কথাটা একবার তুলি। রেফ্যাইল কোন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মুখাকৃতি হইতে মেরীর *Outline* ও কোন একটি লোকের আদর্শ হইতে যিশুর মুখের *Outline* সংগ্রহ করিয়া নিজ চিত্রাঙ্কনপ্রতিভাবলে যে তুলির আঘাতে রং ফলাইয়া জগতে মেরী ও যিশুকে ভক্তহৃদয়ে ব্যাপ্ত করিয়া গিয়াছেন, যথার্থ মেরী বা যিশুকে অদ্য পৃথিবীতে সেই আদর্শই দাঁড় করাইয়াছে। এটা যেমন রেফ্যাইলের মহিমপরিচায়ক, বৈষ্ণব দার্শনিকও সেইরূপ সৌন্দর্য্যতত্ত্বদ্বারা দর্শনের শেষ মীমাংসা করিয়া জগতে প্রেমসুখ প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

উপসংহারে নিবেদন,—প্রবন্ধটিতে শত শত দোষ পরিলক্ষিত হইবে,—সমালোচকগণ, বৈষ্ণব রসিকগণ,—বিশেষত বৈষ্ণব মহাজনগণ ইহাতে রসাভাসের অনেক কারণ দেখিবেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন,—প্রবন্ধটি বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্বের গভীর গবেষণার নির্য্যাস নহে। ইহা বৈষ্ণব সৌন্দর্য্যমদিরাপানের ক্ষণিক মাদকতাবস্থার সুখস্বপ্নাবেশের প্রলাপও হইতে পারে। সুসঙ্গীতশ্রবণের শেষ তান যখন প্রাণ বিমোহিত করে, ঐ সময়ের ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির ভাবমাত্র। কাজেই প্রবন্ধটিকে নামকরণ করিবার সময় তার স্বরূপ ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইলেই প্রবন্ধলেখকের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ পাইবে। এমনও

আশা করা যায় যে, বৈষ্ণবদর্শন উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িয়া সময়ে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে মহামূল্য রত্ন সঞ্চয় করিবে। সে আশা সুদূরপরাহত নহে।

শ্রীমহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা।

অন্তিমে। *

মারগারেট অন্তিমশয্যায় শায়িতা। পঁয়ষট্টিবৎসর বয়সে তাঁহাকে অন্তত পঁচাত্তর বৎসরের মত দেখাইতেছে। নিশ্বাস অতি কষ্টে বহিতেছিল, সমস্ত শরীর কম্পিত ও বিবর্ণ; মুখ বিকৃত এবং চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়া আসিতেছিল।

তাঁর বড় বোন—তাঁর চেয়ে পাঁচ বৎসরের বড়—তাঁর পদতলে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। একটা ছোট টেবিল পালঙ্কের পাশে সরান ছিল, তার উপর বাতি জ্বলিতেছিল। তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে ধর্ম্মযাজকের আগমন ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ঘরটিতে চিরবিদায়ের সে নিরাশার দৃশ্য অতি ভয়াবহ। ঔষধের শিশিগুলা, কাপড়ের টুকরা এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চৌকীগুলা যে ত্রস্ত ও ভীত—রুদ্র কাল যেন ঘরেরই কোন্‌খানে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এই দুই ভগ্নীর পূর্ব্বকাহিনী বড় দুঃখের। সে কথা সকলেই জানিত এবং বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিত।

বড় বোন সুজেন যৌবনে একজনকে বড় ভাল বাসিয়াছিল এবং তাহার সে ভালবাসার প্রতিদানও সে পাইয়াছিল। তাহাদের

* গি—ডে—মোপাসা হইতে।

বিবাহের দিনও স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই হেনরির মৃত্যু হয়। ভগ্নহৃদয় সুজেন সেই যে বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিল, তাহা আর সে ত্যাগ করে নাই!

তার ছোট বোন মারগারেট—বয়স তার তখন সবেমাত্র বার—সে আসিয়া দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বড় দিদি ভাই, তোমাকে আমি অসুখী হইতে দিব না, চিরজীবন কাঁদিয়া কাটাইতে দিব না—কখন না। আমি—আমিও এ জীবনে কখন বিবাহ করিব না, চিরদিন তোমার কাছেই থাকিব।" সুজেন বালিকার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, কিন্তু তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। কিন্তু মারগারেট তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। জননীর ক্রন্দন, জনকের অনুরোধ, সুজেনের আগ্রহ, কিছুই তাহাকে টলাইতে পারে নাই। কত যুবক তাহাদের সমস্ত হৃদয়ের ভালবাসা সেই উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরীর পদে উৎসর্গ করিয়াছিল, কিন্তু সে কাহারও পূজা গ্রহণ করে নাই—সে তার বোনের কাছেই রহিল।

তাহারা দুই বোনে সমস্ত জীবন একত্রে কাটাইয়াছে। মারগারেট সর্ব্বদা বড় বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট থাকিত, যেন তার এই আত্মবিসর্জ্জন তার সমস্ত হৃদয়কে একবারে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়াছে। মারগারেট দিদির আগেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ত্রিশ বৎসরেই তার কেশ শুভ্র হইয়াছিল। দেখিলে মনে হইত, যেন কোন অন্তর্গূঢ় দুঃসহ বেদনা তাহাকে তুষানলের মত দহন করিতেছে।

আজ সে-ই আগে চলিয়া যাইতেছে। কাল সমস্তদিন কথা কহিতে পারে নাই। আজ প্রত্যূষেই বলিল—"দিদি, আমার সময় আসিয়াছে—ধর্ম্মযাজককে ডাকিয়া পাঠাও।" এই কয়টিমাত্র কথা বলিয়াই সে চুপ করিয়া রহিয়াছে। মুখ বিবর্ণ, ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল, মাঝে মাঝে কষ্টে শ্বাস বহিতেছিল, সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল—যেন হৃদয়ের

গোপন একটা কথা বলিবার জন্য তার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। সুজেন তার শয্যাপ্রান্তে মাথা রাখিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল—"মারগট, মারগট, ছোট বোনটি আমার।"

এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুমূর্ষু মারগারেট তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল এবং কথা কহিবার চেষ্টা করিল। বৃদ্ধ সাইমন ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়া তার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন—"বৎসে, পরমেশ্বর তোমার পাপ মার্জ্জনা করুন। সাহস অবলম্বন কর, সময় আসিয়াছে, কি বলিবার আছে—বল।"

সুজেন তখনও বিছানায় পড়িয়াছিল, ধর্ম্মযাজক তাহার নিকটে গিয়া তার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—"বৎসে, জগদীশ্বর তোমার হৃদয়ে বল দান করুন। তোমার মঙ্গল করুন।"

মারগারেট বলিতে আরম্ভ করিল। স্বর অতি ক্ষীণ, অতি কষ্টে বাহির হইতেছিল, সে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, "বড় দিদি ভাই, আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। হায়! আমি কত উদ্বেগের—কত আশঙ্কার সঙ্গে যে এই অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য চিরজীবন প্রতীক্ষা করিয়াছি, তাহা কে জানিত!"

সুজেন তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"লক্ষ্মী বোনটি আমার, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ? তুমি দেবী—তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছ, আমার জন্য তুমি জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছ।"

মারগারেট বলিল, "চুপ কর, চুপ কর, আমাকে বলিতে দাও, বাধা দিও না। বড় ভয়ানক, কিন্তু তা হোক্, আমি সব বলিব—শোন। তোমার হেনরি—হেনরিকে মনে পড়ে—" নাম শুনিয়া সুজেন কাঁপিয়া উঠিল। মারগারেট বলিতে লাগিল—

"শোন, সব না শুনিলে বুঝিতে পারিবে না। আমার বয়স তখন

সবেমাত্র বারবৎসর। আমি বড় আদুরে ছিলাম—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতাম। তোমার মনে আছে বোধ হয় কেমন করে সকলে আমাকে আদর দিয়া নষ্ট করিয়াছিল। প্রথম যেদিন সে আসিল, সেদিন চক্‌চকে বুট পায়ে দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিল। সিঁড়ির নিকটে নামিয়া তাহার এই বেশের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিল—সে পিতার কাছে কি একটা খবর লইয়া আসিয়াছিল। আমি তাহার সেই তরুণ দেবতার মত রূপ দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম—সে যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, আমি ঘরের এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমি তখন বালিকামাত্র। আমি সেই বালিকা-বয়সেই ভালবাসিতে শিখিলাম—সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। সে প্রায়ই আসিত এবং আমি নয়ন ভরিয়া তাহার সে রূপরাশি পান করিতাম। আমি বয়সের অপেক্ষা সকল বিষয়েই বড় ছিলাম—অনেক কথা বুঝিতাম। আমি রাত্রিদিন তাহারই কথা ভাবিতাম, আস্তে আস্তে বলিতাম—"হেনরি, হেনরি।"

তার পর—তার পর শুনিলাম, সে তোমাকে বিবাহ করিবে। ওঃ কি কষ্ট! সে আমার অসহ্য—অসহ্য! আমার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতে লাগিল—অশ্রুজলে কত বিনিদ্র রজনী পোহাইলাম। মনে পড়ে কি, একদিন তুমি তাহার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিলে; সে কত আনন্দ, কত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল, বলিল,—"বড় উপাদেয়!" রাক্ষসী হিংসা আমার হৃদয়ে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল—ভালবাসা ও হিংসায় মিলিয়া সেখানে একটা রণক্ষেত্র করিয়া তুলিল। ভাবিতাম আমি তাকে ভালবাসি—সে আমার, আমি বড় হইলে সে আমাকে বিবাহ করিবে। শেষে হিংসারই জয় হইল। আমি পাগলের মত হইয়া উঠিলাম।

তোমাদের বিবাহের দিনকয়েক পূর্ব্বে—মনে পড়ে কি—সেই আমাদের উদ্যানমধ্যে দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নালোকে তোমরা দুইজনে বেড়াইতে-

ছিলে। বেড়াইতে বেড়াইতে সে তোমার কটিদেশ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া তোমাকে চুম্বন করিল। আমি লুকাইয়া তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম—সে দৃশ্য আমার চোখে পড়িল। আমার সমস্ত দেহ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইল। আমার হিংসা তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিল—তখন আমি তোমাদের দুজনকেই হত্যা করিতে পারিতাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—"না, আমি এ বিবাহ হইতে দিব না—কখনই না; সে কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

তার পর আমি কি করিলাম জান? দেখিলাম মালী, কুকুর-বিড়াল মারিবার জন্য মাংসের সহিত কাচচূর্ণ মিশাইয়া দেয়। আমি সেই দিন কাচচূর্ণ সংগ্রহ করিলাম এবং তুমি হেনরির জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলে, তাহার সহিত মিশাইয়া দিলাম। সে তাহাই আহার করিল, আমিও কিছু খাইলাম, বাকী জলে ফেলিয়া দিলাম—তার পর সে মরিল, আমি মরিলাম না। তার পর—তার পর শোন, আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। আমি তোমার নিকটেই রহিলাম—বিবাহ করিলাম না। এই দীর্ঘ-জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে আমি যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি—মনে মনে গুমরিয়া গুমরিয়া যে দগ্ধ হইয়াছি, আজ তাহার শেষ। আমি সারাজীবন এই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম—এই দিনে তোমাকে সব কথা বলিব—আজ সেই দিন। আজ বড় ভয় হইতেছে, তাহার সঙ্গে আজ আমার দেখা হইবে—তাই এত ভয়? তা হোক্, দেখা ত হইবে। তোমার আগে আমি তাহার সহিত মিলিত হইব। বড় ভয় হইতেছে! কিন্তু তুমি ক্ষমা না করিলে আমি তার কাছে যাইতে পারিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নহিলে আমি মরিতেও পারিব না।"

মারগারেট নিস্তব্ধ হইল, তাহার শ্বাস বহিতে লাগিল, তার ক্ষীণ দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেই নির্ব্বাক্, নিষ্পন্দ। বহু—বহু কালের সেই পুরাতন স্মৃতি, সুজেনের চক্ষের সমক্ষে তাহাদের

সেই মিলনের চিত্র আঁকিতে লাগিল। তাহার সেই গাঢ় উত্তপ্ত প্রথম চুম্বন, তার সেই একমাত্র চুম্বন,—তার পর সব শেষ, সব অন্ধকার!

অকস্মাৎ বৃদ্ধ সাইমন বলিলেন, "সুজেন, বৎসে, তোমার ভগ্নী—" সুজেন তার অশ্রুমলিন মুখ তুলিল—মারগারেটের গলা জড়াইয়া তাহাকে ব্যাকুলভাবে চুম্বন করিল এবং বলিয়া উঠিল—"ছোট বোনটি আমার, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

পারসীকদিগের ভারতে আগমন।

ভারতবর্ষে যেমন নানা সময়ে নানা প্রদেশে সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় প্রভৃতি রাজারা রাজ্য করিয়া গিয়াছেন, পারস্যেও সেইপ্রকার ভিন্ন-ভিন্ন-বংশীয় রাজারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সহস্রবৎসর পূর্ব্বে "কায়োমার্স্"নামক একজন রাজা পারস্যের আদিম অধিবাসিগণকে জয় করিয়া পারস্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সকল আদিম অধিবাসিগণকে পারসীকেরা রাক্ষস, প্রেত ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিতেন। এই "কায়োমার্সের" পৌত্র "হোষাং" স্বীয় রাজ্যমধ্যে রাজনিয়ম প্রচলিত করেন, প্রজাগণমধ্যে কৃষিকার্য্য বিস্তার করেন। "হোষাং" এইপ্রকার নিয়ম-প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে "পেষ্দাদ্" বা নিয়মসংস্থাপক বলিত। তিনি পারস্যের "মনু" ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ "পেষ্দাদিয়ান" নামে পরিচিত হইতেন। এই পেষ্দাদিয়ানবংশে "জেম্শিদ্"-নামক সম্রাট্ অনেকগুলি সুবৃহৎ-নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, পারস্য-উপসাগর হইতে মুক্তা-উত্তোলন প্রচলিত করেন ও অনেক রাজপথ বারি-বায়ন

ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। "ফারাদিন"নামক একজন সম্রাট্ অতি-বিস্তৃত পারস্যসাম্রাজ্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া "সালাম্", "তুর্" ও "ইরাজ্" নামক স্বীয় পুত্রত্রয়কে প্রদান করেন ও স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। "পেষ্দাদিয়ান"বংশের শেষ রাজা "মুজারের" রাজত্বকালে তুরানপ্রদেশের রাজা "অফ্রিসিয়াব" অক্সস্-নদী পার হইয়া আসিয়া স্বহস্তে "মুজার"কে বধ করিয়া পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। বিখ্যাত পারসী বীর "রোস্তমের" পিতা "জালজার" বাহুবলে আফ্রিসিয়াবকে পরাজিত করিয়া অক্সস্ পার করিয়া তাড়াইয়া দেন। কিন্তু অবশেষে এই তুরাণীগণ আসিয়া পেষ্দাদের বংশ লোপ করে।

"পেষ্দাদ"বংশের পতন হইলে "কায়ানিয়ান্"বংশের "কায়খস্রু"-নামক একজন নিজ বাহুবলে তুরাণীগণকে পারস্য হইতে দূরীভূত করেন। ইউরোপীয় লেখকগণের নিকট "কায়খস্রু" "কাইরস" নামে সমধিক পরিচিত। কায়খস্রুর পর "গুষ্টাপ" অথবা "দেরায়স্ হেষ্টাস্-পিস্"নামক একজন সম্রাট্ গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। "গুষ্টাপের" পর "দারা" অথবা "দেরায়স কডোমানস্"এর রাজত্বকালে মহাবীর সেকেন্দার বা অলেকজণ্ডার পারস্যসম্রাট্কে পরাজিত করেন ও "কায়ানিয়ান্"বংশের লোপ সাধন করেন। "কায়খস্রু" ৫৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট্ হয়েন।

এই কায়ানিয়ান্দিগের রাজত্বকালে পারসীকদিগের ধর্ম্মের অবস্থা কিপ্রকার ছিল, ঠিক জানা যায় না। "গুষ্টাপ" একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করেন। তাহাতে "অরা-মাজদ" (বর্ত্তমান পারসীকদিগের "হরা-মজ্দ") দেবের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও "জোরস্ত্রা"র উল্লেখ নাই। গুষ্টাপের সময় পারস্যসাম্রাজ্য সকল বিষয়েই চরম উৎকর্ষ লাভ করে। "কায়ানিয়ান্"শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকে "আরকি-মিনিয়ান্"শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আলেকজণ্ডার ৩৩১ খৃষ্টাব্দে

পারস্যসাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। তার পর ২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পারস্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল অংশে প্রথমে গ্রীকেরা, পরে "পার্থিনিয়ান্"গণ রাজত্ব করেন। অবশেষে ২২৬ খৃষ্টাব্দে "আর্দ্দেশার বাবেজান্" নামক একজন প্রাচীন রাজবংশীয় সেনাপতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া আবার পারসীক-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ৫০০ বৎসর ধরিয়া বিদেশীর অধীনে থাকিয়া পারসীকগণের সকল দিকেই যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল। বাবেজান আবার পারসীকগণের উন্নতিতে মনোযোগ করিলেন। তিনি "মোবেদ"-নামক একজন পণ্ডিতের সাহায্যে উহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "অবস্থার" পুনরুদ্ধার করেন।

"আর্দ্দেশার"বংশের পর "সাসনিয়ান"বংশের একজন ভূপতি পারস্যের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই পারসীকদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কণামাত্র চেষ্টা করেন নাই। এই বংশের "নসিরবান"নামক নৃপতি (৫৩১—৫৭৯ খৃষ্টাব্দ) সিন্ধুনদ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। "সাস-নিয়ান"বংশের সকলেই "অজদীশন" বা "হবামাজদা সেবক" উপাধি গ্রহণ করিতেন।

"সাসনিয়ান"বংশের শেষ নৃপতি "ইয়াজ্দ্ এজ্রাৎ"। ইঁহার রাজত্বসময়েই মুসলমান-আক্রমণে পারসীকগণ চিরকালের জন্য পারস্য হইতে বিতাড়িত হয়েন; পারস্যের প্রাচীন রাজধানী "একবাট্না"র ২৫ক্রোশ দক্ষিণে "নাহাবাঁদ"নামক রণক্ষেত্রে পারস্যের সৌভাগ্য-রবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়েন। আরবের খালিফ, ওমার, পারস্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে "কাদেশিয়া", পরে "জাবুলা" ও অবশেষে "নাহা-বাঁদ" ক্ষেত্রে পারসীকগণকে উপর্য্যুপরি পরাজিত করেন। এই শেষ যুদ্ধে পারস্যের সম্রাট্ স্বয়ং একলক্ষ পঞ্চাশহাজার সৈন্য লইয়া "হামা-

দান"নামক পার্ব্বত্যপথ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণের নিকট পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রস্থান করেন।

কিছুদিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ইয়াজ্‌দ্‌ এজ্‌রাৎ" আবার লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক "কাদেশিয়া"র প্রান্তরে মুসলমানগণের সম্মুখীন হইলেন। ৪দিন ভয়ানক যুদ্ধের পর পারসী সেনাপতি "রোস্তম" হত হইলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের সুপবিত্র বৈজয়ন্তী 'দারেফশি-কাবানি" মুসলমানগণকর্ত্তৃক গৃহীত ও ধর্ষিত হইল। ইহার কিছুদিন পরে রাজা আবার একবার বিধর্ম্মীদিগের সহিত সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষাধিক পারসী মুসলমানহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। রাজা বনে বনে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে অর্থলোভে কোন তস্কর তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করে। বহুকালের প্রাচীন বহুজনসেবিত পারসীকগণের ধর্ম্মের চিরকালের জন্য পতন হইল। মুসলমান-অত্যাচারে অধিকাংশ পারসীক হয় নিজ ধর্ম্ম, না হয় নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রাচীন "মাজদাসনিয়ান্‌" ধর্ম্ম লইয়া বনমধ্যে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

মুসলমান-আক্রমণের পর প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই মুষ্টিমেয় পারসীকগণ প্রাণপণে নিজ ধর্ম্ম লইয়া ইতস্তত পলাইয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাবে সময়ক্ষেপণ করা বড় কষ্টকর। ভবিষ্যতে আর পারসীকগণের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অনেকেই ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য পারস্য ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একশত বৎসর খোরাসানের বনমধ্যে বাস করিয়া অবশেষে তাঁহারা পারস্য-উপসাগরের তীরে "অরমস্‌"বন্দরে উপস্থিত হইলেন ও তথায় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবর্ষ-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা গুজরাটের দক্ষিণে "দ্বীপ" বা "দিউ" নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে ঊনবিংশতি বৎসর অবস্থানের পর তাঁহারা আরও উপযোগী ও বিস্তৃত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা এইপ্রকারে পোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে আসিতেছেন, এমনসময় আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। হতভাগ্য পারসীকগণ, মানব ও দেবতা, উভয়েরই যেন কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তাঁহারা আসন্ন মৃত্যু স্থির করিয়া প্রাণের আশা ছাড়িয়া ইষ্টদেবতার শরণ লইলেন। তাঁহারা অগ্ন্যুপাসক ছিলেন, তাই অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা ও মানসিক করিলেন যে, যদি এই দৈববিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দিবারাত্র "আতস-বের্হাম" বা ব্রহ্মার অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে অগ্নির অবতার বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া থাকেন। এখনও আমাদের দেশে কোথাও গৃহদাহ হইলে লোকে ব্রহ্মার পূজা দিয়া থাকে। যাহা হউক, ব্রহ্মা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী স্থলে অবতরণ করিলেন।

তাঁহারা যে স্থানে অবতীর্ণ হইলেন, সে দেশের নাম "সঞ্জন"। সেটি গুজরাটের দক্ষিণ অংশ, তথায় যাদব রানা নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজার নিকট বিপন্নগ্র আগন্তুক পারসীকগণের একজন "দস্তুর" বা পুরোহিত প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার নির্ভীক, প্রশান্ত, সুন্দর, প্রতিভোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক "দস্তুর" বলিলেন, তাঁহারা পারস্যদেশবাসী; মুসলমান-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা রাজার নিকট একখণ্ড ভূমি

প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "আমরা আর কিছু চাহি না, আমরা বিনা ব্যাঘাতে আমাদের ধর্ম্মালোচনা করিতে চাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের ধর্ম্মমত কিপ্রকার না জানিলে কোন কথা বলিতে পারি না।" "দস্তুর" রাজার নিকট ২।৪দিন সময় চাহিয়া নিজের বাসায় উপনীত হইলেন ও সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৬টি সংস্কৃত শ্লোকে স্থূলত আপনাদের ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, "দস্তুর" বলিলেন :—

১। আমরা "হরমাজ্‌দা" ও সূর্য্য ও পঞ্চভূতের উপাসক।

২। আমরা স্নানকালে, পূজার সময়ে ও আহারে মৌনব্রতাবলম্বী।

৩। আমরা পূজার সময় পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করি।

৪। আমরা গাভীপূজা করিয়া থাকি।

৫। আমরা "সত্র"নামক জামা, "কোষ্টী"নামক উপবীত ও দ্বিধা বিভাজিত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করি।

৬। আমরা বিবাহাদিতে নৃত্য-গীত-বাদ্য করিয়া থাকি।

৭। আমরা গন্ধদ্রব্য ও অলঙ্কার দানে স্ত্রীগণকে সম্বর্দ্ধনা করি।

৮। আমরা সহজে দাতা, বিশেষত জলাশয়প্রতিষ্ঠায় মুক্তহস্ত।

৯। আমরা নরনারী উভয়ের প্রতি সমান সহানুভূতি প্রকাশ করি।

১০। আমরা গোমূত্র দ্বারা স্নাত হইয়া শুচি হই।

১১। আমরা প্রার্থনা ও আহার কালে পবিত্র রজ্জু (উপবীত) ব্যবহার করি।

১২। আমরা চন্দনকাষ্ঠে অথবা অন্যবিধ গন্ধদ্রব্যে অগ্নিদেবকে আহুতি দিয়া প্রজ্বলিত রাখি।

১৩। আমরা প্রত্যহ পাঁচবার প্রার্থনা করি।

১৪। আমরা দাম্পত্যবিধানে বিশেষ দৃষ্টি রাখি ও সতীত্ব ও পাতিব্রত্যকে শ্রদ্ধা করি।

১৫। আমরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বাৎসরিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকি।

১৬। আমরা নবপ্রসূত স্ত্রীলোকদিগের শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখি।

রাজা "দস্তুরের" কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সঞ্জনরাজ্যের প্রান্তসীমায় অনেক স্থল খালি পড়িয়াছিল, রাজা যাদব রানা সেই স্থলে পারসীকগণকে থাকিবার জন্য অনুমতি দিলেন। তাঁহারা রাজপ্রদত্ত ভূভাগে বন কাটিয়া নগর স্থাপন করিলেন ও সর্ব্বাগ্রে আপনাদের মানসিক-অনুযায়ী অগ্নিদেবের অথবা ব্রহ্মার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পারসীকদিগের প্রথম অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত ১৬টি শ্লোক পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধিমান্ পারসীকগণ বহুকাল ধরিয়া দেশে দেশে বনে বনে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া ফিরিয়া এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে কোন প্রকারেই হউক, একটা আশ্রয় লাভের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই তাঁহারা রাজার সন্তুষ্টির জন্য একটু চাতুরী করিয়াছিলেন। যে লক্ষণগুলি তাঁহাদের ধর্ম্মে পালনীয় অথচ হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ বারণ নাই, অথবা যেগুলির সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কেবল সেইগুলিমাত্র তাঁহারা উল্লিখিত শ্লোকমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা তাঁহারা যে "দেবদ্বেষী" "অসুরপূজক", মৃতদেহসৎকারে নূতন প্রথা অবলম্বন করেন, এ সকল কথার উচ্চবাচ্য করেন নাই। পারসীকগণ গাভীপূজা করিতেন সত্য, কিন্তু গোমাংসও আহার করিতেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহারা হিন্দুরাজার সন্তুষ্টির জন্য গো-পূজা বজায় রাখিলেন, কিন্তু গোমাংস আহার পরিত্যাগ করিলেন না। যে অল্পসংখ্যক পারসীক পারস্যের অরণ্যে নিজ ধর্ম্ম লইয়া গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা গো-মাংস ভোজন করিতেন ও তাঁহাদের বংশধরেরা আজিও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকেন। আগন্তুক পারসীরা রাজার অনুরোধে পারসীক রমণীদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইয়া হিন্দু-রমণীর মত সাটী পরিধান করাইলেন। কালক্রমে নিজেদের ভাষাও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পারসী ভাষার সহিত গুজরাটী ভাষা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার সঙ্কর ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন ও অবশেষে তাঁহাদের ভাষা পূরা গুজরাটী হইয়া পড়িল।

সঞ্জানে অবস্থানের কিছুদিনের পর পারসীকদিগের মধ্যে একটা বিবাহব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারা উক্ত বিবাহে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলে সদাশয় রাজা নবাগত প্রজাদিগের তুষ্টিসাধনের জন্য স্বয়ং বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েন। বলা বাহুল্য যে, বিবাহের মন্ত্রাদি সমস্তই জেন্দ-ভাষায় পঠিত হইতেছিল। রাজা তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া কৃতজ্ঞহৃদয় পারসীরা রাজার অবগতির জন্য সেই বিবাহসভাতেই বিবাহের মন্ত্রাদি সংস্কৃতে অনুবাদিত করিয়া দিলেন। রাজা যে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন, এই বিষয়টি চিরকাল স্মৃতি-পথে জাগরূক রাখিবার জন্য তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে, অতঃপর তাঁহাদের সমস্ত বিবাহকার্য্যে মন্ত্রাদি প্রথমে জেন্দ ও পরে সংস্কৃত ভাষায় পঠিত হইবে। অদ্যাপি অনেক পারসীক এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন।

মুচীর মান।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, মাদ্রাজনগরে অবস্থানকালে তথাকার ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জ গেজেট নামক সরকারী (গবর্ণমেণ্ট) গেজেটে মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর মুন্সেফ, ডাক্তার, তহশীলদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের পদোন্নতি, ছুটি, পেন্সন প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের (Official Notifications) তালিকায় নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম—

Promotion.—His Excellency The Governor-in-Council is pleased to promote Kotayah, 2nd cobbler attached to the Govt. House, to the post of the Cobbler in-chief (Sirder Moochi.).

অর্থাৎ "মহামাননীয় মাদ্রাজের, শ্রীলশ্রীযুক্ত সকৌন্সেল গবর্ণর-সাহেব বাহাদুরের আদেশানুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের কোটায়া-নামক দ্বিতীয় মুচী সর্ব্বপ্রধান মুচীর পদে উন্নীত হইল।"

সরকারী গেজেটে সম্ভ্রান্ত হাকিমদিগের নামের তালিকায় কোটায়া মুচীর পদোন্নতির বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, মুচীর কি মান!! অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম—

মুচী হোয়ে শুচি হয় যদি লাট ভজে।
শুচি হোয়ে মুচী হয় যদি লাট ত্যজে॥

মাদ্রাজ হইতে অনেকদিন পরে পঞ্জাবপ্রদেশে আসিয়াছিলাম। তথায় একজন মুচী বিনামা (জুতা) নির্ম্মাণ এবং চামড়া বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। কোন কোন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সেই মুচীকে সেলাম করিত। আমি একদিন একজন

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা এই মুচীকে সেলাম কর কেন?" ইংরাজ এই বলিয়া উত্তর দিল, "আমরা জাতির মান্য করি না, টাকার মান্য করিয়া থাকি।" বুঝিলাম, এই বিশ্বসংসারে ইংরাজপ্রভুর নিকটে টাকাই মান এবং টাকাই সম্ভ্রম। বুঝিলাম, মোক্ষপথভ্রষ্ট—মায়ামুগ্ধ—সংসারী মানবদিগের মতে টাকাই ধন, টাকাই ধর্ম্ম, টাকাই মান, টাকাই প্রাণ, টাকাই শিক্ষা এবং টাকাই মোক্ষ!! সুতরাং টাকায় মুচীর মান না হইবে কেন?

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মুচী, মেথর, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ-জাতীয় লোকদিগের উচ্চশিক্ষার উপায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই সকল নীচজাতি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, একজাতিত্ব ও সমভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পাদ্রী প্রভুদিগের অনুগ্রহে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া অথবা ধনোপার্জ্জন করিয়া সমাজে সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়। এইজন্য খৃষ্টানধর্ম্মের দিকে নীচজাতীয় লোকদিগের চিত্ত যত সহজে আকৃষ্ট হয়, উচ্চজাতির চিত্ত তত সহজে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু ধনোপার্জ্জনই কি মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য? টাকা ভিন্ন এই জগতে এমন এক মহাধন—মহারত্ন—আছে, যাহার সহায়তায় মুচীর বংশ চিরকালই শুচির বংশ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া অমরত্ব লাভ করে এবং ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম কি টাকা হইতে অধিকতর মূল্যবান্ এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় নহে? ধর্ম্ম আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তির প্রধান সহায়, প্রশস্ত ও পবিত্র পথ, উন্নতির সর্ব্বপ্রথম উপায়, এবং ধর্ম্মই সুখ, শান্তি ও আনন্দের একমাত্র অবলম্বন। এইজন্য দাশরথি রায়ের মুখে শ্রীভগবান্ গাহিয়াছিলেন—

"ভক্তিবিহীন আমি ব্রাহ্মণেরও নই,
ভক্তি থাকিলে আমি চণ্ডালেরও হই।"

পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ অমর ধর্ম্মসংস্কারক রোহীদাস দরিদ্র মুচী ছিলেন; ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান সখা ভুবনবিখ্যাত গুহক জাতিতে চণ্ডাল ছিলেন; সুতরাং ধর্ম্ম কি ধন হইতে বড় নহে? ব্রাহ্মণ হইতে মুচী পর্য্যন্ত কাহারও মোক্ষলাভ ধনোপার্জ্জনের ফল নহে; ধর্ম্ম বিনা মোক্ষ নাই; ধর্ম্ম বিনা সকলেই অশুচি; ধর্ম্ম থাকিলে মুচী আর মুচী নহে, ধর্ম্ম থাকিলে মুচী শুচি, সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে মুচী পর্য্যন্ত সকলেরই ধর্ম্মেই প্রকৃত মান, ধর্ম্মেই প্রকৃত মহত্ত্ব এবং ধর্ম্মেই প্রকৃত মুক্তি।

পাঠকমহাশয়কে এতদ্দেশের কয়েকজন চর্ম্মকারের কথা শুনাইলাম, এবারে (আমেরিকার) মার্কীণমুলুকের একজন আশ্চর্য্য মুচীর কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি। এই জগদ্বিখ্যাত জীবন্মুক্ত মুচীর নাম উইলিয়ম চার্লস্ মুলার। ইঁহাকে আমি মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য করি। মুলরের মাতা স্পেনদেশীয়া রমণী এবং তাঁহার পিতা আমেরিকাবাসী পুরুষ ছিলেন। মুলরের মাতামহ আমেরিকায় মুচীর কার্য্য করিতেন, তথায় তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, এই রমণীকে সুন্দরী এবং সুবুদ্ধিসম্পন্না দেখিয়া মুলরের পিতা ইঁহাকে বিবাহ করেন। উইলিয়ম চার্লসের পিতাও মুচী ছিলেন এবং পুত্রকে দোকানে রাখিয়া মুচীর কার্য্য শিখাইতেন। আমাদের দেশের মুচীর ন্যায় বিলাত ও আমেরিকার মুচীরা একেবারে নিরক্ষর নহে; উইলিয়ম মুলর কিছু লেখাপড়াও শিক্ষা করিয়াছিল। জুতা ও চামড়ার দোকান খুলিয়া মুলরের পিতা মাসিক ৫০৲ টাকা লাভ করিতেন; কিন্তু আমেরিকায় পিতা, মাতা ও পুত্রের ভরণপোষণের জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ের খরচের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা যথেষ্ট ছিল না। যাহা হউক, তাহাতেই তাহাদের সাংসারিক ব্যয় কোনরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া যাইত। অকস্মাৎ একদিন বিসূচিকারোগে উইলিয়ম মুলরের পিতা ভবলীলা সংবরণ করিলেন,

সুতরাং তরুণবয়স্ক মুলরের হস্তেই দোকান ও গৃহস্থের সমুদয় ভার পতিত হইল।

মুলরের দোকানের পার্শ্বে মোটে ৫খানা মুচীর দোকান ছিল, তদ্ব্যতীত সেই স্থানে আর কোনও মুচী বা মুচীর বিপণী ছিল না। সেই ক্ষুদ্র নগরের সেই পার্শ্বে যে সকল ভদ্রলোক বাস করিতেন, তাঁহাদের কেহ অধ্যাপক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ সুপণ্ডিত, কেহ সুবক্তা, কেহ সুলেখক, কেহ ধর্ম্মযাজক অথবা কেহ গ্রন্থকার বা সম্পাদক ছিলেন। সেই দিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সততই চর্চ্চা হইত এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া পণ্ডিতেরা পরস্পর আলাপ করিতেন। উইলিয়ম মুলর সদাসর্ব্বদা দোকানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত বটে, কিন্তু সে নিকটবর্ত্তী গির্জ্জায় যাইয়া সমধর্ম্মীদিগের সহিত রীতিমত প্রার্থনায় যোগ দিতে কখনই অবহেলা করে নাই। তাহার হৃদয় স্বভাবত ধর্ম্মপ্রবণ ছিল, তাহার ধার্ম্মিকা মাতার সৎসঙ্গ এবং সদুপদেশে তাহার স্বভাব ও চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষিত, সুসভ্য, সচ্চরিত্র এবং ধার্ম্মিক লোকদিগকে চতুষ্পার্শ্বে সততই দর্শন করিয়া উইলিয়ম মুলর পাপ ও অসদাচারকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিল। গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় ধর্ম্মের দিকে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে তাহার প্রিয়তমা জননী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অজাতশ্মশ্রু মুলরের হৃদয়ে ঘোরতর বৈরাগ্যভাবের অভ্যুদয় হইল; অতিশীঘ্রই দোকান বন্ধ করিয়া দিয়া মুলর ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য এবং ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পৈতৃক ব্যবসা বন্ধ করিবার হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে পাদ্রীদিগকে মুলর বলিয়াছিলেন, "জুতা বিক্রয় করিলে জগতের হিত করা যায় না, যাহাতে আত্মার হিত হয়—যাহাতে পরকালের হিত হয়—যাহাতে ইহলোকবাসী সমগ্র মানবসমাজের হিত হয়—এইরূপ কার্য্য করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মকেই সহায় করিতে ইচ্ছা করি, ধর্ম্ম বিনা এ সংসারে শান্তি ও সুখ নাই।"

উইলিয়ম চার্লস্ মুলর অবশেষে একজন প্রসিদ্ধ সুবক্তা, সুপণ্ডিত ও বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ধর্ম্মসভা তাঁহাকে ধর্ম্মাচার্য্য (পাদ্রী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর কোনও মুচীকুলে এত বড় ধার্ম্মিক, পরোপকারী, সদ্বিদ্বান্ এবং সদাচারী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সমস্ত জীবন ঈশ্বরোপাসনায়, জ্ঞানবিতরণে, দুঃখীর দুঃখমোচনে, রোগীর শুশ্রূষায়, স্ত্রীলোকের কষ্টনিবারণে, লোকশিক্ষায় এবং ধর্ম্মপ্রচারে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। হাস্যমুখে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে, মুখে মৃদুমধুর স্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, উইলিয়ম মুলর ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার সমাধি-সময়ে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের প্রেসিডেণ্ট এবং লর্ড বিশপ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পর্ণকুটীরবাসী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই ম্লানমুখে উপস্থিত ছিল এবং "আমেরিকা-আকাশের মধ্যাহ্নসূর্য্য" বলিয়া লক্ষ লোকে লক্ষ কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিল। এই নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ এখন আর জীবিত নাই, তিনি পরমানন্দে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অমর পুরুষপুঙ্গবের মহৎ চরিত্র এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের শিক্ষার ও অনুকরণের অত্যুৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া এখনও গণ্য। চার্লস মুলরের সমাধিপ্রস্তরে তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিম্নলিখিত শব্দগুলি খোদিত আছে—

The Rev. William Charles Muller.

Born 1793.

Died 1860.

Blessed are they that die in the Lord.

I am, indeed, sir, a Surgeon to old shoes; when they are in great danger, I recover them."—Tulins Caesar, Act. I.

(Shakspeare)

From the mending of soles

To the mending of souls.

উইলিয়ম মূলরকে কি আর মুচী বলিতে ইচ্ছা হয়? জগতের যে সকল কপটাচারীরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া কেবল্ কথায় "শুচি" বলিয়া বর্ণাভিমান বা চর্ম্মাভিমান করে, মূলরের তুলনায় এবং সকল শাস্ত্রানুসারে তাহারাই প্রকৃত মুচী। এইজন্য ঋষিরা কহিয়া গিয়াছেন—

মুচী হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে মুচী হয় যদি হরি ত্যজে॥

পরমহংস-সম্প্রদায়ের মহাপুরুষেরা বনে, কোণে, বৃক্ষতলে, কখনও বা লোকালয়ে থাকেন। ইঁহাদের জাতি কেহ জানে না এবং ইঁহারা তাহা কখনও প্রকাশ করেন না। অথচ মহামহাশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণাধ্যাপকেরা ইঁহাদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন এবং অনেক ত্রিসন্ধ্যাজাপী পণ্ডিত ইঁহাদের উচ্ছিষ্টকে মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য করেন। ধর্ম্মসাধনে মুচীর মুচীত্ব যায়, ধর্ম্মবিহনে শুচি মুচীত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই সংসারে—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে—ব্রাহ্মণ হইতে মুচী পর্য্যন্ত সকলেরই পক্ষে ধর্ম্মই প্রকৃত ধন, ধর্ম্মই সুখ, ধর্ম্মই শান্তি, ধর্ম্মই মোক্ষ এবং ধর্ম্মই মান।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মায়ার খেলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৃহ।

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ।

ইমনকল্যাণ—একতালা।

শান্তা।— পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরীপানে ধাও!

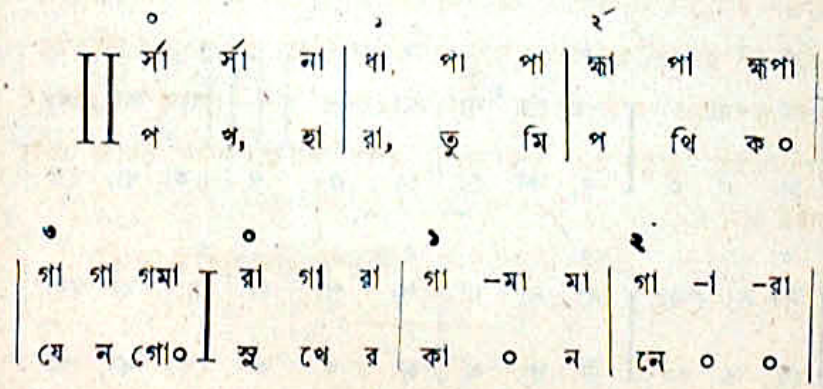

৩ ০ ১ ২´
| -া সা সা I সা- ধ্া- া | -া সা রা | রপা -গা -া |
| ০ ও গো I যা ০ ০ | ও, কো থা | যা ০ ০ |

৩ ০ ১ ২´
| -া ধা পা I গা -রা -া | -া সা সপা | গা -া -া |
| ও, ও গো I যা ০ ০ | ও, কো থা | যা ০ ও |

৩ ০ ১ ২´
| সা ধ্া সা I সা সা রা | গা গা গা | পা পা পা |
| সু খে, ঢ I ল, ঢ ল | বি ব শ | বি ভ ল |

৩ ০ ১ ২´
| রা গা পা I ধা -নধা না | র্সা -া -া | -া ধা পা |
| পা গ ল I ন ০ য় | নে ০ ০ | ০ তু মি |

৩ ০ ১ ২´
| গা -রা -া I -া সা রা | রপা -গা -া | -া ধা পা |
| চা ০ ০ I ও, কা রে | চা ০ ০ | ও, তু মি |

৩ ০ ১ ২´
| গা -রা -া I -া সা সপা | গা -া -া | পা পা র্সা |
| চা ০ ০ I ও, কা রে | চা ০ ও | কো থা, গে |

৩ ০ ১ ২´
| র্সা র্সা র্সনা I ধা না ধা | পা পা রা | রা রা গরা |
| ছে, ত র০ I উ দা স | হ দ য় | কো থা, প০ |

৩ ০ ১ ২´
| গা মা মা I গা -া রা | সা -া -া | র্সা র্গা র্রা |
| ড়ে, আ ছে I ধ ০ র | ণী ০ ০ | মা য়া র |

৩ ০ ১ ২´
| র্সা না র্সা I না র্গা র্সা | না ধা পা | ক্ষা না ধা |
| ত র ণী I বা হি য়া | যে ন গো | মা য়া, পু |

৩ ০ ১ ২´
| পা ক্ষা পা I গা- রা- া | -া পা- ক্ষা | পা না ধা |
| রী, পা নে I ধা, ০ ০ | ও, কো ন্ | মা য়া, পু |

৩ ০ ১ ২´
| পা ক্ষা পা I গা -রা -া | সা- ধ্া -া | -া সা রা |
| রী, পা নে I ধা ০ ০ | যা ০ ০ | ও, কো থা |

৩ ০ ১ ২´
| পা -সা -া I -া ধা পা | গা- রা -া | -া সা পা |
| যা ০ ০ I ও, ও গো | যা ০ ০ | ও, কো থা |

৩
| গা -া -া IIII
| যা ০ ও IIII

বাদক

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ-দুয়ারে
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হ'তে যায় কোথা রে!

কেহ নাহি চায় থামিতে!
শিরে লয়ে বোঝা চলে' যায় সোজা,
না চাহে দখিণে বামেতে!
বকুলের শাখে পাখী গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে!

বাঁশি লই আমি তুলিয়া!
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে' বসে ভুলিয়া!
আছে যাহা চির পুরাতন
তারে পায় যেন হারা ধন,
বলে, "ফুল এ কি ফুটিয়াছে দেখি!
পাখী গায় প্রাণ খুলিয়া!"

হে রাজন্ তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরাম বিহীন
তোমার সিংহদুয়ারে!
যারা কিছু নাহি কহে' যায়,
সুখ-দুখভার বহে' যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময় ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহদুয়ারে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অসময়।

তখন দেখিনি চেয়ে, সেই টুকু ক্ষুদ্র বুকে
বহিত সে, কি প্রেম দুর্জ্জয়!
স্নিগ্ধ আঁখি—তটে তার কি করুণা উছলিত
আজি তাহা বুঝিবার নয়।
ব্যর্থ প্রেম রাশি দিয়ে পায় নাই এত টুকু,
চায় নি সে কভু প্রতিদান!
হৃদয়ের প্রেমপুষ্প— না বুঝে, সে দিয়েছিল
ভাবে নাই—হ'বে ধূলি-ম্লান।

দেখি নাই আঁখি তুলে, কিশোরীর সেই দান—
স্বার্থহীন আত্ম-নিবেদন।
আজি যেন মনে হয়— শুধু এক জন বুঝি
পূজা তার করেছে গ্রহণ।

অবজ্ঞাত প্রেম তার লুকায়েছে তার সনে,
সেত আর পৃথিবীর নয়।
বসন্ত গিয়াছে কবে কুসুম ঝরিয়া গেছে
আজ মম হ'য়েছে সময়।
জ্যোৎস্না নিবে গেছে কবে, শশী কোথা লুকায়েছে,
প'ড়ে আছে আঁধার আকাশ!
বাঁশরী নীরব হ'য়ে কখন গিয়াছে থেমে,
আজ কি হ'য়েছে অবকাশ?
মালা কবে শুকায়েছে ভ্রষ্ট সুত্রসার হ'য়ে,
এত দিন পরি নাই গলে।
এ জীবনে এক দিন শুভ উষা জেগেছিল,
সে কি শুধু গিয়াছে বিফলে?
আজি দগ্ধ মরু-বুকে— খুঁজিতেছি মধ্য দিনে
কোথা ছায়া—শ্যামল, শীতল।
সতৃষ্ণ অঞ্জলি ভরি' সংসার দিয়েছে, কি গো,
প্রায়শ্চিত্ত—স্বার্থের গরল।
দাও—দাও পূর্ণ করি' আমার এ ভিক্ষা-পাত্র,
কই স্নিগ্ধ—তোমার প্রণয়!
আজি শুষ্ক নদীতীরে, ঘুচিয়াছে ভ্রম মম,
আজ দেবি, হ'য়েছে সময়।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

আশ্বাস।

যে মিলন অসম্পূর্ণ রহিল জীবনে
পূর্ণ তাহা হবে পরে অজানা ভুবনে,
এ আশায় আছি বুক বেঁধে, তাই যবে
সন্ধ্যারবি অস্ত যায় একান্ত নীরবে,
বিরহ-কাতর শ্রান্ত হৃদয়েরে বলি
হে আর্ত্ত আশ্বস্ত হও, অই গেল চলি
দিবস মিলনহীন;—দেখ আনিয়াছে
প্রিয় সম্মিলন আরো একদিন কাছে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রার্থনা।

বুক পাতি স'ব দুখ, যদি পেতে হয়,
শুধু নাথ মনে মোর জাগে এই ভয়,
দুখের ছলনে পাছে নিমেষের তরে
তোমার করুণ ছবি ভুলি মোহভরে!

শ্রীপ্রেমবল্লভ গুপ্ত।

জগদ্বিখ্যাত

ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

১৮৭৪ সালে আবিষ্কৃত। মতিলাল বসু এণ্ড কোং ইহার একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা। ইহার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধিতা, স্নিগ্ধকারিত্ব, লাবণ্যপ্রদায়ক, মস্তক ও ত্বক-রোগনিবারক অসাধারণ গুণপ্রভাবে ইহা জনসাধারণের নিকট বহুদিনাবধি বিশেষ সমাদৃত। ইহার অতিশয় বিক্রয় দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত অনেকে জাল করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষ অনুরোধ, ভ্রমক্রমে জালতৈল ক্রয় করিয়া ব্যবহারে সুফল প্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগের জগৎ-পরীক্ষিত ও পরম পবিত্র তৈলের উপর দোষারোপ না করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি চিহ্ন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

১। রেজেষ্টারি করা (শ্রীরামচন্দ্রমূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও মতিলাল বসু এণ্ড কোংর নামাঙ্কিত সবুজ রঙের শিশি ও উহার উপরিভাগে সোনালি রঙ বিশিষ্ট ক্যাপশুল এবং প্রোপায়েটরের প্রতিমূর্ত্তি ও নাম সম্বলিত নেক-লেবেল।

২। চারি ভাষায় লিখিত রঙ্গিন টিকিট্ ও উহাতে সরু সরু ডোরা কাটা এবং (শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি) ও কোংর নাম লেখা।

৩। ব্যবস্থাপত্র যাহা শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে ও যাহার মধ্যে ৩ রকম কাগজে ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা (গোলাপী, সাদা ও সবুজ) সাত-প্রকার ভাষায় (বাঙ্গালা, ইংরাজি, নাগরী, কায়েতী, গুজরাটী, উড়িয়া এবং উর্দ্দু,) লিখিত নিয়মাবলী মুদ্রিত আছে।

৪। ব্যবস্থা-পুস্তক ব্যতীত শিশি লইবেন না।

আট আউন্স শিশির মূল্য ৸০ আনা, ২৪ আউন্স বোতল ২৲ টাকা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোম্পানি,

অর্ডার সাপ্লায়ার্স, কমিশন এজেণ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্ট,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত

ঔষধালয়, কলিকাতা।

সমালোচনী।

মাসিক পত্র।

(অগ্রহায়ণ)

১১শ সংখ্যা।

১৩০৯।

সূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা
১। সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও তাহার বিকাশ	...	...	...	৪১৩
২। চিঠি চুরী	...	...	...	৪১৯
৩। কুন্দ, সূর্য্যমুখী ও কমল	...	...	...	৪৩১
৪। ললনা ...	...	...	...	৪৫০
৫। রমণী ...	...	...	...	৪৫১

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সমালোচনী।

পৌষ সংখ্যা সমালোচনী আর দুই সপ্তাহ মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। মাঘ মাস হইতে সমালোচনীর দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ। দ্বিতীয় বর্ষের "সমালোচনী" উৎকৃষ্টতর করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হইতেছে।

প্রকাশক।

"সমালোচনীর" বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল এক টাকা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৯। | ১১শ সংখ্যা।

সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও তাহার বিকাশ।

আমরা সাধারণত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ক্বচিৎ আমাদের হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ সাধনের চেষ্টা করিয়াই আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া থাকি। সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ সাধনের জন্য চেষ্টা করা আদৌ প্রয়োজন মনে করি না। যদি কাহারও স্বভাবতঃ এই বুদ্ধি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বরং তাহাকে সৌখীন বলিয়া উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হই না।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র একটা সুন্দর সামঞ্জস্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান। যাহার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বিকশিত হইয়াছে, এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য তাহার চক্ষে ধরা পড়ে। এই সামঞ্জস্য কেবল বাহিরের জড়ব্রহ্মাণ্ডে নহে—আমাদের নিজ নিজ শরীরেও বর্ত্তমান। সুতরাং দেখিতে জানিলে আমরা সর্ব্বত্রে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

এই শিক্ষা গ্রহণ করিলে—এই সামঞ্জস্যবোধ সমুৎপন্ন হইলে জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

সুবিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসিক Victor Hugo তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ Les Miserablesএ ইহার এক অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। Cosette জানিত না যে সে সুন্দরী—তাই তাহার আশ্রয়দাতা Jean Valjean তাহাকে যেরূপ পরিচ্ছদে যেরূপ অবস্থায় রাখিয়াছিলেন সে তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন হৃদয়ের নববসন্ত-সমাগমে আলোকোজ্জ্বল ধরণীর কোন এক সুমধুর শুভ মুহূর্ত্তে Cosette দর্পণে মুখ দেখিল—সে মুখ সুন্দর—সেই আনন্দোজ্জ্বল যৌবনের তরঙ্গবিচঞ্চল চক্ষু সুন্দর—রক্তিম অধর পুট বঙ্কিম ললাট, ঘনবিন্যস্ত গুচ্ছীকৃত অলকদাম যথেচ্ছ বিন্যস্ত হইয়াও মনোহর! Cosette এর হৃদয়ে সৌন্দর্য্য বুদ্ধি জাগিল—সামঞ্জস্যের মোহনমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। Cosette সেই সমুদ্ভাসিত সামঞ্জস্যের মধুর আলোকে চাহিয়া দেখিল, তাহার সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ যষ্টির সঙ্গে তাহার আকারহীন শ্লথ শিথিল পরিচ্ছদের সামঞ্জস্য কোথায়? ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রকারের অদ্ভুত দ্রব্য-রাজিপূর্ণ বাসভবনের সামঞ্জস্য কোথায়?

Cosette বেশপরিবর্ত্তন করিল—গৃহের দ্রব্যরাজি নূতন করিয়া সাজাইল, অসুন্দর দ্রব্য বাহির করিয়া দিল। তার পর Cosette যখন নূতন পরিচ্ছদে নূতন সজ্জায় সান্ধ্য বায়ু সেবন মানসে Jean Valjean এর সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি Jean Valjean Cosette এর প্রতি সচকিতে চাহিয়া বুঝিলেন Cosette এর জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বিকাশের ফল এই পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন স্পৃহণীয় নহে কি? এই সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন পরিচ্ছদ সুসজ্জিত, যথাস্থান সন্নিবেশিত সুন্দর দ্রব্যসামগ্রী, সুনিশ্মিত সুদৃশ্য বাসভবন,

বাসভবনের চতুষ্পার্শ্বে সুশোভিত কুসুমদামখচিত সুরম্য উদ্যান বা বৃক্ষরাজি—এ সকল স্পৃহনীয় নহে কি? কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে কেহ কেহ বিলাসিতার বিভীষিকা দেখিতে পারেন। কিন্তু তাহা ভ্রম।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি যে কেবল অট্টালিকা ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীতেই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেও ইহার তৃপ্তি সাধনের যথেষ্ট অবসর আছে।

আয়ত্তাধীন দ্রব্যরাজির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই সৌন্দর্য্য বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে—যাহা নাই তাহার জন্য হাহাকার করা ইহার কার্য্য নহে। বিলাসিতা বিকৃত সৌন্দর্য্য বুদ্ধির ফল।

এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির অনুকূলে আর একটা কথা আছে এবং সেটা আরও অধিক প্রয়োজনীয়।

যাহার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি পূর্ণ বিকশিত তাহার পক্ষে পাপাচরণ বা কুৎসিত কার্য্য করা অসম্ভব। যাহা সামঞ্জস্যের বিঘাতক তাহাই পাপ। সব সুন্দর শুধু পাপ অসুন্দর।

সুতরাং যাহার সামঞ্জস্যবোধ সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার চক্ষে সামঞ্জস্যের হানিকর পদার্থ অসহনীয়।

কবির সৌন্দর্য্য-বুদ্ধ সাধারণ অপেক্ষা সমধিক বিকশিত তাই কবি শুদ্ধ পাপচিত্র আঁকিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। পাপচিত্র অঙ্কনের দ্বারা যে সামঞ্জস্য হানি ঘটিয়া থাকে, তাহা যতক্ষণ পাপীর দণ্ডবিধান দ্বারা পুনঃ সংস্থাপিত করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি নাই। ইহারই নাম Poetic justice যাঁহার সৌন্দর্য্য বোধ বিকশিত হয় নাই তিনি কবি নহেন। যিনি শুদ্ধ পাপচিত্র দেখাইবার জন্য পাপচিত্র আঁকেন, তাঁহার কবিত্বে আমার সুগভীর সন্দেহ আছে।

সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পবিত্রতার অতি নিকট সম্বন্ধ। যাহা অপবিত্র

তাহা সুন্দরের কাছে পরাজিত—লাঞ্ছিত। তাই কবি তাঁহার সুন্দর কবিতায় 'অচ্ছোদসরসীতীরে' স্নানোত্তীর্ণা সুন্দরীর অনাবৃত সৌন্দর্য্য-মহিমার সমক্ষে চঞ্চল মদনের পরাজয় কাহিনী সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য ত্রিধা বিভক্ত—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। সুতরাং পূর্ণ সৌন্দর্য্য বোধ বলিতে এই ত্রিবিধ সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি বুঝায়।

এই ত্রিবিধ সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তি যাঁহার বিকশিত হইয়াছে, তিনি শুদ্ধ নিজ শরীর, সজ্জা ও বাসভবন সুসজ্জিত করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না—তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল, বাক্য সুমধুর ও আত্মা স্নেহ প্রেম ভক্তিতে সুশোভিত হয়। তিনি শুদ্ধ প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যের আদর্শে আপনার চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যরাজি, সুনির্ব্বাচিত ও সুসজ্জিত করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে একটা উদার ও বিশাল ভাব অন্তর্নিহিত আছে তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া আপনার হৃদয় উদার ও প্রসারিত করেন—নহিলে প্রকৃতির সুরের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের সুরের লয় হয় না—সামঞ্জস্য বিচলিত হয়। প্রকৃতির সর্ব্বত্র পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় আকর্ষণ—অণুতে অণুতে আকর্ষণ,—তারকায় তারকায় আকর্ষণ,—গ্রহে উপগ্রহে আকর্ষণ—আকর্ষণ সর্ব্বত্র। এই আকর্ষণও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত।

মনুষ্য-হৃদয়ে আকর্ষণের অনুরূপ শক্তি প্রেম। প্রেম সকলকে কাছাকাছি আনে, বিরাগ পরস্পরকে দূরীভূত করে। তাই হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ না হইলে পূর্ণ সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ব্যথিত হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে একমাত্র সৌন্দর্য্য বুদ্ধি পূর্ণ বিকশিত হইলেও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে—সুতরাং ইহার বিকাশ বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি

সকলের স্বভাবত সমান থাকে না—কোন্ শক্তিই বা থাকে? সুতরাং ইহা বিকশিত করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতে হয়।

আজ কাল যখন সৌন্দর্য্য বুদ্ধির বিকাশই আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় না—তখন সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি-বিকাশোপযোগী আয়োজনের সম্ভাবনা কোথায়?

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বিকাশের প্রধান সাধন প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন। প্রকৃতি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধারভূতা। প্রকৃতি হইতেই আমরা সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রাপ্ত হই। ঊর্দ্ধে দূরবিস্তৃত মেঘচুম্বিত তুষারকিরীট পর্ব্বতমালা—নিম্নে তরঙ্গিত অনন্তপ্রসারিত সুনীল লহরীলীলাময় সাগররাজি, ঊর্দ্ধে আকাশতটে কোটীহীরকলাঞ্ছিত অগণিত তারকাদাম—নিম্নে নবকিশলয়সংবেষ্টিত নয়নানন্দ কুসুমরাজি—চিত্তমধ্যে সামঞ্জস্যের ভাব যেমন দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দেয়, এমন আর কিছুতেই পারে না।

নগরের সহস্র কৃত্রিম শোভার মধ্যে প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়—এবং চক্ষু এই সকল কৃত্রিম শোভায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য পূর্ণরূপে ধরিতে পারে না কাজেই রুচিবিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু একবার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি-বিকাশপ্রাপ্ত হইলে তাহার আর ততটা আশঙ্কা থাকে না।

তাই কোলাহলময় রাজধানী শিশুশিক্ষার উপযুক্ত স্থান নহে—কারণ শৈশবই সর্ব্ববিধ শিক্ষার উপযুক্ত সময়। প্রাচীন ঋষিনিষেবিত ভারতবর্ষে ছিলও তাহাই। জনকোলাহল হইতে বহুদূরে প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে শুদ্ধ শান্ত তপোবনে সরল শিশু সরল সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচিত হইত—সুচিক্কণ সুবিন্যস্ত পত্ররাজি মধ্যে, কুসুমিত লতাদামে, তপোবনতীরবাহিনী স্রোতস্বতীর সুনির্ম্মল ঊর্ম্মিমালায়, মৃগশিশুর আকর্ণ বিস্তৃত শান্তোজ্জ্বল লোচনতটে যে সামঞ্জস্য যে

সৌন্দর্য্য পূর্ণ বিকশিত থাকিত, তাহা শিশুর চিত্তমধ্যে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া তাহাকে তাহার গার্হস্থ্য জীবনে সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা ও পাপ-প্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখিত। কিন্তু হায় "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ!"

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করিবার উপায় না থাকিলে, এই শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় উপায় কলা বিদ্যার আলোচনা। কারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই বহু পরিমাণে কাব্যে ও চিত্রে প্রতিফলিত। সুন্দর চিত্র দর্শনে ও প্রকৃত কাব্য পাঠেও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বিকশিত হইতে পারে। কিন্তু আজকালকার শিশুশিক্ষায় সে ব্যবস্থাও নাই। কাব্য যাহা পড়ান হয় তাহাতে কোন চিত্রই চক্ষুর সমক্ষে ফুটিয়া উঠে না। কতকগুলা মিলযুক্ত বাক্য-নিবদ্ধ নীরস উপদেশমালা পাঠেই শিশুদের কাব্যপাঠবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, চিত্রের ত কথাই নাই। বিদ্যালয়-গৃহই বহু স্থলে এমন ভাবে নির্ম্মিত যে তদ্দর্শনে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং সুন্দর চিত্রাবলীর স্থান ভৌগোলিক মানচিত্র অধিকার করিয়া শিশুর মনে একটা আতঙ্ক উদ্রিক্ত করিতে থাকে।

অথচ সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশে যে কাজ অতি সহজে নীরবে সম্পন্ন হয়, প্রহরব্যাপী বক্তৃতা বা সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী উপদেশপুস্তক গুরু-মহাশয়ের বেত্রদণ্ডের প্রবল সাহায্য লাভ করিয়াও তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

চিঠিচুরি।

ডিটেক্টীভের গল্প।

১

যখন শ্রীমান্ অক্ষয়কুমারকে প্রবেশিকার দ্বার-সম্মুখে উপনীত দেখিয়া মা সরস্বতী দুই হস্ত আন্দোলন করিয়া তাহাকে দুই দুই বার বিতাড়িত করিলেন, তখন শ্রীমান্‌ও মা সরস্বতীর প্রতি একেবারে ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন। এবং পড়াশুনা বন্ধ করিয়া প্রায় তিন চারিটি বৎসর বাটীতে বসিয়া অতিবাহিত করিলেন।

সংসারের ভার দাদার স্কন্ধে ছিল, সুতরাং সংসারের ভাবনা অক্ষয়কে কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। এই তিন চারিটী বৎসর হাসিয়া খেলিয়া, বেড়াইয়া, গল্প করিয়া তাহার পরম নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

বহু দিন পূর্ব্বে পিতার কাল হইয়াছিল, তখন অক্ষয়ের বয়স আট বৎসর মাত্র। অক্ষয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়কুমার বয়সে অক্ষয়ের অনেক বড়, তখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর; তিনি তখন চিকিৎসা-বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে স্নেহে অষ্টমবর্ষীয় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার লালিত পালিত এবং কথঞ্চিৎ শিক্ষিত হইয়া এখন দ্বাবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের শিক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ স্কন্ধে কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বলা বাহুল্য জ্যেষ্ঠ সে জন্য যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

যখন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে হস্তপদ ধৌত করিয়া অক্ষয়কুমার উঠিয়া বসিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার বিনয়কুমারের পশার এমন অপরিসীম হইয়া উঠিল, যে মস্তক কণ্ডুয়নের অবসরও তাঁহার ঘটিয়া উঠিত

না। সুতরাং বেকার অক্ষয়কুমারের সম্বন্ধে কোন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বৎসর অজ্ঞাতভাবে কাটিতে লাগিল।

কিন্তু শেষে বসিয়া বসিয়া অক্ষয়কুমারের দিন আর কাটে না। যখন বিদ্যালয়ে গমনাগমন ছিল তখন দিনগুলা এত শীঘ্র কাটিয়া যাইত যে, খেলা করিবার সময় না পাইয়া অক্ষয় সাতিশয় বিস্মিত হইত। কিন্তু এখন এক একটা ঘণ্টাকে দিনের মত দীর্ঘ হইতে দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইল এবং অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তখন অক্ষয়কুমার স্বয়ং এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। প্রথমে রেণল্ডস্-রচিত ইংরাজী উপন্যাসগুলি কিনিয়া কিনিয়া পাঠ করিতে লাগিল, তখন পুনরপি খঞ্জপায়ে-হাঁটা দিনগুলি অশ্বারোহণে সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। পড়িয়া পড়িয়া যখন রেনল্ডসে অরুচি ধরিল, তখন চিত্তোত্তেজক ডিটেক্টীভ ষ্টোরী (Detective Story) পাঠে মনোনিবেশ করিল। পাঠকালে গল্প-লেখকদিগের অদ্ভুত কল্পনার অসাধ্যসাধক ডিটেক্টীভদিগের অসম্ভব কার্য্যকলাপে অক্ষয়কুমারের মন তন্ময় হইয়া উঠিত; এবং তাহাদিগের অলৌকিক চরিত্র প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অক্ষয়ের হৃদয়ে অতুল মহিমাময় ও গৌরবময় বলিয়া অনুভূত হইত। তখন নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করিতে তাহাকে আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল না। মনে মনে স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক, পুলিশ বিভাগে ঢুকিতে হইবে।

২

যখন মনের এই আগ্রহটা একান্ত অদম্য হইয়া উঠিল, তখন একদিন অক্ষয়কুমার দাদাকে সুযোগমত নিরিবিলি পাইয়া, তাহার নিকট অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সেই প্রস্তাব করিল; এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিল।

দাদা বিনয়কুমার প্রথমে সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত কথাটা শুনিলেন এবং ভ্রাতার মুখের দিকে আকুলভাবে চাহিয়া রহিলেন। এমন কি তখন তাঁহার নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি রহিল না। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "অকু, কি হইয়াছে বল্ দেখি? ডিটেক্টী-ভের কথা কি বলিতেছিস্?"

দাদার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে অক্ষয়ের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। জড়িতকণ্ঠে কহিল, 'মনে করিতেছি, ডিটেক্‌টীভের কাজ করিব—কত দিন আর বসিয়া বসিয়া কাটাইব।"

এবার দাদা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ডিটেক্‌টীভের কাজ! আমার ভাই হইয়া তুই পুলিশে কাজ করিবি?"

অক্ষয় মৃদু হাস্যে বলিল, "হাঁ, আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি কি বলেন?"

দাদা কিছুই বলিলেন না, স্তম্ভিতবৎ তাহার মুখের দিকে অবাঙ্মুখে চাহিয়া রহিলেন। দাদাকে সেইরূপ ভাবে নিজের দিকে চাহিতে দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিতে লাগিল, "দেখুন, দাদা, আমি যদি বেশ কাজের লোক হইতে পারি, এ কাজে বেশ উপায় আছে। এমন কি, তাহা হইলে, পুলিশের কাজ ছাড়া বাহির হইতেও দুই একটা সন্ধান সুলভের কাজ মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করিয়া বেশ উপায় করিতে পারিব, এমন মনে হয়। তা ছাড়া আর কি করিব? এই ত কত দিন বাটীতে বসিয়া রহিয়াছি, নিজের তেমন টাকা নাই যে কোন একটা ব্যবসা করিব, আর আমি যেরূপ কাজের লোক, আপনি তাহা সবিশেষ জানেন, তাহাতে কোন ব্যবসায়ের জন্য যে আপনি আমাকে কিছু টাকা বিশ্বাস করিবেন সে বিশ্বাস আমার আদৌ নাই। যাই হোক্, ডিটেক্‌টীভ্‌গিরী কাজের জন্য আমার মনে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে—যাহার যে কাজে বিশেষ আস্ত-

রিকতা এবং আগ্রহ থাকে, সে অধিকাংশ স্থলেই সেই কাজে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে। আমারও মনে হয়, এক দিন হয়ত আমিও মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিব।"

বিনয়কুমার কহিলেন, "বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া তোর মাথাটা যেরূপ বিগড়াইয়া গিয়াছে দেখিতেছি, তাহাতে ও মাথা আর কোন কালে খুলিবে না। নতুবা আমার ভাই হইয়া তোর এমন নীচ-প্রবৃত্তি! তোর মনের যে এমন একটা দুর্গতি হবে, তা আমি স্বপ্নেও একবার ভাবি নাই।"

অক্ষয়কুমার বিষণ্ণভাবে কহিল, "তবে দাদা, আপনি যদি——"

বাধা দিয়া হস্ত ও মস্তক যুগপৎ আন্দোলন করিয়া দাদা বলিলেন, "এখন যা, এখন যা—আর কোন কথা শুনিতে চাই না, আর কোন কথা নয়।"

এই বলিয়া ডাক্তার বিনয়কুমার একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন; আর কোন কথা না কহিয়া অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ভাই তাহার দাদার মন জানিত, বুঝিতে পারিল, যখন দাদা একবার 'না' বলিয়াছেন, তখন দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে 'হাঁ' হইবার সম্ভাবনা একেবারে নাই।

৩

পরদিন সায়াহ্নে অক্ষয়কুমার বেড়াইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ বংশী আসিয়া সংবাদ দিল, "বড় বাবু আপনাকে একবার ডাকিতেছেন। তিনি বাহিরের ঘরে আছেন।"

অক্ষয় কহিল, "হঠাৎ আমাকে ডাক পড়িল কেন? কি হইয়াছে?"

বংশী কহিল, "কি জানি কি হইয়াছে, বাবু; তিনি রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার কহিল, "দাদার রাগের কথা আমি বেশ জানি, একটু কিছুতেই বাড়ী মাথায় করিতে থাকেন। আচ্ছা, আমি এখনই যাইতেছি।"

অক্ষয়কুমার তাড়াতাড়ি দাদার সহিত দেখা করিতে চলিল। এবং যেমন সে দ্বিতলের সোপানাবতরণ আরম্ভ করিয়াছে, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ডাক্তার বিনয়কুমারের একমাত্র পুত্র দশম বর্ষীয় সুশীল এক হাতে কাকার জামা টানিয়া ধরিল, তাহার অপর হস্তে একটা প্রকাণ্ড লাটাই ও একখানা ততোধিক প্রকাণ্ড ঘুড়ি। ঘুড়িখানার দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে—সংস্কার প্রয়োজন।

নৃত্যভঙ্গী সহকারে সুশীল আব্দার করিয়া বলিতে লাগিল, "কাকা বাবু, আমার ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে, এস না, মা আমার ঘুঁড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, তুমি চল না কাকা বাবু, আমার ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে।"

অক্ষয়কুমার প্রবোধ দিয়া বলিল, "তাইতো, আজ একবার ঘুঁড়ি উড়াইতে হইবে বৈ কি। কিন্তু এখন নয়, এখন ছাদে বড় রোদ।" বলিতে বলিতে সবেগে অক্ষয়কুমার সিঁড়ির নীচে নামিয়া গেল।

৪

তাড়াতাড়ি দাদার ঘরে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে অক্ষয়কুমার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে, আজ একটা কিছু বেশি রকমের দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দাদা একবার চেয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছেন, একবার টানিয়া বসিতেছেন, উঠিয়া বসিয়া কিছুতেই তিনি চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছেন না।

দাদাকে অক্ষয়কুমার যেমন অতিশয় ভক্তি করে তেমনি আবার ততোধিক ভয় করে। দাদার সেইরূপ ভাব দেখিয়া সে প্রথমে কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর কিছু সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল, "বংশীর মুখে শুনিলাম আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন।"

বিনয়কুমার কহিলেন, "হাঁ হাঁ, তাহাই বটে, তা এত দেরি হইল! বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার অকু, বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। কেবল আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এই টেবিলের উপরে একখানা কাগজ—কাগজ কেন? একখানা গোপনীয় চিঠী রাখিয়াছিলাম, সে খানা এখন কোথায় গেল কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

"কখন রাখিয়াছিলেন?"

"এই মাত্র।"

"দাদা, আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।"

"কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতেছি।" বলিয়া বিনয়কুমার বলিতে লাগিলেন, "কা'ল তুই ডিটেক্টীভগিরী কাজ শিখিবার জন্য আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলি, আজ থেকে আমার সেই চিঠী খানার ডিটেক্টীভগিরী কর্ দেখি। তোর মনে ধারণা পুলিসের কাজে তুই মাথা তুলিয়া একজন বেশ পাকা নাম জাদা ডিটেক্টীভ হইতে পারিবি; আজ আমার চিঠীখানা খুঁজে বাহির করিয়া দিলে তোর সে ধারণা কতদূর সত্য বেশ বুঝিতে পারিব। আর তোর বিদ্যাবুদ্ধির কত দূর দৌড় জানা যাইবে।"

অক্ষয়কুমার সাভিনিবেশ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, তাঁহার তখনকার সে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা মিথ্যা নহে। বরং তিনি তাহা ঢাকিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

বিনয়কুমার বলিলেন, "ঝি মাগী ডাকিতে আসিলে, আমি পত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া একবার বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গিয়াছিলাম।"

অ। পত্রখানিতে কি লেখা ছিল?

বি। যাহাই লেখা থাকুক না কেন, সে কথায় দরকার কি? বিশেষ গোপনীয় পত্র, যে লোকের পত্র সে কিম্বা আমি ছাড়া আর কাহারও নজরে যদি সে পত্রখানা পড়ে তাহা হইলে আমাকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে, এমন কি তাহা হইলে আমার মান সম্ভ্রম আর কিছুতেই থাকিবে না, একেবারে সকল দিকে সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

অ। কে আপনাকে সে পত্র লিখিয়াছিলেন?

বি। কেহ লেখেন নাই—আমিই কোন লোককে লিখিতেছিলাম। প্রায় লিখিয়া শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম, এমন সময় ঝি মাগী আমাকে ডাকিতে আসিয়া এই গোল বাধাইয়া দিল।

অ। কোন্ ঝি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিল?

বি। মঙ্গলা, তাহার উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। আমি যখন উঠিয়া যাই, তখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়াছিল। উপরের শোবার ঘরে এখনও সে কাজ করিতেছে—নীচে নামে নাই।

অ। কতক্ষণ আপনি এখানে অনুপস্থিত ছিলেন?

বি। দশ মিনিট। দশ মিনিট? দশ মিনিটও হবে না। পত্রখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া, আমি আরও তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসি।

অ। যাইবার সময় কি আপনি দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন?

বি। হাঁ, ফিরিয়া আসিয়াও আমি সেইরূপ বন্ধ থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

অ। পত্রখানি ছাড়া আর কোন জিনিস চুরি গিয়াছে?

বি। আর কিছু না, আর কোন জিনিসে কেহ হাত দেয় নাই। এমন কি টেবিলের উপরে যেখানে যে জিনিসপত্র যেমন ভাবে থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া ঠিক তেমনই দেখিয়াছি।

অ। টেবিলের উপর ঠিক কোন্ স্থানে আপনার চিঠীখানি ছিল?

বি। ব্লটিং প্যাডের উপরে ছিল। মঙ্গলা যখন আমাকে ডাকিতে আসে, তখনও আমি লিখিতেছিলাম, যাইবার সময় ব্লটিং প্যাডের উপর চিঠীখানা চাপিয়া, উঠিয়া যাই।

অ। আপনি বেশ জানেন যে উঠিয়া যাইবার সময় চিঠীখানা ব্লটিং প্যাডের উপর চাপিয়া গিয়াছিলেন।

বি। না, সে কথা আমি এখন ঠিক বলিতে পারি না। আমার এখন তাহা ঠিক মনে পড়িতেছে না।

অ। মঙ্গলা আপনাকে চিঠী লিখিতে দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল; সে যখন ঘরের ভিতরে আসিয়াছিল, তখন, সে অবশ্যই দেখিয়াছিল। কিন্তু, আমি কি লিখিতেছি, কি না লিখিতেছি সে কি করিয়া জানিবে? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

অ। তাহাকে আমি কোন সন্দেহ করিতেছি না। আপনি এ রকম একখানা গোপনীয় চিঠী এ সময়ে লিখিবেন, একথা বাড়ীর আর কেহ জানেন?

বি। কেহ না—কেহ না—জনপ্রাণী না।

বলিতে বলিতে ডাক্তার বিনয়কুমারের উদ্বেগ ক্ষোভ যুগপৎ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিল। "যেমন করিয়া হউক পত্রখানি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। এমন বিপদে আমি আর কখনও পড়ি নাই। তোর উপরই চিঠীখানার সন্ধান করিবার ভার রহিল।"

অ। দাদা, আপনি আমার উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যখন আপনি এখানে অনুপস্থিত ছিলেন তখন আর কোন লোক এ ঘরে ঢুকিয়াছিল কি না, সে সন্ধান লইয়াছেন কি?

বি। সে সন্ধান আমি আগেই লইয়াছি। বংশী জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, "আমি খুব জানি বাবু আপনার ঘরে আর কেহ যায় নাই।"

অ। বংশী আর কি বলিল?

বি। আর কিছু নয়। কেন তাহার উপর কোন সন্দেহ হয় না কি?

অ। না, তাহাকে আমি সন্দেহ করিতেছি না, বংশীকে আমি খুব জানি। সে আমাকে বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কিন্তু, সে কিরূপে এমন নিশ্চয় করিয়া বলিল যে, আপনার এ ঘরে তখন আর কেহ প্রবেশ করে নাই।

বি। তখন সে এই সাম্‌নের ঘরে কাজ করিতেছিল। আমার ঘরে কেহ ঢুকিলে সে অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইত। বিশেষতঃ এ ঘরের দরজাটা ঠেলিয়া খুলিবার সময় এক প্রকার শব্দও হয়।

অ। তাহা যেন হইল। দরজা দিয়া না আসিয়া কেহ যদি জানালা দিয়া আসিয়া থাকে?

বি। জানালা এখন যেমন খোলা আছে, তখনও এমনি খোলা ছিল। জানালা দিয়া কেহ আসে নাই। জনালাগুলি অনেক দিনের পুরাতন হইলেও গরাদেগুলি এখনও বেশ মজবুত আছে।

অক্ষয়কুমার তথাপি নিজে একবার প্রত্যেক গরাদেটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—দাদার কথা সত্য।

৫

অনন্তর অক্ষয়কুমার দাদার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে টেবিলের উপরিস্থিত কোন একটী দ্রব্যের উপর তাহার নজর পড়িল। সচকিতে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এ কি এ?"

বিনয়কুমার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, টেবিলের এক পার্শ্বে গাঁদ বা তৈলের মত কি একটু লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন,

"কি জানি বলিতে পারি না। যখন আমি উঠিয়া যাই, কই, তখন ইহা ছিল না। বোধ হয় কোন আটা হইবে।

অক্ষয়কুমার দাদার রিডিংল্যাম্প লইয়া অবনত দেহে ভূন্যস্তজানু হইয়া সেই তৈলবৎ পদার্থটী বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে উঠিয়া বলিল, "দাদা, আপনার কথাই ঠিক, গঁদের আটা। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিরূপে আপনার পত্র চুরি গিয়াছে; বাঁথারিতে গঁদের আটা মাখাইয়া কেহ জানালার বাহির হইতে চিঠীখানা তুলিয়া লইয়াছে। হয় ত কোন লোকের পরামর্শে কেহ এই কাজ করিয়া থাকিবে।"

বিনয়কুমার নির্নিমেষনেত্রে ক্ষণেক নীরবে অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে এমন কাজ করিবে? কাহাকে তোমার সন্দেহ হয়? সেই চিঠীখানাই যে ঠিক সেই সময়ে টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিবে সে কিরূপেই বা জানিতে পারিল? এমন অনেক দিন অন্যান্য পত্রও ত টেবিলের উপর পড়িয়া থাকে। আজ আমি ঠিক ঐ চিঠীখানিই লিখিব, লিখিতে লিখিতে হঠাৎ ফেলিয়া উঠিয়া যাইব, এ সকল কে আগে জানিতে পারিবে, এ কথা ঠিক নহে।"

অক্ষয়কুমার কহিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। সে যাই হোক, যেমন করিয়া পারি, আমি আপনার চিঠীখানি সন্ধান করিয়া বাহির করিবই। আপনার বেশ মনে হয় যে আপনি এই টেবিলের উপরেই চিঠীখানি ফেলিয়া গিয়াছিলেন?"

বিনয়কুমার বলিলেন, "হাঁ, আমার এখন মনে পড়িতেছে যেন যাইবার সময় আমি তাড়াতাড়ি চিঠীখানা ব্লটিংপ্যাডের উপর উল্টাইয়া দুই এক বার চাপিয়া রাখিয়া যাই।"

অক্ষয়কুমার কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "যদি আমি আপনার চিঠীখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিই দাদা,

আমাকে আপনি কি পুরস্কার দিবেন, বলুন দেখি? সে চিঠী কেহ পড়ে নাই, আপনি ভিন্ন আর কেহ তাহার মর্ম্ম জানিবে না, এইরূপ অবস্থায় সে পত্র আপনি ফিরিয়া পাইবেন।"

বিনয়কুমার বলিলেন, "তাহা হইলে তুই জানিস্, সে চিঠীখানা কোথায়।"

অক্ষয়কুমার বলিল, "কিছুই না। আপনার মত আমি এখনও অন্ধকারে আছি। তথাপি আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, আপনার এই অপহৃত পত্রের ডিটেক্‌টীভগিরী করিয়া কিছু করিতে পারি কি না। আপনার অপহৃত পত্রের পুনরুদ্ধারের ভার আমার উপরেই রহিল। যদি আমি আপনাকে আমার ডিটেক্‌টীভ বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারি, বলুন, আপনি কি পুরস্কার দিবেন? আমি আর কোন পুরস্কার চাই না। বলুন, আমাকে পুলিসলাইনে ঢুকিতে আপনি সম্মতি দিবেন?"

বিনয়কুমার অপরিসীম আগ্রহের সহিত বলিলেন, "তাহাই হইবে; সেই চিঠীর মর্ম্ম আর কেহ না জানিতে পারে, এমন অবস্থায় যদি তুই চিঠীখানি আনিয়া আমার হাতে দিতে পারিস্, কেবল আমি পুলিস কর্ম্মচারী হইতে তোকে সম্মতি দিব না, তোর এই প্রথম ডিটেক্‌টীভগিরির ফি বা পারিশ্রমিক স্বরূপ তোকে আরও আড়াইশত টাকা দিব। দেখি তোর ডিটেক্‌টীভ বুদ্ধির দৌড় কত।"

"আমিও দেখি, আপনার পত্রখানার কোন কিনারা করিতে পারি কি না।" এই বলিয়া অক্ষয়চন্দ্র গমনোদ্যত হইল।

বাধা দিয়া বিনয়কুমার বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছিস্—সে চিঠী কোথায় আছে?"

অক্ষয় উপন্যাসের ডিটেক্‌টীভদের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক গম্ভীরভাবে কহিল, "এখন আমার কাছে কোন কথা পাইবেন না, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন; যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তখন

সকল কথাই আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া বলিব। আপনার নিকট প্রার্থনা, এখন আপনি কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।

বলিতে বলিতে অক্ষয়কুমারের প্রস্থান।

অক্ষয়কুমার চলিয়া গেলে, তাহার দাদা অনেকক্ষণ ধরিয়া পত্রের সন্ধানে ইতস্তত করিলেন। কোন ফল হইল না। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ঘরের বাহির হইয়া দ্বারে চাবি লাগাইলেন এবং বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে বিনয়কুমার বিশ্রামার্থ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায় গৃহিণীর বাক্যসুধাবর্ষণে তাহার উদ্বিগ্নহৃদয় অনেকটা পরিমাণে আপাতত প্রকৃতিস্থ হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে তিনি শয়নগৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া বংশীকে সম্মুখে দেখিয়া যেন বংশী আজন্ম বধির, এমন অপরিমিত উচ্চকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে বংশি, ছোটবাবু গেল কোথা রে?"

বংশী বলিল, "কৈ বাড়ীতে নাই, বোধ হয় বাহিরে গেছেন!"

বিনয়কুমার পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে কহিলেন, "বাহিরে কোথায়?"

বংশী কহিল, "তা বাবু আমি ঠিক বলিতে পারি না, এই কতক্ষণ আগে তিনি বাহির বাড়ীর উঠানে বেড়াইতেছিলেন।"

বিনয়কুমার ভিতর-বাটী হইতে, পুনরপি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ঘরের ভিতরে সকল স্থান তন্ন-তন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে—সুতরাং পত্রের সন্ধানে পরিশ্রমস্বীকারের আর তিনি কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। একখানা চেয়ারের উপর করতললগ্নশীর্ষ হইয়া বসিলেন এবং আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "কি আপদ্, আমি অকুর কথায় নির্ভর করে' নিশ্চিন্ত আছি। এমন নির্ব্বোধ আর দুটী নাই। যে চিঠি চুরি করিয়াছে, সে এতক্ষণে তিনক্রোশ তফাতে চলিয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! চিঠিখানির জন্য আমার মানসম্ভ্রম সকলই নষ্ট হইবে, দেখিতে পাই। যেমন করিয়া হোক, চিঠিখানি আমার পাওয়া চাই। কি করি, আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এখনই আমি একজন ভাল ডিটেক্‌টীভের জন্য টেলিগ্রাফ করিব। এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। মাথা তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে?" "আমি"! (ক্রমশঃ)

কুন্দ, সূর্য্যমুখী ও কমল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদেশখ্যাত বিষবৃক্ষ উপন্যাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে সকল আলোচনার বিষয় একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উক্ত উপন্যাসের প্রধান দুটী স্ত্রীচরিত্রের সম্বন্ধে গুটীকতক কথা বলিতে চাহি।

বিষবৃক্ষ সামাজিক উপন্যাস, বাঙালীগৃহের ভাস্বর চিত্র। এ কথা অনেকে হয় ত জানেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার এ কথা জানিয়া ও স্বীকার করিয়াও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় অসম্ভাব্যের ছায়াপাত দেখিতে পান। অর্থাৎ বিষবৃক্ষকে Realistic গল্প জানিয়াও ইহাকে Romantic গ্রন্থের শ্রেণীতে নিহিত করেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান একটী ভ্রম। কবি এই গ্রন্থকে সম্পূর্ণরূপে Realistic করিয়া গড়িয়াছেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরানার অসূর্য্যম্পশ্যা কন্যা আয়েষার পক্ষে অপরিচিত যুবক জগৎসিংহের সহিত প্রেমসম্ভাষণ অপ্রাকৃত হইতে পারে, যুবতী বাঙালীর দুহিতা প্রফুল্লের গীতোক্ত "সর্ব্ববৃত্তির স্ফূর্ত্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা" * সাধন করিতে গিয়া মল্লের সহিত

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

কুস্তিশিক্ষা বা (দ্বিজেন্দ্রলালবাবু যেমন 'ভারতীতে' দেখাইয়াছিলেন) ব্রাহ্মণযুবতী শাস্তির মল পায়ে দিয়া ইংরাজযুবকের সহিত একত্রে বসিয়া অশ্বচালনা বিসদৃশ, সন্দেহ নাই ; কিন্তু পতিপ্রেমবঞ্চিতা সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ বা সমাবস্থাপন্না কুন্দের বিষপান কোন অংশেই সত্য ও সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই এ কথা বলিয়া রাখা ভাল। কারণ যে দুটী চরিত্র আমরা সমালোচনা করিতে যাইতেছি, তাহা বুঝিতে হইলে এ কথা পূর্ব্বে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্যার এডুইন আর্‌নলণ্ড, বিষবৃক্ষের ইংরাজী অনুবাদের মুখবন্ধে, গ্রন্থের প্রধান প্রধান চরিত্রের যে সংক্ষিপ্ত ও উৎকৃষ্ট সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে এই কথার উপরই প্রধানত ইংরাজী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর চরিত্রসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "এরূপ স্ত্রী-চরিত্রের পতিপ্রাণতা পাশ্চাত্য জগতে বিরল ও অসম্ভব বোধ হইলেও বঙ্গের অনেক গৃহে এরূপ স্ত্রীচরিত্র দেখিতে পাওয়া আশ্চর্য্য নহে"—এরূপ মর্ম্মের একটা কথা বলিয়াছেন। আমরাও পাঠককে এই কথা স্মরণ রাখিতে বলিয়া উক্ত দুটী স্ত্রীচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইব।

গ্রন্থের প্রধানা স্ত্রী বা নায়িকা সূর্য্যমুখী, ইহা সকলেই জানেন—কুন্দ ও কমল দুটী পারিপার্শ্বিক চিত্রমাত্র। সূর্য্যমুখীর চরিত্র পূর্ব্বগামী অনেক বিজ্ঞ সমালোচকেরা বিস্তৃত-বিশদ-ভাবে সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন—সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় ধৃষ্টতা করিতে চাহি না, আভাস-মাত্র করিব। প্রায় কাব্যসাহিত্যে ইহা দেখা গিয়াছে যে, গ্রন্থের প্রধানা স্ত্রীর চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যে পারিপার্শ্বিক অপরাপর চিত্রগুলি অনেক স্থলে ম্লান, অনেক স্থলে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের

আর এক উৎকর্ষের বিষয় এই যে, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও বিভিন্ন-নামধারী মাত্র না হইয়া, পরস্পর আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রাখিয়া গিয়াছে। কুন্দ, কমল, দেবেন্দ্র, হীরা, শ্রীশ, এমন কি, সুরেন্দ্র পর্য্যন্তও আপনাপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল! বিশেষত কুন্দ ও কমলের চরিত্র। যেমন বহিঃপ্রকৃতিতে দেখা যায় যে, একটী বৃহৎ তেজাল বৃক্ষের আওতায় সমীপবর্ত্তী অন্যান্য ছোট গাছগুলি মারা যায় বা বাড়িতে পায় না, কাব্য-সাহিত্যেও অনেকটা তাই—একটী উজ্জ্বল চরিত্রের আওতায় অনেক পারিপার্শ্বিক চিত্র পরিস্ফুট হইতে পারে না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ কথার সাপক্ষে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা অসম্ভব—সীতার স্থানে উর্ম্মিলার চিত্র, শকুন্তলার স্থানে তাঁহার সখীদ্বয়, এমির পাশে পিউরিটান তনয়া জ্যানেটের (Kenilworth) বা রমোলার পাশে টেসার চিত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি একটী মনোরম মৌলিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সব কাব্যের উপেক্ষিতাদের প্রতি বঙ্গীয় পাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছেন।

কিন্তু বিষবৃক্ষের ব্যাপার স্বতন্ত্র—সেখানে যেন কুন্দ-কমলের চিত্র সূর্য্যমুখীর লোকমোহিনী মূর্ত্তিকে আরও উজ্জ্বল ও মধুর করিয়াছে। যেমন ক্ষুদ্র বুল্ আইল্যাণ্টারণে গৃহের ক্ষুদ্র প্রচ্ছন্ন কোণও উজ্জ্বল স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেইরূপ কুন্দ ও কমলরাণী ল্যাণ্টারণের সহায়ে সূর্য্যমুখীর চরিত্রের অনেক প্রচ্ছন্ন কোণও আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেখানে মহামহিমময়ী সূর্য্যমুখী পতিদেবতাদের অমর সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিতা আছেন, সে সুখস্বর্গ হইতে তাঁহাকে কেহ স্থানচ্যুত না করুক (অভাগিনী কুন্দ, স্বেচ্ছায় নহে, ঘটনাচক্রে তাঁহাকে সে সিংহাসনচ্যুত করিবার প্রয়াসে আপনার জীবন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দণ্ড দিয়াছিল)—তাহার পার্শ্বে যে স্থানটুকু আছে, তাহা স্বল্পপরিসর

হইলেও গৌরবময়। যদিও সূর্য্যমুখীর গৌরবোদ্ভাসিত মহিমগর্ব্বপূরিত প্রেমোৎফুল্ল সাম্রাজ্ঞীমূর্ত্তির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার আনন্দময়ী চিরকৌতুকময়ী ননদিনী কমলের হাসি-মাখা মুখখানি ও নৈসর্গিক লজ্জা ও নম্রতায় অবনতনয়না সপত্নী কুন্দনন্দিনীর পরিম্লানমুখশ্রী কে ভুলিবে? সূর্য্যমুখীকে দেখিলে আমাদের মন, তাঁহারই পৌরন্ধ্রী মহিলাদের ন্যায়, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়, যদি সহসা কবির অলৌকিকী প্রতিভার মায়ামন্ত্রবলে এই দেবকন্যা আমাদের চর্ম্মচক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হন—সত্যই যদি কল্পনার মায়াবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি শরীরী হইয়া দর্শন দেন, তাহা হইলে দর্শনমাত্রেই কি আমরা এই পতিপ্রাণা দেবীমূর্ত্তির চরণতলে মস্তক লুটাইয়া পড়ি না? সত্যই কি তাঁহার সমক্ষে পাপিষ্ঠা হরিদাসী বৈষ্ণবীর চপল পরিহাস সহ্য করি, না তাহার অসভ্য রসিকতায় এই দেবীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইতেছে ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া বন্ধু সুরেন্দ্রের কথায় "দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী যাত্রা ঘুচাইয়া দি?"

বস্তুত, বিষবৃক্ষ অনেকদিন হইল লিখিত হইয়াছে; তাহার পর অনেক প্রতিভাশালীর লেখনীপ্রসূত সদ্‌গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইয়াছে, কিন্তু কোনটীতে এমন একটী চরিত্র চিত্রিত দেখিতে পাইলাম না, যিনি সূর্য্যমুখীর স্থান অধিকার করিতে পারেন। এমন কি, স্বয়ং গ্রন্থকারও তাঁহার বিস্তীর্ণ ও মনোরম চিত্রশালিকায় সূর্য্যমুখীর দ্বিতীয় আর একটী চরিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলেন না—ইহা অপেক্ষা উক্ত চরিত্রের আর অধিক প্রশংসা কি হইতে পারে?

ত্রেতার তপঃক্লিষ্ট তাপসের মানসী কন্যা বা যাঁহার সতীত্ব-প্রভাবে অমোঘ যমদণ্ডও স্খলিত হইয়াছিল বা যিনি কলির অন্যায় শাপে পিতৃগৃহে নিয়মব্রতচারিণী একবেণীধরা হইয়া ভর্ত্তার দীর্ঘ

বিরহব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন—সেই হিন্দুকুললালনাদের আরাধ্যা দেবীরা—সেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী গান্ধারী প্রভৃতি যাঁহারা—

"ধুরি স্থিতা পতিদেবতানাম্"

সেই পতিব্রতার অগ্রগণ্যারা এখন যে লোকে স্থান পাইয়াছেন, তাহা দেবলোক—তাহা হিন্দুকুললালনার নন্দনভূমি;—সে লোকে মনুষ্যের গতায়াতের উপায় নাই। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন অলৌকিক প্রতিভা তাঁহাদিগকে হিন্দুনারীর আদর্শস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছেন, সেই দিব্য-লোক হইতে বিচ্যুত করিতে কোন দেশের কোন কবি কখনও সক্ষম হইবেন, এরূপ কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারি না।

কিন্তু উঁহারা দেবী—কোনও কালে এলোকে দেহধারিণী বলিয়া বর্ণিত বটে; এখন তাঁহারা কেবল হিন্দুনারীদের আদর্শস্থানীয়া নহেন, দেবীবৎ পূজনীয়া। আমরা আমাদের কুমারীদের সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠান করিতে শিখাই, ব্রত-উদ্‌যাপন-কালে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির পাতিব্রত্য অনুকরণ করিতে সক্ষম হইবার জন্য দেবতার প্রসাদ যাচ্ঞা করি—বিবাহকালীন মঙ্গলবাসরে আমরা দুরনক্ষত্রলোকে সতীর অগ্রগণ্যা অরুন্ধতীর প্রতি নবীন দম্পতির দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইহার অর্থ এই যে, সেই সতীকুলসাম্রাজ্ঞীরা পাতিব্রত্যের যে পরম পবিত্র মার্গ ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু-নারীদের জন্য তাঁহারা যে অমরপদাঙ্কচিহ্ন স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন—তাহার কিছুমাত্র অনুসারিণী হইলেও তাহাদের নারীজন্ম সার্থক হইল, বিবেচনা করি। সূর্য্যমুখী আমাদের সেরূপ ভক্তির পাত্রী নহেন। দেবতাকে লইয়া সিংহাসনে স্থাপনা করিয়া পূজা করিতে হয়, ঘর করা চলে না। বৈদ্যুতিক আলো অত্যুজ্জ্বল বটে, কিন্তু গৃহের রন্ধন-কার্য্যাদির জন্য তাহা উপযোগী নহে, সেখানে কাঠ-কয়লার জ্বাল চাই। সীতা-সাবিত্রীকে আমাদের ঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অসামান্যা হইলেও সূর্য্যমুখী আমাদেরই কন্যা, আমাদেরই বধূ; বোধ হয়

যেন তাঁহাকে মানসনেত্রে দেখিতেছি—যেন কোন দূরপল্লীগ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুললক্ষ্মী হইয়া এখনও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সূর্য্যমুখীকে ভাবিতে গেলে আমাদের কল্পনা পরিশ্রান্ত, হতাশ হইয়া দূর নক্ষত্রলোক হইতে ফিরিয়া আসে না, এই বঙ্গগৃহেই নেত্র নির্ব্বাণ পায়—দোষেগুণে কবি এমনই Realistic ছবি গড়িয়াছেন।

আর কমল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রথমেই গোবিন্দপুরের জমিদারবাটীর অন্তঃপুরে প্রথমপ্রবেশকালীনই সূর্য্যমুখীর দেবীমূর্ত্তি তোমাকে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করিবে। মনে হইবে যে, এই সর্ব্বগুণশালিনী অসামান্যা রূপবতী পতিপ্রাণা রমণী যাঁহার সহধর্ম্মিণী, "না জানি সে কোন্ ভাগ্যবান্?"

কিন্তু একেবারে বিস্ময়-চকিত হইয়া থাকিও না, সেথা হইতে তোমার মুগ্ধনয়নকে একবার কলিকাতার একটী বাসভবনে ফিরাইতে অনুরোধ করি। যেখানে, গ্লওর্ ফেয়ার্লি কোম্পানীর বৃহৎ হৌসের মুৎসুদ্দি শ্রীশচন্দ্রবাবু গদিয়ান্ হইয়া তিনি ও সর্ষপের আয়ব্যয়ের হিসাবে গাঢ় নিমগ্ন—সেখানে একবার প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি। গৃহটী গোবিন্দপুরের জমিদারগৃহের অপেক্ষা সাজসজ্জা ও ঐশ্বর্য্যে কোন অংশে নূন্য নহে। যেখানে দেখিবে; সেখানেই সাজসজ্জার পারিপাট্য, সর্ব্বত্র এক নিপুণ পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতায় গৃহস্বামিনীর গৃহিণীপনার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, যে অষ্টাদশবর্ষীয়া (বয়সে অষ্টাদশ বটে, কিন্তু মুখে এমন একটী প্রেমগর্ব্বপূর্ণ মাধুরীমাখা চিরানন্দময় তারুণ্যের ভাব আছে, যাহা ষোড়শীরও দুর্লভ) পরমা সুন্দরী যুবতী এক কুসুমোপম শিশুকে কক্ষে লইয়া তোমার নেত্রপথবর্ত্তিনী হইবেন, তাঁহাকে দেখিয়া তুমি নিশ্চয় মনে করিবে যে, ইহা অপেক্ষা কোন্ অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী তোমার অধিক মনোহারিণী? সেই আলোকময়ী আনন্দময়ীর মুখ দেখিয়া তুমি নিশ্চয় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে

পারিবে না। তুমি হও আর না হও, ঐ দেখ, আমাদের মুৎসুদ্দিবাবুর অবস্থা দেখ, তাঁহার খতিয়ান্ ও রোকড়, গম ও তিসির হিসাব কোন্ মিশ্চিন্তপুরের অতলতলে মিলাইয়া গেল! আর এই গ্লওরের হৌসের সুচতুর বাবুটী—যিনি অনেকসময়ে অনেক কাল্পনিক হিসাবে অনেক বুদ্ধিকৌশলে আফিসের বড়-সাহেবকে সর্ষপকুসুম দেখাইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন—তাঁহাকেও নিমেষে হতবুদ্ধি হইতে হইল! কারণ কমল খাতির করিয়া নিজের স্বামীটীকে মন্ত্রিত্বে অভিষেক করুন, কিন্তু অপক্ষপাতী দর্শকমাত্রেই বলিবেন যে, কমলের যোগ্য মন্ত্রী শ্রীশ নহেন—কথায় অনেকসময় কমলকে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহার বাগ্-বৈদগ্ধ্যে ও রসিকতায় অনেকসময় আমাদের মুৎসুদ্দিবাবুকে ব্যাকুব বনিতে হইয়াছে।

এই চতুরতা, এই রহস্যপ্রিয়তা, এই পরিহাসরসিকতা কমলের নৈসর্গিক। এস্থলে একটী কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেটী এই যে, কমলমণি নগেন্দ্রের সহোদরা ভগিনী বটেন, কিন্তু অগ্রজের প্রকৃতি অনুজার অনুরূপ নহে। অন্যান্য বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিতেছি না, বলিতেছি এই রহস্যপ্রিয়তায়। নগেন্দ্র গম্ভীরপ্রকৃতি, চলিত কথায় যাহাকে "রাশ্ভারী" লোক বলে—সূর্য্যমুখীও অশেষগুণশালিনী হইলেও এবিষয়ে স্বামীর অনুরূপিণী। তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্বের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য, যেখানে হরিদাসী বৈষ্ণবী বহুপৌরমহিলাসমাকুল দত্তদের অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে স্থানের সেই মেয়েদের আসরবর্ণনায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, "সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গার্ব্বতা, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না।" অর্থাৎ এক কথায় তিনি রাশ্ভারি লোক ছিলেন, অন্য স্ত্রীলোকদের মত চপল

হাস্যপরিহাস তাঁহার ভাল লাগিতানা। গ্রন্থকার তাঁহাকে যে 'গর্ব্বিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেরূপ ঐশ্বর্য্যের অসহনীয় গর্ব্ব, যাহাকে চলিত কথায় 'দেমাক্' বলে, তাহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ সে চরিত্রের দোষস্থানীয়। ইহা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, যাহা অনেক উদার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির আনুষঙ্গিক দেখা গিয়াছে; অথচ ইহা 'দেমাক্' নহে। কমল কিন্তু সেরূপ আদৌ নহেন; তিনি সর্ব্বদাই হাস্যময়ী, রঙ্গপ্রিয়া। ঘোর বিপদের সময়ও এ মূর্ত্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এজন্যই কুন্দচরিত্রে সন্দিহান হইয়া সূর্য্যমুখী যখন রোষ-কষায়িত লোচনে হরিদাসীর প্রকৃততথ্যনির্ণয়ে হীরাকে অনুযোগ করিতেছেন, তখন কমল মাগীকে 'বাবলা কাঁটা ফোটানোর সুখ' বুঝাইবার সুযোগ খুঁজিতে ভুলেন নাই। পিতৃহারা কুন্দকে কলিকাতায় আনিয়া যখন কুন্দের কোন আত্মীয়কে খুঁজিয়া না পাইয়া নগেন্দ্র এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া বিব্রত হইতেছিলেন, কমল তখন তাহাকে পাইয়াই এক নিমেষে অতর্কিতে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িয়া তাহাকে অনতিতপ্ত জলের টবের ভিতরে ফেলিলেন। সরলা গ্রাম্যবালিকাকে এরূপ সহসা চকিত সন্ত্রস্ত করিতে কমলের কি কৌতুক! তাহাকে সৌরভযুক্ত সোপ মাখাইয়া হাসিতে হাসিতে যখন কুন্দের গাত্রমার্জ্জনা করিতেছেন, তখন স্বয়ং কর্ত্রীকে এ সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর পরিচারিকার গাত্রে তপ্ত জল ঢালিয়া দেওয়ার কৌতুক কমলের কিরূপ স্বভাবসঙ্গত! স্বামীর আফিসের দোয়াত উল্টাইয়া, 'সুখটানে' প্রবৃত্ত তাঁহার ছিলিম ফেলিয়া, তাঁহার আহ্লাদ দেখে কে? এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুকে স্বামীকে কিরূপ উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কবি এই সব তুচ্ছ ঘটনায় তাঁহার চরিত্রের এ বিশেষত্ব কিরূপ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

এই রহস্যপ্রিয়তা কমলের চরিত্রে সর্ব্বত্র নবীনতা ও মাধুর্য্যের আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে তরুণ শরতের সূর্য্যরশ্মি যেমন

কোথাও গৃহস্থের গৃহে হাস্যারুণদীপ্ত শিশুমণ্ডলীর ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে, কোথাও গবাক্ষ দিয়া সুপ্তা সুন্দরীর ভ্রমরভরস্পন্দিত দীর্ঘপক্ষ্মবিশিষ্ট কমলনেত্রশোভী চন্দ্রমুখের উপর, কোথাও নবোদ্ভিন্ন তাম্ররুচি কিশলয়ের মধ্য দিয়া পুষ্করিণীর জলের উপর কনকের নিক্ষ-রেখা অঙ্কিত করে, কমলের রহস্যোজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্ল মুখখানিও যেখানে দেখা দিয়াছে, সে স্থান উজ্জ্বল করিয়াছে, সেখানেই শোকান্ধকার কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। শ্রীশচন্দ্রের গৃহ যে সর্ব্বদা এই আনন্দময়ী হাস্যমুখর করিয়া রাখিবেন, সে ত স্বাভাবিক; কিন্তু গোবিন্দপুরের বৃহৎ প্রাসাদের আলোক ও আমোদ যখন ম্লান হইয়া আসিতেছে ও অকাল-জলদোদয়ে চতুর্দ্দিকের ঘনান্ধকারে যেরূপ ভাবী অমঙ্গল সূচনা করে, সেরূপ সেই—

কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম—

নগেন্দ্রের সুন্দরী পুরী শোকের অমঙ্গলছায়ায় অন্ধকার হইয়াছে ও পৌরাঙ্গনাদের হাস্যলহরী, শিশুদের ক্রীড়াকৌতুক, অতিথি-অভ্যাগতদের কোলাহল, যাহা ঐ প্রাসাদকে পারাবতসঙ্কুল গৃহবলভীর ন্যায় নিয়ত মুখরিত করিয়া রাখিত, সেই আনন্দকলরব যখন পরিক্ষীণতৈল স্তিমিত দীপশিখার ন্যায় ম্লান মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, সেখানে সেই অসময়ে গিয়া, আনন্দময়ী উদিত হইলেন। তখন গোবিন্দপুরের শোক-ম্লান দত্তগৃহ যেন আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল!

এই অত্যধিক রঙ্গকৌতুকপ্রিয়ার হৃদয়ে করুণা ও প্রেমের পূতধারা অন্তঃসলিলবাহিনী ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিয়াছে। স্নেহবৃত্তিবর্জ্জিত, কেবল রসিকতামাত্রসম্বল নারীহৃদয় আদৌ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে না, তাহা থ্যাকারে (Thackeray) তাঁহার রেবেকার চরিত্রে বেশ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বেকি শার্পের (Becky Sharp)

চিত্র, শারীরিক সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল, প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিতে, চাতুর্য্যে, লোক-চরিত্রপরিজ্ঞানে অতুল ; কিন্তু এত গুণ থাকিলেও সে হৃদয়হীন—তজ্জন্য পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে অক্ষমা। এইজন্যই বুদ্ধিহীনা হইলেও এমেলিয়ার (Amelia) দুঃখ আমাদের এতটা মর্ম্মস্পর্শ করে। কবি তাঁহার কমলকে এই মহৎ-দোষ হইতে বাঁচাইয়াছেন। কমল চতুরা, কতক মুখরাও বটে, কিন্তু হৃদয়হীনা নহে। কারণ সে, হিন্দুগৃহের সাধ্বী রমণী। আমাদের হিন্দুগৃহের রমণী কেবল রঙ্গিণী বিলাসিনী নহেন, সংসারের শত বিপদ্-আপদে সহায়দাত্রী ও শান্তিরূপিণী। তাঁহারা মধুকররতা, সুখের অংশভাগিনী ও বিপদে বিঘ্নকারিণী নহেন ; সাধ্বী স্ত্রীর কল্পনা করিতে গেলে আমাদের মনে অন্নপূর্ণার স্নেহসুধাময়ী কল্যাণমূর্ত্তি জাগরূক হয়। কমলকে যদি তোমরা চপলা, রসিকা, চতুরা, লঘুহৃদয়া মনে করিয়া থাক, তবে যেখানে সূর্য্যমুখী কুন্দকে স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া সান্ধ্য অন্ধকারে রুদ্ধগৃহে যখন ভূতপূর্ব্বের শীর্ণছায়ার মত বসিয়াছিল, সেখানে সেই পতিপ্রেমসর্ব্বস্বের নিরাশ হৃদয়ে কমলের গভীর স্নেহ ও সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়া সুস্থ করিবার প্রয়াস দেখিয়া তোমার এ ভ্রম নিশ্চয় দূর হইবে। আবার সূর্য্যমুখী যখন এ সাক্ষাতের পর কমলকে ত্যাগ করিয়া পলাইল, (কমল বুঝিয়াছিল, জন্মের মত) তখন তাহার অকপট মর্ম্মভেদী বিলাপ দেখিয়া কোন্ সাহসে তাহাকে হৃদয়হীনা বলিবে? কুন্দকে নগেন্দ্রের নেত্রান্তরাল করিয়া দত্তপরিবারকে আসন্ন সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কুন্দকে কলিকাতা যাইতে অনুরোধ করিবার সময় তাহাদের কথোপকথনে তাহা কিরূপ উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট—অভাগিনী মিত-ভাষিণী কুন্দও মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিল যে, কমল তাহাকে কত ভালবাসে! সূর্য্যমুখী-বিয়োগবিধুর নগেন্দ্র যখন সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সকলের নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন, তখন কত প্রাণপণ

যত্নে কমল দত্তপরিবারের ভ্রষ্টশ্রীক বৃহৎ প্রাসাদের পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—কেন না, পাছে গৃহের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অগ্রজের মনে সূর্য্যমুখীর বিরহবেদনা দ্বিগুণিত হয়।

কমলের চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব তাহার পতিপ্রেমে। এ সম্বন্ধে তাহাকে কুন্দ ও সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের কথা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। তিন জনের কাছে পতির প্রেমই সর্ব্বস্ব ও পতিচরিত্রে অচলা ভক্তি। তবে ইহার মধ্যে প্রভেদ আছে। সূর্য্যমুখী পতিকে দেবতা ভাবিয়া তাহার নারীহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল। উপাস্য দেবতাকে সাধক যেমন সমস্ত প্রাণ খুলিয়া ভক্তি করে, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের শ্রীচরণে সেরূপ তাহার সমস্ত দেহমন উৎসর্গ করিয়াছিল। সে প্রেমে সখ্যভাবের অপেক্ষা ভক্তিভাবের সমধিক প্রাবল্য ছিল। কিন্তু কমলের পতিপ্রেমে বা প্রেমভক্তিতে সখ্যভাবের অধিক প্রাবল্য ছিল। হিন্দুস্ত্রীর নিকট স্বামী যেমন এক পক্ষে মহাগুরু দেবতাতুল্য পূজনীয়, তদ্রূপ অপর পক্ষে তিনি প্রাণাধিক সখা, বয়স্য, সুহৃৎ। মিতভাষিণী কুন্দ নগেন্দ্রকে দূর হইতে, তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দিয়া, নীরবে পূজা করিত—সে প্রেম নীরব অথচ শান্তজলাধিবক্ষের ন্যায় গভীর। কমলের কৌতুকপ্রবণ হৃদয়ে প্রথমোক্ত ভাব অপেক্ষা এই শেষ ভাবেরই প্রাধান্য পরলক্ষিত। উভয়েরই পতির উপর গভীর বিশ্বাস—যদিও কমল এ সম্বন্ধে বড়াই করিয়া বলিয়াছিল যে, যাহার পতির উপর বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরণই মঙ্গল—তথাপি প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কমলমণি সূর্য্যমুখীর সমাবস্থা-পন্না হইলে কি করিতেন, বলা দুষ্কর। তবে তিনি যে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার মত পতিকে দেবতার মত ভালবাসিতেন, এরূপ তাঁহার রঙ্গপ্রিয় চরিত্রে ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার প্রেম অনেকটা দুর্গেশনন্দিনীর বিমলার মত, যেমন গভীর সেইরূপ কৌতুকপ্রিয়—অথচ কে বলিবে বিমলার পতিপ্রেম

গাম্ভীর্য্যময়ী আয়েষা বা লাজসঙ্কুচিতা তিলোত্তমা অপেক্ষা ন্যূন? এইজন্যই দেখিতে পাই, সূর্য্যমুখীর সোহাগেও একটা গাম্ভীর্য্য আছে—কিন্তু কমলের কথায়-কথায় এত অকারণ মান ও ক্রোধ, যাহার উৎপাত বেচারা শ্রীশচন্দ্রকে অহরহ সহিতে হইত—উহা যেরূপ অকারণসঞ্জাত তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী—অথচ প্রভাতের জলদোদয়বৎ এই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—একটী সোহাগের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া যাইত, তাহার ঠিকানা নাই—এই সমস্ত চপল ব্যবহারের মূলে কি কমলের স্নেহোৎফুল্ল রঙ্গময় হৃদয় নিহিত নয়?

আমরা দেখিলাম যে, কমলমণি পরমা সুন্দরী, রসিকা, পতিপ্রাণা, দয়াবতী, স্নেহপরায়ণা। এ সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক গুণের সহিত যখন বিদ্যা, শিল্প ও কলানৈপুণ্য প্রভৃতি সুশিক্ষা সমবেত হইয়া তাহাকে অসামান্যা করিয়াছে, তখন শ্রীশচন্দ্রের যে আফিসের বাবুদের নিকট স্ত্রৈণ অপরাধ রটিবে ও কমলের বিরহে তাহার মুৎসুদ্দিগিরি অব্যাহত রহিবে না, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

কুন্দের চরিত্র এরূপ দুকথায় বুঝান যায় না। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, কমলমণি প্রভৃতির চরিত্র স্বচ্ছন্দে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যাইতে পারে, কারণ তাঁহারা রক্তমাংসে গঠিত, তাঁহাদের চরিত্রের অস্থিমজ্জা আছে। কিন্তু কুন্দ যেন একখানি অশরীরিণী ছায়া—Ethereal—গোলাপের পরাগ যেমন ধরিতে গেলে ঝরিয়া যায়, সুগন্ধ পুষ্পসারের সৌরভ বা কর্পূরের সুবাস যেমন হাওয়ায় 'উবিয়া' যায়, কুন্দচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার সৌন্দর্য্যকণা যেন তেমনি চারিদিকে 'উবিয়া' যায়। নগেন্দ্র কুন্দকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে আনিবার কালে বন্ধু হরদেব ঘোষালকে লিখিয়াছিলেন :—

"যেন এ পৃথিবীর চোখ নহে, এ পৃথিবীর সামগ্রী সে ভাল করিয়া দেখে নাই; অন্তরীক্ষে কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে,.....বোধ

হয় কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবীছাড়া কি আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়, যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।"

এই কয়টী ছত্রে অসামান্যবর্ণনানিপুণ চিত্রকর যে চিত্রটী প্রদান করিয়াছেন, অন্যে শত পৃষ্ঠায়ও তাহা পারিতেন কি না, সন্দেহস্থল। তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব তাহার অনন্যসাধারণ সারল্য—যে শিশুসুলভ সারল্যে হীরার সহজবোধ্য কৌশলজালে তাহাকে বারংবার পড়িতে হইয়াছে। সেইজন্যই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে হীরার কপট মৈত্রী ও তৎপরে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কুন্দ কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় নাই। সেইজন্যই পিশাচী হীরার বিস্মৃতির ভাণে পরিত্যক্ত বিষবটিকা পান করিয়া অভাগিনী অকালে প্রাণ হারাইল। সেইজন্যই নিতান্ত ভীরু-স্বভাবা হইয়াও স্বপ্নশ্রুত মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ না রাখিয়া নগেন্দ্রের রূপফাঁদে পড়িল। কমল বা হীরা কুন্দের অবস্থায় পড়িলে অনায়াসে বুঝিতে পারিত যে, নগেন্দ্রের ক্ষণিকের রূপমোহ স্থায়ী প্রণয় নহে। কারণ স্ত্রীলোকমাত্রই, নিতান্ত সরলা না হইলে, অন্য যে কোন বিষয়ে ভ্রান্ত হউক না কেন, প্রণয়ভাজনের চরিত্র বা প্রণয় সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না। ইহা স্ত্রীচরিত্রেরই বিশেষত্ব। চতুর স্ত্রীলোকের কথাই নাই, তাহারা তাহাদের প্রণয়ীর চরিত্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নখদর্পণের মত বুঝিতে পারে—যেমন হীরা দেবেন্দ্রের—কিন্তু 'স্বভাবোত্তানহৃদয়া' কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের হৃদয় বুঝিতে পারিল না। অবশ্য, এ কথা আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, নগেন্দ্র ইচ্ছা করিয়া, শঠে যেমন প্রেমসর্ব্বস্ব রমণীকে কৌশলে ঘৃণিত প্রতারণায় তাহার নারীজন্ম ব্যর্থ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারিণী করে, নগেন্দ্র সেইরূপ কুন্দকে প্রতারিত করিয়াছিলেন—দস্যুর মত তাহার হৃদয় লুঠিয়া লইয়া তাহাকে ভগ্নশাখবৃক্ষের ন্যায়, প্রতিমাবিসর্জ্জনের পর নির্ব্বাণদীপ নিরানন্দ ভগ্নঘট পূজাগৃহের ন্যায়, ঝটিকাবিচ্যুত যূথিকা-কোরকের ন্যায় অনাদরে অবহেলায়

শুকাইতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন! তাহা কখনই নহে—নগেন্দ্র সেরূপ নীচপ্রকৃতি নহেন—কুন্দের বিবাহেই তাহা প্রকাশ—তবে তাঁহার হৃদয় তিনি বুঝিতে পারেন নাই—ক্ষণিকের মোহকে চিরস্থায়ী প্রবৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—আশুপ্রাণহর বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎকে অমলধবল সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি দীপ মনে করিয়াছিলেন—সুশীতলমলয়ক্রমগলিতা-চন্দনলতিকাবোধে দুর্ব্বিপাক বিষদ্রুমকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—তজ্জন্যই জ্ঞানী নগেন্দ্র, সংযমী নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখীসর্ব্বস্ব নগেন্দ্র যে ভ্রম করিয়া বসিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমস্ত জীবন কাটিয়াছিল!

কুন্দকে বিবাহ করিয়া নগেন্দ্র যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অনতিবিলম্বে কুন্দকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই নির্ব্বুদ্ধিতার চরমসীমায় পৌঁছিলেন—গীতাকার বুঝাইয়াছেন যে, পাপের পথ এইরূপই পিচ্ছিল,—আপাতমনোহর, কিন্তু একবার পদস্খলন হইলে ক্রমিক পদস্খলনে নিম্নতম সোপানে অবতীর্ণ হইতে হয়! সঙ্গ বা সংসর্গ হইতে মোহ, মোহ হইতে চিত্তবিভ্রম, চিত্তবিভ্রম হইতে বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিভ্রংশ হইতে বিনাশ! নগেন্দ্রের জীবনে এ সত্য কিরূপ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট!—'সীতারাম' গ্রন্থের গীতাপ্রতিপাদিত এ নিগূঢ় সত্য, যাহা motto স্বরূপ উদ্ধৃত ও সীতারামের চরিত্রে যাহা পরিদর্শিত বলিয়া উদ্দিষ্ট, আমাদের ক্ষুদ্রবোধে নগেন্দ্রচরিত্রে উহা উজ্জ্বলতররূপে পরিব্যক্ত! সৌভাগ্যক্রমে নগেন্দ্রের শুভাদৃষ্টে নগেন্দ্রকে আর অতদূর পৌঁছিতে হয় নাই—পুণ্যময়ী, স্নেহময়ী সূর্য্যমুখী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কুন্দকে বিবাহ করা নগেন্দ্রের জীবনের প্রথম গুরুতর অপরাধ। প্রথম অপরাধী বলিয়া তখনও তিনি দয়ার পাত্র, কিন্তু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, কোন অংশেই উহা ক্ষমার্হ নহে। নগেন্দ্র স্থির

করিল যে, এরূপ ব্যবহারে সূর্য্যমুখীর বিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত হইল! কি নির্দ্দয় নির্ব্বুদ্ধিতা! হতভাগ্য বুঝিতে পারিল না যে, সরলা তদ্গত-প্রাণা কুন্দের সহিত এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিবার তাহার কি অধিকার? কে কুন্দকে স্বর্গের সোপান দেখাইতে বলিয়াছিল? কেই বা নন্দনের মন্দারসুরভি পানপাত্র কুন্দের মুখে ধরিয়া আবার তৎক্ষণাৎ অতি নির্দ্দয়-হস্তে কাড়িয়া লইয়া উগ্র হলাহল পান করিতে দিতে বলিয়াছিল? কুন্দ ত অধিক আশা করে নাই—কাহারও কাছে ত হৃদয়ের অসহ্য বেদনা জানায় নাই—সে নীরবে আপনার ব্যর্থপ্রণয়ের তীব্র নৈরাশ্য-যন্ত্রণা সমস্তজীবন ভোগ করিত—কেন ক্রূর নগেন্দ্র তুমি একবার আশা দিয়া তাহার নবীন জীবন এরূপ বিষময় করিলে? তুমি কি জানিতে না যে, চিরদুঃখ—চিরনৈরাশ্য বরঞ্চ সহ্য যায়, কিন্তু আশা বা সুখ একবার করায়ত্ত হইয়া বিনষ্ট হইলে, চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তির পর অন্ধকারের ন্যায়, সে যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য? তুমি এমন জ্ঞানী উন্নতহৃদয় হইয়া কোন্ প্রাণে এরূপ পশুবৎ আচরণ করিলে? কোন্ প্রাণে অস্ফুটযৌবনে নবীন কুন্দকুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিয়া পদদলিত করিলে?—নববধূর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণের ন্যায়, বিরহীর স্বপ্নভঙ্গের ন্যায়, কোকিলের অর্দ্ধপথরুদ্ধ কাকলীর ন্যায় ফুটিতে ফুটিতে ত্রিদিবসুরভিপূর্ণ কুন্দকুসুম শুকাইল!—

'Ah fairest flower, no sooner blown than blasted!

এই সংসারজ্ঞানশূন্যা কুসুমকোমলা বালিকার এরূপ দারুণ নিয়তির আর একটি দৃষ্টান্ত একদিন বহিঃপ্রকৃতিতে ঘটিতে দেখিয়াছিলাম। একদিন প্রয়াগসঙ্গমে নদীসৈকতে দাঁড়াইয়া যমুনার সান্ধ্যশোভা দেখিতেছিলাম। গ্রীষ্মের পরিণামরমণীয় অপরাহ্ণ; মৃদুমন্দানিলান্দোলিত নদীহৃদয়ে মৃদুল বীচিভঙ্গ হইতেছিল। নদীতট প্রায় নির্জ্জন, কদাচিৎ সুদূর হইতে কোন নৌকারোহীর দূরশ্রুত মধুর সঙ্গীত মধুরতর হইয়া কাণে লাগিতেছিল—সে মাধুর্য্য যেন তখনকার সান্ধ্যসৌন্দর্য্যের সহিত

একতানতা সম্পাদন করিতেছিল! ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিয়া যমুনার নীলজলের উপর কালিমা বিস্তার করিল। শুক্লা পঞ্চমীর শশাঙ্কের মৃদুকিরণে যমুনার নীলবক্ষ, সুন্দরীর মণিমাণিক্যখচিত নীলাম্বরের ন্যায়, শোভা পাইতেছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে শান্ত প্রকৃতির মুখে উগ্রতর রেখা অঙ্কিত হইল। যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিনও গ্রীষ্মযাপন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, নিদাঘের এরূপ শান্তশোভা অকস্মাৎ কিরূপে তিরোহিত হয়। আকাশের গায় ঈশানকোণে একখণ্ড কালো মেঘ হঠাৎ দেখা দিল—ক্রমে উহা দীর্ঘতর হইয়া সমস্ত আকাশময় যেন এক কালিমার যবনিকা টানিয়া দিল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বের শান্তস্থির নদীবক্ষ তরঙ্গভঙ্গভীষণ হইয়া উঠিল! যমুনার নীলজল—ফেনিল, ম্লান, কর্দ্দমময় পঙ্কিলতায় ও আবর্ত্তে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রখর-বেগ বৃষ্টির সহিত প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা আসিয়া মিশিল। অগত্যা তীরস্থ কোন বৃক্ষের স্বল্প ছায়ায় কায়ক্লেশে শরীররক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই নিদাঘসন্ধ্যায়, সেই বৃষ্টিবাত্যাময় নদীসৈকতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, নদীস্রোতের কিছু উপর আকাশে একটি নীড়াভি-মুখিনী, শ্বেতকায়া, ক্ষীণাঙ্গী কপোতী আকুল কূজনে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে—সে আর্ত্তস্বর আমার মর্ম্ম ব্যথিত করিল। কিন্তু তাহার রক্ষার উপায় তখন আমার সাধ্যাতীত। দেখিতে পাইলাম, প্রবল বায়ুবেগ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পক্ষের বল হরণ করিতেছে। আর রক্ষা নাই!—নিমেষমধ্যে মৃত্যুর করাল কবলে তাহাকে পতিত হইতে হইবে—নদীর আবর্ত্তময় অতল তলে তাহার জন্য সমাধিশয্যা বিস্তৃত! ক্রমে ঘূর্ণাবাত্যার তীব্রবেগ সহিতে না পারিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবর্ত্তময় নদীগর্ভে পড়িয়া নিমেষের মধ্যে সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! সেদিনকার সে শোককাহিনী,—তাহার সে করুণ আর্ত্তস্বর, তাহার সুন্দর দুটি রক্তবর্ণ চক্ষুর ভয়চকিত মিনতি, ঝটিকা-

বেগ হইতে আত্মরক্ষার্থ তাহার ক্ষীণপক্ষের বৃথা প্রয়াস—যখনই মনে হয়, তখনই আমি কুন্দের অদৃষ্টের কথা ভাবি—এই পাপপঙ্কিল কুটিল সংসারাবর্ত্তে কবির কল্পনার সেই স্বর্ণবিহগীটি কোন্ অতলতলে লুকাইয়া গেল!—ত্রিদিবের অস্ফুটসুষমাময় কুন্দকুসুমটি মর্ত্ত্যের খর আতপতাপে কেমন করিয়া অকালে শুকাইয়া গেল!

কয়েক বৎসর হইল, 'সাহিত্য'পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সুলিখিত প্রবন্ধে জর্জ্জ ইলিয়টের টেসার (Tessa) সহিত কুন্দচরিত্রের তুলনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তুলনা তত সমীচীন বলিয়া আমার বোধ হয় না। তাহার কারণ সারল্যে উভয়ে অতুল-নীয়া হইলেও উভয় চরিত্রের এই প্রধান বিশেষত্বেও প্রভেদ আছে। কুন্দের সরলতা সহজাত—মানসিক-শিক্ষা-জনিত-উন্নতি-সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ দ্যাবুদ্ধির আলোচনায় উন্নতি লাভ করে নাই, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রখর বলিয়া বর্ণিত হইলেও সাংসারিক-সহজজ্ঞানমাত্র-পরি-শূন্যা। তজ্জন্যই কুন্দের লোকচরিত্রাভিজ্ঞান এত অল্প—তজ্জন্যই এ বিষয়ে প্রতি পদে তাহাকে ঠকিতে হইয়াছে। এমন লোক কি দেখ নাই, যিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিবৃত্তিও পরিমার্জ্জিত—অথচ সংসারজ্ঞান আদৌ নাই। অন্যের সহজভেদ্য কৌশলও ভেদ করিতে পারে না—ছলকপটতা আদৌ জানে না—এরূপ সারল্য কুন্দের। Tessaর সারল্য অনেকটা নিম্নশ্রেণীর রমণীদের প্রকৃতিগত নির্ব্বুদ্ধিতা—idiotcy। কুন্দের সারল্য এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রসূতি নহে। অধিকন্তু, টেসা সপত্নী রমোলার প্রতি যেরূপ ঈর্ষান্বিতা—তবুও কুন্দের মত তাহার বিবাহিতা পত্নীর অধিকার নাই—কুন্দে সে দোষ আদৌ নাই। এটি কুন্দের সুন্দর চরিত্রের আর একটি সুন্দর বিশেষত্ব! এমন কি, সূর্য্যমুখীও একদিন কুন্দের চরিত্রে অন্যায় সন্দিহান হইয়া কতকগুলি রূঢ়কথায় কুন্দকে মর্ম্মব্যথিত করিয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহার মূলে

সপত্নীর ঈর্ষা নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু একদিনের জন্য কথায় পর্য্যন্ত কাহারও কাছে বা স্বগত কুন্দ ঈর্ষার ভাব জানায় নাই। এক-একবার সারল্যে ও গভীর প্রণয়সর্ব্বস্বতায় কুন্দকে দেখিয়া লিটনের অ্যালিসকে (Alice) মনে পড়ে—কারণ অ্যালিসেরও যেমন গভীর প্রেম, তাহার সারল্যও তদ্রূপ কুন্দের অনুরূপ। প্রণয়িপরিত্যক্তা যে রমণী নিজের বিবাহের পূর্ব্বজাত সন্তানকে অম্লানবদনে, কোন কিছু গোপন না করিয়া, সকলের নিকট যথাযথ পরিচয় দেয়, কোন দোষের কথা না মনে করে,—তাহার সারল্য অপরূপ, পবিত্র ও এ পাপপঙ্কিল সংসারে একান্ত দুর্লভ। পবিত্র এজন্য বলিতেছি যে, ইহা সাংসারিক জ্ঞানের অভাবজনিত—প্রেম সর্ব্বদাই স্বর্গীয়, এ ধারণাবশত। "The woman who did" গ্রন্থের নায়িকা Herminiaর অদ্ভুত, ভ্রান্ত ও অন্ধ দুর্নীতি পোষণের জন্য নহে। একথা সত্যপ্রিয় সমালোচকমাত্রই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুন্দের সাদৃশ্য 'রাজা ও রাণী'র ইলাচরিত্রের সহিত। রবীন্দ্রনাথের এই মানসী কন্যা বঙ্গসাহিত্যে অভিনব বেশে উদিতা হইয়া সহৃদয় সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহারিণী হইয়াছেন! সূর্য্যমুখী যেমন কুন্দের অপেক্ষা অনেক জমকালো, সুমিত্রাও তেমনি ইলা অপেক্ষা সমধিক তেজস্বিনী। কয়েক বৎসর হইল, "হিতবাদী"পত্রিকার এই মনোরমার চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে পুনরুক্তিদোষে পতিত হইব। অতএব এস্থলে কুন্দ ও ইলার চরিত্রের সম্বন্ধে সংক্ষেপত আলোচনা করিব। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সুমিত্রা ও সূর্য্যমুখী, কুন্দ ও ইলার মধ্যে কোন্ চিত্রগুলি অধিক ভাস্বর—আমি বলিব, নিশ্চয় প্রথমোক্তারা—ঔজ্জ্বল্যে, চরিত্রের স্পষ্ট রেখাপাতে, তেজোগর্ব্বে চিত্রকরেরা তাঁহাদের যত বর্ণবৈচিত্র্য, সমস্তই এ দুটি চরিত্রে ব্যয়িত করিয়াছেন—অভাগিনী

কুন্দ ও ইলার চরিত্রসম্বন্ধে কেবল অস্পষ্ট তুলিকাপাত মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্যই এ দুটি লাজসঙ্কুচিতা সমধিক মনোজ্ঞা হইয়াছেন! সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর বিবাহিতা কুন্দকে যেমন কবি বিরহতাপে শুকাইতে রাখিয়া গেলেন ও অবশেষে মৃত্যুশয্যায় নগেন্দ্রের সহিত শেষ মিলন হইল—অভাগিনী ইলাকেও কুমার বিবাহের প্রতিশ্রুতি করিয়া গ্রহবৈগুণ্যে আর ফিরিতে পারিলেন না—কত সাধের পূর্ণিমা এরূপ বিফল হইল?—যে জীবনের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলাইয়াছে, সে ত আর ফিরিল না—

মধুনিশি পূর্ণিমার,
ফিরে আসে বারবার
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে!

তাহার পর একদিন যখন সুমিত্রা ও কুমারের আগমন-আশায় বিক্রমদেবের কাশ্মীরের রাজসভা প্রমোদপ্রফুল্ল, তখন সেই দীপমালা-শোভিত, পুষ্পমাল্যমনোরম আনন্দের শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্য দিয়া সুমিত্রা তাঞ্জামের ভিতর হইতে কুমারের ছিন্নমুণ্ড স্বর্ণথালে আনিয়া উপহার দিলেন—তখন সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রম যত-না স্তম্ভিত, ততোঽধিক বজ্রাহতা কোমলা ইলা—তাহার জীবনের তন্ত্রী সে আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল। সুমিত্রার প্রেমবঞ্চিত নিরাশহৃদয় বিক্রমদেব—মজ্জমান ব্যক্তি যেমন নিকটের ভাসমান পদার্থমাত্রেই অবলম্বন করিতে যায়—সেরূপ সকাতরে ইলার প্রণয়যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন ইলার হৃদয় কুমার সে পূর্ব্বেই অপহরণ করিয়া লইয়াছেন ও কুমারের ফিরিবার আশায় তিনি যে প্রাণধারণ করিয়া আছেন, সে কথায় বলিয়াছিলেন:—

যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে!

এ কয়টি কথায় কত নিরাশ প্রতীক্ষা, কত সুদীর্ঘ রাত্রির অতৃপ্ত

আকুল জাগরণ, কত উদ্বেগ, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশঙ্কা নিহিত রহিয়াছে। ইহা যেন ইলার হৃৎকুম্ভ ফাটিয়া দীর্ঘশ্বাসরূপে বহির্গত হইয়াছে! সেইজন্য বলিতেছিলাম, গ্রন্থদ্বয়ের plot সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, আপাত-দৃষ্টে উভয় চরিত্র বিসদৃশ বোধ হইলেও, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উভয় চরিত্রের সাদৃশ্য কোথায়—আমি বলিব, তাহাদের স্বর্গীয় সারল্যে, তাহাদের প্রেমসর্ব্বস্বতায়, সাংসারিক জ্ঞানের অভাবে, তাহাদের প্রেমের গভীরতায়, তাহাদের নিষ্ঠুর পরিণামে।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

(ভিক্টর হিউগো হইতে—)

ললনা।

সে ছিল ললনা বটে— সে ছিল সুন্দরী!
পার্থিবতা ছিল তাহে স্বর্গ-শোভা ধরি।
দীপ্ত প্রেম-শিখা মোর অধর-যুগলে
লইত সে প্রেম আর প্রেমের অনলে।
ছিল না সঙ্কোচ মিথ্যা— আগ্রহ অস্থির,
বঞ্চিতও নহে—নহে লোলুপ অধীর।
ইহা হ'তে বিস্ময়ের আছে কিবা আর
সর্ব্বস্ব দিয়াও কিছু যায় নাই তার।
নির্ব্বিবাদে নগ্ন তনু—গৌরবে—হেলায়
শয্যা'পরে—তবু যেন কৈলাসচূড়ায়।
করিত যতই প্রেম তারে অধিকার
ঝলসি উঠিত স্বর্গ হৃদি হ'তে তা'র।

তাহায় সোহাগ যেন জ্যোৎস্না-মধুরিমা—
নগ্ন-পদে জাগি উঠে অধিক গরিমা
মানসী সুষমা পূর্ণ নারীর চলনে;
আঁধারে ফুটিত দীপ্তি কমল-আননে—
মেরুমাঝে আলো যথা নিশীথে প্রকাশে;
চুম্বন-ধারার মাঝে, প্রেমের বিলাসে
অমর বিভব দেহে উঠিত গো জাগি,
সুনীল আকাশ—দুটি কুবলয় আঁখি।
এ অপূর্ব্ব ললনার মহিমা অপার—
দেবী হ'ল যেই দিন ঘুচিল কৌমার।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

রমণী।

সামান্য কলঙ্ক তরে, রমণী হইত কবে
চির-কলঙ্কিত?
পুরুষ যদ্যপি তাঁরে, দেখিতে কল্পনা করে
হৃদে না পূজিত!

সমালোচনী।

মাসিক পত্র।

(পৌষ)

১২শ সংখ্যা।

১৩০৯।

সূচী.

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা	৪৫৩
২।	চিঠি চুরী	৪৬৫
৩।	অনুস্বর ও বিসর্গ	৪৭৩
৪।	প্রেমের আদর্শ	৪৭৭

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মাঘমাস হইতে সমালোচনীর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে। মাঘ-সংখ্যা গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া মূল্য গ্রহণ করা হইবে, এই প্রকার নিয়ম হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়দের মধ্যে যাঁহার এ বন্দোবস্তে আপত্তি আছে, সপ্তাহ মধ্যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার, সমালোচনী।
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে 'সমালোচনী' নিয়মিত-রূপে যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের সমালোচনী আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে অধিকতর তুষ্ট করিতে পারিবে ভরসা করিতেছি।

—০—

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

প্রথম বর্ষ। | ১৩০৯। | ১২শ সংখ্যা।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

(সমালোচনা।)

এই ঋষিনিষেবিত ভারতবর্ষ হইতে প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে এবং জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনের প্রতিকূল বিজাতীয় শিক্ষা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতসন্তান ক্রমশ ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের পথ হইতে পরিচ্যুত হইতেছে। এই ক্ষতিকর শিক্ষাপ্রণালীর সত্বর কোন পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের দারুণ অধঃ-পতন অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ক্ষতিকর হইলেও পুরুষদের তথাপি কোনপ্রকার শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কোনপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়।

পাশ্চাত্য আদর্শে দুই একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা অতি অল্প স্ত্রীলোকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে বিশেষ কোন

উন্নতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। সুতরাং ভারতের শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক যে আদৌ শিক্ষা পায় না অথবা নামমাত্র শিক্ষা পায়, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ স্ত্রীলোকের শিক্ষা পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা কোন-ক্রমেই অল্প প্রয়োজনীয় নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কারণ স্ত্রীলোকের প্রভাব—জননীর প্রভাব—সন্তানের উপর অত্যধিক এবং সন্তানগণই যে উত্তরকালে সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিবে, তাহাতেও সংশয় নাই। এরূপ স্থলে স্ত্রীলোকের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে কাহারও মতভেদের কারণ দেখি না।

কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রকৃত শিক্ষা কি? কিরূপে এই শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে? স্ত্রীশিক্ষার কথা উঠিলেই স্বত এই সকল প্রশ্ন মনো-মধ্যে সমুদিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া যে আবশ্যক, এবিষয়ে আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই বলিয়াই বোধ হয়। মতভেদ শিক্ষাদানের প্রণালী লইয়া। কেহ বালিকাদের গৃহকর্ম্মশিক্ষাতেই সন্তুষ্ট—তাহাদের পুস্তকাদিপাঠবিষয়ে অমনোযোগী—আবার কেহ তাহাদিগকে ষোলআনা পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত দেখিতে উৎকণ্ঠিত।

এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত চিন্তাশীল ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যে সমাজের এক গুরুতর অভাব দূরীকরণের সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চিন্তাশীল লেখক শাস্ত্রগ্রন্থাবলী আলোচনা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আদর্শ (standard) লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহার জলন্ত মহিমায় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অমূল্য। স্ত্রীলোকের সমস্ত শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য তাহার মাতৃত্বের বিকাশ ও পরিণতি। এই আদর্শ দৃঢ় রাখিয়া আমরা যাহা কিছু

স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় মনে করিতে পারি, তাহাই স্ত্রীলোকের প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের এই পরমপবিত্র মাতৃভাব জগতের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথমে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিল। তাই প্রাচীন হিন্দু অনুশাসন করিয়াছিলেন—"পরদারেষু মাতৃবৎ"। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের মাতৃভাব—স্ত্রীলোকের পবিত্র সুন্দর মঙ্গলভাব হিন্দুর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। এখনকার এই আচারহীন জাতীয়তাবর্জ্জিত অধঃপতিত ভারতবর্ষেও আজিও তাহার ক্ষীণপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই নিতান্ত মূর্খ অসভ্যও স্ত্রীলোকের অঙ্গে হাত তুলিতে সঙ্কুচিত হয়—সসম্মানে স্ত্রীলোকের পথ ছাড়িয়া দেয়—কাহাকেও স্ত্রীলোকের অপমান করিতে দেখিলে তাহার স্বভাবশীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে।

হায় দুর্ভাগ্য! আমরা পাশ্চাত্য ভোগলালসা ও পার্থিব সুখের আদর্শে আমাদের এই মহান্ পবিত্র ভাব বিকৃত করিয়া ফেলিতেছি এবং স্ত্রীলোকদিগকেও কুশিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে মাতৃত্বের পুণ্য-সিংহাসন হইতে রঙ্গিণীর অপবিত্র ধূলিশয্যায় অধঃপাতিত করিতেছি!

স্ত্রীলোকের শিক্ষা চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) সংস্কারজনিত শিক্ষা, (২) ব্রতাদি-অনুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষা, (৩) পুস্তক-পাঠ ও কলাবিদ্যাদির আলোচনার দ্বারা শিক্ষা এবং (৪) ধর্ম্মশিক্ষা বা পাতিব্রত্যশিক্ষা।

(১) সংস্কার বলিতে এখানে আমি দশবিধ সংস্কার বুঝিতেছি। হিন্দুদের গর্ভাধান হইতে বিবাহাদি পর্য্যন্ত সংস্কার এমন সুন্দরভাবে নিয়মিত যে, ইহার দ্বারা মনের মধ্যে এমন একটা কোমল পবিত্রভাবের উদ্রেক হয়, যাহা বহু বাচনিক উপদেশে লব্ধ হইবার নহে। এই সকল সংস্কারের বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে চিন্তাশীলমাত্রেই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই সকল সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিবাহ। হিন্দুবিবাহে যে পবিত্র ধর্ম্মভাব দেদীপ্যমান, অন্য কোন দেশের বিবাহে সেরূপ ভাবের বিকাশ দেখা যায় না। এই বিবাহের পরমমঙ্গলময় পবিত্রভাবই স্ত্রীপুরুষের চিত্তকে জঘন্য কামবৃত্তির বহু উর্দ্ধে তুলিতে কতদূর সমর্থ, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। সুতরাং এই সংস্কার-জনিত শিক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুরোহিত-বর্গের অবনতিবশত আজকাল বিবাহের এই পূর্ণ পবিত্র মঙ্গলময় ভাব সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে না—এবং ততোধিক দুর্ভাগ্যবশত কেহ কেহ হিন্দুবিবাহের এই সমুন্নত ভাবের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য বিবাহের চুক্তিমূলক ধর্ম্মহীন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন।

লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবাহের আদর্শের তারতম্য বর্ণনা করিয়াছেন। সকলকেই সেই অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অতএব আমাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংস্কারাদির অনুষ্ঠান স্ত্রীলোকের মাতৃত্ববিকাশের সাহায্যকারী, সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্ভূত হইবার যোগ্য।

(২) ব্রতাদি-অনুষ্ঠান দ্বারাও পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের শিক্ষা সাধিত হইত।

লেখক বলেন—"এই সকল ব্রত বাল্যক্রীড়ার অঙ্গ হইলেও হিন্দুর সকল কর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মমূলক এবং অনুষ্ঠানাদির অবান্তর অঙ্গ বলিলেও চলে। বালিকাদিগের এই সকল ব্রতখেলা ছাড়িয়া দিলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পিঠে পার্ব্বণ প্রভৃতি যে সকল আমোদজনক কার্য্য পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সেই সকলে বিমল আমোদের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর সাংসারিকতার মধ্যেও কোমল মাতৃভাব কেমন জাগ্রত থাকে। ভগ্নী যখন তাঁহার সুকোমল স্নেহময় অঙ্গুলিতে চন্দন গ্রহণ করিয়া ভ্রাতার কঠোর চিন্তাপূর্ণ ললাটে "ভাইয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ুক

কাঁটা" বলিয়া চন্দনবিন্দুর সহিত স্নেহ ঢালিয়া দেন, তখন কোন্ হিন্দু আছেন, যিনি সকল যাতনা ভুলিয়া যান না এবং কে এমন নিষ্ঠুরহৃদয় আছে যে, এমন সুন্দর প্রথাকে পর্ব্বের মধ্য হইতে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করে? এই সকল পর্ব্ব রক্ষা করাই যে একটা মহৎ কর্ম্ম, তাহা নহে। তবে হিন্দুসমাজের শিক্ষার ইহা একটী সুব্যবস্থা যে, সর্ব্বাঙ্গীন স্ত্রীশিক্ষা দিবার সুযোগ সর্ব্বতোভাবে না ঘটিলেও এই সকল পর্ব্বব্রত প্রভৃতি রক্ষা করিতে থাকিলে ক্রীড়াস্থলেও অন্তত আংশিক স্ত্রীশিক্ষা নিশ্চয়ই সংসাধিত হইবে এবং এই স্ত্রীশিক্ষা আমোদের সহিত লাভ করাতে আমাদের স্ত্রীকন্যাদিগের হৃদয়ে তাহা মুদ্রিত হইয়া সুফলপ্রদ হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" কিন্তু আজকালকার পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে এই সকল ব্রতপার্ব্বণাদি অতি দ্রুতবেগে হিন্দুসংসার হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার পূর্ণতার জন্য ইহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন মনে হয়।

(৩) পুস্তকপাঠ ও কলাবিদ্যাদির আলোচনা দ্বারা শিক্ষা। এই শিক্ষাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষানামে অভিহিত করিয়া থাকি।

লেখক বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীলোকেও বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারিতেন।

ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ মাতৃত্ববিকাশের প্রবল সহায়—সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানলাভে স্ত্রীলোকের পূর্ণ অধিকার থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যে শিক্ষার বলে ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া মাতৃত্বকে পূর্ণপরিণত করিয়া তুলিত, সে শিক্ষার ব্যবস্থা এখন আর আদৌ নাই বলিলেই হয়।

এখন স্ত্রীলোকের যে শিক্ষার ব্যবস্থা বর্ত্তমান, তাহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মহীন

এবং মাতৃত্বের বিঘ্নকর। লেখক বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার (অর্থাৎ বেথুন কলেজে প্রদত্ত শিক্ষার) তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লেখক বলেন—"স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতামাত্রই অনিষ্টকর বলিয়া আমাদিগের ধারণা। সকলের সহিত মৈত্রীই মাতৃত্বের একটী প্রধান উপকরণ এবং স্ত্রীলোকের একটী প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু প্রচলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ছাত্রীগণ সহপাঠীদের উপর জয়লাভেচ্ছায় নিজেদের মনকে অনুদার ও নীচরূপে পরিণত করিয়া মৈত্রীর মূলে কুঠারাঘাত করে।" শুদ্ধ ইহাই নহে, আধুনিক ব্যবস্থার ফলে স্ত্রীলোকদিগের শরীরও রুগ্‌ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। লেখক বলেন—"আমরা বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা রমণীগণের অধিকাংশই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা পরীক্ষার জন্য বহুক্ষণ ঝুঁকিয়া অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়েন এবং প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ, সুতরাং উপহাসের কারণ ভাবিয়া কোনপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম করিতে চান না।" কাজেই শিক্ষিত স্ত্রীলোক অনুদার চিত্ত এবং রুগ্‌ণ দেহ লইয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং রুগ্‌ণ পুত্রকন্যার জন্মদান করিয়া সংসারের দুঃখভার বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত করেন।

এইরূপ বহু অনিষ্টকারী শিক্ষার প্রচলনে কি প্রয়োজন, এবং ইহাতে সংসারের কি উপকার?

লেখক বলেন—"পুরুষেরা যেন পরিবারপ্রতিপালনের দায়ে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করে। কিন্তু মেয়েদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তি। এই শস্যশ্যামল বঙ্গদেশে, আতিথেয়তানিপুণ ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষা করিলে জীবনধারণের ভাবনা থাকে না, এবং যেখানে কোন গৃহস্থব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে প্রতিপালন করিতে কখনই

কাতর হয় না, সেখানে স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলতা নহে, তাহা পাপ এবং সেই পাপের ফল তাহাদিগের সন্তানেরাও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া থাকে।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে নিন্দা করিয়া লেখক আমাদের সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ ও লক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন—তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি মহান্। এই আদর্শে স্ত্রীশিক্ষা পরিচালিত হইলেই আবার আমরা সীতা-সাবিত্রী, দ্রৌপদী-দময়ন্তীর সাক্ষাৎকারলাভের ভরসা করিতে পারি।

লেখক বলিতেছেন—"স্ত্রীলোকের মাতৃত্বেই জীবনের পূর্ণতাসাধন হয়—ইহারই মধ্যে তাহাদের নিজের আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ও তদ্বিষয়ে অপরের সহায় হওয়া, এই উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই আনন্দের মূল কোথায়? উপনিষদের নিকটে এই মহান্ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর অতি স্পষ্টভাষায় প্রাপ্ত হই—উপনিষদ্ বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন—আনন্দো বৈ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। আনন্দকে মূলভিত্তি করিয়া জীবনযাপন করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, মূলে ব্রহ্মকেই ভিত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তবেই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতেছি যে, জীবনের পূর্ণতাসাধন অথবা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ ব্রহ্মবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে ব্রহ্মকে জীবনের কেন্দ্ররূপে অবলম্বন করা যায় না। রমণীর মাতৃত্বেরও উপাদান আনন্দ, সুতরাং তাহারও অবলম্বনভূমি এই "আনন্দো বৈ ব্রহ্ম।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্রহ্মবিদ্যালাভ। ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব স্বভাবতই

পরিস্ফুট হইবে। সকল বিদ্যাই যে সেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় ব্রহ্মেরই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে, ঋষিরা তাহা বুঝিয়া বলিলেন যে, "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" এবং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মচর্য্যের বলে বলীয়ান্ ও পরিশুদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও বলি যে, ঋষিপ্রদর্শিত এই বিশুদ্ধপথে চলিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।"

সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষাই যে স্ত্রীলোকের প্রকৃত শিক্ষা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইজন্যই লেখক স্ত্রীলোকদিগের উপন্যাস এবং প্রেমবিষয়ক কবিতারাশি পাঠের পক্ষপাতী নহেন। ইহাতে হৃদয়ে চঞ্চলতা আসে এবং শুভ্রশান্ত মাতৃত্ব ব্যথিত হয়। রমণীগণ মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, আচারতত্ত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় পাঠ করেন, ইহাই গ্রন্থকারের অভিলাষ। এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র মতভেদ নাই। লেখক স্ত্রীলোকদিগের নভেল ও প্রেমকবিতা লেখার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি বলেন—"বর্ত্তমানে মাসিকপত্রাদিতে পুরুষ ও রমণীর লিখিত কৃত্রিমতাপূর্ণ প্রেমকবিতার যেরূপ ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাহাতে কিছু তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা বলিতেছি যে, হিন্দুরমণীদিগের লিখিত কবিতায় আমরা প্রেমের এরূপ ঢলাঢলিভাব আর দেখিতে চাই না।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে লেখকের কথার অনুমোদন করি।

পুস্তকাদি-পঠন-পাঠন ব্যতীত সঙ্গীত এবং রন্ধনাদিও স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্ভূত।

পবিত্র সঙ্গীতের আলোচনা দ্বারা যে মাতৃত্ব বিকশিত হইতে পারে, তাহাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ দেখি না। কিন্তু এই সঙ্গীত যথেষ্ট সংযতভাবে এবং কেবল আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিকটেই গীত হওয়া উচিত। নহিলে লজ্জাহীনতা আসিয়া পড়িতে পারে।

লেখক প্রেমসঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। তিনি বলেন—"এইরূপ গানের ফলে পুরুষেরা বীর্য্যহীন ও রমণীগণ শালীনতাবিহীন হইয়া উঠিতেছে। * * *

আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া বলের সহিত বলিতেছি যে, বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন রমণীরই বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন পরপুরুষের নিকট, শত বন্ধুতা সত্ত্বেও, এই সকল গান গাওয়া উচিত নহে। এইরূপ গানের ফলে দেখিয়াছি যে, ইয়ারকি (flirtation) আসিয়া পড়ে—কোথাও ইহার ব্যতিরেকস্থল দেখি নাই।"

রন্ধনশিক্ষা যে স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অঙ্গ, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

স্বহস্তে খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করিয়া আত্মীয়বর্গকে পরিবেষণ করিবার সময়ে স্ত্রীলোকের যে পরমপবিত্র মঙ্গলময় অন্নপূর্ণামূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠে—তাহার মধ্যে মাতৃত্বের যেপ্রকার সুন্দর চিত্র বিকসিত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও মাতৃত্বের সেরূপ বিকাশ দুর্লভ।

অন্যান্য শিল্পকার্য্য, সীবন প্রভৃতিও স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু এসকল গৃহকর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলে করণীয়—গৃহকর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া নহে।

(৪) ধর্ম্মশিক্ষা বা পাতিব্রত্যশিক্ষা।

স্ত্রীলোকের শিক্ষার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা। পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বেরই অপর নাম সতীত্ব। পতিসেবা ইহার মধ্যবিন্দু এবং ব্রহ্মচর্য্য ইহার সাধন।

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এই মাতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। "মনু স্ত্রীজাতিকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুশাসন করিয়াছেন" এবং "পাছে মাতা, ভগিনী বা কন্যা প্রভৃতির মনেতেও তাহাদের মাতৃত্ব বিন্দুমাত্র কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, অথবা পুরুষের অন্তরে

বিন্দুমাত্রও কামভাব জাগরূক হইয়া মাতৃত্ববিষয়ে তাহাদের এতটুকুও অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে, এই কারণে ঋষিরা উপদেশ দিয়াছেন যে, পরস্ত্রী ত দূরের কথা, মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত পর্য্যন্ত নির্জ্জনে একত্র অবস্থিতি করিবে না।" এবং "এই কারণেই যুবক ব্রহ্মচারী, গুরুপত্নীকে মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে আদিষ্ট হইলেও, গুরুপত্নী যুবতী হইলে ঋষিরা যুবক ব্রহ্মচারীকে তাঁহার তৈলাভ্যঙ্গ প্রভৃতি দূরে থাক্, পাদস্পর্শপূর্ব্বক অভিবাদন করিতেও বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন।"

ঋষির আদিষ্ট এই নিষ্কলঙ্ক-মাতৃত্ব-রক্ষাপ্রণালী উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে স্ত্রীপুরুষের উন্মাদ নৃত্য বা স্ত্রীপুরুষের একত্র পাঠের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়, সন্দেহ নাই!

এই নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব বা সতীত্বের মধ্যবিন্দু পতিসেবা। তাই মনুপ্রমুখ ঋষিরা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের পতিসেবার অধিক কোন যজ্ঞাদিও নাই। স্বামী যেপ্রকারই হউন না কেন, তাঁহাকে স্ত্রীর দেববৎ সেবা করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু "মনুর এই উক্তি শুনিয়া হয় তো অনেকেই মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশার গভীর স্রোতে চিরজন্মের মত বিদায় দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয় একটু ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে স্ত্রীলোকের উপর কঠোর অনুশাসন করিলেন বটে যে, অতি নিন্দিত স্বামী তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে দেবতাস্বরূপ, কিন্তু অন্যদিকে অনুশাসন করিলেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তাহাও ভাল—কিন্তু কদাপি বিদ্যাদিগুণরহিত পুরুষকে কন্যাদান করিবে না।"

দুর্ভাগ্যবশত আজকাল মনুর দ্বিতীয় অনুশাসন আদৌ প্রতিপালিত হয় না। কন্যা একটু বয়স্থা হইলেই কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে ব্যাকুল

হইয়া উঠেন এবং অধীরতাবশত যাহাকে তাহাকে কন্যাদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

মনুর অনুশাসন প্রতিপালন করিলে এরূপ অধীরতাপ্রকাশের কোনই কারণ থাকে না এবং স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরে পরস্পরের যোগ্য হইবার চেষ্টায় উভয়েই যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে পারে।

"মনুপ্রমুখ ঋষিরা এই পতিসেবারূপ মধ্যবিন্দুর উপর দাঁড়াইয়া যেমন পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতিকে পতিসেবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মে মনোযোগী হইতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ পতি প্রবাসে যাইলে স্ত্রীজাতিকে অধিকতর সংযত হইয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন।" এবং "বিধবা হইলেও যে তাঁহাদের আমরণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর্ত্তব্য, তাহাও বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

"এই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীত্ব যাহাতে নির্ব্বিরোধে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য ঋষিরা স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যও নিষেধ করিয়াছেন।"

বর্ত্তমানকালের নব্য শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের এ সকল কথা বোধ হয় ভাল লাগিবে না। কিন্তু লেখক বহুতর যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে।

স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এইরূপে আলোচনা করিয়া লেখক প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীস্বাধীনতা, বিবাহের বয়স, স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

লেখক শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঋষিগণ বর্ত্তমানের জেনানাপ্রথার সমর্থক ছিলেন না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া যতটুকু স্বাধীনতা সম্ভব, তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না,—স্বামী বা পিতামাতার সঙ্গে তীর্থভ্রমণাদিকার্য্য স্ত্রীলোকে অবাধে করিতে পারিতেন।

ইংরাজের শান্তিপূর্ণ রাজ্যে পূর্ব্বের জেনানাপ্রথা ক্রমশ শিথিল

হইয়া পড়িতেছে, এবং ঋষিগণ যতটুকু স্বাধীনতাদানে অভিলাষী ছিলেন, বোধ হয় আজকালও স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই ততটুকু স্বাধীনতা ক্রমশ লাভ করিতেছেন। এখন আমাদের বরং পাশ্চাত্য আদর্শের অনুযায়ী অতি-স্বাধীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার বিপক্ষেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

লেখক মনুসংহিতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঋষিরা যৌবনবিবাহেরই পক্ষপাতী ছিলেন—তাঁহারা স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষই বিবাহের উপযুক্ত কাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে ঋষিদের মধ্যে মতভেদ আছে। এবং আজকালকার অকালপক্কতার দিনে মনে হয় স্ত্রীলোকের যৌবনারম্ভেই বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সতীত্বে কলঙ্কস্পর্শ করিতে পারে। একান্নবর্ত্তিতার জন্যও বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু লেখক বলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতা উপযোগী নহে। একান্নবর্ত্তিতার জন্য যে সংযম ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক আজকাল তাহা না থাকায় অনেকস্থলেই একান্নবর্ত্তিতা যন্ত্রণার আকর হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা আমাদেরও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু একান্নবর্ত্তিতা উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বা একান্নবর্ত্তিতার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনার যোগ্য।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদসম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, যেরূপ পরিচ্ছদে লজ্জারক্ষা হয় এবং নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বে আঘাত না লাগে, সেইরূপ পরিচ্ছদই স্ত্রীলোকের উপযোগী।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং আর অধিক আলোচনা করিয়া পাঠকের বিরক্তি উদ্রিক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যিনি স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, তিনিই এই চিন্তাপূর্ণ পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকের উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই পুস্তক একবার মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

চিঠিচুরি।

ডিটেক্‌টিভের গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬

বিনয়কুমার চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ঈষদুন্মুক্ত দরজায় কড়ার উপর হাত রাখিয়া অক্ষয়কুমার দাঁড়াইয়া। দেখিয়া বিনয়কুমার আরও বিরক্ত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ অক্ষয়, আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তোর কথার উপর নির্ভর করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। ব্যাপারটা বড় সহজ নহে, এমন কি চিঠিখানা যদি না পাওয়া যায়, আমার মানসম্ভ্রম সকলই যাইবে। আমি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না। তোর নিজের অপেক্ষা তোর বুদ্ধিবৃত্তির উপর আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, সে সম্বন্ধে কোন কথা তোর কাছে এখন প্রকাশ করিয়া আমি তোকে নিরুদ্যম করিতে চাহি না। আমি মনে করিতেছি, কোন একজন ভাল ডিটেক্‌টীভের জন্য টেলিগ্রাফ করিব।"

সেই ভাবে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যের সহিত অক্ষয়কুমার বলিল, "মন্দ কি দাদা, যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। কিন্তু

আমি জানিতে চাই, আপনি সেই চিঠিখানা পাইবার পূর্ব্বে, না পরে, টেলিগ্রাফ করিবেন ?"

"এ আবার কি কথা—আমি বুঝিলাম না।"

"প্রকৃত কথা—সেই চিঠিখানা পাওয়া গিয়াছে।"

"পাওয়া গিয়াছে! সত্য নাকি!" বলিতে বলিতে বিস্ময়স্তম্ভিত বিনয়কুমার, চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আরও বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কই সে চিঠি? কে চুরি করিয়াছিল?"

অক্ষয়কুমার কহিল, "আপনার চিঠি আপনি নিজে চুরি করিয়াছিলেন।"

"আমি চুরি করিয়াছি! অকু, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, পূর্ব্বজন্মকৃত মহাপাতকের ফলেই আমি তোর দাদা হইয়াছি। তুই আমার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আমার অপমান করিস্!" বলিতে বলিতে অতি দুঃখিতভাবে বিনয়কুমার একখানা চেয়ার টানিয়া পুনরুপবেশন করিলেন।

অক্ষয়কুমার কহিল, "দাদা, আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, আমি সত্যকথাই বলিয়াছি।"

বিনয়কুমার আরও রাগিয়া উঠিয়া, রাগে-দুঃখে মহাখ্যাপা হইয়া বলিলেন; "আমি চোর? তুই আমার সম্মুখ হইতে এখনই সরে যা।" মুখভঙ্গীসহকারে "সত্য কথা বলিয়াছি!" সরে যা, চালাকি করিবার জায়গা নাই বটে। তুই না আমার সহোদর ভাই! ভাল, সে চিঠি যদি পাওয়া গিয়াছে, কৈ, নিয়ে আয় দেখি।"

"এই দেখুন আপনার সেই চিঠি।" বলিয়া অক্ষয়কুমার দরজাটা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিয়া বলিল, "সুশীল, একবার আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে এস ত।

সুশীল এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। এখন অক্ষয়কুমারের সহিত সে সভয়ে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বামহস্তে একটা মস্ত লাটাই, এবং দক্ষিণহস্তে তেমনি এক প্রকাণ্ড ঘুড়ি, এবং সেই প্রকাণ্ড ঘুড়িখানায় ততোধিক প্রকাণ্ড একটা লেজুড় ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। অক্ষয়কুমার তাহার হাত হইতে ঘুড়িখানা লইয়া দাদার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনার সেই পত্র।"

তাড়াতাড়ি চস্‌মাখানি চোখে লাগাইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে ঘুড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে বিনয়কুমার বলিলেন, "কই, সে পত্র কই?"

"এই যে, দেখিতে পাইতেছেন না।" বলিয়া অক্ষয়কুমার ঘুড়িখানি দাদার টেবিলের উপর ফেলিয়া দুইপদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। অক্ষয়কুমারের ভয় হইয়াছিল, এইবার বুঝি সবেগে দাদার রুলটা তাহার মাথায় সশব্দে আসিয়া পড়ে। নিতান্ত নিরীহ দাদার রুল অনেকবার তাহার মাথায় পড়িয়াছে। কিন্তু দাদা আপাতত তাহা করিলেন না এবং ঘুড়ির দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। নিতান্ত মর্ম্মভেদী কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, অকু, তুই মনে নিশ্চয় জানিস্, অপরাপর লোকের ন্যায় তোর দাদারও সহ্যগুণের একটা সীমা আছে।"

অক্ষয়কুমার বলিল, "আপনার সহ্যগুণের সীমা আছে কি না, তাহাতে আমার কোন আবশ্যকতা নাই। আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নাই।" অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া—"ঐ দেখুন, আপনার পত্র রহিয়াছে। সুশীলের ঘুড়ির যে লম্বা লেজুড় দেখিতেছেন"—সুশীলের প্রতি—"ঘুড়িটায় লম্বা লেজুড় লাগাইয়া দিতে ঘুড়িখানা কোনদিকে কাত্নিক না টানিয়া বেশ উড়িতেছিল, না সুশীল?" দাদার প্রতি—"সুশীল কাগজের লম্বা ফালিতে ঘুড়ির লেজুড় তৈয়ারি করিয়াছে, আপনি নীচের দিক্‌কার আধখানা লেজুড় কাটিয়া নিন। তাহা হইলেই আপনি আপনার সেই চুরি-যাওয়া পত্রখানা দেখিতে পাইবেন।"

বিনয়কুমার কহিলেন, "আর চালাকি করিতে হইবে না. তুই যা, আর আমার রাগ বাড়াস্ নি।"

অক্ষয়কুমার কহিল, "আপনি না কাটেন. আমি কাটিয়া দেখাইতেছি। পত্রখানা যে এখনও কেহ পড়ে নাই, আপনি নিজে কাটিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া, আমি ঘুড়ি এবং ঘুড়ির মালিককে সুদ্ধ আপনার সম্মুখে আনিয়াছি, নিজে কাটিতে সাহস করি নাই। এখন আপনার সম্মুখে আমি কাটিলে তেমন কোন দোষ হইবে না।"

দশ-বার-টুকরা কাগজের ফালিতে সুশীল সুতার গাঁট দিয়া তাহার ঘুড়ির মস্তবড় এক লেজুড় তৈয়ারি করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার সেই লেজুড়ের নীচের দিক্‌কার অনেকটা কাটিয়া লইয়া দাদার হাতে দিল।

বিনয়কুমার সেই ঘুড়ির ছিন্ন লেজুড়টা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত—তাই ত—এ যে আমারই"—তখন তাঁহার মনের যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা মুখে তিনি কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না—বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে সুশীলের প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পাজী ছেলে—এই চিঠিতে তুই হাত দিতে গিয়াছিলি কেন?"

অক্ষয়কুমার তাড়াতাড়ি দাদাকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "সুশীলের উপর আপনি কেন রাগ করিতেছেন। সুশীল আপনার পত্র চুরি করে নাই। আপনি স্থির হইয়া বসুন—যাহা ঘটিয়াছে, সমুদয় আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।" বলিয়া সুশীলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সুশীল, এই তোর ঘুড়ি নে। তুই এখন এখানে থেকে যা। আমি একটু পরে গিয়া তোর ঘুড়ির আবার একটা এর চেয়ে খুব বড় লেজুড় করিয়া দিব।"

অক্ষয়কুমারের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে সুশীলকুমার তাহার অগ্নিশর্ম্মা পিতার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে এখনও নিজের ভয়ের কারণ ভালরকম বুঝিতে না পারিলেও, পিতার রুদ্র-চণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া যথেষ্ট ভীত হইয়াছিল। পলায়নপর সুশীলকুমার দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেলে, তাহার পিতা সেই পত্রের ছিন্ন টুক্‌রাগুলি নীরবে পরপর সাজাইতে লাগিলেন। মানসিক আনন্দাতিশয্যে তখনও কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

দাদাকে নীরব দেখিয়া অক্ষয়কুমার কহিল, "দাদা, এখন বোধ হয় আমি আপনার নিকট আমার প্রাপ্য পুরস্কারের দাওয়া করিতে পারি।"

দাদা কহিলেন, "অবশ্যই। আমি আরও আড়াইশত টাকা বেশি দিব।" এই বলিয়া ড্রয়ারের ভিতর হইতে একখানা চেক্‌বুক টানিয়া বাহির করিলেন। এবং চেক লিখিবার জন্য এককলম কালী লইয়া প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র যে কেহ পড়ে নাই, তাহা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিব?"

অ। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, কেহই আপনার এ পত্র পড়ে নাই। যখন আমি প্রথম এ পত্রের সন্ধান পাইলাম, তখন দেখি ইহা আকাশমার্গে বিরাজ করিতেছে। আমি জানি, আমি যে আপনার বিনানুমতিতে কোন কাজ করি না, সে বিশ্বাস আপনার খুব আছে। সুতরাং আমার সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। বিশেষত সুশীল যেরূপ ভাবে পত্রখানি টুক্‌রা করিয়াছে, তাহাতে পুনরায় ঠিক করিয়া জুড়িয়া না লইলে এ পত্র কাহারই পাঠযোগ্য হইতে পারে না। সেইজন্য আমি ঘুড়িসুদ্ধ এবং ঘুড়ির মালিককে সুদ্ধ আনিয়া আপনার কাছে হাজির করিয়া দিলাম। সে কথা যাক্; যখন আপনার মুখে প্রথমে শুনিলাম যে, আপনি আজ এই পত্রখানি লিখিবেন, তাহা কেহই জানে না, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনি

উঠিয়া গেলে আপনার এ পত্র চুরি করিবার জন্য জানালা বা দরজা দিয়া কেহই ঘরের ভিতরে আসে নাই। এরূপ স্থলে এ চুরির জন্য আপনিই একমাত্র দায়িক, আর কেহ নহে।

"তবে ভূতে চুরি করিতে আসিয়াছিল।"

অক্ষয়কুমার বলিতে লাগিল, "তাহার পর যখন টেবিলে ঐ গঁদের দাগ দেখিতে পাইলাম, আপনার পত্রখানি কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছে, তখন সেটা আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।"

বি। আমি ত এখনও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

অ। না পারিবারই কথা। কথাটা অতি সহজ। এখন যাহা আপনার ভোজবাজীর মত নিতান্ত বিস্ময়জনক বোধ হইতেছে, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিলে ইহাতে বিস্ময়ের বিন্দুমাত্র দেখিবেন না। ইতিপূর্ব্বে আমি আপনার আলমারীতে গঁদের এই ভাঙা-ফাটা শিশিটা দেখিতে পাই। এই দেখুন, শিশির এই ফাটামুখ দিয়া ঝরিয়া অনেকটা গঁদ আলমারীতেও পড়িয়াছে।

বি। হাঁ হাঁ, ঠিক বটে, ঐ আলমারী হইতে যখন ঐ রিপোর্ট-বইখানা টানিয়া বাহির করিতে যাই, শিশিটা আমার পায়ের উপর পড়িয়া যায়। কিন্তু শিশিটা যে ফাটিয়া গিয়াছে, ব্যস্ত থাকায় তখন আমি তাহা অত লক্ষ্য করি নাই।

অক্ষয়কুমার কহিল, "তাহাই হইবে। যাই হোক, তাহার পর টেবিলের উপরও এই গঁদের দাগ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, যখন আপনি রিপোর্ট-বইখানা টানিয়া বাহির করিতেছিলেন, সেই সময়ে হউক বা পরে যখন উহা পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে যান্, ঐ গঁদ আপনার কামিজের আস্তিনে লাগিয়াছে। আপনি জানিতে পারেন নাই।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার দাদার কামিজের দক্ষিণহস্তের আস্তিনটা ঘুরাইয়া ধরিল। বিনয়কুমার দেখিলেন, বাস্তবিক তাহাই বটে।

অক্ষয়কুমার বলিতে লাগিল, "তাহার পর যখন আপনি চিঠীখানি ব্লটিংপ্যাডের উপর উল্টাইয়া দুইএকবার ডানহাতের আস্তিন দিয়া চাপিয়াছিলেন, সেই সময়ে চিঠিখানা আস্তিনের গঁদে লাগিয়া যায়। এবং বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন, সেজন্য চিঠিখানার উপর তখন আপনার নজর পড়ে নাই। তখন আমি মনে করিলাম, আপনার অজ্ঞাতসারে আস্তিন হইতে চিঠিখানা কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে, সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এই ঘরের ভিতরে যখন চিঠিখানা পড়ে নাই, তখন অবশ্যই বাহিরে কোনস্থানে পড়িয়া থাকিবে। দ্বিতলে উঠিবার পূর্ব্বেই চিঠিখানা আস্তিন হইতে খুলিয়া পড়াই সম্ভব। কেন না, দ্বিতলে উঠিলে বউদিদি অবশ্যই চিঠিখানা আপনাকে দেখাইয়া দিতেন। তাহার পর আমি ইতস্তত করিতে করিতে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির নীচে কতকগুলা কাগজের টুক্‌রা দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে আপনার চিঠীর মত কিছু দেখিতে পাইলাম না। তখন সহসা সুশীলচন্দ্রের কথা মনে পড়িল। তাহার ঘুড়ি উড়িতে চায় না দেখিয়া সে বিব্রত হইয়াছিল, এবং আমাকেও সেজন্য একবার বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্যই সে আপনার পত্রখানিতে তাহার ঘুড়ির লেজুড় করিয়া থাকিবে মনে করিয়া আমি তাহার সন্ধানে ছাদের উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, এক দীর্ঘ লেজুড় লইয়া সুশীলচন্দ্রের ঘুড়ি আকাশে নিঃশব্দে বিচরণ করিতেছে। তাহার পর ঘুড়িখানা নীচে নামাইয়া আনিয়া দেখি, যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তখন আমি সন্যাঙ্গুল-ঘুড়িলাটাই-সমেত সুশীলকে আপনার কাছে লইয়া আসিলাম। আপনার চিঠিখানা যে আর কেহ পড়ে নাই, এখন বোধ করি আপনি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। আমি সুশীলকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, সেখানা সে সিঁড়ির পাশে কুড়াইয়া পাইয়াছে। আপনার হাতের লেখা পাঠ করা সম্বন্ধে

সুশীলের ক্ষমতা কতদূর, তাহা আপনি জানেন। পত্রখানি অদৃশ্য হওয়ায় আপনি প্রথমে যতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এখন বোধ করি ইহাতে আশ্চর্য্যের তেমন কিছুই নাই, দেখিতেছেন।"

আশ্চর্য্য কিছুই নাই বটে, কিন্তু পত্রখানি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন দশদশা প্রাপ্ত হইবে, তাহা কে জানিত? বলিতে বলিতে বিনয়কুমার পুনরায় এককলম কালী লইয়া চেক লিখিতে লাগিলেন। পাঁচশত টাকার একখানি চেক অক্ষয়কুমারের হাতে দিয়া কহিলেন, "আমার হাতে এই তোর ডিটেক্টীভগিরি বৌনী হইল। যাহাতে এখন অপরের নিকট হইতে এই কাজে তোর আরও চেক্‌প্রাপ্তি ঘটে, সেজন্য চেষ্টা কর্ গিয়া—আমার আর অমত নাই।"

অক্ষয়কুমার চেক্ লইল না। দাদাকে ফেরৎ দিয়া বলিল, "আমি পুলিসবিভাগে কাজ করিবার জন্য আপনার সম্মতিমাত্র পাইবার আশা করিয়াছিলাম। চেকের আশা করি নাই। টাকা আমি লইব না।"

বিনয়কুমার আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। লিখিত চেক্‌খানি লইয়া পুনরায় ড্রয়ারের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

সেবার শারদীয়া পূজার সময় বিনয়কুমার তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে পাঁচ শতাধিক টাকার একজোড়া স্বর্ণবলয় কিনিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, তখন অক্ষয়কুমার দাদার অনুমতিক্রমে পুলিসকর্ম্মচারি-শ্রেণীভুক্ত। *

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সমাপ্ত।

* ইহার পর অক্ষয়কুমার যখন একজন নামজাদা পাকা ডিটেক্টীভ, তাঁহার তখনকার জীবনের কয়েকটি কৌতূহলজনক রহস্যপূর্ণ কাহিনী পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিবার ইচ্ছা আছে। লেখক।

অনুস্বর ও বিসর্গ।

সে অনেক দিনের কথা। একবার সংস্কৃত-সাহিত্য-আলোচনার ঝোঁক হইয়াছিল কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবির খ্যাতি শৈশব হইতে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একটু প্রত্যক্ষপরিচয়সাধনের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল।

কিন্তু এই প্রবল প্রবৃত্তির স্রোত অকস্মাৎ অর্দ্ধপথে শুকাইয়া গেল—ঝঙ্কারিত কবিতালহরী সহসা বাক্যাভাবে ছন্দভগ্ন হইয়া অচল হইয়া দাঁড়াইল! সংস্কৃতসাহিত্যের দ্বারদেশে অবস্থিত দুই দ্বারীর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া আমার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে হইল!

আমি স্বভাবত কিছু অভিমানী, কিছু অপমান-ভয়-ভীত। তাই লাঞ্ছনাটা বড় মনে লাগিয়াছিল।

একদিন নিদাঘের প্রত্যূষে তখনও তন্দ্রা সম্পূর্ণ কাটে নাই—এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নেও সেই লাঞ্ছনা—দ্বারিদ্বয় অর্দ্ধচন্দ্রদানোদ্যত। মনে কিঞ্চিৎ ক্রোধের উদয় হইল। দ্বারিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"বাপু অনুস্বর ও বিসর্গ, তোমাদের এত আস্ফালন কেন বল দেখি? তোমাদের নিজের ত একটা স্থান পর্য্যন্ত নাই—চিরকাল কেবল পরের স্কন্ধে ভর করিয়া দিব্য নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতেছ! তোমাদের এতটা আস্ফালন সহ্য হয় না। তোমরা সংসারে না থাকিলেই বা জগতের কি হানি, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না। কি কৌশলে যে তোমরা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছ, তাও বুঝা কঠিন। প্রাচীন হিন্দুদের নির্ব্বোধ পাইয়াই কিছু সুবিধা করিয়া লইয়াছ, একালে আর অত বাড়াবাড়ি খাটিবে না। বাংলাদেশে তোমাদের অন্ন ত একরকম উঠিয়াছেই—যেটুকু আছে, তাও শীঘ্র যাইবে!"

আমার এই তীব্রোক্তিতে অনুস্বর ও বিসর্গ কিছুমাত্র ভীত হইল না—

বরং এক ক্ষীণকটি মুণ্ডিতশীর্ষ নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার পার্শ্বদেশস্থ অনুস্বরাকারে বিলম্বিত অসিফলক ঝঞ্ঝনায়িত করিয়া "কাংস্যক্রেঙ্কার"-ধ্বনিতে বলিতে লাগিল—

"তুমি অতি অর্ব্বাচীন, তাই আমাদের অবজ্ঞা করিতেছ। বাংলা-দেশ হইতে আমাদের অন্ন উঠিয়াছে, এ কথা বলা তোমার মত অন্ধের পক্ষেই শোভা পায়। বাংলাসাহিত্য হইতে যতই আমাদের তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছ, ততই আমরা চারিদিকে জাঁকিয়া বসিতেছি। আমরা না থাকিলে এতদিন তোমাদের হাট ভাঙিয়া যাইত—চারিদিক্ আঁধার দেখিতে। তোমাদের এ বাংলাদেশে স্বরবর্ণ কয়জন? সবই ত আমরা—সবই ত আশ্রয়স্থানভাগী।

"বিশ্বাস করিতেছ না?

"ওই দেখ, ওই যে সব আকুঞ্চিত-কুন্তলরাজি-শোভিত—সুবর্ণচসমা-মণ্ডিতনেত্র—নারীপ্রকৃতি—কার্পেটমণ্ডিতপদযুগল, উদাসদৃষ্টি, অনু-নাসিকস্বরসংযুক্ত বাবুর দল—উঁহাদের সাটিনের পোষাক ও চিক্কণ সাজ দেখিয়া কি মনে করিতেছ, উঁহারা সব স্বত উচ্চারিত? ভ্রমেও তাহা ভাবিও না। একটু চাপিয়া ধরিলেই দেখিবে, উঁহাদের ভাবের কোন ভিত্তি নাই—কবিতার কোন বন্ধন নাই—উঁহারা সব রবিবাবুর অনুস্বরবর্গ—তোমাদের সাহিত্যে একএকজন মহারথী—অমরত্বলাভের ভরসা রাখেন।

"তার পর ওই যে ওদিকে বাছিয়া-বাছিয়া বানাইয়া-বান'ইয়া গুম্ফ-মর্দ্দন করিতে করিতে উপন্যাসের স্রোত ভাসাইতেছেন—প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া—কার্য্যকারণসম্বন্ধের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া বিপুল বিরাট্ কায় সংহার-উপসংহারাত্মক গল্পরাজি গঠিত করিয়া তুলিতেছেন—উঁহাদের কি মনে কর? উঁহাদের গর্ব্বিত দৃষ্টি, কাহারও বা অর্দ্ধপক্ক শ্মশ্রুরাজি, কাহারও বা শোভন গুম্ফ-

লীলা দেখিয়া হয় ত ভাবিতেছ—ইঁহারা নিশ্চয়ই স্বরবর্ণ। এত স্তূপাকার গ্রন্থরাশি, এত বিপুল আড়ম্বরের তলে কি কোন ভিত্তি নাই? একটু চাহিয়া দেখ—ইঁহারাও আমাদের স্বশ্রেণী—বঙ্কিমবাবুর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া তাঁহার রক্তশোষণে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছেন।

"বঙ্কিমবাবুর অনুস্বর-বিসর্গ অনেক, কারণ তাঁহার স্বর কিছু বেশী ছিল—তাঁহার উপর ভর করিয়া অনেকেরই তিষ্ঠিবার সুবিধা আছে—ক্ষুদ্র স্বর হইলে এত চাপে মারা পড়িতে পারিত—কিন্তু বঙ্কিমবাবুর শ্বাসযন্ত্র কিছু সুদৃঢ়—এততেও টিকিয়া আছেন। সমালোচক, সম্পাদক, প্রবন্ধলেখক, অনেকেই ইঁহার উপর চাপিয়া আছেন। কোন্ দিক্ ছাড়িয়া কোন্ দিক্ই বা দেখাইব? প্রহসনকার-নাটককারদের দেখি-তেছ? ইঁহাদের চুণকালীর ভাঁড় ইঁহাদের নিজস্ব ভাবিতেছ!—তোমার নিতান্ত মতিভ্রম। ইঁহারা দীনবন্ধু প্রভৃতির স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া আছেন।

"'এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়!'

"বক্তাদের কণ্ঠলহরী শুনিয়া বিচলিত হইতেছ, উঁহাদের মধ্যেও আমরা আছি।

"ওই রাসভলাঞ্ছনদিগের দল, উঁহাদের সূর্য্য ভাবিও না—উঁহারা উপগ্রহমাত্র।—সুরেন্দ্রনাথ-লালমোহনের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

"'সমাজসংস্কার' 'বিধবাবিবাহ'—প্রভৃতি চীৎকারকারী সংস্কারক-দলের তুমুল কোলাহল শুনিয়া ভাবিতেছ, ইঁহারা সমাজসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন বা সংস্কারাদির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া-ছেন! মনেও করিও না। ইঁহারা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি-মাত্র—আমাদেরই দলপুষ্টি করিতেছেন।

"ওই যে আর একদল দেখিতেছ—যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্যাকুল

হইয়া উঠিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম্ম মহান্, জাগ্রত, শাশ্বত" বলিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন—উঁহাদের কি ভাবিতেছ? ধর্ম্মের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে মনে করিতেছ? হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গলময় পবিত্র ভাবে ইঁহাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বাস করিতেছ? মূর্খ আর কাহাকে বলে?

"ইঁহারাও ঐ—কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের অনুস্বর ও বিসর্গ মাত্র।

"আর কত দেখাইব—যে দিকে চাহিবে—কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি আন্দোলনে—সর্ব্বত্রই আমরা। আমাদের নহিলে সংসার শ্মশান—জগৎ নীরব। ২।৪ জন স্বরবর্ণ—আমরা হাজার হাজার। খাতির Majorityর—আমাদের প্রতি সম্মান রাখিও, তোমার কল্যাণ হইবে। বঙ্গদেশ হইতে আমাদের তাড়াইবে? তার চেয়ে আকাশ উৎপাটন কর না কেন? 'হাজারযোজন' লেজ বাড়াইয়া দাও না? পৃথিবীর মধ্যে বঙ্গদেশেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা দলপুষ্টি—যে সংস্কৃত-সাহিত্যে আমাদের দেখিয়া ভয় পাইয়াছ, সেখানে বরঞ্চ আমাদের তত পসার নাই।

"বাংলাদেশ হইতে আমাদের তাড়াইবে? ইচ্ছা করিলে বরং আমরা তোমাদের তাড়াইতে পারি। তোমাদের মত সমালোচকের আমরা তোয়াক্কা রাখি না। যদি ভাল চাও, আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখ—আমাদের চটাইও না। তোমার বিস্তর বাড়াবাড়ি আমরা সহ্য করিয়াছি। তোমার 'আদর্শ কবিতা'—'আদর্শ উপসংহার' প্রভৃতি আমরা সবই দেখিয়াছি। আমরা উহাতে ভয় পাই নাই। ভয় পাইব কেন? আমাদের সংখ্যা বিস্তর, ভক্ত অগণ্য—আমরা তোমায় ডরাইব? তোমারি মঙ্গলার্থে বলিতেছি—আমাদের আর চটাইও না।"

অনুস্বর ও বিসর্গ মহাশয় চুপ করিলেন। আমি চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম কেবল অনুস্বর আর বিসর্গ—স্বরবর্ণ প্রায় দেখাই যায় না।

যাহাদের ভয়ে সংস্কৃত ছাড়িয়াছি—তাহারাই আমার আশেপাশে ঘুরিতেছে! শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, প্রভাতের আলো আমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবাদে বলে, প্রভাতের স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হয়। আমার এ স্বপ্ন সত্য নাকি?

শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।

প্রেমের আদর্শ।

সমস্ত সাহিত্য ও ললিতকলায় অনেকসময় প্রেম প্রাধান্যলাভ করিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ চিত্র ও চরিত্রে যে একটা প্রেমের আদর্শ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সমাজ ও জাতিভেদে বিভিন্ন। বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের আদর্শের বিষয় আলোচনা করিলে কথাটা কিছু পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

আমাদের সাহিত্যেও জ্যোৎস্নাপুলকিত মলয়সিঞ্চিত বনবীথিকায় ফুলে ফুলে প্রেম ফুটিয়া উঠে,—প্রকৃতির বিচিত্র শোভন দৃশ্যে, সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ছায়ালোকে বহু মিলনবিরহে, সুখে-দুঃখে প্রেম পরিণতি-লাভ করে।

মনে কর, সেই হরিদ্রাগ্রামের বাপীতটে, বসন্তের কোকিল একবার ডাকিয়া কি কাণ্ডটাই না বাধাইয়া দিল; আর সেই নীলফেনিল অনন্ত সমুদ্রকূলে আলুলিতকুন্তলা বনবালিকার করুণকণ্ঠে নবকুমারের দশা কি হইল!

কিন্তু তাহার পরিণতি স্বতন্ত্র—তাহা শান্ত, সংযত; কখনও তাহা মঙ্গলকে অতিক্রম করে নাই।

সেইজন্য Romantic loveটা নিতান্তই বিলাতী জিনিষ এবং সহস্রচেষ্টাসত্ত্বেও তাহা আমাদের চরিত্রে ঠিক মিশ খাইল না।

মনে কর, শৈবলিনীর চরিত্রে বঙ্কিমবাবু কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বজ্র নিপাত করিলেন। হিন্দুর চিরাচরিত আত্মার একনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সমাজ ও মঙ্গলকে অতিক্রম করিয়া কুন্দনন্দিনীর প্রেমের দশা কি হইল? হিন্দু-রমণীর চিরক্ষুণ্ণ পথ হইতে সরিয়াছিল, ভ্রমর অতি দুঃখে মরিল, রোহিণীর রূপলালসায় আত্মসমর্পণ করিয়া গোবিন্দলালের সংসার ছারখার হইল। অথচ সূর্য্যমুখীর ও প্রতাপের চরিত্রে ক্রমাগত স্বার্থবিসর্জ্জন ও আত্মত্যাগে যে প্রেম পরিণতিলাভ করিয়াছে, তাহা যেমনি সংযত, তেমনই মহিমান্বিত! প্রবৃত্তির পথে না গিয়া নিবৃত্তির পথেই তাহাদের চরম স্ফূর্ত্তি।

ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রবৃত্তির আলোকে প্রেমকে অঙ্কিত করিলে, তাহার একটা প্রচণ্ড আবেগ, বিজয়িনী ঘূর্ণা সমস্ত সমাজকে বিধ্বস্ত ও মঙ্গলকে পদদলিত করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করে; ইহাই পাশ্চাত্যপ্রেমের আদর্শ। কিন্তু মঙ্গল-আলোকে সর্ব্বশুভান্বিত প্রেমের যে শান্ত-সংযত মূর্ত্তি অপরূপ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই প্রাচ্য প্রেমের আদর্শ।

কেন না, প্রবৃত্তির পথে না গিয়া নিবৃত্তির পথেই আমাদের সাফল্য। চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস বরং শ্রেয়স্কর, তথাপি পিতৃসত্য লঙ্ঘিত হইবার নহে; বরং প্রিয়তমা রাজমহিষীকে ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, তথাপি রাজার প্রধান কর্ত্তব্য যে লোকরঞ্জন, তাহাতে যেন ত্রুটি না হয়।

এই নিবৃত্তির উজ্জ্বলচিত্রের পার্শ্বে লঙ্কার প্রবৃত্তিসঙ্কুল মোহময় চিত্রাবলী কত ম্লান, কত ক্ষণভঙ্গুর। মহাভারতের সংযম ও নিবৃত্তির

পথ ত্যাগ করিয়া কৌরবকুলের যে অকালবিলয় ঘটিয়াছিল, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

যেখানে রাজপুত্র করায়ত্ত সমস্ত রাজ্যভোগসুখ ত্যাগ করিয়া সত্যের অন্বেষণে আত্মসমর্পণ করে এবং বর্ণাশ্রমের বিবিধ পর্য্যায়ে সমস্ত গৃহী প্রবৃত্তির পথে সামাজিক শুভ বিনষ্ট না করিয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ নিবৃত্তির পথে আত্মবিকাশ প্রার্থনীয় মনে করে, সেখানে যে প্রেম আত্ম-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা আত্মবিসর্জ্জনে অধিকতর ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

আমাদের যাহা শুভ, তাহাই সুন্দর, তাহাই সত্য। যাহা অশুভ, তাহা সৌন্দর্য্যের বিনাশক। হিন্দুরমণীর সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু সুন্দর, তাহা সধবাত্বের পরিচায়ক বলিয়া; এবং পুত্রবতী নারীর যে এত সৌন্দর্য্য, সে কি তাহার মাতৃত্বের পরিচায়ক বলিয়া নহে? সেইজন্য যে প্রেম শুভকর, তাহাই সুন্দর বলিয়া আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে। এবং সেইজন্যই যে প্রেম গোপনে মঙ্গলকে অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেবর্ষির অভিশাপে চিরদিন অভিশপ্ত এবং কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সহায়তায় ও কন্দর্প এবং বসন্তের সহকারিতায় যে প্রেম ফুটিতে চাহিয়াছিল, তাহা সফল হইল না। আমাদের কবিও তাহাই অঙ্কিত করিয়াছেন। একটি চিত্র দেখুন।

মণিপুররাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা পার্থদর্শনে মুগ্ধা। পার্থ তখন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী, সুতরাং চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। চিত্রাঙ্গদা, প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা সময়সাপেক্ষ মনে করিয়া, রমণীসৌন্দর্য্যের মোহ-জাল বিস্তার করিল। ধ্যানরত মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে মদন ও বসন্ত যেমন পার্ব্বতীর সহায় হইয়াছিল, এখানেও তাহারা তেমনি চিত্রাঙ্গদার সাহায্যে কৃতসঙ্কল্প। ঋতুরাজ চিত্রাঙ্গদাকে বর দিয়াছেন, তাহার কুরূপ দূর হইবে, তিনি বলিয়াছেন:—

"বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি,
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকাশি।"

চিত্রাঙ্গদা এই বর লাভ করিয়া বসন্তের পুষ্পাভরণ এবং অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিত যৌবনোচ্ছ্বাস লইয়া অর্জ্জুনের নিকটবর্ত্তী হইলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের যোগভঙ্গ করিতে গিয়া কাম ভস্মীভূত হইয়াছিল, কিন্তু অর্জ্জুন অশেষগুণসম্পন্ন হইলেও মানব, সুতরাং চিত্রাঙ্গদার মনোমোহন রূপরাশি তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চক্র উঠি
যেমন নিমেষে ভাঙি দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা অন্ধকার।"

কিন্তু প্রেমই সৌন্দর্য্যকে অমরতা প্রদান করে এবং তাহার অরূপ লাবণ্য প্রেমের কনককিরণে অজস্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু রূপলালসামুগ্ধ অর্জ্জুনের হৃদয়ে তখনও প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাই বসন্ত নিত্যনূতন "সৌন্দর্য্যসম্ভার" জোগাইতে জোগাইতে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

"শ্রান্ত আমি ; ক্ষান্ত দাও সখা! হে অনঙ্গ
সাঙ্গ কর রণরঙ্গ তব। রাত্রিদিন
সচেতনে থাকি, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্ত দীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব উজ্জ্বলতা।"

অনুদিন সৌন্দর্য্যের উপভোগে অর্জ্জুনও ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। পূর্ব্বে মনে হইত না, কিন্তু পরে মনে হইত, চিত্রাঙ্গদার জন্যই—

'চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্ত্তব্যবিহীন।'

মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত, এই প্রেমখেলা সমাপন করিয়া তিনি কর্ত্তব্যসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িবেন। তখনও সংবৎসর পূর্ণ হয় নাই, তখনও চিত্রাঙ্গদার যৌবনললিত দেহলতায় বাসন্ত সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ. কিন্তু অর্জ্জুনের হৃদয় তথাপি যেন অ-তৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পর পার্থ যখন চিত্রাঙ্গদাকে জানিতে পারিলেন, যখন তাঁহার ছদ্মবেশ দূরীভূত হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, চিত্রাঙ্গদা

"স্নেহে নারী বীর্য্যে সে পুরুষ।"

তখন বসন্তপ্রদত্ত অঙ্গশোভা বসন্তের অক্ষয়ভাণ্ডারে ফিরিয়া গেলেও প্রকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইল। চিত্রাঙ্গদার রূপরাশিমাত্র দেখিয়া যাহা বলেন নাই, গুণরাশিদর্শনে তাহা বলিলেন। অর্জ্জুনের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—

"প্রিয়ে আজ ধন্য আমি।"

কবি বৈকুণ্ঠের পথে যে প্রেমের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছেন, তাহা কখনও আপনাকে লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। যে প্রেম ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত না হয়, আমাদের কবির মতে তাহা প্রকৃত প্রেম নহে। দাম্পত্যপ্রেম ক্রমে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়, কবির কথায়—

"যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎলক্ষ্মীর রূপ পাই নি তখন।

* * * * * *

অপরূপ মায়াবলে তব হাসিগান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে-আগে দীপ হাতে করে'
তব পাছে-পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।"

বিশ্ব যদি পাছে-পাছে প্রবেশ না করে, প্রেম যদি কেবল আত্ম-তৃপ্তিতে পরিসমাপ্ত হয়, তবে সে প্রেমের সাফল্য নাই। কবি রাজা ও রাণী নামক নাটকেও তাহা দেখাইয়াছেন।

বিক্রমদেব প্রেমে আত্মতৃপ্তি মাত্র চাহিতেছেন; সংসাররাজ্য তাঁহার নিকট কিছুই নহে। রাণী সুমিত্রা গৃহকাজে গেলেও তিনি অস্থির হইয়া বলেন—

"থাক্ গৃহ, গৃহকাজ!
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই;
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ!"

সুমিত্রা যদি মনে করাইয়া দেন, এখন তাঁহারা রাজারাণী, সুতরাং কর্ত্তব্যসম্পাদন অবশ্যকরণীয়, তবে বিক্রমদেব বলেন—

"নহি আমি রাজা! শূন্য সিংহাসন কাঁদে!
জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।"

রাজার প্রেমসম্বন্ধে যখন এই আদর্শ, তখন রাজ্যের মঙ্গল কোথায়! প্রজাগণ বিদেশীর উৎপীড়নে ধনহীন, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, নির্য্যাতিত, রাজা তাহাদের কাতর ক্রন্দনে বধির। প্রজার দুঃখদারিদ্র্যের কথা যখন সুমিত্রার শ্রবণগোচর হইল, যখন তিনি জানিলেন রাজকর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছে, কিন্তু রাজার প্রেমের মোহ তখনও অক্ষুণ্ণ,

তখন প্রজার ক্লেশনিবারণের জন্য সুমিত্রা রাজান্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রমদেবের স্বার্থপর প্রেমে বিধাতার বজ্র নিপতিত হইল। যে প্রেমের জন্য তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রেমের জন্য তিনি সংসারকে সসম্ভ্রমে দূরে রাখিয়া অন্তঃপুরে আত্মতৃপ্তির জড় আচরণের মধ্যে জড়িত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বিশ্বহিত সেই অন্তঃপুর হইতে তাঁহার প্রেমপ্রতিমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল, তাঁহার সযত্নরক্ষিত সেই প্রেম নিমেষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বিক্রমদেবের প্রেমের মত কুমার ও ইলার প্রেমও বুঝি ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। যাহা প্রকৃত প্রেম, তাহা মিলনে, বিরহে, সকল অবস্থায় ফুটিয়া উঠে। ইলার প্রেমসম্বন্ধে আদর্শ—

"সুখ, দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জ্জন করি রমণীর সুখ।"

ইলা কুমারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, সুতরাং কে বলিতে পারে, তাহার প্রেম সফল হয় নাই। আর কুমারের প্রেমসম্বন্ধে মত—

"পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে! শ্রান্তিহীন কর্ম্মসুখভরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী
বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
পারি নে করিতে ভোগ অলসের মত।"

বিশ্বমাঝে কর্ম্মসুখে যে প্রেমের লক্ষ্য, সে প্রেম কুমারের জীবনে, কুমারের কার্য্যে এবং প্রজার মঙ্গলসাধনে, অবশেষে আত্মজীবন-

বিসর্জ্জনে যে সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেমের আদর্শ যেখানে অতি উচ্চ, অর্থাৎ যে প্রেম প্রকৃত প্রেম, সেখানে সংসারের মাপকাটি লইয়া তাহার সফলতাবিচার চলে না। বঙ্কিম-বাবুর কথায় সেখানে "একক্বরি গজ" চালাইতে হয়।

বিক্রমদেবের প্রেমের আদর্শ ছিল কেবল আত্মতৃপ্তি, উহা সফল হয় নাই, হইতে পারে না। এই ক্ষুদ্র আদর্শের ভ্রম তিনি শেষে বুঝতে পারিয়াছিলেন এবং তাই তাঁহার বেদনাকাতর হৃদয় হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!"

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।